মাহিষ্য-সমাজ।

তৃতীয় ভাগ—১৩২০।

সম্পাদক—শ্রীসেবানন্দ ভারতী।

MAHISHYA-SAMAJ.

Vol—III.

Editor—SEBANANDA BHARATI.

কলিকাতা ইটালী, ৩৮নং পুলিশ হাসপাতাল রোড,

মাহিষ্য-সমাজ ও বঙ্গীয়-মাহিষ্য-সমিতির কার্য্যালয় হইতে

শ্রীনরেন্দ্র নাথ দাস কর্ত্তৃক প্রকাশিত

ও

বহুবাজার, ১৪নং মদন বড়ালের লেন লীলা প্রিণ্টিং ওয়ার্কসে

প্রকাশক কর্ত্তৃক মুদ্রিত।

১৩২০ সাল।

মূল্য ১৲ এক টাকা মাত্র।

বর্ণানুক্রমিক সূচী।

মাহিষ্য-সমাজ।

তৃতীয় ভাগ—১৩২০।

সম্পাদক—শ্রীসেবানন্দ ভারতী।

MAHISHYA-SAMAJ.

Vol—III.

Editor—SEBANANDA BHARATI.

কলিকাতা ইটালী, ৩৮নং পুলিশ হাসপাতাল রোড,
মাহিষ্য-সমাজ ও বঙ্গীয়-মাহিষ্য-সমিতির কার্য্যালয় হইতে
শ্রীনরেন্দ্র নাথ দাস কর্ত্তৃক প্রকাশিত
ও
বহুবাজার, ১৪নং মদন বড়ালের লেন লীলা প্রিন্টিং ওয়ার্কসে
প্রকাশক কর্ত্তৃক মুদ্রিত।

১৩২০ সাল।

মূল্য ১৲ এক টাকা মাত্র।

ব্যবসা ও বাণিজ্য।

দ্বিতীয় বৎসর !!

(কৃষি, শিল্প ব্যবসায় ও বাণিজ্য সম্বন্ধীয় সচিত্র মাসিক পত্র)

অগ্রিম বার্ষিক মূল্য—৩।৴৹।

সম্পাদক—শ্রীশচীন্দ্র প্রসাদ বসু।

৩৫ নং সীতারাম ঘোষের ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

নিরন্ন বাঙ্গালীর ঘরে অন্ন যোগাইবার জন্য—বেকার লোকের কাজ কর্ম্ম জুটাইবার জন্য, আমাদিগের আশে পাশে, বনে জঙ্গলে, পাহাড়ে পর্ব্বতে, কোথায় কি ধনরত্ন আছে তাহার সন্ধান বলিয়া দিবার জন্য, আমাদিগের নষ্টপ্রায় শিল্পবাণিজ্য পুনরুদ্ধার করিবার জন্য, কৃষিপ্রাণ ভারতে কৃষির উন্নতির জন্য, যাহার ধন আছে তাহার সদ্ব্যবহার ও বৃদ্ধির উপায় নির্দ্দেশ জন্য, কৃষির কৃষি, শিল্পীর শিল্প, ব্যবসায়ীর ব্যবসায়, ও গৃহস্থের গৃহস্থালী যাহাতে সুচারুরূপে সম্পন্ন হয়, তাহার আলোচনার জন্য ব্যবসায় ও বাণিজ্য বাহির হইয়াছে।

বেঙ্গলী বলেন:—Every article gives some new ideas and suggestions to those who had been struggling hard to eke out an independent existence.

অমৃত-বাজার বলেন:—Byabosa-o-Banijya would prove a very valuable adition to the vernacular periodical literature of the country.

ডেলি-নিউজ বলেন:—It is not only the mouthpiece of Bengal trade and commerce but exposes fraudulent practices in the line.

বঙ্গবাসী বলেন:—ব্যবসা ও বাণিজ্যে যে সকল সময়োপযোগী বিষয়ের আলোচনা হইয়া থাকে, ঐ সকলের দ্বারা অনেক নিরুপায় যুবকের জীবনোপায়ের পথ প্রস্তুত হইবে।

হিতবাদী বলেন:—আমরা বঙ্গীয় যুবকদিগের হাতে হাতে ব্যবসা ও বাণিজ্য দেখিতে ইচ্ছা করি।

স্বাস্থ্য-সমাচার বলেন:—ইহা বঙ্গের গৃহে গৃহে ধর্ম্ম পুস্তকের ন্যায় পঠিত হউক।

যশোহর বলেন:—ব্যবসা ও বাণিজ্য হতাশ যুবকদিগের জীবনের অবলম্বন হউক।

নীহার বলেন:—প্রত্যেক ব্যবসায়ীর এই কাগজ মনোযোগের সহিত পাঠ করা উচিত।

২৪ পরগণা বার্ত্তাবহ বলেন:—শচীন্দ্র বাবু এই উৎকৃষ্ট পত্রিকাখানির প্রচার দ্বারা দেশের এক বিশেষ অভাব দূর করিয়াছেন।

হিতবার্ত্তা বলেন:—হিন্দুদের পঞ্জিকার ন্যায় এই পত্রিকা ব্যবসায়ীদের পক্ষে অপরিহার্য্য।

আনন্দ-বাজার বলেন:—নানাবিধ শিক্ষণীয় প্রসঙ্গে ব্যবসায় বাণিজ্যের কলেবর পূর্ণ।

ঢাকা-প্রকাশ বলেন:—ইহার নাম সার্থক হইয়াছে একথা অসঙ্কোচে বলা যাইতে পারে। বহু নিত্য প্রয়োজনীয় বিষয়ের আলোচনায় অলঙ্কৃত হইয়া এই পত্রখানি অনুসন্ধিৎসু ব্যক্তি মাত্রেরই চিত্তাকর্ষক হইয়াছে।

সুরমা বলেন:—ব্যবসা ও বাণিজ্য অতি নিপুণতার সহিত লিখিত হইতেছে।

বর্ণানুক্রমিক সূচী।

মাহিষ্য-সমাজ।

তৃতীয় ভাগ।

রঘুনন্দন ভট্টাচার্য্য ও তাঁহার নব্যস্মৃতি।

(১)

বর্ত্তমান সুসভ্য ব্রিটিশ রাজত্বের শুভদিনে প্রত্নতত্ত্বের অনুসন্ধিৎসার অনুকূল-সুবাতাসে জাগ্রত হইয়া, উদারতার নেত্রোন্মীলনে একবার অতীতের অদূরবর্ত্তিনী যবনিকা খানিকে উত্তোলন করিলে, দেখিতে পাওয়া যাইবে যে, এই শস্য-সম্পৎ-সমন্বিতা কলুষনাশিনী সুরকল্লোলিনী কল-স্বর-নিনাদিতা বাণিজ্যপোতবহুল-সুবিপুল নক্রমকরাদিসঙ্কুল উত্তাল-তরঙ্গ-ভয়াল ভীমভৈরব-রব অর্ণববন্দিতা বঙ্গভূমিতে বৌদ্ধধর্ম্মের অভিযানের সঙ্গে সঙ্গে সুপ্রতিষ্ঠিত বৈদিকধর্ম্মের আত্ম-গোপন—তৎপশ্চাৎ রাজ্যবিস্তৃতির নামে বিজাতীয় ধর্ম্মবিস্তার—এইরূপ ধর্ম্ম-বিপ্লবের বিভীষিকাময়ী কালরাত্রির প্রদোষকালে, হিন্দুধর্ম্মের অবসন্নতার চূড়ান্ত চরম সময়ে, বঙ্গের সুপবিত্র কেন্দ্রস্থল হইতে যে দুই অনন্যসাধারণ প্রতিভাপ্রদীপ্ত অলৌকিক শক্তিমান্ মহাপুরুষ প্রাদুর্ভূত হইয়াছিলেন, তাঁহাদের একের নাম শ্রীশ্রীচৈতন্যদেব, অপরের নাম বন্দ্যঘটীয় হরিহর ভট্টাচার্য্যাত্মজ **মহামহোপাধ্যায় রঘুনন্দন ভট্টাচার্য্য।**

কে না স্বীকার করিবে যে, ধর্ম্মবিপ্লবরূপ বিষম প্রাবৃট্‌প্লাবনের সময় শ্রীচৈতন্য ও শ্রীরঘুনন্দন এই দুই মহাত্মা উদ্ভিদ্ধ মহানদের সুদৃঢ় তটযুগের ন্যায় বঙ্গদেশকে কর্ম্মনাশার অগাধজলের চিরাবগাহনের পথ হইতে রক্ষা করিয়াছেন? কে না স্বীকার করিবে যে, রাষ্ট্রবিপ্লবের নিত্য সহচর ধর্ম্মবিপ্লবের ঘোর বাত্যান্দোলনের করাল গ্রাস হইতে বঙ্গদেশকে রক্ষা করিবার জন্য শ্রীচৈতন্য ও শ্রীরঘুনন্দন এই দুই মহাত্মা মহামহীরুহের স্বরূপ দণ্ডায়মান হইয়াছিলেন? কে না স্বীকার করিবে যে, সেই প্রগাঢ়তমসাচ্ছন্ন কালরজনীর তমোরাশি ছিন্ন ভিন্ন করিয়া অভাবনীয়রূপে যুগপচ্চন্দ্রসূর্য্য স্বরূপে শ্রীচৈতন্য ও শ্রীরঘুনন্দন বঙ্গের ভাগ্যগগণ উদ্ভাসিত করতঃ রাত্রিচর তমঃপ্রিয় প্রেতপিশাচ

দৈত্যদানব দস্যুতস্করদলকে অপসারিত করিয়া সমুদিত হইয়াছিলেন? পূর্ব্বঘাট ও পশ্চিমঘাট পর্ব্বতযুগল যেরূপ মহোদধির ভীষণ মুখব্যাদান ব্যর্থ করিয়া দক্ষিণ-ভারত-ভূভাগকে রক্ষা করিতেছে, কে না স্বীকার করিবে যে, শ্রীচৈতন্য ও শ্রীরঘুনন্দন এই মহানুভাবদ্বয় বঙ্গদেশকে ধর্ম্মবিপ্লবের—সমাজ বিপ্লবের নিদারুণ ঘাতস্রোত হইতে সেইরূপে রক্ষা করিয়াছিলেন?

এই দুই মহাপুরুষের মহাপ্রাণতায় যে উচ্ছৃঙ্খল উন্মার্গগামী বহির্মুখ দেশবাসিগণ পুনরায় সংযত, সৎপথানুসৃত গৃহাভিমুখ হইয়াছেন, বর্ণাশ্রম ধর্ম্মের নিদারুণ নির্য্যাতনের সময় কত শত প্রচ্ছন্ন ও প্রকাশমান কালান্তক কালাপাহাড়ের অগ্ন্যুৎপাতের সময় এই দুই মহাপুরুষের পুরুষকারবলেই দেশবাসিগণ যে আত্মরক্ষায় সমর্থ হইয়াছিলেন তাহা বস্তুতই অব্যভিচারিসত্য। কিন্তু ন্যায়ের মানদণ্ড দ্বারা তুলনা করিয়া দেখিলে বুঝা যায় যে এতদুভয়ের মহাপ্রাণতা পুরুষকার. তুল্যরূপে সমানস্থান অধিকার করিতে পারে নাই। একজনের সীমা—সংকীর্ণ! অন্যের—বিস্তৃত!

একদিকে নদীয়ার চাঁদ, তাঁহার বিশ্বপ্রেমের অপার্থিব স্নিগ্ধ সুধাসিঞ্চনে জাতিবর্ণনির্বিশেষে সাদর-সাগ্রহ—সানুগ্রহ প্রেমালিঙ্গনে, সানন্দ-সুধামাখা সম্বোধনে, অবসন্ন সমাজকে একতার সুমধুর তানে প্রাণেপ্রাণে অনুপ্রাণিত করিয়া কেন্দ্রের সংকীর্ণবৃত্তক্ষেত্র উল্লঙ্ঘনপূর্ব্বক দিগ্‌দিগন্তর "ডুবু-ডুবু" করিয়া ভাসাইয়াছিলেন। অপরদিকে রঘুনন্দন, বেদ, বেদান্ত, সংহিতা ও পুরাণোপ-পুরাণ, জ্যোতিষ শাস্ত্র হইতে সনাতন হিন্দুধর্ম্মের আধার শক্তিরূপিণী, বর্ণাশ্রম ধর্ম্মের সংরক্ষিণী অষ্টাবিংশতিতত্ত্ব স্মৃতি সঙ্কলন করিয়াও অন্যান্য ভূভাগ দূরে থাকুক, কেবলমাত্র বঙ্গের সর্ব্বত্র সর্ব্ববাদিসম্মতরূপে পরিগৃহীত না হইয়া সঙ্কীর্ণ 'গণ্ডির' অন্তরালে অবস্থিত রহিয়াছেন! সমানাধিকারের অখণ্ডনীয় অপ্রতিবন্দী কারণ;—দেশকালপাত্রের সাম্যভাব। এক্ষেত্রে তাহার সম্পূর্ণ সদ্ভাব সত্ত্বেও সমানাধিকারের অসদ্ভাবে সহৃদয় ভাবুকের মনে স্বতই স্বল্পবিস্তর চিন্তাস্রোত বহিতে থাকে।

যদি সত্য সত্যই এই দুই মহাত্মা একবিধকারণে "ধর্ম্মসংস্থাপনার্থায়" উদ্বুদ্ধ হইয়া সাধ্যবিষয়ের সিদ্ধিজন্য অনুষ্ঠানগত দ্বিবিধ কার্য্য করিলেও মূলতঃ মতের একতাসূত্রে এককর্ম্মী একধর্ম্মী হইয়া থাকেন; যদি বাস্তবিকই স্নেহ, দয়া, প্রীতি, মৈত্রী, সহানুভূতি প্রভৃতি লোকধর্ম্মের বৈকল্য এবং আধ্যাত্মিক উন্নতির অধিরোহিণীরূপিনী বৈদিক-শৌচ-সংস্কারাদিক্রিয়ার বৈপরীত্য সন্দর্শনে এই দুই

মহাত্মা লোকহিতৈষণার আকর্ষণে আকৃষ্ট হইয়া, অহোরাত্র অসহনীয় কঠোর কষ্টকে জাবনের মহাব্রত জ্ঞানে, তাহার-পবিত্র হোমকুণ্ডে ভোগসুখের চিরাহুতি দিয়া থাকেন; যদি উভয়েরই সাধ্য বস্তু এক হয়, যদি উভয়ের সাধন মন্ত্র এক হয়, যদি উভয়েরই সেই 'একমেবাদ্বিতীয়ম্' "সর্ব্বমঙ্গল মঙ্গল্যোবরেণ্যো বরদঃ শুভো নারায়ণ" একমাত্র গুরু হইয়া থাকেন, তবে উভয়ের সফলতার তারতম্য কেন হইল ?

"অনর্পিতচরীং চিরাৎ করুণয়াবতীর্ণঃ কলৌ
সমর্পয়িতুমুন্নতোজ্জ্বল রসাং স্বভক্তিশ্রিয়ং।
হরিঃ পুরটসুন্দরো দ্যুাত-কদম্ব-সন্দীপিতঃ
সদা হৃদয়-কন্দরে স্ফুরতু বঃ শচীনন্দনঃ ॥"

"ন্যাসং বিধায়োৎ প্রণয়োঽথ গৌরঃ, বৃন্দাবনং গন্তুমনা ভ্রমাত্মা
রাঢ়ে ভ্রমন্ শান্তিপুরীময়িত্বা, ললাস ভক্তৈরিহ তং নতোঽস্মি ॥"

"নৌমি তং গৌরচন্দ্রং যঃ কুতর্ক-কর্কশাশয়ম্।
সার্ব্বভৌমং সর্ব্বভূমা ভক্তিভূমানমাচরেৎ ॥"

"স্মৃতিশাস্ত্রাম্বুধৌ লীলাকৃতসেতুং জগদ্‌গুরুম্।
বিদিতং ত্রিষুলোকেষু নমামি রঘুনন্দনম্ ॥"

"মীমাংসাদি নানাশাস্ত্র পারদৃশ্বা, বন্দ্যঘটীয়ঃ শ্রীমান্ রঘুনন্দন ভট্টাচার্য্যঃ প্রাচীন বিচক্ষণগণ নানাবিধ ব্যাখ্যাজনিত সন্দেহস্য স্মৃতিশাস্ত্রস্য মুস্তুর বচন-যুক্তিভ্যাং তত্ত্বং নির্ণীয় ইদানীন্তনানাং সুখবোধায় নিবন্ধাংশ্চকার।"

আবার—

চৈয়ে ছোঁড়া বড় দুষ্ট নিমে তার নাম।
রঘো বেটা মোটা বুদ্ধি ঘটে করে থাম ॥
কাণা ছোঁড়া বুদ্ধে দড় নাম রঘুনাথ,॥
মিথিলার পক্ষধর যারে করে মাথ ॥
তিনজনে তিনপথে কাঁটা দিল শেষ।
ন্যায় স্মৃতি ব্রহ্মচর্য্য হইল নিঃশেষ ॥
কাণার সিদ্ধান্তে ন্যায় গৌতমাদি হত।
প্রাচীন স্মৃতির মত নন্দা হ'তে গত ॥

শচী ছেলে নিমে বেটা নষ্টমতি বড়।
মাতা পত্নী দুই ত্যাগী সন্ন্যাসেতে দড় ॥
আরও—রঘো চৈতে বলা। তিন কলির চেলা ॥

এইরূপে যাঁহারা উভয়েই স্তুত এবং নিন্দিত হইয়া কর্ম্মে, ধর্ম্মে সমতালাভ করিয়াছিলেন, তাঁহাদের এইরূপ ন্যূনাধিক সংকীর্ণপ্রসর লঘুগুরু অধিকারলাভের কারণ কি ?

বঙ্গদেশের বাহিরে যাও, সেই সুদূর উত্তর-পশ্চিম-প্রদেশ অযোধ্যা মথুরা মায়া-কাশী কাঞ্চী অবন্তিকা পুরী দ্বারাবতী হরিদ্বার হিমালয় যাও, দেখিবে, শ্রীচৈতন্যদেবের বিজয়-বৈজয়ন্তী শত শত নিনাদে প্রোড্ডীয়মানা, দেখিবে তাঁহার সাঙ্গোপাঙ্গ নিত্যানন্দ, অদ্বৈত, শ্রীবাস, জীব প্রভৃতি লোক-পাবন মহাজন-গণের শ্রীকরকমলের অক্ষয়লেখনীপল্লব সমুদ্ভব চৈতন্যভাগবত, চৈতন্য চরিতামৃত, চৈতন্যমঙ্গল প্রভৃতি শ্রীগ্রন্থাবলী দর-বিগলিত অশ্রুধারার সহিত সুসেবিতা। শুনিতে পাইবে ;—বিদ্যাপতি, চণ্ডীদাস, নরোত্তম প্রভৃতি প্রেমোন্মত্ত ভক্তগণ উন্মাদিনী ভাষায়—কেহ বা হিন্দি, কেহ বা ব্রজবুলি কেহ বা দেববাণী সংস্কৃত, কেহ বা মিশ্রভাষায়—সেই বিশ্বপ্রেমিকের মহিমাগীতি গান করিয়া আজও দেশকে ভাবে বিভোর করিয়া রাখিয়াছে। আরও দেখিতে চাও ঐ দেখ, অপার-পারাবারের অপর পারে চল দেখিতে পাইবে, শুনিতে পাইবে এই বাঙ্গালার ধুলায় ধূসর—এই অসার বঙ্গভাষাভাষী বাঙ্গালী—কাঙ্গাল বেশধারী শ্রীচৈতন্যের চৈতন্যচরিত্র পশ্চাত্যভাষায় অনুবাদিত হইয়া তত্রত্য জনগণের চিত্তবিনোদন করিয়া সঙ্গে সঙ্গে বাঙ্গালীজাতিকেও স্মৃতিপথে আরোপণ করাইতেছে। কিন্তু স্মার্ত্তরঘুনন্দন—যিনি "অনন্তশাস্ত্রং বহুবেদিতব্যং স্বল্পশ্চ কালো বহবশ্চ বিঘ্নাঃ। যৎসারভূতং তদুপাসিতব্যং হংসো যথা ক্ষীরমিবাম্বুমিশ্রম্॥" এই মনে করিয়া—যিনি "প্রায়েণাল্পায়ুষঃ সভ্য কলাবস্মিন্ যুগে জনাঃ। মন্দাঃ সুমন্দমতয়ো মন্দভাগ্যাহ্যপদ্রুতাঃ॥" মনে করিয়া—প্রাচীন স্মৃতিসমূহের অধ্যয়ন অধ্যাপনায় গুরুশিষ্য উভয় সম্প্রদায়ের আশানুরূপ সম্যক্ ফলপ্রাপ্তিপক্ষে সন্দিহান হইয়া, সারাৎসার-সর্ব্বস্ব সংগ্রহ সংকলন করিয়া, সমুদ্র মন্থন করিয়া সুধার উদ্ধারের ন্যায়, অথবা সাত সমুদ্র তের নদী সেচন করিয়া সাত রাজার ধন মাণিকের ন্যায়, "নব্যস্মৃতির" আবিষ্কার করিয়াছেন, সেই মহামহোপাধ্যায় রঘুনন্দন ভট্টাচার্য্যের অমর নাম উৎকল দ্রাবিড় মগধ সৌরাষ্ট্র পঞ্চাল কান্যকুব্জ মিথিলা প্রভৃতি পুরাণ প্রসিদ্ধ পুণ্যজনক ভূভাগে কীর্ত্তিত হয় না। তাঁহার সংকলিত নিবন্ধ-

নিচয় অধীত হয় না। তাঁহার ব্যবস্থাপিত সিদ্ধান্তীকৃত নিবন্ধ-নির্দ্দিষ্ট বিধিগুলি প্রতিপাদিত হয় না। দেশান্তরের কথা দূরে থাকুক;—এই বঙ্গদেশের কৃষ্ণনগরের বিদ্বদ্বৃন্দও অনেকস্থলে তাঁহার মত স্বীকার করেন না।

আরও দেখা যাইতেছে যে, আজ পর্য্যন্ত অস্মদ্দেশে যাঁহারা স্মৃতিশাস্ত্রে অধিকারলাভের আশা করেন, তাঁহাদের পক্ষেও রঘুনন্দনের নিবন্ধগুলি পর্য্যাপ্ত বলিয়া প্রতীতি হয় না। যেহেতু তাঁহারাও মন্বাদিকৃত মূল প্রাচীন সংহিতাগুলির এবং মহামহোপাধ্যায় শূলপাণি, হলায়ুধ পশুপতি, ভবদেব, কালেসি, জীমূতবাহন প্রভৃতি রঘুনন্দনের অপেক্ষাকৃত পূর্ব্ববর্ত্তী নিবন্ধকারগণের গ্রন্থগুলির যথারীতি অধ্যয়ন করিয়া পূর্ব্বোক্ত বাক্যের যাথার্থ্য সম্বন্ধে সাক্ষ্যপ্রদান করিতেছেন। যাঁহারা স্মৃতিশাস্ত্রের অতি সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম সিদ্ধান্ত সমূহে সিদ্ধিলাভে ইচ্ছুক, যাঁহারা স্মৃতিশাস্ত্রে লব্ধপ্রতিষ্ঠ হইয়া প্রসিদ্ধ পণ্ডিত শব্দবাচ্য হইতে অভিলাষী, তাঁহাদিগকে কেবলমাত্র রঘুনন্দনের নব্যস্মৃতি অধ্যয়ন করিলে চলিবে না। তাঁহাদিগকে মন্বাদির আর্ষসংহিতা ও প্রাচীন নিবন্ধগুলি অধ্যয়ন করিতেই হইবে। বিদ্যোৎসাহী প্রজাহিতৈষী গুণগ্রাহী মহামহিম ব্রিটিশ গভর্ণমেণ্ট প্রবর্ত্তিত সংস্কৃত শাস্ত্রের পরীক্ষাপ্রণালীর দিকে লক্ষ্য করিলেও এ বিষয়ের নিঃসংশয়তা প্রমাণিত হইবে।

অতএব বুঝা যাইতেছে যে, রঘুনন্দনের স্বদেশবাসিগণও যে গ্রন্থান্তরের প্রতি নিরপেক্ষ হইয়া তাঁহার উপর সম্পূর্ণ আস্থা স্থাপন করিতে পারিয়াছেন, তাহাও নহে।

ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত প্রবচন গুলিকে একত্র সন্নিবেশ এবং দার্শনিক যুক্তি-উপন্যাসের দ্বারা তাহাদের পরস্পর অসামঞ্জস্য-বিরোধ মীমাংসা করিয়া ক্রমে ক্রমে তিথি প্রভৃতি অষ্টাবিংশতি তত্ত্ব নব্যস্মৃতি সংগ্রহ করিয়াও, স্বল্পায়াসে স্বল্প সময়ে স্মৃতিশাস্ত্রের অধ্যয়নাদির সুব্যবস্থা প্রতিপাদিত করিয়াও, সুখী ভোগী রোগী অন্নথী বিদ্যার্থীদিগের 'অগতির গতি' 'পতিত পাবন' 'অধমতারণ' হইয়াও, সম্পূর্ণরূপে সর্ব্বতোভাবে আস্থার পাত্র হইলেন না—ইহার এক বা একাধিক কারণ অবশ্যই আছে। আমরা ক্রমে ক্রমে আমাদের প্রিয় পাঠকগণকে সেই সেই কারণগুলি দর্শাইতে চেষ্টা করিব।

অভিনিবেশ সহকারে কারণগুলি দেখিতে ও দেখাইতে গেলে, নিম্নলিখিত বিষয় সমূহের দিকে একবার দৃষ্টিপাত করিলে গন্তব্য স্থানে পৌঁছিবার অনেক অনুকূল সুগমপন্থা আবিষ্কৃত হইতে পারে।

(১ম) বিজাতির শাণিত তরবারির মুখে "পরধর্ম্মো ভয়াবহ"তায় আত্মহারা পরপদ-দলিত পদে পদে নির্য্যাতন-প্রাপ্ত অন্তঃসারশূন্য অভিশপ্ত দেশবাসীর সুদীর্ঘ অননুশীলনের ফলে—অননুষ্ঠানের শোচনায় ফলে, সুপ্রাচীন সংহিতাসমষ্টির দারুণ দুর্দ্দশার পাপ অবসরে. শম-দম-তিতিক্ষা-উপরতি প্রভৃতি মনোবৃত্তি প্রবর্ত্তিত কৃচ্ছ্রসাধ্য শ্রৌতসংস্কারাদির পুনরনুশীলন ও পুনরনুষ্ঠানের মঙ্গলময়ী আবাহনী গীতিরূপিণী শ্রীরঘুনন্দনের নবীনাস্মৃতি কর্ম্মবিপাকগ্রস্ত অলস জড়তা-জড়িত ছন্নমতির নিকট উদ্যম-উৎসাহ-উদ্যোগ-অধ্যবসায়-অভ্যুদিত কর্ম্মযোগের মত সম্যক্ সমাদরলাভে বঞ্চিতা হইয়াছে কি না ?

(২য়) আচার্য্যপাদগণের গ্রন্থাদির প্রতি রক্ষণ-শীলতা শ্রীরঘুনন্দনের নব্য-স্মৃতিকে সর্ব্বব্যাপিনী শক্তিলাভে বঞ্চিতা করিয়াছে কি না ?

(৩য়) প্রাচীন মন্বাদিসংহিতায় ব্যুৎপন্ন মনীষীদিগের সিদ্ধান্ত ও তদনুকূল যুক্তি-উপন্যাসের প্রামাণ্যদর্শনে তেজীয়ান্ সারলিপ্সু বিদ্যার্থিবৃন্দ "নানাশাস্ত্রোদ্ধৃতংবক্ষ্যে রাজনীতি সমুচ্চয়ং। সর্ব্ববীজমিদংশাস্ত্রং চাণক্য-সার-সংগ্রহং" ইতিবৎ সংকলিত সমুদ্ধৃত নব্যস্মৃতির অধ্যয়নে পল্লবগ্রাহী পাণ্ডিত্যে পুরুষের বিড়ম্বনা মনে করিয়া তাহার প্রতি অনন্যাশ্রয়া আস্থা স্থাপনে অনিচ্ছুক হইয়া মূল কাণ্ডাদির অনুসন্ধান তৎপর রহিয়াছেন কি ?

(৪র্থ) পর্ব্বতবহুল প্রদেশবাহিনী কচিৎপ্রসরা কচিৎ সংকীর্ণা স্রোতস্বতীর ন্যায় যুক্তিপরম্পরাবলে কোথাও বা যুক্তির সম্যগনুসারিণী, কোথাও বা ঈষদনুসারিণী, কোথাও বা কষ্ট-কল্পনা শিরোবেষ্টনপূর্ব্বক নাসিকা স্পর্শের মত কুটিলগামিনী, মনে করিয়া কি শ্রীরঘুনন্দনের নব্যস্মৃতির সর্ব্ববিজয়িনী শক্তি সকলে স্বীকার করেন নাই ?

(ক্রমশঃ)

শ্রীনারায়ণচন্দ্র ভট্টাচার্য্য কাব্যরত্ন।

মাহিষ্যের জাতীয় উপাধি।

বিগত আশ্বিন মাসের "মাহিষ্য-সমাজ" পত্রিকায় আমি শীর্ষোদ্ধৃত বিষয়ের কিঞ্চিৎ আলোচনা করিয়াছিলাম, কিন্তু বোধ হয় আমার ভাষার প্রয়োগ দোষে পাঠকগণ মধ্যে কেহ কেহ আমার উদ্দেশ্য গ্রহণ না করিয়া প্রবন্ধের অন্যরূপ অর্থ গ্রহণ করিয়াছেন; তন্মধ্যে শ্রীযুক্ত নলিনীরঞ্জন সেনী মহাশয়

"দেই", শব্দ ইতিহাসের প্রাচীন উপকরণ বলিয়া তাহা রক্ষা করিবার পক্ষপাতী, আমরাও ঐ "দেই" উপাধি তমলুকাদি রাজবংশের বংশ তালিকা হইতে নিঃসারিত করিতে বলি নাই। উহা চিরকালই ঐতিহাসিক সাক্ষ্য প্রদান করিবে, তবে যাঁহারা স্ত্রীলোকের উপাধিস্থলে বর্ত্তমানে "দাসী" শব্দ ব্যবহার করেন তাঁহাদিগকে আমি "দেবী" শব্দ ব্যবহার করিবার জন্ত মতামত জিজ্ঞাসা করিয়াছিলাম। "দেই" শব্দ "দেবী" শব্দের অপভ্রংশ বলা ভিন্ন ভাষার অন্ত শব্দ অদ্যাপি প্রচলিত হয় নাই। সুতরাং প্রচলিত রীতিতে যেমন চন্দ্রের অপভ্রংশে চাঁদ, বংশের অপভ্রংশে বাঁশ, গাভীর অপভ্রংশে গাই, নাভির অপভ্রংশে "নাই" বলা হয়, তেমনি দেবীর অপভ্রংশে "দেই" বলিলে কোন দোষ হয় না। এই অপভ্রংশ শব্দ ভিন্ন অন্ত শব্দের দ্বারায় ঐ ভাব প্রকাশ করিতে হইলে নূতন শব্দ সৃষ্টি করিতে হয়। তাহা সাহিত্য-পরিষদের স্তায় কোন সমিতির দ্বারা সর্ব্ববাদিসম্মত হওয়া আবশ্যক।

নলিনী বাবুর কৃষিজীবী মাহিষ্যগণের "ক্ষেত্রী" উপাধির সমালোচনা দেখিয়া বিস্মিত হইলাম, আমি কি অর্থে "ক্ষেত্রী" শব্দের ব্যবহার করিয়াছি; তিনি কি অর্থ গ্রহণ করিয়াছেন? কৃষক-ভ্রাতৃগণের মধ্যে দাস উপাধির পরিবর্ত্তে "ক্ষেত্রী" উপাধি গ্রহণ করিলে অর্থ-বিহীনতা, অবজ্ঞা, একতার বিঘাত হইবে কেন? যাঁহার যে উপাধি আছে বা হইবে তাহার সঙ্গে জাতীয় উপাধি সংযুক্ত থাকিবে, যেমন বর্ম্মরায় বর্ম্ম-মাইতি, বর্ম্ম-নায়ক, বর্ম্ম-সেনী, বর্ম্মদেশমুখ, বর্ম্মক্ষেত্রী"। রাজা, মহারাজা, উকীল, বারিষ্টার প্রভৃতিরও যেমন "বর্ম্মা" বলিবার অধিকার থাকিবে নিরক্ষর কৃষকেরও সেইরূপ "বর্ম্মা" বলিবার অধিকার থাকিবে, তাহাতে জাতীয় স্বাস্থ্য ও একতার বিঘাত করিবে না, বরং জাতীয় স্বাস্থ্য ও একতা রক্ষিত হইবে। কৃষিবলগণের দাস উপাধি পরিত্যজ্য কি না—এইটী আমি বিচারস্থলে উপস্থিত করিয়াছি মাত্র। যদি সর্ব্বসাধারণের মতে উহা পরিত্যজ্য না হয় তবে "দাস" উপাধির সঙ্গে বর্ম্মা উপাধি সংযুক্ত হইবে। যেমন বর্ম্মদাস, বর্ম্মজানা, বর্ম্ম-মণ্ডল। দৈব-পৈত্র্য কর্ম্মে বর্ম্মা উপাধি ব্যবহারে কোন বাধা নাই। উহা নিজের হাতে। এখন হইতে শ্রাদ্ধে বিবাহে মন্ত্রোচ্চারণ কালে অমুক বর্ম্মণঃ পুত্রং বা প্রপৌত্রং ইত্যাদি ক্রমে মন্ত্র বলা যাইতে পারে। চিঠি-পত্রে অমুক বর্ম্মরায়, অমুক বর্ম্ম-মণ্ডল, অমুক বর্ম্ম-দাস নাম স্বাক্ষর স্থলে লিখা যাইতে পারে।

স্ত্রীলোকের উপাধিস্থলে আমি "অর্য্যা" শব্দের প্রস্তাব করিয়াছিলাম।

কিন্তু মুদ্রাকর ভ্রান্তিতে "আর্য্যা" ছাপা হইয়া গিয়াছিল, অর্য্যা শব্দের অর্থ বৈশ্যা। আমি মাহিষ্য নরনারী দ্বারা পিতৃ-মাতৃ উপাধি ঠিক রাখিতে মনন করিয়াছিলাম। কিন্তু আমার ভাগ্যদোষে অন্যরূপ অর্থগ্রহ হইয়াছে। বৈশ্যা রমণীর "গুপ্তা" উপাধি হইতে পারে, কিন্তু বৈদ্য জাতির মধ্যে ঐ উপাধি প্রচলিত আছে; এই অসুবিধা পরিহার জন্য "অর্য্যা" উপাধির প্রস্তাব করিয়াছিলাম।

উপসংহারে আমার মত এই যে, মাহিষ্য মাত্রেরই জাতীয় উপাধি "বর্ম্মা" এবং মাহিষ্য রমণীর উপাধি "অর্য্যা দেবী" হওয়া উচিত। অতঃপর এ সম্বন্ধে বাদানুবাদ হইয়া শেষ মীমাংসা হয় ইহাই প্রার্থনীয়। অধিকাংশের মতে যাহা সিদ্ধান্ত হয় তাহা সমিতির নামে প্রচলিত হইলে জাতির সমবেত সিদ্ধান্ত বলিয়া গ্রাহ্য হইবে। আশা করি, সকলেই ইহাতে মনোযোগ দিবেন।

শ্রীসুদর্শন চন্দ্র বিশ্বাস।

প্রভাত।

প্রভাত হইল, শুন গো মন্দির ঘরে,— শঙ্খ উঠিল বাজি,
নিদ্রালস্য পরিহরি, ওগো মাহিষ্য জাতি, উঠ শয্যা ত্যজি।
অন্ধকার নাই, দূরে গেছে চ'লে, বাজিয়া উঠিল ভেরী,
গম্ভীর স্বরে বলিতেছে,—জাগো সবাই, করো না আর দেরী।
গাছে গাছে পাখী, গাইল প্রভাতী, পঞ্চমে সুতান তুলিয়া,
করি গুণ গুণ, গাইছে মধুর, ভ্রমর কুঞ্জে জুটিয়া।
সুদূর মন্দির ঘরে, উঠিল মৃদুস্বরে মঙ্গলারতি বাজিয়া।
জাগরে জাগরে ভাই মোহনিদ্রা হ'তে মায়ের চরণ স্মরিয়া।

শ্রীফণিভূষণ সরকার।

মাহিষ্য জাতির উপনাম বিচার (৩)।

মাহিষ্যের জাতীয় উপাধি ক্ষত্রোচিত হওয়া উচিত, কি বৈশ্যোচিত হওয়া উচিত তাহা বিশেষ বিবেচনার কথা। মতামত প্রকাশের যোগ্য আমি নই; তবে মনে মনে চিন্তা করিয়া যুক্তির দ্বারা যাহা কর্ত্তব্য বিবেচনা করিয়াছি, তাহাই পত্রিকায় প্রকাশ করিবার জন্য প্রবন্ধ লিখিয়াছি। রণঝম্প, বাহুবলীন্দ্র, গজেন্দ্র, সেনাপতি, সিংহ, প্রভৃতি উপাধি ক্ষত্রিয় বর্ণগত উপনাম নহে; ঐ সকল ক্ষত্রিয় বৃত্তিগত উপাধি মাত্র। একাকী অরণ্য মধ্যে প্রকাণ্ড ব্যাঘ্র নিহত করিয়া যবন বীর স্বীয় প্রভু নবাব কর্ত্তৃক সের খাঁ উপাধি প্রাপ্ত হইয়াছিল। পারস্য ভাষায় সের অর্থে ব্যাঘ্র। এইরূপ মাহিষ্য বীরগণও স্বীয় অমিত বলবিক্রমের পরিচয় দিয়া কেহ সিংহ, কেহ ব্যাঘ্র, কেহ হাতী ইত্যাদি বিক্রমসূচক উপাধি লাভ করিয়াছিলেন। বাহুবলীন্দ্র, রণঝম্প প্রভৃতি উপাধি যুদ্ধনৈপুণ্যতা জন্য। ব্রাহ্মণের ন্যায়রত্ন, বিদ্যারত্ন, তর্কচূড়ামণি প্রভৃতি উপাধিগুলি যেমন বিদ্যার পরিচায়ক এবং ব্যষ্টিগত ভাবে লাভ হয়, কিন্তু সমষ্টি গত ভাবে ব্রাহ্মণ বর্ণের "শর্ম্মা" এই উপনামই শাস্ত্রসম্মত ও কর্ম্মকাণ্ডে ব্যবহৃত হয়; তদ্রূপ ক্ষত্রিয় বর্ণেরও বাহুবলীন্দ্র প্রভৃতি উপাধি প্রবল পরাক্রমের পরিচায়ক এবং ব্যষ্টিগত ভাবে বিদ্যমান আছে, কিন্তু সমষ্টিগত ক্ষত্রিয় বর্ণের "বর্ম্ম" এই উপনামই শাস্ত্রপ্রসিদ্ধ ও কর্ম্মকাণ্ডে ব্যবহৃত হয়। এইরূপ বৈশ্যবর্ণের উপনাম বিষ্ণুপুরাণের মতে "গুপ্ত এবং মনুসংহিতার মতে "দত্ত।" মনুর মতে ব্রাহ্মণের শর্ম্মা উপনামের পূর্ব্বে সুখবাচক শব্দ দেব, অর্থাৎ দেবশর্ম্মা; ক্ষত্রিয়ের বর্ম্মা উপনামের পূর্ব্বে রক্ষা বাচক শব্দ ত্রাতা, অর্থাৎ ত্রাতাবর্ম্মা; বৈশ্যের উপনামের পূর্ব্বে ভূতি—অর্থাৎ ভূতিগুপ্ত কিম্বা ভূতিদত্ত; এবং শূদ্রের দাস উপনামের পূর্ব্বে দৈন্যবাচক শব্দ যথা দীনদাস লিখিবে ইতি। মিশ্রবৈশ্য অম্বষ্ঠগণ গুপ্ত, দত্ত, রক্ষিত প্রভৃতি; সুবর্ণবণিক, গন্ধবণিকাদি মিশ্র বৈশ্যগণ দত্ত; এবং কায়স্থগণ গুহ, দত্ত, রক্ষিত এই বৈশ্যবর্ণগত উপনাম ধারণ করিয়া আসিতেছেন। ইক্ষণে কায়স্থ ভ্রাতারা আপনাদিগকে মসীজীবী ক্ষত্রিয় পরিচিত করিয়া, উপবীত গ্রহণ ও নামের শেষে ক্ষত্রিয় বর্ণোচিত "বর্ম্মা" এই উপনাম ব্যবহার করিতে আরম্ভ করিয়াছেন।

"অনুলোমাসু মাতৃবর্ণাঃ" এই শাস্ত্র বাক্যানুসারে, মাহিষ্য জাতির "বৃত্তি

গোরক্ষা ও বাণিজ্য" এই বৃত্তি-ত্রিতয় হইলেও, অতি পুরাকাল হইতেই মাহিষ্যের মধ্যে অনেকেই পিতৃবৃত্তি অর্থাৎ যুদ্ধ ও রাজ্যপালনরূপ ক্ষত্রিয় ধর্ম্ম সম্পাদন করিয়া আসিতেছেন। মাহিষ্যের পিতা ক্ষত্রিয় ও মাতা বৈশ্য। ক্ষত্রিয় সেনাপতি কিম্বা ক্ষত্রিয় ছত্রপতি, বৈশ্যকন্যাকে বেদবিধিমতে বিবাহ করিলেন। সেই ক্ষত্রিয়ের ঔরসে, সেই বিবাহিতা বৈশ্য ভার্য্যার গর্ভে সন্তান জন্মিল। শাস্ত্রমতে ঋষিগণের ব্যবস্থায় সেই সন্তানের উপনয়ন, অশৌচ পালনাদি বৈশ্য-মতেই সম্পন্ন হইল বটে, কিন্তু সন্তানটি পিতার সংসারে পিতার অধীনে থাকিয়া, পিতার বৃত্তি অর্থাৎ যুদ্ধ, মৃগয়াদি না করিয়া থাকিতে পারেন কই? পিতা যদি ব্রাহ্মণ হইতেন, তাহা হইলে তপঃ, যজ্ঞাদি পিতৃধর্ম্ম করিতে যাইতেন না। তাই অম্বষ্ঠগণের মধ্যে কেহই পিতৃধর্ম্ম করিতে অধিকারী হন নাই কিন্তু মাহিষ্য গণের মধ্যে বিস্তর পিতৃধর্ম্ম অর্থাৎ যুদ্ধ ও রাজ্যপালনাদি কার্য্য করিয়াছেন। ক্ষত্রিয় ধৃতরাষ্ট্রের বিবাহিতা বৈশ্যপত্নীজাত সন্তানের বাল্যকালেই পিতৃধর্ম্মে অর্থাৎ যুদ্ধ কার্য্যে অভিলাষ বুঝিয়াই, বোধ হয় কুরুকুল-পুরোহিত তাঁহার নামকরণ কালে যুযুৎসু নাম রাখিয়াছিলেন। যুদ্ধাভিলাষীকেই যুযুৎসু কহে। অন্যান্য মিশ্র বৈশ্যজাতি অপেক্ষা মাহিষ্য জাতির ইহাই বিশেষত্ব ও গৌরবের বিষয়। যাহা হউক, এক্ষণে মাহিষ্যের উপনাম সম্বন্ধে আরও দুই চারি কথা বলিয়া এই প্রবন্ধ শেষ করিব।

গত আশ্বিন মাসের সংখ্যায় মাননীয় শ্রীযুক্ত সুদর্শন বাবু "মাহিষ্যের জাতির উপাধি" শীর্ষক প্রবন্ধে লিখিয়াছেন যে,—মাহিষ্যের জাতীয় উপাধি বৈশ্যোচিত না হইয়া, ক্ষত্রিয়োচিত "বর্ম্মা" হওয়া উচিত।' তিনি দুইজন মাহিষ্য সম্রাটের ক্ষত্রিয়োপনামধারণের প্রমাণও দিয়াছেন। এ সম্বন্ধে আমার বক্তব্য এই যে, পুরাণেতিহাসে যাহারা লেখক, সংখ্যাবেত্তা, স্ববৃত্তপজীবী প্রভৃতি শূদ্রবৎ নিকৃষ্ট বলিয়া কথিত, তাহারাও যখন এক্ষণে ক্ষত্রিয় বর্ণোচিত "বর্ম্মা" উপনাম ধারণে সাহসী হইয়াছে, তখন সমগ্র মাহিষ্য ক্ষত্রিয়গণ "বর্ম্মা" উপনাম ধারণ করিলে, কিছুমাত্র দোষের হইতে পারে না। কিন্তু সমস্ত মাহিষ্যগণের জাতীয় সংস্কার-কল্পে যেরূপ আস্থা দেখি, তাহাতে বিশ্বাস হয় না যে, তাঁহাদের এ বিষয়ে ইচ্ছা হইবে। অনেকের ইচ্ছা হইলেও সাহসে কুলাইবে না। সাহস করিলেও অনেক প্রতিবন্ধক আছে। "দেব," "দেবী," "বর্ম্মা," "গুপ্ত," প্রভৃতি প্রকৃতি-প্রত্যয় সম্পন্ন সংস্কৃত শব্দের ধাতুগত অর্থবোধ সকলের নাই বটে, কিন্তু উহাদের শব্দগত অর্থ অনেকেরই

পরিচিত। নামের শেষে দেব বা দেবী বলিতে গেলে, বা কোন পত্রের শিরোনাম পড়িলে, একজন নিরক্ষর লোকও ব্রাহ্মণ ব্রাহ্মণী বলিয়া বুঝিয়া থাকে। এইরূপ গুপ্ত বলিতে গেলে নিরক্ষর ব্যক্তিও বৈদ্যজাতি বলিয়া বুঝিয়া থাকে; কিন্তু দুঃখের বিষয় গুপ্ত উপাধিতে মূলবর্ণ বৈশ্যকে অনেকেই বুঝিবে না। লুপ্ত বিষয় উদ্ধার করিতে হইলে, মূল বিষয়কে কিছু-দিনের জন্য প্রচ্ছন্ন রাখাই উচিত। মহাত্মা শঙ্করাচার্য্য বৌদ্ধধর্ম্মাভিভূত ভারতে পুনঃ আর্য্যধর্ম্ম স্থাপন করিতে, হঠাৎ সরস সগুণ ব্রহ্মের উপাসনা প্রচার না করিয়া, নীরস নির্গুণ ব্রহ্মের অর্থাৎ ঘোর অদ্বৈত মার্গ প্রকাশ করেন। পরে চৈতন্যদেব আবির্ভূত হইয়া দ্বৈতমতের পরিপুষ্টি সাধন করিয়াছিলেন। অতএব "দেও" বা "দেঈ" এই প্রাকৃত শব্দই এক্ষণে প্রকাশ্যরূপে ব্যবহার করা সঙ্গত মনে করি। আমি স্বয়ং ও কয়েকজন আত্মীয়কে ব্যবহার করাইয়া দেখিতেছি যে, ইহা লইয়া ব্রাহ্মণাদি উচ্চ জাতিরা কোন উচ্চ বাচ্য করেন নাই। পরিচিত ব্রাহ্মণ বৈশ্যাদিগণ অসংশয়ে পত্রাদিতে ঐ শব্দ লিখিতেছেন। কিন্তু দেব বা দেবী শব্দ ব্যবহারে উচ্চশ্রেণীর ব্রাহ্মণাদির কথা দূরে থাকুক, আমাদের স্বজাতি জনৈক মৌলিক বংশ ভদ্রলোকই আমার সঙ্গে ঘোর বিতর্ক করিয়াছিলেন এবং দেবী উপাধি ধারণ করা যে অধঃপাতে যাইবার হেতু ইহাই প্রকাশ করিয়াছিলেন। তাহাতেই বুঝিয়াছি, দেব, দেবী বা বর্ম্মা উপনাম প্রচলন করার আশা সুদূর-পরাহত। পশ্চিম প্রদেশস্থ ক্ষত্রিয় রাজচক্রবর্ত্তিগণও "দেও" "রাও" এই প্রাকৃত শব্দের উপাধি ধারণ করিতেছেন। অতএব আমাদের "দেও" ও "দেঈ" শব্দ ব্যবহার করাই কর্ত্তব্য।

"দেও" ও "দেঈ" শব্দ অপভ্রংশ নহে কিন্তু প্রাকৃত ভাষা। দেও ও দেঈ শব্দের ক্রমোৎকর্ষে দেব ও দেবী হইতে পারিবে। পত্র দলিলাদিতে পুরুষ ও স্ত্রীর দেও ও দেঈ শব্দই ব্যবহার করিতে হইবে। তবে কর্ম্মকাণ্ড কালে পুরোহিত মহাশয়গণ যজমানদের নামের শেষে পুরুষের "দেব" ও স্ত্রীলোকের দেবী শব্দ ব্যবহার করিতে পারেন। আর্য্যাশব্দ কর্ম্মকাণ্ডে বা উপনামে ব্যবহার অপ্রসিদ্ধ। কৃষিজীবিসাধারণ মাহিষ্যগণের দাস শব্দের পরিবর্ত্তে ক্ষেত্রী শব্দ ব্যবহার করিবার আবশ্যকতা দেখা যায় না। দাস শব্দ ঘৃণাসূচক নহে। উড়িষ্যায় অনেক সদ্‌ব্রাহ্মণের দাস উপাধি আছে। বৈদ্য জাতিরও দাস উপাধি আছে। এ বিষয়ে গত বৈশাখের "উপনাম-বিচার" প্রবন্ধ

দ্রষ্টব্য। দাস শব্দ থাকিবে, কিন্তু প্রামাণিক, কেঠে, প্রভৃতির স্থলে ক্ষেত্রী ব্যবহার করা উচিত বটে। ক্ষেত্রীশব্দও বৃত্তিগত উপাধি, কিন্তু বর্ণগত উপনাম নহে। বর্ণগত উপনামই কর্ম্মানুষ্ঠানে ব্যবহৃত হয়। বর্ণগত উপনাম সম্বন্ধে গত বৈশাখ মাসের পত্রিকায় প্রথম প্রকাশিত হয়; দ্বিতীয়বারে কর্ম্মানুষ্ঠানে উপনামের ব্যবহার সঙ্কেত আশ্বিনের সংখ্যায় প্রকাশিত হইয়াছে। উহা মিশ্র বৈশ্য জাত্যনুমত লিখিয়াছি। আমার পুরোহিতের দ্বারা, আমার মতাবলম্বীগণের মধ্যে, আমার মতই ব্যবহার করাইতেছি। এক্ষণে সুদার্শন বাবুর মত দেখিয়া, মনে আরও আহ্লাদ জন্মিল। সুদর্শন বাবুর হৃদয়—তাঁহার অভিলাষ—আরও উচ্চ। অতএব, তাঁহাকে ধন্যবাদ! ভগবানের নিকট প্রার্থনা এই যে, সমস্ত মাহিষ্য মহোদয়েরই হৃদয় এইরূপ উচ্চ হউক! আপনাদিগকে ক্ষত্রিয় সন্তান বলিয়া আভিজাত্যাভিমান করিতে শিখুক—অচিরে পুনর্ব্বার পিতৃবর্ণের সমকক্ষ হইয়া, শৌর্য্যবীর্য্য প্রকাশ করুক। পিত্রুপনাম ধারণের মত প্রকাশ করায়, সুদর্শন বাবুকে অকৈতবে ধন্যবাদ দিয়াও আমি তাঁহার মতের উপর কিছু বলিতে ইচ্ছা করি। পূর্ব্বেই বলিয়াছি, 'দেও' ও 'দেঈ' অপভ্রষ্ট শব্দ নহে কিন্তু প্রাকৃত ভাষা। প্রাকৃত ভাষাও বহু প্রাচীন। কালিদাস প্রভৃতি মহাকবিগণ তথা শ্রীরূপ প্রভৃতি গোস্বামীগণ কৃত সংস্কৃত ও প্রাকৃত ভাষা মিশ্রিত বহু নাটক বিদ্যমান রহিয়াছে। এই ভাষার পৃথক্ ব্যাকরণাভিধান আছে। আর '**গুপ**' শব্দ প্রাকৃতও নহে, অপভ্রষ্টও নহে। গুহ্ ধাতুর প্রথমার এক বচনে গুহ শব্দের ন্যায় গুপ্ ধাতুর প্রথমার এক বচনে 'গুপ' শব্দ। 'গুপ' এই উপনাম, ক্ষত্রিয় ও বৈশ্য দুই বর্ণোচিতই হইবেক। যথা ক্ষত্রিয়পক্ষে 'গুঃ পৃথিবীং পাতি পালয়তি দান পুণ্যাদি রাজধর্ম্মেণ;' যদ্বা 'গুঃ পৃথিবীং পাতি রক্ষতি দুষ্টদমনেন, সামদানাদিনীতি চতুষ্টয়েন চ' (অত্র পৃথিব্যর্থে লক্ষণায়াং পৃথিবীস্থ প্রজা সমূহঃ জ্ঞেয়ং)। যদ্বা, 'গুঃ পৃথিবীং অস্যাং পত্যর্থে প ইতি গুপ পৃথ্বীপতি সম্রাড়িত্যর্থঃ। মুলক্ষত্রিয়বর্ণানাং 'ভূমিপ' ইতি পর্য্যায় প্রসিদ্ধত্বাৎ, তচ্ছাম্যে মাহিষ্য ক্ষত্রিয়াণাং 'গুপ' ইত্যুপনাম অহর্ণমিত্যলমতুক্ত্যা। বৈশ্যপক্ষে, গুঃ পৃথিবীং পাতি পালয়তি কৃষিবৃত্ত্যা শস্যোৎপাদনেন, (ততোব্রীহিযবাদিক-মিতিশ্রুতিঃ) বাণিজ্যেন গোপালনেন চেতি। অতএব, ক্ষত্র-বৈশ্যাজাত মাহিষ্যজাতির 'গুপ' এই উপনাম ধারণ করাই উচিত মনে করি। এই উপনামে ক্ষত্রিয়ত্ব ও বৈশ্যত্ব উভয় ভাবই অব্যাহত থাকিবেক।

শাস্ত্রে ব্রাহ্মণাদি মূল চতুর্ব্বর্ণেরই নাম, উপনাম, জাতাশৌচ, মরণাশৌচ, ও সংস্কার বিষয়ে পৃথকরূপে নির্দ্দিষ্ট রহিয়াছে। মূলচতুর্ব্বর্ণের অনুলোম বিবাহ-জাত মিশ্রজাতিদের যখন মাতৃধর্ম্ম শাস্ত্রের ব্যবস্থা; তখন উপনাম সম্বন্ধে তাহার অন্যথা হওয়া সম্ভব নহে। অম্বষ্ঠ ও মাহিষ্য বৈশ্য নহেন, কিন্তু বৈশ্যধর্ম্মী। বৃত্তি ও সংস্কার তথা শুদ্ধ্যশৌচাদি যখন বৈশ্যমতে পালন করা ব্যবস্থা, তখন উপনাম সম্বন্ধেও বোধ হয় বৈশ্যমতেই হওয়া উচিত।

সামান্য ও বিশেষ ভেদে বিধি দুই প্রকার হয়। সর্ব্বদেশব্যাপীকে সামান্য ও একদেশব্যাপীকে বিশেষ কহে। অম্বষ্ঠ ও মাহিষ্যের বৈশ্যোপনাম ধারণই সামান্য বিধি। সাধনসিদ্ধ ও ছত্রপতি রাজচক্রবর্ত্তী জনের পক্ষে সামান্য বিধি হইতে পারে না। অতএবই কায়স্থ জাতীয় নরোত্তমদাস "ঠাকুর" উপাধিতে, তথা কায়স্থ জাতীয় রঘুনাথ দাস, "গোস্বামী" উপাধিতে বিখ্যাত হইয়াছিলেন। উহা সমগ্র কায়স্থ জাতির পক্ষে সম্ভব হইতে পারে না। ছত্রপতি সম্রাড়াদির সম্বন্ধেও ঐরূপ বিশেষ নিয়ম, সাধারণের যোগ্য হইতে পারে না। দুই একজন মাহিষ্য সম্রাটের বর্ম্মা উপাধি দেখিয়া, সমগ্র মাহিষ্যেরই উহা গ্রহণ করা বোধ হয় সঙ্গত হইবে না। স্বজাতি হইলেও সম্রাটের মর্য্যাদার আসন, জাতীয় মর্য্যাদার অনেক উচ্চে। নরের মধ্যে নরাধিপগণ ভগবদংশ। গীতাশাস্ত্রে স্বয়ং ভগবন্মুখেই ব্যক্ত হইয়াছে। রাজা বৈশ্য হউন বা শূদ্রই হউন, তিনি জাতিস্মর ক্ষত্রিয় বুঝিতে হইবে। শূদ্র জাতিও যদি ছত্রপতি সম্রাট হয়েন, তবে তাঁহার ছত্রদণ্ডাদি রাজচিহ্ন ও বর্ম্মা উপাধি ধারণ দূষণ না হইয়া ভূষণ হইয়া থাকে। বর্ত্তমানে নীচশূদ্র জাতীয় মধ্যেও রাজা, রায়বাহাদুর প্রভৃতি মর্য্যাদাসম্পন্ন উপাধি বিদ্যমান রহিয়াছে। মাহিষ্যের বর্ম্মা উপাধি গ্রহণ কর্ত্তব্য হইলেও, উহা যে অবাধে প্রচলিত হইবে, এরূপ বিশ্বাস হয় না। যদি বর্ম্মা উপাধি মাহিষ্য মহোদয়দের ব্যবহার করা স্থির হয়, তবে অবশ্যই আহ্লাদের সহিত আমিও ব্যবহার করিব ও আমার মতাবলম্বিগণকে ব্যবহার করাইব। আমি সুদর্শন বাবুর মতের বিরোধী নহি; তবে মাহিষ্যের জাতীয় উপাধি ক্ষত্রিয় বর্ণোচিত কি বৈশ্যবর্ণোচিত হওয়া উচিত, তাহা বিজ্ঞ-মহোদয়গণ এবং সুদর্শন বাবু স্বয়ং বিশেষ বিবেচনাপূর্ব্বক শাস্ত্র ও যুক্তি প্রমাণ-সিদ্ধ বাক্যের দ্বারা স্থির করিয়া এই পত্রিকাতেই প্রকাশ করিবেন। সত্বরেই ইহার মীমাংসা হওয়া একান্ত প্রার্থনীয়। শ্রীদুর্গানাথ দেওরায় তত্ত্ববিনোদ।

উন্নতির উপায়।

যে মাহিষ্য জাতি এক সময়ে উন্নতির চরম সীমায় উপনীত হইয়াছিল এখনও বহু বহু স্থানে যাহাদের নিদর্শন-নিশান উড্ডীয়মান রহিয়াছে, সেই মাহিষ্যজাতি জাতীয় একতাভাবে অবনত হইতে চলিতেছে ও তাহাদের নিদর্শন কালের গতিতে বিস্মৃতির অতল জলধিতে নিমগ্ন হইতেছে। এখনও যদি মাহিষ্য ভ্রাতৃবর্গের মোহনিদ্রা বিদূরিত না হয়, তাহা হইলে আর কিছুদিন পরে মাহিষ্য-সমাজ চরপনের কলঙ্ক কালিমায় আবৃত হইবে। এ জগতে উন্নত হইতে কে না ইচ্ছা করে? বীজকে লৌহময় কঠিন আবরণে আবদ্ধ রাখিলে যেমন তাহা হইতে অঙ্কুরোদ্গম হইতে পারে না, সেইরূপ মনে মনে জাতীয় উন্নতির কামনা করিয়া কার্য্যে নিশ্চেষ্ট থাকিলে ইচ্ছা কার্য্যে পরিণত হয় না, মনে মনে পর্য্যবসিত হয়।

বর্ত্তমান সময়ে মাহিষ্য-সমাজে বহু জমীদার, তালুকদার, ব্যবসায়ী, উকিল, মোক্তার, ডাক্তার প্রভৃতি থাকা স্বত্বেও জাতীয় অবনতির কি যে কারণ, যদি ভ্রাতাগণ সবিশেষ প্রণিধান পূর্ব্বক বিচার না করেন, তাহা হইলে কেবল মৌখিক উন্নতির আভাস প্রদান করিয়া কার্য্যে সাফল্য লাভ না করায় সকলের নিকট উপহাস্যাস্পদ হইতে হয়। যতদিন না সমাজের মধ্যে শিক্ষার প্রোজ্জ্বল আলোক প্রকাশিত হয়, ততদিন সমাজকে নিত্য নিত্য নানা বিড়ম্বনা ভোগ করিতে হইবে। হায়! শিক্ষালোক-প্রদীপ্ত বঙ্গভূমির মধ্যে এখনও এমন অনেক স্থান দৃষ্ট হয়, যে বহু ভদ্র ধনবান মাহিষ্য পল্লীর মধ্যে একটী সামান্য পাঠশালা পর্য্যন্তও স্থান পায় না। তাঁহাদিগের বিদ্বেষ ভ্রমপূর্ণ উক্তি সমূহ শ্রবণ করিলে সাতিশয় সন্তপ্ত হইতে হয়। যে সকল মহানুভব কত উপহাস, নিরাশা, নিন্দা প্রভৃতি অম্লানভাবে সহ্য করিয়া বিরাট মাহিষ্য-সমাজের হিত কামনায় বদ্ধপরিকর হইয়াছেন, তাঁহাদের কার্য্যে প্রশংসাবাদ করা দূরে থাকুক, প্রাচীন মতাবলম্বিগণ ঘৃণা, নিন্দা করিয়া নিতান্ত লঘুচিত্ততার পরিচয় দিতেছেন। হায়! কালের কি কুটিলা গতি! কালে হীরাও সামান্য কাচ সম পর্য্যায়ে অনাদরণীয় হয়!

দোষগুণ লইয়া মানুষ। নির্দ্দোষ মানুষ জগতে একবারে দুর্লভ। প্রাচীন মতাবলম্বিগণের মধ্যে যদিও আধুনিক পাশ্চাত্য শিক্ষার প্রভাব দৃষ্ট হয় নাই, তথাপি তাঁহাদিগের মধ্যে অনেকেই কৃষিকার্য্যে নিপুণতা, সম্যক পরিশ্রমপ্রিয়তা, ধর্ম্মভীরুতা, বিলাসবিহীনতা, আতিথেয়তা, দেবদ্বিজে ভক্তিপ্রবণতা প্রভৃতি

মানবোচিত গুণে মণ্ডিত হইয়া জন্মভূমি অলঙ্কৃত করিয়া রাখিয়াছেন; অনভিজ্ঞতা নিবন্ধন পূর্ব্বাচরিত সংস্কার পরিত্যাগে সম্পূর্ণ বিরোধী। অনেকেই পৈতৃক সম্পত্তির আয়, নির্ম্মমভাবে মহাজনী, ব্যবসায় প্রভৃতি দ্বারা অর্থবান হইয়া অযাচিতভাবে সমাজে কেবল ধনবান আখ্যা লাভে একান্ত উৎসুক। এই সম্প্রদায় মধ্যে আরও অনেক প্রকারের লোক দৃষ্ট হয়। আবার উন্নতিশীল সম্প্রদায়ের মধ্যে শিক্ষার আলোক প্রদীপ্ত থাকা স্বত্বেও অনেকেই বিদ্যাভিমানী, ঘোর বিলাসী, বাচাল, উদ্ধত-প্রকৃতি, লঘুগুরু জ্ঞানবিবর্জ্জিত, অসচ্চরিত্র, পরিশ্রম-বিমুখ দৃষ্ট হয়। সমাজ-শিক্ষক হইয়া কেবল মৌখিক আড়ম্বরী প্রদর্শন পূর্ব্বক বাসনা কার্য্যে পরিণত হউক আর না হউক, জোর করিয়া সুখ্যাতি লাভের জন্য সম্পূর্ণ লালায়িত। অনেক সময়ে নীচ জনোচিত উক্তি দ্বারা কুসংস্করাপন্ন প্রাচীন মতাবলম্বিগণের সরল হৃদয়ে নিদারুণ বিদ্বেষ বহ্নি প্রজ্জ্বলিত করিয়া তুলেন।

মাহিষ্য ভ্রাতৃবর্গের নিকট বিনীত প্রার্থনা, আপনারা একতাসূত্রে আবদ্ধ হইয়া প্রাণপণ চেষ্টায় কৃষিকর্ম্ম, গোরক্ষা, বাণিজ্য প্রভৃতি কার্য্যে সাফল্য লাভ করুন। গ্রামে গ্রামে বিদ্যা চর্চ্চা করিতে থাকুন। এখন হইতে সরলমতি বালক বালিকাদিগের উর্ব্বর হৃদয়ক্ষেত্রে জাতীয় উন্নতি ও জ্ঞানকরী বিদ্যার বীজ রোপণ করুন। আপনারা সমাজ কল্যাণকর কার্য্যে সহানুভূতিকে ব্যক্তি-গত স্বার্থ না ভাবেন। যদি প্রত্যেকে শিক্ষালাভকরতঃ একটী করিয়া অংশ ক্রয় দ্বারা "মাহিষ্য ব্যাঙ্কিং এণ্ড ট্রেডিং কোম্পানী" ও "বঙ্গীয় মাহিষ্য সমিতি" বৃক্ষদ্বয়কে সঞ্জীবিত রাখেন, দেখিবেন, উহাদের অমৃতময় ফলে সমগ্র মাহিষ্য সমাজের বাসনা-ক্ষুধা নিবারিত হইবে। আর ভ্রাতৃবিরোধে বৃথা কালক্ষয় করিবেন না। এইবার জাতীয় শক্তিতে উদ্বুদ্ধ হউন।

শ্রীশিবপ্রসাদ কুতি।

দুর্গাপুর বিদ্যালয়, শুক্তারপুর, হাওড়া।

ঝিকটিপোতা মাহিষ্য-সভা ও
নবদ্বীপ-সম্মত ভাষ-পত্র।

ইতিহাস-প্রসিদ্ধ ইচ্ছামতী নদীর উপকূলস্থ প্রাচীন মাহিষ্য-রাজ্যের—প্রাচীন মাহিষ্য গৌরবের লীলাভূমি লাটকক্ষদ্বীপান্তর্গত—বর্ত্তমান যশোহরের বনগ্রাম মহকুমার অধীন ঝিকটিপোতা নামক গ্রামে স্বজাতি-প্রেমিক সহৃদয় শ্রীযুক্ত বাবু রসময় বিশ্বাস মহাশয়ের উদ্যোগে তদীয় ভবনে বিগত ৩১শে ডিসেম্বর তারিখে এক বিরাট মাহিষ্য-সভার অধিবেশন হয়। যশোহর, নদীয়া, হুগলি, হাওড়া, ২৪ পরগণা, কলিকাতা, বর্দ্ধমান, মেদিনীপুর প্রভৃতি জেলার অনেকানেক কৃতবিদ্য সম্ভ্রান্ত মাহিষ্য ও গৌড়াদ্য বৈদিক শ্রেণীর ব্রাহ্মণ মহোদয়গণ এই সভায় যোগদান করিয়া স্ব স্ব স্বজাতি বৎসলতার পরিচয় দিয়াছিলেন। প্রথমেই সভাচার্য্য নদীয়া চাকদাহ নিবাসী পণ্ডিত শ্রীযুক্ত শ্রীহরি স্মৃতিরত্ন ভট্টাচার্য্য মহাশয় সুললিত সংস্কৃত ভাষায় মঙ্গলাচরণ পাঠ করিয়া সভাপতি নির্ব্বাচনের প্রস্তাব করেন। চুয়াডাঙ্গার উকিল বাবু ভবানন্দ চক্রবর্ত্তীর অনুমোদনক্রমে সর্ব্ববাদিসম্মত রূপে, বঙ্গদেশের জ্ঞানপীঠ শ্রীধাম নবদ্বীপের "নবদ্বীপ-বিবুধ জননী সভার" সুযোগ্য সম্পাদক বিবুধ-বর শ্রীল শ্রীযুক্ত শ্যামাচরণ স্মৃতিতীর্থ মহোদয় সভাপতির আসন অলঙ্কৃত করেন। নবদ্বীপের অন্যতম নৈয়ায়িক কুচবিহারাধিপতি কর্ত্তৃক সুবর্ণপদক-সম্মানিত বিপশ্চিৎ শ্রীযুক্ত রামকণ্ঠ ব্যাকরণতীর্থ-তর্করত্ন এবং ভাজন ঘাট বাস্তব্য প্রসিদ্ধ প্রাচীন স্মার্ত্ত পণ্ডিত শ্রীযুক্ত কালীপদ স্মৃতিরত্ন মহোদয় সহকারী সভাপতির পদ গৌরবান্বিত করেন। হাওড়া জেলার হুল্লে নিবাসী সংক্ষিপ্তসার ব্যাকরণের টীকাকৃৎ পুণ্যশ্লোক গোয়ীচন্দ্র বংশাবতংস বাগ্মী শ্রীযুক্ত হরিশ্চন্দ্র চক্রবর্ত্তী মহাশয়ের স্বভাব-সিদ্ধ ওজস্বিনী চিত্তচমৎকারিণী বক্তৃতায় সভাস্থল মন্ত্রমুগ্ধবৎ হইয়াছিল। হুগলী জেলার উগারদহ গ্রাম নিবাসী পণ্ডিত শ্রীযুক্ত নারায়ণ চন্দ্র কাব্যরত্ন ভট্টাচার্য্য মহাশয় বেদস্মৃতি সংহিতা পুরাণাদি অবলম্বনে সভার গবেষণাপূর্ণ প্রমাণ প্রয়োগ যুক্তি উপন্যাসের দ্বারা অশৌচতত্ত্ব বর্ণন করেন। সুধীবর সেবিকা-সম্পাদক সমাজ-হিতব্রত গুণনিধি পণ্ডিত শ্রীযুক্ত মহেন্দ্রনাথ তত্ত্বনিধি মহাশয় বিবিধ সামাজিকতত্ত্বের অবতারণা করিয়াছিলেন। উকিল বাবু ভবানন্দ চক্রবর্ত্তী মহাশয় গৌড়াদ্য-বৈদিক ব্রাহ্মণগণের ইতিকর্ত্তব্যতা বিষয়ে

সমীচীন সমালোচনা করিয়া হুগলি জেলাস্থ "বলরামবাটী গৌড়াদ্য-বৈদিক-ব্রাহ্মণ-সমিতির" সম্পাদক খ্যাতনামা ডাক্তার শ্রীযুক্ত উমেশচন্দ্র চক্রবর্ত্তী মহাশয় কর্ত্তৃক প্রকাশিত "গৌড়াদ্য-বৈদিক-ব্রাহ্মণ-পরিচয়" নামক পুস্তক ব্রাহ্মণগণকে বিতরণ করেন। হুগলি দলুইগাছার সুকণ্ঠ গায়ক শ্রীযুক্ত বিপিনবিহারী ভট্টাচার্য্য মহাশয়ের কণ্ঠ-নিঃসৃত সামাজিক সঙ্গীত শ্রবণে অনেকেই অশ্রু সম্বরণ করিতে পারেন নাই। বেলা ২টা হইতে রাত্রি ৮ ঘটিকা পর্য্যন্ত সভার কার্য্য চলিয়াছিল। এই সুদীর্ঘ সময়ের মধ্যে সভ্যগণের কেহই স্থানত্যাগ করেন নাই। সকলেই যেন চিত্রার্পিতের ন্যায় উপবেশন করিয়াছিলেন। বিচক্ষণ সদসদ্‌ বিচারপারদর্শী মহামনা সভাপতি মহোদয় সহকারী-সভাপতিদ্বয়ের সহিত একমত হইয়া বিরাট সভামণ্ডপে সর্ব্বজন-সমক্ষে হালিক কৈবর্ত্তই মাহিষ্য এবং তাহাদের "বৈশ্য-বর্ণান্তর্গতত্বাং" "পক্ষাশৌচ" ঘোষণা করিয়া নিম্নলিখিত "ভাষ্যপত্র" প্রদান করিয়াছেন। পরিশেষে সভাপতি মহাশয়কে ধন্যবাদ দিয়া সভাভঙ্গ হয়। পরাহে

রসময় বাবুর স্বর্গীয় মাতার বাৎসরিক শ্রাদ্ধ-বৃষোৎসর্গ সমারোহের সহিত সম্পন্ন হয়। পণ্ডিত শ্রীহরি স্মৃতিরত্ন, পণ্ডিত হরিশচন্দ্র চক্রবর্ত্তী, পণ্ডিত নারায়ণ চন্দ্র কাব্যরত্ন, পণ্ডিত বিপিন বিহারি ভট্টাচার্য্য, পণ্ডিত ক্ষেত্রমোহন ভট্টাচার্য্য ইঁহারা যথাক্রমে বিরাট গীতা, কঠোপনিষদ্‌ পাঠ এবং অন্যান্য বৈদিক কার্য্যে ব্রতী হইয়াছিলেন। যজ্ঞবেদীর অদূরে কুশাসনে গললগ্নীকৃতবাসে বদ্ধাঞ্জলি মাতৃভক্ত রসময় বাবু বাষ্পগদ্গদকণ্ঠে সাশ্রুনয়নে বেদ পাঠাদি শ্রবণে নিরত থাকিয়া দক্ষিণান্তে ধূল্যবলুণ্ঠিত সাষ্টাঙ্গে প্রণত হইলেন। ভূদেবগণের শ্রীমুখোচ্চারিত "শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ" রবে বৈদিক কার্য্য পরিসমাপ্তি লাভ করিল। ইতি।—সন ১৩১৯। ২০শে পৌষ।—

ভাষ্য পত্রম্।

"অনুলোমাস্তু মাতৃবর্ণাঃ" "বৈশ্যঃ পঞ্চদশাহেন" ইতি
বিষ্ণুমনুবচনাভ্যাং বৈশ্যান্তর্গত মাহিষ্যানাং
পঞ্চদশাহাশৌচং সমীচীনমতমিতি।—

(স্বাক্ষর) নবদ্বীপ নিবাসিনাং স্মৃতিতীর্থোপাধিক শ্রীশ্যামাচরণ শর্ম্মণাম্।
,, ,, ,, ব্যাকরণতীর্থ তর্করত্নোপাধিক শ্রীরামকণ্ঠ শর্ম্মণাম্।
,, ভাজনঘাটবাস্তব্যানাং স্মৃতিরত্নোপনামক শ্রীকালীপদশর্ম্মণাম্।

জেলা হাবড়া উলুবেড়িয়া থানার অন্তর্গত শশাবেড়িয়া গ্রাম নিবাসী—শাণ্ডিল্য গোত্রীয় ব্রাহ্মণ-বংশ।

শিবরাম বিদ্যানিধি
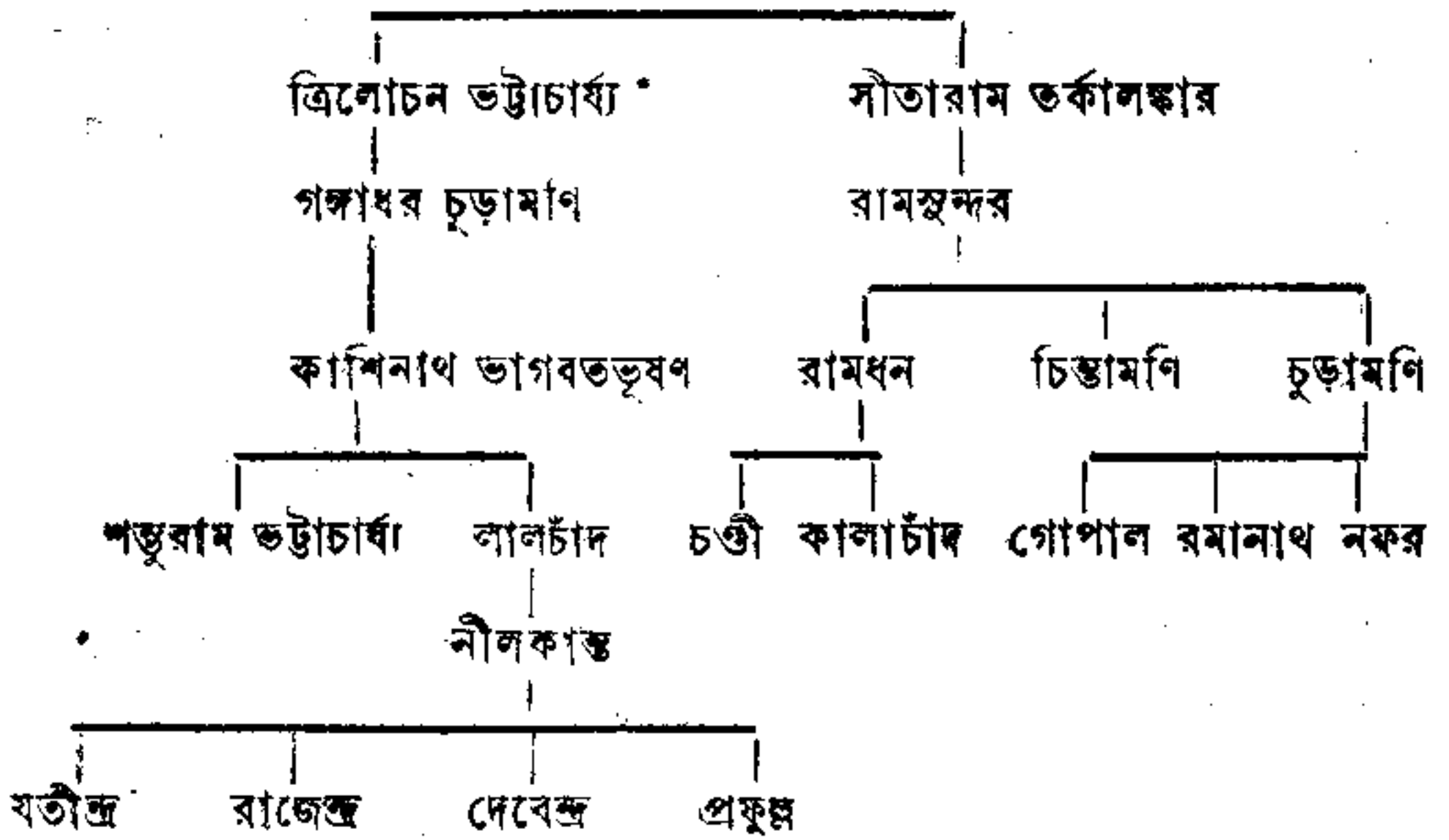
৺শিবরাম বিদ্যানিধি কুলদেবতা শ্রীধর ও শিব, শীতলা, মনসা, প্রতিষ্ঠিত করেন। উক্ত বংশে গঙ্গাধর চূড়ামণি একজন বিখ্যাত নৈয়ায়িক পণ্ডিত ছিলেন। তৎপুত্র কাশিনাথ শিরোমণি ভাগবত গ্রন্থে পরম ব্যুৎপত্তি লাভ করিয়াছিলেন। তিনি স্বীয় বাস্তভিটার উপর চতুষ্পাঠী-স্থাপন করিয়া অধ্যাপকতা করিয়া বহু সংখ্যক ছাত্রকে বিদ্যাদান করিয়া যশস্বী হইয়াছিলেন। বর্দ্ধমান রাজবাটী প্রদত্ত লাখিরাজ ভূসম্পত্তি আছে। সেওড়ফুলিয়া কায়স্থ রাজবংশ উক্ত ব্রাহ্মণদিগের দ্বারা শশাবেড়িয়ার পার্শ্ববর্ত্তী রামচন্দ্রপুর গ্রামে জাগ্রত দেবতা সিদ্ধেশ্বরী কালী প্রতিষ্ঠা করান। অদ্যাপি তাঁহারা উক্ত কালীদেবীর দেবোত্তর সম্পত্তি ভোগ করিতেছেন।

কৃষিবার্ত্তা।

(লেখক—শ্রীআশুতোষ দেশমুখ)

বিগত বৎসরে শিবপুরের বীজভাণ্ডার ও কৃষিবিভাগের অধীনস্থ ক্ষেত্রসমূহ হইতে সর্ব্বশুদ্ধ ৩৬১॥০ মণ নানাজাতীয় শস্যের বীজ সরবরাহ হইয়াছে। বিহার ও উড়িষ্যার প্রদেশে স্বতন্ত্র বীজ ভাণ্ডার স্থাপিত না হওয়ায় আপাততঃ

এখান হইতেই বীজ সরবরাহ করা হইতেছে। ঢাকা বীজ ডিপো এখন বঙ্গীয় গবর্ণমেণ্টের অধীনে আসিয়াছে। ২৬৫ জন লোককে নিম্নলিখিত দ্রব্য সরবরাহ করা হইয়াছে—সরকারী আদর্শ ক্ষেত্রগুলিকে বিনামূল্যে কতক লোককে স্বল্পমূল্যে ও অবশিষ্ট ন্যায্য দরে। যথাঃ—বীজ (চীনেবাদাম, পাট, ধনিচা, গোল আলু, পেঁপে, শণ, জোয়ান, মুগ, মুসুর, ছোলা, অড়হর, ধনে, ইত্যাদি) ৪৫০॥০ মণ ; ইক্ষু ৩৭৪৫০টা ; মালদহী আমের কলম ৪০টা ; কলার তেউড় ৪০টা ; হাড়ের গুঁড়া (সার) ৮৬ মণ ; কৃষিযন্ত্র ২০ টা।

নিম্নলিখিত জেলাগুলিতে গতবৎসর কৃষি প্রদর্শনী ও মেলা হইয়াছিল :—চুঁচুড়া (হুগলি), বাঁকুড়া, সুরী (বীরভূম), বারাসত (২৪পরগণা), বসিরহাট (ঐ), যশোহর, খুলনা, মুর্শিদাবাদ, কাঁন্দি (মুরশিদাবাদ), ফরিদপুর, কালিম্পঙ্, (দার্জ্জিলিং), শিলিগুড়ি, (ঐ), কারসেওং (ঐ)। বঙ্গীয় কৃষিবিভাগ এই প্রদর্শনী-গুলিকে সর্ব্বশুদ্ধ ২৮৫০ টাকা অর্থসাহায্য করিয়াছিলেন।

নিম্নলিখিত ট্র্যাক্টগুলি ছাপাইয়া বিনামূল্যে বিস্তারিত হইয়াছে :—আলুর পোকা ; ঢাকা কেন্দ্রীয় বীজভাণ্ডারের মূল্য তালিকা ; ধান্যশত্রু ছেনি বা লেদা পোকা।

যৌথঋণদান সমিতি জার্ম্মানি প্রদেশে কিরূপ প্রসারিত হইয়াছে তাহা নিম্নলিখিত হিসাব হইতে স্পষ্ট বুঝা যায়। জার্ম্মানির ভূতপূর্ব্ব রাজস্বসচিব হার ভন মিগুয়েল বলিয়াছিলেন "আমাদের লক্ষ্য প্রত্যেক গ্রামে একটী করিয়া ভূমিসম্বন্ধীয় ব্যাঙ্ক স্থাপন করা"। এখন কার্য্যেও এই সঙ্কল্প সফলতার দিকে অনেকদূর অগ্রসর হইয়াছে। ১৯১১ সালের শেষ পর্য্যন্ত ১৪৫০৯টী ঋণদান সমিতি স্থাপিত হইয়াছে। ষোল বৎসরের মধ্যে মাত্র ১৯টী সমিতি ফেল হইয়াছে। এরূপ আশাতীত ফল অল্পস্থলেই দেখিতে পাওয়া যায়। বর্ত্তমান বৎসরে এই সকল সমিতি হইতে প্রায় ছয়শত কোটী টাকা ধারে খাটিতেছে। কৃষির উন্নতি করিতে গেলে যৌথনিয়মে অর্থাগমের সুবিধা করিতে না পারিলে অনেক বিষয়ে পশ্চাৎপদ থাকিতে হয়। আমাদের সরকারী ঋণদান সমিতির উপর কৃষি ও কৃষিব্যবসায়িগণের ভবিষ্যৎ সম্পূর্ণ নির্ভর করিতেছে।

সহযোগী "ইণ্ডিয়ান ডেলি নিউজ" লিখিতেছেন :—উপমা দিবার সময়ে অনেকে জাপানী কৃষককে এতদ্দেশীয় কৃষককে নিকট আদর্শরূপে উপস্থাপিত করেন। কিন্তু শ্রীমতি ই, সি, সেম্পল নামক জনৈক আমেরিকান পর্য্যটক বলিতেছেন—জাপানী কৃষক অপেক্ষা বর্ত্তমান ভারতীয় কৃষকের অবস্থা অনেকাংশে ভাল। জাপানে চাষের জমি কম; সমগ্র দেশের শতকরা ১৪ ভাগ। লোকসংখ্যা অত্যধিক বেশী গড়ে প্রতি বর্গমাইলে ৩৫০ জন হিসাবে; সুতরাং পরিবারে ৬।৭ বিঘার অধিক জমি চাষ করিতে পায় না। দেশে গবাদির অভাব কারণ পশুচারণ ভূমি আদৌ নাই; পশুর খাদ্যও ক্ষেত্রে উৎপাদিত হয় না। অথচ কৃষি হইতেই রাজ্যের পনর আনা আয়। প্রথম শ্রেণীর ইউরোপীয় রাজ্যগুলির সমশ্রেণীভুক্ত হওয়ায় রাজ্যের ব্যয়ভার বিলক্ষণ বাড়িয়াছে ও ইহার অধিকাংশই কৃষকের স্কন্ধে পড়িয়াছে; ফলে অদম্য পরিশ্রম, মিতব্যয়িতা ও সহিষ্ণুতা সত্ত্বেও জাপানী কৃষক পৈতৃক ক্ষেত্র হইতে বিতাড়িত হইতেছে ও কৃষিক্ষেত্রগুলি বড় বড় এষ্টেট প্রভৃতির হস্তগত হইতেছে।

বিজয়-বিয়োগ।

(১)

"বিজয়"-সুগন্ধিফুল অফুটন্ত পড়িল খসিয়া
অকস্মাৎ কাল ঝঞ্ঝাবাতে!
"বিজয়"-গৌরব-রবি কত হৃদি আঁধার করিয়া
চিরতরে অস্ত গেলা প্রাতে!

(২)

এ কি অনিয়ম ভবে শিবময় জগৎপাতার?
যে বাঁচিলে হইত সমাজ
উন্নত বরেণ্য ধন্য, অকালেতে সংহারে তাঁহার
কিবা শিব সাধিলে গো আজ?

(৩)

জান তুমি পূর্ণব্রহ্ম, এ রহস্য অপূর্ণ অজ্ঞান
নরে কভু বুঝিতে কি পারে?

এ ভীষণ অমঙ্গলে কি মঙ্গল হে মহা মহান্ !
সাধ,—জান তুমিই মুরারে !

(৪)

কি গাঢ় স্বজাতি-প্রীতি হে বিজয়, ছিল তব হায় !
বিদ্যার্থীর কর্ত্তব্য কঠোর
পালিয়াও প্রাণপণে, পরাগতি স্বজাতি-সেবায়
মনে প্রাণে ছিলে গো বিভোর !

(৫)

হে প্রশান্ত-পূতচিত্ত-স্নেহ-প্রীতি-শ্রদ্ধার আস্পদ,
হে অক্লান্ত ধীর কর্ম্মবীর,
গেলে তুমি, কিন্তু তব শুভ্রোজ্জ্বল স্মৃতির সম্পদ
জীবিত রাখিবে তোমা চির।

(৬)

নির্জীব হইল আজি "পূর্ব্ববঙ্গ সাহিত্য-সমিতি"
তুমি যার ছিলে গো পরাণ !
পিতার সুকীর্ত্তি তব জাতিতত্ত্ব —"সাহিত্য বিবৃতি"
কাব্যগ্রন্থ—"বিজয়াবসান"

(৭)

তোমারি আগ্রহ-যত্নে হতেছিল সুন্দর আকারে
মুদ্রাঙ্কিত, অপূর্ণ রাখিয়া
সেই প্রাণ-প্রিয় কাজ, করিলে গো যাত্রা পরপারে
শোকার্ণবে সবারে ফেলিয়া !

(৮)

এসেছিলে যেন কোন শাপভ্রষ্ট দেবতার সম
হতভাগ্য আমাদের মাঝ ;
তব যোগ্য দেবধামে চলিলে হে, কিন্তু প্রিয়তম,
দেখো চেয়ে রহিল সমাজ !

শোকার্ত্ত—শ্রীরেবতীরঞ্জন রায়।

বিয়োগ-বার্ত্তা।

নয়ন জলে ভাসিয়া অতি শোকসন্তপ্ত হৃদয়ে আজ এই হৃদয়-বিদারক শোক সংবাদ লইয়া পাঠকগণের চিত্ত মর্ম্মাহত করিতে বাধ্য হইতেছি। যাঁহার আজীবন পরিশ্রম ও যত্নে সাহিত্য-সমাজ নানা বিষয়ে উপকৃত সেই স্বজাতি-প্রেমিক সমাজসেবী আমাদের প্রিয় বন্ধু জেলা ঢাকার অন্তর্গত দোগাছী নিবাসী সুনামগঞ্জ-প্রবাসী শ্রীযুক্ত বাবু বসন্তকুমার রায় এম,এ, বি,এল মহাশয়ের সুযোগ্য প্রথম পুত্র বিজয় কুমার রায় আত্মীয় বন্ধুবান্ধব প্রিয়জন গণকে অকূল শোক-সাগরে ভাসাইয়া সামান্য জ্বর রোগে বিগত ১৯শে চৈত্র তারিখে ইহলোক ত্যাগ করিয়াছেন। সুনামগঞ্জ হইতে আসিয়া বসন্ত বাবু পুত্রের সহিত শেষ দেখা করিতে পারেন নাই। তাঁহার অকাল বিয়োগে বঙ্গীয় সাহিত্য সমাজ একজন কর্ম্মবীর অকৃত্রিম বন্ধু হারাইলেন। তিনি ঢাকা-কলেজে এম এ ও বি এল পড়িতেছিলেন। ঢাকা সাহিত্য-পরিষদের একজন উদ্যমশীল সভ্য ছিলেন। তিনি মধ্যে মধ্যে এই সাহিত্য পরিষদে উৎকৃষ্ট প্রবন্ধ লিখিয়া পাঠ করিতেন। তাঁহারই আগ্রহে বিজয়াবসান ও সাহিত্য-বিবৃতির নূতন সংস্করণ মুদ্রিত হইতে আরম্ভ হইয়াছিল, কিন্তু সম্পূর্ণ না হইতেই তিনি মহাপ্রস্থান করিলেন! অল্প বয়সে তাঁহার যে প্রতিভা দেখা গিয়াছিল, তাহাতে কালে তিনি পিতার ন্যায় একজন লব্ধপ্রতিষ্ঠ হইতে পারিবেন ইহা সকলেই আশা করিয়াছিলেন। কিন্তু মঙ্গলময়ের ইচ্ছা অন্যরূপ। তিনি প্রথম ঢাকায় কাতর হন, তৎপর আরোগ্য হইয়া বাড়ী গিয়া ৭।৮ দিনের জ্বরে জীবন লীলার অবসান করেন। বিজয়াবসানের মুদ্রাঙ্কনের শেষ না হইতে হইতেই বিজয়াবসান হইল! হা অদৃষ্ট! আমরা বজ্রাহতের ন্যায় তাঁহার বিয়োগ-বার্ত্তা শ্রবণে কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ় হইয়াছি। ভগবান তাঁহার পরোলোকগত আত্মার সদ্গতি ও শোকসন্তপ্ত পরিবারবর্গের চিত্তে শান্তি প্রদান করুন, এই আমাদের প্রার্থনা।

বিবিধ প্রসঙ্গ।

কলিকাতার সেন্‌সাস রিপোর্ট।—১৯১১ সালে যে লোকগণনা হইয়াছিল তাহার কলিকাতা সহরের রিপোর্ট বাহির হইয়াছে। চাষী কৈবর্ত্ত যে মাহিষ্য এবং জালিক কৈবর্ত্ত হইতে সম্পূর্ণ পৃথক—তাহা এই রিপোর্টে প্রদর্শিত হইয়াছে। সমগ্র কলিকাতা ও উহার উপকণ্ঠে ৩১৯৬১ মাহিষ্য বাস করেন।

বিজয়া মাসিক পত্র ও দক্ষিণেশ্বর কালীবাটী। —১৩১৯ চৈত্র সংখ্যা বিজয়া-পত্রিকার ৩৫২ পৃষ্ঠায় "শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংস" শীর্ষক প্রবন্ধে রাণী রাসমণি প্রতিষ্ঠিত দক্ষিণেশ্বরের দেবালয়ে অন্নভোগ সংক্রান্ত বিবরণীতে যে উক্ত দেবালয় গুরুকুলকে দান করিয়াছিলেন বলিয়া লিখিত হইয়াছে উহা ভ্রমপূর্ণ। মন্দির-সংক্রান্ত দলিল পত্রে দেখা যায় ১২৬৮ সালে অথবা ১৮৬১ খৃষ্টাব্দের ২৭শে আগষ্ট তারিখে রাণীর দিনাজপুর বিভাগের ২২৬০০০ টাকা মূল্যের জমিদারী সহ উক্ত দেবালয় দেবোত্তর সম্পত্তিরূপে রেজেষ্ট্রী করিয়া দিয়াছেলেন। মন্দিরের কার্য্য ১২৪২ সালে আরম্ভ হইয়া ১২৬০ সালে শেষ হয় এবং ১২৬১ সালের স্নানযাত্রার দিবস মন্দির প্রতিষ্ঠা হয়। তৎপর উহা লেখা পড়া করিয়া দেবোত্তর সম্পত্তি রূপে রেজেষ্টি করিয়া দেওয়া হইয়াছে। সুতরাং গুরুকুলকে দান করিলেন এই কথার মূল্য রহিল কই?

তুলামেরু।—জেলা মেদিনীপুরের কাঁথী মহকুমার অন্তর্গত সুবদী গ্রামের নিকট আমদাবাদ গ্রাম নিবাসী স্বধর্ম্মনিষ্ঠ স্বজাতি-প্রেমিক দানবীর মাহিষ্যকুল-প্রদীপ শ্রীযুক্ত বাবু নারায়ণ প্রসাদ জানা মহাশয় বিগত ১লা চৈত্র (১৩১৯) তারিখে সস্ত্রীক ব্রতী হইয়া তুলামেরু যজ্ঞ অনুষ্ঠান করিয়াছেন। চতুর্ব্বেদ-পারদর্শী ব্রাহ্মণগণ ও অন্যান্য সকল শ্রেণীর ব্রাহ্মণ পণ্ডিত ও অধ্যাপকগণ উপস্থিত ছিলেন। ঋগ্বেদ ও সামগান দ্বারা তুলামেরুর যজ্ঞস্থল মুখরিত ও পবিত্র হইয়াছিল। ধান্দা চতুষ্পাঠীর অধ্যাপক শ্রীযুক্ত শশধর তর্কবাচস্পতি মহাশয় বেদগান দ্বারা শ্রোতৃবর্গকে মন্ত্রমুগ্ধবৎ করিয়াছিলেন বৈশ্যোচিত সমুদয় কার্য্য নির্ব্বিঘ্নে সম্পন্ন হইয়া গিয়াছে। ব্রাহ্মণগণকে যথাযোগ্য সম্মান রক্ষা করিয়া বিদায় প্রদান করা হইয়াছে। আমরা এইরূপ পুণ্যময় বৈদিক উদ্বোধনে সমগ্র বঙ্গদেশকে সঞ্জীবিত হইতে দেখিব কি? সে দিন আবার কবে আসিবে? আর্য্য-পিতৃকুলের সেই শাশ্বত ধর্ম্মে কবে বাঙ্গালী হিন্দুগণের আন্তরিক আগ্রহ পরিদৃষ্ট হইবে?

মাহিষ্য-সমাজ।

[৩য় ভাগ, ২য় সংখ্যা—জ্যৈষ্ঠ, ১৩২০]

কৃষি-পরিষদ।

(১)

আমেরিকার উইজকন্‌সিন বিশ্ববিদ্যালয়ে ৮৫৯ কৃষি-কলেজ আছে, ভারমণ্ট ও টেনাসী বিশ্ববিদ্যালয়দ্বয়ে প্রত্যেকটীতে ৬০টী করিয়া কৃষিকলেজ আছে, আর আমাদের ভারতবর্ষের মধ্যে মধ্যপ্রদেশ ও বিহারে কেবল মাত্র পুনা কৃষিকলেজ ও পুষা কৃষিকলেজ দুইটী মাত্র উল্লেখযোগ্য। ভারতবর্ষ কৃষিপ্রধান দেশ, আমেরিকার তুলনায়,এখানে কতকগুলি কৃষিবিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হওয়া প্রয়োজন তাহা চিন্তাশীল ব্যক্তিমাত্রেই ধারণা করিতে পারেন। মধ্যপ্রদেশ ও বিহারে উন্নত কৃষি-যন্ত্রের ব্যবহার হইতেছে, নূতন যন্ত্র-হলে চাষের সুবিধা হইতেছে, চাষের অন্যান্য রূপ যন্ত্রেরও উন্নতি হইতেছে। উন্নত লাঙ্গল ভারতের নানাস্থানে চলিতেছে, আর আমাদের বাঙ্গালা দেশে কি হইতেছে? যে দেশে কৃষি ব্যতীত অধিকাংশ লোকের জীবনধারণের উপায় নাই, সে দেশের লোক কি করিতেছে? কৃষিবিভাগের রাজপুরুষেরা যত্নের ক্রটী করিতেছেন না। গবর্ণমেণ্টের যত্ন আছে, কিন্তু আমাদের দেশের কৃষকগণ কি তাহা উপলব্ধি করিতে পারিতেছে? আখমাড়া কলের ন্যায় ধানমাড়া কলেরও উপযোগিতা সকল কৃষককে ক্রমশঃ বুঝিতে হইবে। নূতন বিদা, নূতন নিড়ান প্রভৃতির উপযোগিতাও ভারতের কৃষককে না বুঝিতে হইবে এরূপ নহে। গবর্ণমেণ্টের দৃষ্টি বাড়িতেছে, কিন্তু কৃষকের দৃষ্টি কই? ভারতের কৃষক দীনহীন; সুলভ যন্ত্রই ভারতের পক্ষে প্রশস্ত। সুলভ যন্ত্রেরই প্রচলন আবশ্যক। বৃটিশ ও মার্কিনরাজ্যে ধনপতিরা কৃষক হইয়াছেন, আর কৃষকেরা তাঁহাদের কৃষিমজুর হইয়া কৃষাণী করিতেছে—ভারতবর্ষে গরীব কৃষকগণ সুদের দায়ে উৎপন্ন সমুদয় দ্রব্য মহাজনের হস্তে তুলিয়া দিয়া সারা বৎসর অনশনে দিন কাটাইতেছে। গবর্ণমেণ্ট তাহার প্রতীকার করিবার উদ্দেশ্যে "কো-অপারেটিভ ক্রেডিট সোসাইটী" বা

"যৌথ-ঋণদান-সমিতির" প্রতিষ্ঠা করিয়া যাহাতে দেশের গরীব কৃষকগণের উপকার হয়, যাহাতে তাহারা ঋণদায়ে সর্ব্বস্বান্ত না হয় তাহার উপায় করিতেছেন। কিন্তু তাহার উপযোগিতা এখনও দেশের লোকে সম্যক্ উপলব্ধি করিতে পারিতেছে না, দুঃখের বিষয়।

বাঙ্গালা দেশের হিন্দু ও মুসলমান উভয় ধর্ম্মাবলম্বী লোকের মধ্যে বহুতর কৃষক বিদ্যমান, অধিকাংশই নিঃস্ব ও অজ্ঞ। মুসলমান হউক আর হিন্দু হউক —বাঙ্গালার জনসংখ্যার শতকরা ৭৫ জন কৃষক। কৃষক শ্রেণীর লোকের মধ্যে উচ্চশিক্ষার তেমন বিস্তার হয় নাই। উচ্চশিক্ষা লাভে পশ্চাৎপদ কৃষকশ্রেণী উন্নত কৃষি-বিজ্ঞান বুঝিবে কি করিয়া? সুতরাং এই বাঙ্গালার অধিবাসীদিগের মধ্যে যাহারা ভদ্রনামধারী 'বাবু' তাহারা শতকরা ১৩ জন হইলেও উচ্চশিক্ষা লাভ করিয়া, হয় জজ ম্যাজিষ্ট্রেট প্রভৃতি রাজপুরুষের কার্য্যে, অথবা ডাক্তার উকীল মোক্তার প্রভৃতিরূপে বিরাজ করিতেছেন। বাকী শতকরা ৮৭ জন, না উচ্চ শিক্ষা লাভ করিয়া ভদ্র বাবুদের সমকক্ষ হইতে পারিতেছে, আর না উন্নত কৃষি-বিজ্ঞানের প্রসার করিয়া দেশে ধনাগমের পন্থা উন্মুক্ত করিতে পারিতেছে, আর না বর্ত্তমান শিক্ষা-প্রণালী মতে ইংরাজী-শিক্ষিত হইয়া অন্নসংস্থানের উপায় করিতে পারিতেছে—পক্ষান্তরে কৃষিপ্রধান বাঙ্গালাদেশ নিঃস্ব ও অজ্ঞবহুল কৃষকশ্রেণীর সমবায়ে দুঃখদারিদ্র্য ও দুর্ভিক্ষে উৎসন্ন যাইতে বসিয়াছে! এ বিষয়ে সদাশয় গবর্ণমেণ্টের দৃষ্টি পড়িয়াছে, কিন্তু দেশের নেতৃনামধারী হোমরা চোমড়া বাবুদের তাহাতে লক্ষ্য নাই। যে দেশের শতকরা ৭৫ জন কৃষক এবং শতকরা ৯৪ জন নিরক্ষর, সে দেশে উন্নত কৃষিবিজ্ঞানের প্রচার কিরূপ আয়াসসাধ্য, তাহা সহজেই বোধগম্য। সুতরাং কৃষকদিগকে লেখাপড়া শিখাইতে হইবে, তাহাদিগকে কৃষিবিজ্ঞান বুঝাইয়া দিতে হইবে। কৃষিই যে দেশের সকল প্রকার উন্নতির মূল, ইহা আমাদের দেশের উচ্চশিক্ষিত বাবুদের ভাল করিয়া বুঝিতে হইবে। সুতরাং কৃষক, কৃষিক্ষেত্র ও কৃষির উন্নতি সাধন করা একান্ত প্রয়োজনীয়—ইহা প্রত্যেক বাঙ্গালীর বুঝিতে হইবে। কৃষকের অবনতি হইলে, কৃষিক্ষেত্রের অবনতি হইলে, কৃষির অবনতি হইলে যে দেশ দুঃখদারিদ্র্য-দুর্ভিক্ষে শ্মশানে পরিণত হইবে ইহা সকলেরই মর্ম্মে মর্ম্মে অনুধাবন করা বাঞ্ছনীয়। ইতিমধ্যে মুসলমান ভ্রাতৃবৃন্দের মধ্যে যেরূপ দ্রুত শিক্ষা-স্রোত প্রবাহিত হইয়াছে তাহাতে তাঁহাদের জন্য আমাদের হিন্দু ভ্রাতৃগণের বেশী ভাবিতে হইবে না। তবে হিন্দু কৃষকগণের মধ্যে আগুরী, সদ্গোপ ও মাহিষ্য

এই তিন সম্প্রদায়ের লোকই মৌলিক কৃষিজীবী বলিয়া সকল লোকেই নির্দ্দেশ করিয়াছেন। অন্যান্য সম্প্রদায় যে ইদানীং কৃষিবৃত্তি অবলম্বন করিয়াছে—তাহারা সম্প্রতি সেবাবৃত্তি ছাড়িয়া অনন্যোপায় বশতঃই ঐরূপ করিতে বাধ্য হইয়াছে। প্রকৃতপক্ষে রাজবংশী নমঃশূদ্র প্রভৃতি কয়েকটী জাতি মৌলিক কৃষিজীবী নহে—কৃষি উহাদের জাতিগত বৃত্তি বা ব্যবসায় নহে। চাতুর্বর্ণ্যাশ্রমী হিন্দুসমাজের বৈশ্যবর্ণের অন্তর্গত উল্লিখিত আগুরী, সদ্গোপ ও মাহিষ্য জাতিই মৌলিক আর্য্য কৃষক। ইহাদের মধ্যেও আজকাল বেশ লেখাপড়ার চর্চ্চা আরম্ভ হইয়াছে কিন্তু তাহা ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈদ্য, ও কায়স্থ জাতির ন্যায় নহে। এই ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় বৈদ্য ও কায়স্থ প্রভৃতি জাতি উচ্চশিক্ষিত হইয়া বিবিধ রাজকার্য্যে নিযুক্ত হইয়াছেন; উকীল, মোক্তার ডাক্তার হইয়াছেন; কিন্তু তাহাতেই কি দেশের মৌলিক উন্নতি সাধিত হইতেছে? তাহা নহে। তাঁহারা উচ্চশিক্ষিত হইয়া উচ্চ রাজকার্য্যে নিযুক্ত হইয়া মোটা মোটা বেতনে বা রোজগার করিয়া নিজেরাই বড়লোক হইতে পারিতেছেন, কিন্তু তাঁহারা দেশের শতকরা ১৩ জন মাত্র, বাকী ৮৭ জন কি করিতেছে? এই ৮৭ জনের মধ্যে নবশাখ শ্রেণীর শিল্পীরা শতকরা ১৬ জন এবং গোপ, আগুরী, সদ্গোপ ও মাহিষ্য জাতীয় শতকরা ১৬ জন মৌলিক কৃষক শ্রেণী; বাকী অন্যান্য বিভিন্ন শ্রেণী। মৌলিক কৃষক শ্রেণীর শতকরা ১৬ জনের মধ্যে শতকরা ১০ জন মাহিষ্য জাতীয়। মাহিষ্য জাতিরই জাতিগত ব্যবসায় কৃষি, মাহিষ্য শব্দের ব্যুৎপত্তিগত অর্থই কৃষক। সুতরাং শাস্ত্রচর্চ্চার উন্নতি অবনতির জন্য যেমন ব্রাহ্মণগণই দায়ী; আয়ুর্ব্বেদ বিদ্যার উন্নতি অবনতির জন্য যেমন অম্বষ্ঠগণ দায়ী, তেমনই দেশের রক্ষণাবেক্ষণের ভার একদিন যাহাদের হস্তে ছিল, দেশের ব্যবসা বাণিজ্য একদিন যাহাদের সহায়তায় শ্রীবৃদ্ধি সাধন করিয়াছিল, যাহাদের দুর্দ্দমনীয় তেজে একদিন ভারত সাগর বিলোড়িত হইত, যাহাদের উন্নত কৃষি-বিজ্ঞানের বলে একদিন যে বাঙ্গলাদেশ পৃথিবীর মধ্যে গরীয়সী ছিল, বর্ত্তমানে কৃষির উন্নতি অবনতির জন্য তাহারাই প্রকৃত পক্ষে দায়ী। অন্যান্য সম্প্রদায়ের কৃষকগণ মাহিষ্য জাতির প্রবর্ত্তিত কৃষি-প্রণালীর অনুবর্ত্তন করিবে মাত্র। অতএব দয়ালু গবর্ণমেন্টের দৃষ্টি এই মৌলিক কৃষক সম্প্রদায়ের প্রতি যাহাতে আকৃষ্ট হয় তাহাতে দেশের ভ্রাতৃবর্গের সচেষ্ট হওয়া একান্ত কর্ত্তব্য।

যাহাতে মাহিষ্য জাতির মধ্যে উচ্চ শিক্ষার প্রচার হয়, যাহাতে মাহিষ্য উন্নত কৃষি-বিজ্ঞানের আশ্রয় করিয়া দেশে প্রচুর শস্য উৎপাদনে রত হইয়া

দেশের দুর্ভিক্ষ দূর করিতে চেষ্টা করে তাহা প্রত্যেক শিক্ষিত মাহিষ্যের চিন্তা করা উচিত। যে জাতি একদিন জগতের বরণীয় ছিল, জাতীয় সম্মানের উচ্চ-শিখরে সমাসীন ছিল, তাহারা এক্ষণে শিক্ষার অভাবে অজ্ঞ বলিয়া অন্যের ঘৃণার পাত্র হইতেছে, অবজ্ঞার পাত্র হইতেছে, উপহাসের পাত্র হইতেছে ইহার কি প্রতীকার করিতে কাহারও চিত্ত উদ্বুদ্ধ হয় না? লেখা পড়া শিক্ষা করা চাই—তা বলিয়া খান কয়েক ইংরাজী পুস্তক পড়িলেই উচ্চ শিক্ষা লাভ হইল তাহা নহে—তাহাতে আমরা দেখিতে পাই, কৃষকের ছেলে ইংরেজী পড়িয়াছে বলিয়া আর কৃষি কাজ করিতে চাহে না, কৃষিক্ষেত্রে যাইতে চাহে না—বাবু হইয়া পড়ে। না জুটে কোন চাকরী, না পারে করিতে জাতীয় ব্যবসায় চাষ—উভয়ের বাহিরে পড়িয়া একটী কিম্ভূতকিমাকার জন্তু বিশেষ। তাহা ত শিক্ষার উদ্দেশ্য নহে—শিক্ষার উদ্দেশ্য পরসেবা বা চাকরী নহে—জ্ঞানলাভ করাই শিক্ষার উদ্দেশ্য। সুতরাং মাহিষ্য জাতীয় নেতৃ-বর্গের এখন দেখা উচিত যে, যেন মাহিষ্য ছাত্রেরা উচ্চ শিক্ষায় শিক্ষিত হইয়া, যাহাতে উন্নত কৃষিবিজ্ঞান আলোচনা করিয়া, দেশে নানা প্রকার বহু পরিমিত শস্যোৎপাদনে রত হয়। এ বিষয়ে অবশ্য গবর্ণমেণ্টের সহায়তা প্রয়োজন। গবর্ণমেণ্ট এ বিষয়ে সহানুভূতি প্রকাশ না করিলে কোনরূপে এরূপ মহদুদ্দেশ্য সাধিত হইতে পারে না।

এই যে পুষায় উন্নত কৃষি বিজ্ঞানের আলোচনা করার জন্য গবর্ণমেণ্ট কত চেষ্টা করিয়া কৃষি-কলেজ স্থাপন করিয়াছেন, পরীক্ষার জন্য বন্দোবস্ত করিয়াছেন, আদর্শ কৃষিক্ষেত্র স্থাপন করিয়াছেন, তথায় কয় জন মাহিষ্য ছাত্র অধ্যয়ন করিতেছে? ইহা কি কম দুঃখের কথা! বিভিন্ন শ্রেণীর ছাত্রেরা এই কৃষিকলেজে পড়িয়া উন্নত হইতেছে, আর কৃষকের সন্তান তাহাতে আগ্রহ প্রকাশ করে না? অনেকে হয় ত বলিবেন পুষা বহু দূরে!—ইচ্ছা থাকিলেই উপায় হয়। মাহিষ্য ছাত্রের আগ্রহ আছে দেখিলেই গবর্ণমেণ্ট বাঙ্গলাদেশের বিভিন্ন জেলার মাহিষ্য কেন্দ্রে ঐরূপ কলেজ প্রতিষ্ঠা করিতে পারেন—সহানু-ভূতি সহকারে সহায়তা করিতে পারেন, কিন্তু সে বিষয়ে কাহারও লক্ষ্য পড়িয়াছে কি? আমি জানি কতকগুলি ছাত্র ম্যাট্রিকুলেশন, এফ্, এ পাশ করিয়া চাকরীর জন্য উমেদারী করিয়া বেড়াইতেছে—সামান্য ২০।২৫৲ টাকা বেতনের জন্য লালায়িত হইয়া বেড়াইতেছে—কতিপয় গ্রাজুয়েট আইনের পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইবার জন্য ব্যগ্র হইতেছে—তাঁহারা যদি কৃষি-কলেজে

প্রবিষ্ট হইতেন, তবে দেশের ভাবী মঙ্গলের সূত্রপাত হইত—জাতীয় জীবনের ভবিষ্যৎ সুখময় হইত। ওকালতী পাশ করিয়া কেবল দেশে মামলা মোকদ্দমার সৃষ্টি ও বৃদ্ধি করা অপেক্ষা ইহা কি ভাল নহে? কৃষির উন্নতিতে দেশের ও দশের যে কি অতুলনীয় উন্নতি সাধিত হইবে তাহা বলিয়া শেষ করা যায় না।

বঙ্গীয় গবর্ণমেণ্টের কৃষিবিভাগেও কৃষিতত্ত্ববিদ্ রাজকর্ম্মচারীর প্রয়োজন রহিয়াছে। কৃষি-বিভাগের কার্য্য দিন দিন যেরূপ বাড়িতেছে ও ভবিষ্যতে দেশের কৃষকগণের দৃষ্টি পড়িলে আরও যেরূপে ঐ বিভাগের কার্য্য বৃদ্ধি হইবে, তাহাতে চাকুরী পাওয়াও যাইতে পারে। ইহা হইল গৌণ লক্ষ্য—কিন্তু মুখ্য লক্ষ্য—কৃষির উন্নতি। ভিন্ন শ্রেণীর কর্ম্মচারী অপেক্ষা কৃষক শ্রেণীর উচ্চ শিক্ষিত কর্ম্মচারী যে কৃষি বিভাগে অধিকতর কার্য্যকারী তাহা গবর্ণমেণ্ট বুঝেন॥

বিলুপ্ত জাতীয় মর্য্যাদা, পুনঃস্থাপন কল্পে মাহিষ্য জাতির মধ্যে যে উদ্যোগ আয়োজন, অনুষ্ঠান চলিতেছে তাহার মধ্যে উচ্চ-শিক্ষা লাভ সর্ব্বশ্রেষ্ঠ উপায় বলিয়া বিবেচিত হয়; কিন্তু উচ্চশিক্ষিত হওয়া যেমন প্রয়োজনীয় বটে, তেমনই জাতীয় ব্যবসায়ের উন্নতি সাধন জন্য প্রকৃষ্ট পন্থার আবিষ্কার করা চাই—তাহাতে ধনাগমের পন্থা সুপরিস্কৃত হইবে। নিঃস্ব সমাজ উন্নতির আশা করিতে পারে না। জাতীয় ভাণ্ডারে ধন সঞ্চয় না হইলে কোন মহৎ কাজ করিতে পারা যায় না। তদ্ব্যতীত জাতীয় মর্য্যাদা নষ্ট হইবে ইহা প্রত্যক্ষ প্রমাণ।

মাহিষ্য জাতির মধ্যে উচ্চ শিক্ষা-বিস্তারে গবর্ণমেণ্টের সহানুভূতি আকর্ষণ করা চাই। গবর্ণমেণ্টের উদ্দেশ্যের অনুকূল কাজ করা চাই। তবেই সহানুভূতি মিলিবে। যে জাতির হস্তে এককালে বাঙ্গালা দেশের শাসন দণ্ড, বাণিজ্য ও কৃষি রক্ষিত ছিল সেই জাতি এক্ষণে দারিদ্র্য ও শিক্ষা সৌকর্য্যের অভাব-তাড়নে নিষ্পেষিত পদদলিত হইতে বসিয়াছে—মাননীয় জাতি এক্ষণে কিরূপ অবসাদগ্রস্ত হইয়াছে তাহা দেখা সহৃদয় গবর্ণমেণ্টের অবশ্য কর্ত্তব্য। এই বিরাট বিশলক্ষাধিক মাহিষ্য সম্প্রদায় তাহাদের জাতীয় কৃষিবৃত্তি আশ্রয় করিয়া কোনরূপে অবস্থান করিতেছে. ইহাদের রাজসম্মান গিয়াছে, ধন গিয়াছে, মান গিয়াছে, বিদ্যাবত্তা গিয়াছে, পাণ্ডিত্য গিয়াছে! আছে কেবল অতীত গৌরব-স্মৃতি! "আমাদের

দেশের জাতি সাধারণ শিক্ষার জন্য যে পরিমাণ ট্যাক্স প্রদান করেন, ঐ ট্যাক্স দ্বারা মাত্র ২।৩টী জাতির কতিপয় লোক শিক্ষা লাভ করিয়া আসিতেছেন; যাঁহারা ট্যাক্স দান করেন, তাঁহারা ঐ টাকা দ্বারা কোন উপকার প্রাপ্ত হন না। জগতের কোন সাম্রাজ্যের এই আকারের বিচার দেখা যায় না—কিন্তু ভারত-বর্ষে—বিশেষতঃ বাঙ্গলাদেশে—তাহা বেশ হইয়া আসিতেছে। দৃষ্টান্ত দ্বারা বুঝাইতেছি। মনে করুন, বাঙ্গলাদেশে প্রতি বৎসর যেন এক কোটী টাকা কেবল শিক্ষার জন্য ব্যয়িত হয়। অল্পদিন পূর্ব্ব পর্য্যন্ত এই এক কোটী টাকা দ্বারা কেবল উচ্চ শিক্ষাই বিস্তৃত হইতেছিল। উচ্চ শিক্ষার স্কুল কলেজে ২।৩টী হিন্দু জাতীয় কতিপয় ছাত্র দ্বারাই পূর্ণ। অন্যান্য জাতি এ যাবৎ এই সকল স্কুল কলেজে পড়া শুনা করিত না। মনে করুন, এই সকল ছাত্রের বেতন দ্বারা এক কোটী টাকার মধ্যে এক লক্ষ টাকা উঠিয়া থাকে এবং বাকী ৯৯ লক্ষ টাকা গবর্ণমেণ্ট দান করিয়া থাকেন। গবর্ণমেণ্ট এই ৯৯ লক্ষ টাকা ৪॥০ কোটী মুসলমান ও ৪॥০ কোটি হিন্দু হইতে ট্যাক্সের আকারে উঠাইয়া থাকেন। যে দুই তিনটী জাতীয় ছাত্রগণ এই সকল বিদ্যালয়ে পাঠ করে তাহাদের জন সংখ্যা ২০।২৫ লক্ষের অধিক নহে। কাজেই আট কোটী লোকের মধ্যে ইহাদের সংখ্যাও যেমন নগণ্য, ইহাদের প্রদত্ত ট্যাক্সের ভাগও তেমনি নগণ্য—অর্থাৎ উপরবর্ণিত ৯৯ লক্ষ টাকার মধ্যে ইহাদের প্রদত্ত ট্যাক্স কিছুই নহে। অথচ ইহাদেরই কতকগুলি লোক অন্যের প্রদত্ত ৯৯ লক্ষ টাকার ষোল আনা উপস্বত্ব ভোগ করেন। আমাদের দেশের অন্যান্য জাতি খুব অজ্ঞান বলিয়াই এই সকল কথা বুঝেন না, প্রতিবাদও করেন না। কাজেই ব্যপার এই দাঁড়াইয়াছে যে, এদেশের অন্যান্য জাতি বাধ্য হইয়া নিজ পুত্র সন্তান দিগকে শিক্ষা না দিয়া, ঐ ২।৩টী জাতীয় কতকটী লোকের পড়া শুনার খরচ চালাইয়া ক্লান্ত হইয়া পড়িতেছেন। তাঁহাদের পক্ষে কথা বলিবার একটী লোকও নাই। ইহারা কতকাল যে এইরূপ পোষ্য পুত্র পালন করিবে, বলা যায় না; বিগত অর্দ্ধ শতাব্দী যাবৎ এইরূপ চলিয়াছে। অথচ যাহারা পিতার অর্থ দ্বারা বিদ্যাশিক্ষা না করিয়া অন্য জাতীয় লোকের প্রদত্ত অর্থের দ্বারা বিদ্যা শিক্ষা করেন, তাঁহাদের নিকট হইতেই সেই অন্যান্য জাতি কিছুমাত্র প্রতিদান প্রাপ্ত হইতেছেন না। প্রতিদান পাওয়া ত দূরের কথা, তাঁহারা নিজ টাকা দ্বারা অন্য জাতীয় লোককে লেখা পড়া শিখাইয়া তাঁহাদের নিকট হইতে নিয়ত অবজ্ঞা ও গালি ভক্ষণ করেন, অপমানও ভোগ করেন।"

"যাঁহারা পরের প্রদত্ত অর্থে অনেক বিদ্যা ও অনেক ধন উপার্জ্জন করিয়াছেন তাঁহাদের পক্ষে অন্যের প্রদত্ত অর্থ আর গ্রহণ করা উচিত নহে—তাঁহারা নিজের শিক্ষার ব্যয়ভার নিজেরাই বহন করুন—তাহা হইলেই ত অন্যান্য জাতি নিজ নিজ প্রদত্ত অর্থ দ্বারা অনেকটা শিক্ষা লাভ করিতে পারিবেন। সকলে অবগত আছেন, এদেশের কৃষকগণই পর্য্যাপ্ত কর দান করিয়া থাকেন। পূর্ব্বেই বলিয়াছি, হিন্দু কৃষকদিগের মধ্যে আগুরী, সদ্গোপ ও মাহিষ্য (চাষাকৈবর্ত্ত) মৌলিক কৃষিজীবী বলিয়া সকল লেখক নির্দ্দেশ করিয়াছেন। এতন্মধ্যে পূর্ব্বোক্ত দুই জাতির জন সংখ্যা অনেক কম। মাহিষ্যের জন সংখ্যা প্রায় বিশ লক্ষ, এই প্রকাণ্ড ও প্রবল সম্প্রদায় বিগত ৬০ বৎসর যাবৎ শিক্ষার জন্য অনেক কোটী টাকা প্রদান করিয়াছেন। এই করভারদায়ী কৃষক সম্প্রদায়ের মধ্যে উচ্চশিক্ষার বিস্তার অপরিহার্য্য হইয়া পড়িয়াছে।—কৃষক সম্প্রদায়ের জন্য উচ্চবিদ্যালয় ও কলেজে প্রভূত বৃত্তি ও ফ্রীশিপ স্থাপিত হওয়া আবশ্যক হইয়া পড়িয়াছে। এখন এই সকল সহিষ্ণু জাতির উচ্চ শিক্ষার্থে গবর্ণমেণ্ট অবশ্যই বিশেষ বিধান করিবেন।" যাহাতে ন্যায়পরায়ণ গবর্ণমেণ্ট এই সকল শিক্ষা বিস্তার কার্য্যে সফলকাম হইতে পারেন স্বার্থপর লোকে কোন বাধা দিতে না পারে তাহাই আমাদের মিলিত ভাবে দেখা কর্ত্তব্য। স্বার্থপরায়ণ লোক যাহাতে গোলযোগ উপস্থাপিত করিতে না পারেন তাহার জন্য আমাদের একটু সতর্ক হইতে হইবে। এইরূপে কৃষক শ্রেণীর মধ্যে উচ্চশিক্ষা-বিস্তার ও উন্নত কৃষিবিজ্ঞানের আলোচনায় প্রকৃষ্ট পন্থা নির্দ্ধারণ জন্য **বঙ্গীয়-কৃষি-পরিষৎ** গঠনের উপযোগিতা ও আবশ্যকতা উপলব্ধি করা যাইতেছে।

আর্য্য-সংস্কার-তত্ত্ব।

বর্ণাশ্রমীর পক্ষে বেদে ৪৮শ প্রকার সংস্কারের বিধান আছে। সেই সকল সংস্কারে সংস্কৃত হওয়া বিষম কঠিন ব্যাপার। বিশেষতঃ অল্পায়ু কলির জীবের পক্ষে কখনই সম্ভবপর নহে। যবন রাজ্যের অভ্যুদয় ও আর্য্য জাতির অবনতির

সময় হইতে ক্রমশঃ বৈদিক সংস্কারের হ্রাস হইতে আরম্ভ হইয়াছে। বোধ হয়, এইজন্যই স্মার্ত্ত পণ্ডিতগণ সেই ৪৮ সংস্কারের মধ্যে ক্রমশঃ সংক্ষেপ করিয়া ২৫টী, পরে ১৬টী, ১৩টী, অবশেষে ১০টী মাত্র প্রচলিত করিয়াছেন! সম্প্রতি এই দশটীর মধ্যেও হিন্দু সমাজে ৪।৫টী সংস্কার প্রতিপালন করিতে দৃষ্ট হয়॥

প্রথমতঃ ১ গর্ভাধান, ২ পুংসবন, ৩ সীমন্তোন্নয়ন, ৪ জাতকর্ম্ম, ৫ নামকরণ, ৬ অন্নপ্রাশন, ৭ চৌল, ৮ উপনয়ন, ৯ মহানাম্নী ব্রত, ১০ মহাব্রত, ১১ উপনিষদ্ ব্রত, ১২ গোদান ব্রত ১৩ সমাবর্ত্তন, ১৪ বিবাহ, ১৫ দেবযজ্ঞ, ১৬ পিতৃযজ্ঞ, ১৭ মনুষ্যযজ্ঞ, ১৮ ভূতযজ্ঞ, ১৯ ব্রহ্মযজ্ঞ, ২০ অষ্টকা, ২১ পার্ব্বণ, ২২ শ্রাদ্ধ, ২৩ শ্রাবণী, ২৪ আগ্রহায়ণী, ২৫ চৈত্রী, ২৬ আশ্বযুজী, (যাহার সহিত পাক যজ্ঞ হয়); ২৭ অগ্ন্যাধেয়, ২৮ অগ্নিহোত্র, ২৯ দর্শপৌর্ণমাস, ৩০ আগ্রয়ণ, ৩১ চাতুর্ম্মাস্য, ৩২ নিরূঢ় পশুবন্ধ, ৩৩ সৌত্রামণি (যাহার সহিত হবি যজ্ঞ হয়); ৩৪ অগ্নিষ্টোম্, ৩৫ অত্যগ্নিষ্টোম্, ৩৬ উক্থ্য, ৩৭ ষোড়শী, ৩৮ বাজপেয়, ৩৯ অতিরাত্র, ৪০ আপ্তোর্যাম (যাহার সহিত সোমযজ্ঞ হয়);। এই ৪০ সংস্কারের মধ্যে কোন কোনটী দেহ সম্বন্ধে ও কোন কোনটী দ্রব্য সম্বন্ধে সংস্কার বিশেষ। পরে ৮টী আত্মগুণের সংস্কার বিশেষ; যথা,—৪১ সর্ব্বভূতে পরদয়া, ৪২ ক্ষান্তি, ৪৩ অনুসূয়া, ৪৪ শৌচ, ৪৫ অনায়াস, ৪৬ মঙ্গল, ৪৭ অকার্পণ্য, ৪৮ অস্পৃহা; এই ৪৮শ প্রকার সংস্কার "গৌতমীয় ধর্ম্মসূত্রে" বিস্তারিত ভাবে লিখিত আছে॥

এতদ্ব্যতীত "নিষ্ক্রমণ" নামে একটী সংস্কার আছে, কেহ কেহ শাস্ত্রজ্ঞ পণ্ডিত উক্ত সংস্কারটীকে বিশেষ আবশ্যক বলিয়া মনে করেন না। তজ্জন্যই, নিষ্ক্রামণ সংস্কারটীর নামোল্লেখ নাই। এবং মৃতের পক্ষে ৪৮শ সংস্কারের বিধান আছে; এস্থলে, তাহাদের নাম বর্ণন করা অনাবশ্যক। সর্ব্বসমেত ৯৬টী সংস্কার আছে॥

এক্ষণে স্মৃত্যনুসারে দ্বিজধর্ম্মিগণের প্রতি সমন্ত্রক দশবিধ সংস্কার দ্বারা আর, শূদ্রের প্রতি অমন্ত্রক ৯টী সংস্কার দ্বারা শুক্রশোণিত জনিত দেহশুদ্ধির ব্যবস্থা করা হইয়াছে। অশুদ্ধ দেহী "দৈব পৈত্র্য" কর্ম্মাধিকারী হইতে পারে না। দ্বিজধর্ম্মীদিগের দশ সংস্কার এই;—

"জীবসেকঃ পুংসবনং সীমন্তোন্নয়নং তথা।
জাতনাম্নী নিষ্ক্রমণমন্নাশনমতঃপরং॥
চূড়োপনয়নঃ উদ্বাহাঃ সংস্কারাঃ কথিতা দশাঃ॥"

১ গর্ভাধান, ২ পুংসবন, ৩ সীমন্তোন্নয়ন, ৪ জাতকর্ম্ম, ৫ নামকরণ, ৬ নিষ্ক্রমণ, ৭ অন্নাশন, ৮ চূড়াকরণ, ৯ উপনয়ন, ১০ বিবাহ। এই দশবিধ সংস্কারের আবশ্যকতা পাঠকগণের বিদিতার্থে সংক্ষেপে বর্ণন করিতেছি।

১। গর্ভাধান। যে সময়ে পত্নী প্রথম ঋতুমতী হইবে, তখন ষোড়শদিনের মধ্যে যুগ্মদিনে শুভতিথি নক্ষত্রে সূর্য্যার্ঘদান ও হোমাদি কার্য্য করিবে। এবং রাত্রিতে শুভলগ্নে স্ত্রীসহবাস করিবে। এই গর্ভাধান সংস্কার মনুষ্য জীবনের শেষ সংস্কার ও ভাবী জীবনের প্রথম সংস্কার। ইহা একবার করিলে চিরকাল গর্ভসংস্কৃত থাকে, পুনঃ পুনঃ গর্ভসংস্কার করিতে হয় না। এই গর্ভাধান সংস্কার দ্বারা মাতা পিতার শোণিত শুক্রগত দোষের মার্জ্জন হয়।

২। পুংসবন। স্ত্রী গর্ভাবতী হইলে দুই মাসের পর আড়াই মাসের মধ্যে বৃদ্ধিশ্রাদ্ধ ও হোমাদি কার্য্য করিতে হয়। এই পুংসবন সংস্কার দ্বারা পুত্রোৎপাদনের সহায় এবং কন্যা উৎপাদনের দোষ নিবারিত হয়।

৩। সীমন্তোন্নয়ন। প্রথম গর্ভস্পন্দনের পর ষষ্ঠ মাসে বা অষ্ট মাসে গর্ভিনীর কেশ-সংস্কার করিয়া দিতে হয়। ইহাতে দীর্ঘায়ু পুত্র প্রসব করিবে। এই সংস্কার দ্বারা মাতার অধঃবাহিনী শিরার স্রোত উর্দ্ধগামী হয়, এবং তাহাতে মাতার মস্তিষ্কে উত্তম ভাবের বিকাশ হয়; এই উত্তম ভাবের ছায়া গর্ভস্থ সন্তানে সংক্রমিত হয়।

৪। জাতকর্ম্ম। বালক জন্মিলেই নাড়ীচ্ছেদন করিবার পূর্ব্বে পিতা বৃদ্ধি শ্রাদ্ধ ও হোমাদি করিয়া মন্ত্রপাঠ পূর্ব্বক ব্রীহি যব দ্বারা বালকের জিহ্বা মাজিয়া দিবে। পরে নাড়ীচ্ছেদন করাইয়া দুগ্ধ পান করাইবে। যদি পুংসবনাদি না হইয়া থাকে, তবে এই সময়ে সেই সকল কার্য্য সম্পন্ন করতঃ জাতসংস্কার করা কর্ত্তব্য। এই সংস্কার দ্বারা গর্ভনিবাস কৃত দোষের মার্জ্জন হয়। এই সংস্কারটী সকল সমাজ হইতে একবারে বিলুপ্ত হইয়াছে।

৫। নামকরণ। বালকের জন্ম হইতে একাদশ দিনে, শত দিনে বা বৎসরে শাস্ত্রোক্ত হোমাদি করিবে। মনুষ্য মাত্রেই এই সংস্কার করিয়া থাকে; উক্ত নামকরণ না হইলে সংস্কারের কোন ব্যবহারই চলে না। ব্রাহ্মণের শর্ম্মন্, ক্ষত্রিয়ের বর্ম্মন্, বৈশ্যের ভূতি, গুপ্ত ও ধন এবং শূদ্রের নামের শেষে দাস উপাধি রাখিবে।

৬। নিষ্ক্রমণ। বালকের জন্ম হইতে তৃতীয় জ্যোৎস্নার তৃতীয়ার প্রদোষে, বালককে সূতিকা গৃহ হইতে বাহির করিয়া চন্দ্র দর্শন পূর্ব্বক বাসগৃহে আনিতে

হয়। এই সংস্কারে বালকের আয়ুঃ বল বুদ্ধি জন্য বৃদ্ধিচন্দ্রকে শুভ প্রার্থনাদি করিতে হয়।

৭। অন্নপ্রাশন। যে সময়ে বালকের জঠরাগ্নি অন্নরস পরিপাকের যোগ্য হয় এবং নাড়ী অন্নরস ধারণ বহন করিবার যোগ্য হয়, তখন এই সংস্কারের আবশ্যক। কোন কোন স্মার্ত্ত পণ্ডিত বলেন, বালকের দন্তোদ্গম হইলে ষষ্টমাসে বা অষ্টমাসে এই সংস্কার করিবে। ইহাতে পিতা বৃদ্ধিশ্রাদ্ধ ও হোমাদি কর্ম্মসমাপন করিয়া স্বর্ণপাত্রে সংস্কৃত অন্নাদি ভোজন করাইবে। এই সংস্কার দ্বারা পূর্ব্বপিতৃপুরুষগণের শুভাশীর্ব্বাদ প্রাপ্ত হইয়া বালক দীর্ঘজীবন লাভ করে।

৮। কৌল বা চূড়াকরণ। প্রথম বা তৃতীয় বর্ষে এই সংস্কার করিতে হয়। বৃদ্ধিশ্রাদ্ধ ও হোমাদি করিয়া মন্ত্রপাঠপূর্ব্বক শিখাস্থান বাদে সমস্ত কেশ ক্ষৌর করিবে। ক্ষৌরান্তে স্বর্ণ বা রৌপ্যশলাকা দ্বারা কর্ণবেদ করাইয়া কার্য্য সমাধা করিবে। সন্ধ্যাশীল ব্যক্তি গায়ত্রী দ্বারা উক্ত শিখা বন্ধন করিয়া সন্ধ্যা উপাসনা করিয়া থাকে।

৯। উপনয়ন। বৈশ্যের গর্ভদ্বাদশে বা চতুর্বিংশতি বর্ষমধ্যে এই সংস্কার করিয়া দ্বিজত্বলাভ করিতে হয়। অর্থাৎ যে সময়ে বালকের বুদ্ধিবিকাশ আরম্ভ হয়, সেই সময়ে এই সংস্কার আবশ্যক। এই সংস্কার না হওয়া পর্য্যন্ত বালক অনাশ্রমী থাকে। উপনয়ন হইলেই ব্রহ্মচর্য্যাশ্রমী হয়, ব্রহ্মচারী হইয়া গুরুকুলে বাস, গুরুসেবা, ভিক্ষান্নভোজন, ব্রহ্মচর্য্য, অগ্ন্যুপস্থান করিয়া দারগ্রহণ পূর্ব্বক গৃহস্থাশ্রমে আসিতে হয়। বর্ত্তমানে এ প্রথা একবারে তিরোহিত হইয়াছে। একদিনেই উপনয়ন হইতেই সমাবর্ত্তনাদি কার্য্য শেষ করিয়া আশ্রমী হওয়া হয়। এই সংস্কারের পর "দ্বিজ" সংজ্ঞাপ্রাপ্ত হয়।

যজ্ঞোপবীত গ্রহণের পর গায়ত্রী, মন্ত্রোপদেশ গ্রহণ করিয়া বেদপাঠ করিতে হয়। বেদপাঠান্তে পরব্রহ্মজ্ঞানের উদয় হইলে, উহাঁর সাক্ষাৎলাভের জন্য দীক্ষাগ্রহণ করিতে হয়। অতএব যে ব্যক্তি "বৈষ্ণবী-দীক্ষা" লাভ করিলেন, তাঁহার উপনয়নাদি গৌণসংস্কারের তত আবশ্যক হয় না। যেহেতু, বৈষ্ণবী দীক্ষা প্রভাবে মনুষ্যমাত্রেই দ্বিজত্ব লাভ করে। যথা,—

"কাঞ্চনতাং যাতি কাংস্যং রসবিধানতঃ।
তথা দীক্ষাবিধানেন দ্বিজত্বং জায়তে নৃনাম্॥"

(শ্রীহঃ, ভঃ, বিঃ ধৃত তত্ত্বসারবচন।)

এই শ্লোকের টীকায় শ্রীপাদ সনাতন গোস্বামী লিখিয়াছেন, "নৃণাং সর্ব্বেষামেব দ্বিজত্বং বিপ্রতা"। অর্থাৎ রসের বিধান অনুসারে যেমন কাংস্যও খনিজাত স্বর্ণের ন্যায় বর্ণে, গুণে ও মূল্যে তুল্যতা প্রাপ্ত হয়, সেইরূপ মনুষ্য-মাত্রেই যথাবিধানে বৈষ্ণবীদীক্ষা গ্রহণ করিলে দ্বিজত্ব অর্থাৎ বিপ্রতা প্রাপ্ত হয়। বৈষ্ণবী দীক্ষাই মুখ্যসংস্কার; যেহেতু উপনয়ন সংস্কার অনিশ্চিত। উপনয়ন একবার হইলেও পুনরায় প্রয়োজন হইয়া থাকে। যথা, শাঠ্যায়ন ব্রাহ্মণে,—"নান্যত্র সংস্কৃতো ভৃগ্বঙ্গিরোহধীয়ত:"। (অন্যত্র অন্য বেদার্থং ভৃগ্বঙ্গিরোহর্থ বেদং) উপনীতস্যাপি অথর্ব্ব বেদাধ্যয়নার্থং পুনরুপনয়নং শ্রূয়তে। অর্থাৎ ঋগ্বেদাদি অধ্যয়নের নিমিত্ত যিনি উপনয়ন গ্রহণ করিয়াছেন, তিনি যদি অথর্ব্ববেদ না পাঠ করিয়া থাকেন, তাহা হইলে সেই অথর্ব্ববেদ পাঠ করিবার জন্য তাঁহাকে পুনরায় উপনয়ন সংস্কার করিতে হইবে। সুতরাং একবার উপনয়ন হইবার পর পুনর্ব্বার যখন উপনয়ন সংস্কারের বিধি দৃষ্ট হইতেছে, তখন জ্ঞানযজ্ঞোপবীত ভিন্ন বাহ্য উপবীত অনিত্য। ফলতঃ একমাত্র দীক্ষা-সংস্কার দ্বারাই বেদোক্ত উপনয়নাদি সংস্কার সিদ্ধ হইয়া থাকে।

বৈশ্যজাতির মধ্যে যাহাদের উপনয়ন সংস্কার আছে বা যাহাদের উহা নাই, কিম্বা যাহাদের নাম মাত্র সূত্রধারণের প্রথা আছে, তাহারা সকলেই উপনয়ন স্বরূপ বিষ্ণুমন্ত্রাদি দীক্ষা দ্বারা আপনাদিগকে সংস্কৃত ও দ্বিজত্ব মানিয়া থাকেন।

পূর্ব্বে দ্বিজাতি বর্ণনির্ণয় যেরূপ গুণগত ছিল, যজ্ঞোপবীত ধারণও সেইরূপ গুণগত ছিল। দ্বিজাতি গুণসম্পন্ন ব্যক্তি মাত্রেই উপবীত গ্রহণ করিতেন। কিন্তু বর্ত্তমানকালে জন্মগত জাতি-নির্ণয়ের সঙ্গে সঙ্গে উপনয়ন সংস্কারও জন্মগত হইয়া পড়িয়াছে।

আজকাল উপনয়ন-সংস্কার বেদপাঠের বা ব্রহ্মচর্য্যের দ্বার স্বরূপ নহে,—উচ্চবর্ণাভিমানিত্বের পরিচায়ক। অত্রি এইরূপ অভিমানকে পশুত্ব বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন। যথা,—

"ব্রহ্মতত্ত্বং ন জানাতি ব্রহ্মসূত্রেণ গর্ব্বিতঃ।
তে নৈব চ স্ পাপেন পশু বিপ্ররুদাহৃতঃ॥"

"যে ব্রাহ্মণ ব্রহ্মতত্ত্বানভিজ্ঞ, অথচ কেবল ব্রহ্মসূত্র বা যজ্ঞোপবীত ধারণ করিয়া "আমি ব্রাহ্মণ" এই বলিয়া গর্ব্বিত, তিনি ঐ পাপদ্বারা পশু ব্রাহ্মণরূপে কথিত হয়েন"। বাহিরে কেবল ব্রহ্মসূত্র ধারণ করিলেই প্রকৃত দ্বিজ বা ব্রাহ্মণ হওয়া যায় না।

যিনি ব্রহ্মতত্ত্ব আদৌ অবগত নহেন, কেবল ব্রহ্মসূত্র ধারণেই গর্ব্বিত, তাঁহার ব্রাহ্মণত্বের অভিমান বৃথা।

যে সময়ে আর্য্য ও অনার্য্য এই উভয় সম্প্রদায়ের মধ্যে সংঘর্ষণ উপস্থিত হয়, সেই সময়ে আর্য্যগণ অনার্য্য সম্প্রদায় হইতে আপনাদিগকে প্রভেদ করিবার জন্য উপবীত প্রথার সূচনা করেন। ভগবান গোভিলাচার্য্য কৌথুম গৃহ্যসূত্রে লিখিয়াছেন ;—

"যজ্ঞোপবীতং কুরুতে সূত্রং বস্ত্রং বাহপি বা কুশরজ্জুমেব"।

অর্থাৎ সূত্র, বস্ত্র, কুশ, রজ্জুর মধ্যে যখন যাহা সুলভ হইবে, তখন তাহারই যজ্ঞোপবীত ব্যবহার করিবে। ফলতঃ তখন যজ্ঞোপবীত ধারণ বর্ত্তমান কালের ন্যায় বাহ্যাড়ম্বরপূর্ণ ছিল না। অনন্তর যে সময়ে বর্ণভেদ প্রথা প্রবর্ত্তিত হয়, সেই সময় হইতেই দ্বিজাতিত্রয়ের পার্থক্য জ্ঞাপনের জন্য বিভিন্নরূপ যজ্ঞোপবীত ধারণ ব্যবস্থা হইয়াছে। যথা,—

"ভাবিন্যুপবীত সংজ্ঞা যস্য বিশিষ্টন্যাসস্য তদ্বিপ্রাদীনাং কার্পাসশণোর্ণাময়ং যথাক্রমং কার্য্যং।" (মনুস্মৃতি ২য় অঃ গোবিন্দরাজ **টীকা**)

যেরূপ বিন্যাস-বিশেষ দ্বারা উপবীত সংজ্ঞা হয়, সেইরূপ ব্রাহ্মণের কার্পাস-সূত্র-নির্ম্মিত, ক্ষত্রিয়ের শণসূত্র-নির্ম্মিত ও বৈশ্যের পশুলোম-নির্ম্মিত উপবীত হইবে। দ্বিজাতিগণের পক্ষে বহিঃসূত্র ধারণ বা উপনয়ন সংস্কারের যে প্রয়োজনীয়তা আছে, তাহা অবশ্যই স্বীকার করিতে হইবে। যথা ব্রহ্মোপ-নিষদে ;—

"কর্ম্মাণ্যধিকৃতা যে তু বৈদিকে ব্রাহ্মণাদয়ঃ।
তৈঃ সন্ধ্যার্য্যমিদং সূত্রং ক্রিয়াণং তদ্বিধৈ স্মৃতম্॥"

ব্রাহ্মণাদি ত্রিবর্ণ বৈদিক কর্ম্মে নিযুক্ত হইলে তাঁহাদের ক্রিয়াঙ্গ এই বহিঃসূত্র অবশ্য ধারণ করা বিধেয়।

মাহিষ্য জাতি উপবীত গ্রহণ করিলে উৎকর্ষ আছে, কিন্তু না লইলেও কোন ক্ষতি নাই। "অনুলোমাসু মাতৃবর্ণাঃ," এই নিয়মে মাহিষ্য বৈশ্যবর্ণ ও দ্বিজধর্ম্মী কদাচ শূদ্র নহে। দ্বিজধর্ম্মী বলিয়া উপনয়ন সংস্কার না লইলে মাহিষ্যের কোন অপকর্ষ নাই। জন্মতঃ ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় ও বৈশ্য এই তিন জাতিরই অপকর্ষ ঘটে। মাহিষ্যের জাতিগত উৎকর্ষ ইহাঁদিগকে কোনরূপেই ত্যাগ করিতে পারে না। উপনয়নাভাব মাহিষ্যত্বের বিলোপক নহে। ক্ষত্রিয়-বৈশ্যজাত মাহিষ্যের উপনয়নাভাবে ব্রাত্যত্ব দোষ ঘটে নাই।

উৎকলের মাহিষ্যগণ ও ময়নাগড়ের মাহিষ্যগণের মধ্যে কেহ কেহ চিরকাল "উপনয়ন সংস্কার" গ্রহণ করিয়া আসিতেছেন। এ বিষয়ে সমগ্র মাহিষ্য সমাজের মনোযোগ আকর্ষণ করিতে বাসনা বলবতী হইতেছে। যে হেতু তত্ত্বজ্ঞান লাভার্থ শ্রীগুরু সান্নিধ্যে লইয়া যাওয়ার নিমিত্তই এই সংস্কারের নাম **উপনয়ন**। এখন এই সিদ্ধান্ত হইল যে, মাহিষ্যজাতি দ্বিজধর্ম্মী অর্থাৎ উপনয়নাদি বৈশ্যোচিত দশবিধ সংস্কারের সম্পূর্ণ অধিকারী।

১০। বিবাহ।

গর্ভ অযুগ্মবর্ষে পুরুষের এবং বালিকার ছয় বর্ষের পর গর্ভ যুগ্মবর্ষে এই সংস্কার করিতে হয়। দ্বিজাতিগণ বিদ্যাভ্যাস শেষ করিয়া দৈবপৈত্র্য কর্ম্ম করিবার জন্য গৃহস্থাশ্রমে প্রবেশরূপ এই পাণিগ্রহণ সংস্কার করিবে। মানব মাত্রেরই বিবাহ সম্বন্ধ আছে। তন্মধ্যে আর্য্য জাতির বিবাহ পরস্পর ব্যাভিচার-বর্জ্জিত ও অনন্তকাল স্থায়ী। রাত্রিতে শুভলগ্নে কন্যার পিতা যৌতুকসহ সম্প্রদান করিবে। তৎপর দিন বর ভার্য্যার সহিত হোমকরণান্তর গৃহস্থাশ্রমে প্রবেশ করিবে। পিণ্ড প্রয়োজনে পুত্র ও পুত্রার্থে এই বিবাহ সংস্কার আবশ্যক। উপরোক্ত দশবিধ সংস্কারে সংস্কৃতগণ আর্য্য ও অসংস্কৃতগণ অনার্য্য।

পরিশেষে বৈশ্যাচার অর্থাৎ মাহিষ্যের আচার সম্বন্ধে কিঞ্চিৎ আলোচনা করা যাইতেছে। পশু-পালন, দান, যজ্ঞ, অধ্যয়ন, বাণিজ্য, মহাজনী, এবং কৃষ্যাদি বৈশ্যের বৃত্তি। (মনু ১।৯০।) কালমাহাত্ম্যে সকল জাতিই স্ব স্ব বৃত্তি পরিবর্ত্তন করিয়াছে; কিন্তু মাহিষ্যের বৈশ্যবৃত্তি চিরকালই অক্ষুণ্ণ রহিয়াছে। বৈশ্যের গর্ভাধান, পুংসবন ও সীমন্তোন্নয়ন এই তিনটী গর্ভ সংস্কার; পরে জাতকর্ম্ম, নামকরণ, নিষ্ক্রমণ, অন্নপ্রাশন, চূড়াকরণ, উপনয়ন ও বিবাহ এই সাতটী, মোট দশটী সংস্কার। বৈশ্য নামের শেষে ভূতি দত্ত, গুপ্ত ও ধন উপাধি থাকিবে—সাংখ্য সং ২।৪। বৈশ্যের ঊর্ণাসূত্রের পৈতা ধারণ করিবে। বৈশ্য ব্রহ্মচারী শিখা রাখিবে এবং অর্দ্ধচন্দ্র তিলক ধারণ করিবে। বৈশ্য প্রথমে দক্ষিণপদে তৈল মর্দ্দন করিবে।

বৈশ্য মুখ মধ্যে প্রবিষ্ট জলদ্বারা আচমন করিবে। বৈশ্যেরা বৃত্তাকার মণ্ডল আঁকিয়া তদুপরি ভোজন পাত্র রাখিবে। বৈশ্য মাত্রেরই কৃষ্ণোপাসক হওয়া কর্ত্তব্য। বৈশ্যের শব পশ্চিম দ্বার দিয়া শ্মশানে লইয়া যাওয়া কর্ত্তব্য। বৈশ্যের অশৌচ পঞ্চদশ দিন (মনু ৫।৮৩)। বৈশ্যের পিণ্ড সংখ্যা পঞ্চদশ। বৈশ্য অশৌচান্তে পশুতাড়ন দণ্ড স্পর্শ করিবে।

মাহিষ্যগণ সৎ বৈশ্য ও কৃষিকার জাতি, তাহাদিগের আচার ব্যবহার বৈশ্য তুল্য এবং ক্রিয়া কলাপ দ্বিজের ন্যায় হইবে। কর্ম্ম দ্বারা উৎকর্ষ লাভ করা বর্ত্তমান কালে কর্ত্তব্য বলিয়া মাহিষ্য সাধারণের বৈশ্যাচার পালন করা বিধেয়। মাহিষ্য জাতির পূর্ব্ব গৌরব ও মর্য্যাদা স্মরণ করিয়া প্রত্যেক মহাত্মা সমাজপতির কর্ত্তব্য যে, তাঁহারা যেন এ বিষয়ে মনোযোগ দেন।

ডাক্তার শ্রীবসন্ত কুমার ভৌমিক।

অযোধ্যা।

অনেকেই অযোধ্যা দেখিয়াছেন, এ সম্বন্ধে নূতন কিছু বলিবার নাই—তবে দুই একটা বিষয় যাহা আমার অযোধ্যা দেখিবার সময় চিত্তাকর্ষণ করিয়াছিল তাহাই নিম্নে লিপিবদ্ধ করিলাম। এই স্থান রেলের ষ্টেশন হইতে প্রায় তিন চারি মাইল দূরে, তথায় যাইবার জন্য ঘোড়ার গাড়ি এবং মনুষ্য হস্ত দ্বারা চালিত একরূপ গাড়ি পাওয়া যায়। ষ্টেশনে উপস্থিত হইবামাত্র পাণ্ডারা আসিয়া কেবল জিজ্ঞাসা করে—"বাড়ী কোথায়, নাম কি, বাপের নাম কি"? এই অপ্রীতিকর প্রশ্ন হইতে তাহাদের কিছুতেই নিবারণ করা যায় না এবং এইরূপ জিজ্ঞাসা করিতে করিতে গাড়ির সহিত সহর পর্য্যন্ত দৌড়াইয়া যায়। তথায় বড় বড় অট্টালিকায় নানান্ মূর্ত্তি—বিশেষতঃ রাম্ লক্ষ্মণ সীতা দেবী ও হনুমানের মূর্ত্তি—স্থাপিত আছে। পাণ্ডারা কোন অট্টালিকা দেখাইয়া বলে যে ইহা রাজা দশরথ সীতাদেবী ও রামচন্দ্রকে বাস করিবার জন্য দিয়াছিলেন এবং কোন অট্টালিকা সম্বন্ধে বলে যে ইহা কৌশল্যার ভবন ছিল। এইরূপে একটি বড় ইষ্টকালয় দেখাইয়া বলে যে ইহাই কেকয়ীর ক্রোধাগার বা কেকয়ী-ভবন। পাণ্ডারা ভিন্ন ভিন্ন বাটীর সহিত রামায়ণের কোন না কোন দেবতার বা ঘটনার সংযোগ করিয়া দিয়া যাত্রীদের বাটীর উপর ভক্তির উদ্রেক করিবার চেষ্টা করে। অনুসন্ধানে জানিতে পারিলাম যে অধিকাংশ বাটীই পশ্চিমাঞ্চলের সমৃদ্ধিশালী রাজারা নির্ম্মাণ করিয়া দিয়াছেন এবং তথায় বিগ্রহ স্থাপন করিয়াছেন। পাণ্ডারা দেবালয়ের পূজারীদের সহিত যোগ করিয়া যাত্রীদের ঠাকুর বাটীতে থাকিবার স্থান দেয়, তাহাতে উভয়েরই লাভ হয়। যে গৃহটী কেকয়ীভবন বলে তাহার নিকটেই রামের জন্মভূমি। এই স্থানের সম্মুখে পথের নিকট সামান্য একখণ্ড প্রস্তরে কেবলমাত্র লেখা আছে—"জন্মভূমি" এবং ইহার পশ্চাদ্দেশে প্রকাণ্ড এক মসজিদ দণ্ডায়মান—তাহা

অরঙ্গজীবের সময় রামের জন্মভূমির উপর নির্ম্মিত হইয়াছিল। এইরূপ মন্দির কাশীতে বিশ্বেশ্বরের পুরাতন মন্দিরের স্থানে, মথুরার কংশের দুর্গমধ্যে কেশবের মন্দিরের স্থানে এবং হিন্দুদের অন্য অন্য তীর্থস্থানে অরঙ্গজীবের সময় নির্ম্মিত হইয়াছিল। জন্মভূমির উপর মশজিদ থাকায় মুসলমানেরা তথায় কোনরূপ মন্দির বা মূর্ত্তি স্থাপন করিতে দেয় না। কিন্তু অর্থ উপার্জ্জনের লালসায় কোন এক ব্যক্তি মশজিদের বহির্দ্দেশের এক পার্শ্বে একটা মঞ্চ নির্ম্মাণ করতঃ তাহার নিম্নে গর্ত্ত করিয়া রাম লক্ষণ ও সীতাদেবীর ছোট ছোট পুত্তলিকা রাখিয়াছে এবং যাত্রীদের বুঝাইয়া দেয় যে তাহাই তাঁহাদের বাল্যকালের মূর্ত্তি। এইরূপে কিছু অর্থ যাত্রীদের নিকট আদায় করে। জন্মভূমির নিকটে এক বাটীতে একখণ্ড প্রস্তরের বেল্লা এবং তদুপরি প্রস্তরনির্ম্মিত একটি বেলুন রক্ষিত হইয়াছে। বাটীর অধিকারী বেল্লা বেলুন সীতাদেবীর বলিয়া উল্লেখ করেন। ইহারই নিকটে এক মঠে সন্ন্যাসীরা রামায়ণের শ্লোক সকল এরূপ সুললিত স্বরে উচ্চারণ করেন যে শুনিয়া মন মুগ্ধ হয়। সহরের মধ্যে মহাবীর (হনুমানের) ও লচমন ঝোলার মন্দির প্রধান এবং দেখিতে সুন্দর। মহাবীরের মন্দির একটি উচ্চ পাহাড়ের উপর নির্ম্মিত—অপরটি সরযূ নদীর তীরে স্থাপিত। শেষোক্ত স্থানটি মনোরম এবং অপেক্ষাকৃত নির্জ্জন—এখানে দেখিলাম প্রধান প্রধান পরলোকগত সাধুদের সমাধি মন্দির নির্ম্মিত হইয়াছে। তথায় অগ্রে সাধুদের আত্মার উদ্দেশে পূজা হয়, তৎপরে দেবতার পূজা হয়। জনৈক সাধুকে ইহার কারণ জিজ্ঞাসা করায় তিনি বলিলেন যে কোন মহৎ ব্যক্তির গৃহে প্রবেশ করিতে হইলে প্রথমে দ্বারবানের নিকট যাইতে হয় এবং তাহার অনুমতি লইয়া গৃহস্বামীর নিকট উপস্থিত হইতে হয়—তাঁহার মতে সাধুরা দ্বারবানের স্বরূপ তাঁহাদের পূজা না হইলে দেবতার পূজা হইতে পারে না। এই কথাটি কতদূর ন্যায়সঙ্গত তাহা জানি না, তবে ইহাতে এই বুঝিলাম যে সাধুদের দেবতুল্য হইবার বড় প্রবল ইচ্ছা। সহরের মধ্যে অযোধ্যারাজের প্রাসাদ সর্ব্বাপেক্ষা বৃহৎ ও মনোহর। তাহার প্রাঙ্গণে রাম লক্ষ্মণ সীতা লক্ষ্মী সরস্বতী প্রভৃতি অনেক দেবদেবীর মূর্ত্তি সুন্দর কারুকার্য্যবিশিষ্ট মন্দিরে স্থাপিত আছে। ধীরপ্রবাহিতা পবিত্রসলিলা সরযূ তীরে দেখিলাম—পশ্চিম দেশস্থ অনেক লোক পিতৃ পুরুষদের শ্রাদ্ধ শান্তি ক্রিয়ায় নিযুক্ত আছে এবং দক্ষিণার জন্য পুরোহিতেরা বড় পীড়াপীড়ি করিতেছে। এখানে আমরা সমভিব্যাহারী পাণ্ডাকে জিজ্ঞাসা

করিয়াছিলাম—অযোধ্যার পুরাতন কীর্ত্তি বিদ্যমান আছে কি না? তিনি উত্তর করিলেন—"আপনার নিকট সরযূতীরে মিথ্যা কথা বলিব না, এখানে পুরাতনের মধ্যে কেবল "অযোধ্যার মাটি—এবং সরয়ূ নদী"। এবং আমরা যাত্রীদের নিকট সীতা দেবীর বাটী ইত্যাদি যাহা কিছু বলি, সবই তাহাদের ঔৎসুক্য বাড়াইবার হেতু এবং আমাদের অর্থ উপার্জ্জনের জন্য।" এই কথা শুনিয়া পাণ্ডার উপর আমার ভক্তি হইল; তৎপরে কথোপকথনে বুঝিলাম লোকটী শিক্ষিত ও উদারমতি তবে অর্থোগমের জন্য পাণ্ডাগিরি করিতেছে। ভারতবর্ষে রামায়ণের সময়ের কীর্ত্তি এখন একরূপ লুপ্ত হইয়াছে বলিলে অত্যুক্তি হয় না। বহু পুরাকালে অযোধ্যার সকল চিহ্ন লোপ পাইয়া ছিল, কিন্তু রাজা বিক্রমাদিত্য অযোধ্যা নগরের স্থান নিরূপণ করিয়াছিলেন এবং তৎপরে সেই স্থানে বর্ত্তমান অযোধ্যা নির্ম্মিত হইয়াছে।

অযোধ্যার প্রাচীন কীর্ত্তি সমূহ বিলুপ্ত হইয়াছে কিন্তু সেই প্রসন্ন-সলিলা সরয়ূ এখনও যেন সেই পবিত্র গীতি কলস্বনে গাহিয়া গাহিয়া সেই পবিত্র ভূমির পাদদেশ প্রক্ষালন করিতে করিতে বহিয়া যাইতেছে। সেই ক্ষীণ কল্লোল অনন্ত শূন্যে প্রতিধ্বনিত হইয়া দর্শকের হৃদয়ে এক অনির্ব্বচনীয় ভক্তির উদ্রেক করিয়া দেয়। কিছুক্ষণ সেই নিস্তব্ধ নদীতটে অপেক্ষা করিলে আর্য্য পিতৃ-কুলের অলৌকিক কীর্ত্তি স্মরণ করিতে করিতে আভিজাত্য গৌরবে বিভোর হইয়া যাইতে হয়। তখন কত পুরাতন কথাই না মনে উদিত হইতে থাকে! একদিন আমাদের আর্য্য পিতৃকুল এই প্রসন্নসলিলা সরয়ূ-তট হইতে বিজয় যাত্রায় বহির্গত হইয়া বিন্ধ্য পর্ব্বতের অধিত্যকার পূর্ব্ব প্রান্ত দিয়া নর্ম্মদা তটে অবস্থিত হইয়াছিলেন। তথা হইতে দক্ষিণ ভারত ও উড়িষ্যার মধ্য দিয়া বাঙ্গালাদেশে আসিয়া আধিপত্য স্থাপন পূর্ব্বক বাস করিয়াছিলেন। ইহা মহাভারতীয় যুগের পূর্ব্বের ঘটনা। এই প্রকাণ্ড সাহিত্য-বাহিনী উত্তাল-তরঙ্গ-সমাকুল প্রবাহে প্রচণ্ড বেগে বাঙ্গালা দেশের আদিম অধিবাসী অনার্য্যগণকে সরাইয়া দিয়াছিলেন এবং বাঙ্গালা দেশ হইতে যব বালী প্রভৃতি ভারত সাগরীয় দ্বীপপুঞ্জে—আর্য্যজাতির বিজয় পতাকা উড্ডীন করিয়া উপনিবেশ স্থাপন করিয়াছিলেন। এই সাহিত্যবীর বাহিনীর বিজয় কাহিনীও কালের আবর্ত্তে অযোধ্যার প্রাচীন কীর্ত্তিচিহ্ন-লোপের সহিত বিস্মৃতির তমোময় গর্ভে লীন হইতে চলিয়াছে।

শ্রীযজ্ঞেশ্বর বিশ্বাস।

ডেপুটী ম্যাজিষ্ট্রেট, আরেরিয়া—পূর্ণিয়া।

মৃত্যু ও শ্রাদ্ধ।

(তাম্বূলি-সমাজ হইতে উদ্ধৃত)

ত্রিশ দিনে আদ্যশ্রাদ্ধ হইতে পারে কি না, এ বিষয় কিঞ্চিৎ আলোচনার জন্য এই প্রবন্ধ লিপিবদ্ধ হইল। মানুষের মৃত্যু হওয়া মাত্র কর্ম্মগত প্রাণটি বায়ুর আকার প্রাপ্ত হয়। এ বিষয়ে যোগবাশিষ্ঠ পুস্তকে উৎপত্তি প্রকরণের ৫৫ সর্গে লিখিত হইয়াছে,—

> কেবলং বাতসং রোধাৎ যদা স্পন্দঃ প্রশাম্যতি।
> মৃত ইত্যুচ্যতে দেহস্তদাসৌজড়নামকঃ॥
> ততোঽসৌ প্রেত শব্দেন প্রোচ্যতে ব্যবহারিভিঃ।
> তদৈব মৃতিমূর্চ্ছান্তে পশ্যত্যন্য শরীরকম্।
> মৃত এবাসু ভবতি কশ্চিৎ সামান্য পাতকী।
> স্ববাসনানুসারেণ দেহং সম্পন্নমক্ষতম্॥
> সস্বপ্ন ইব সংকল্প ইব চেততি তাদৃশম্।
> তস্মিন্নেব ক্ষণে তস্য স্মৃতিরিত্থমুদেতিচ॥

অর্থাৎ প্রাণবায়ুর সঞ্চার রহিত হইলে যখন শরীরের স্পন্দন নিবৃত্তি হয়, তখন দেহকে মৃত বা জড় বলিয়া থাকে, তাহার পরে মৃতজীব প্রেতশব্দে উক্ত হয়; সেই অবস্থায় মৃত্যুজনিত মূর্চ্ছার শেষ হইলে অন্য শরীর গ্রহণ করে। সামান্য পাতকী ব্যক্তি মরিয়াই নিজের চিন্তানুযায়ী অক্ষত শরীর অনুভব করিতে থাকে; তাহা স্বপ্নবৎ বা সংকল্পময় ধরা যায়। তখন প্রেতের পূর্ব্বভাব সকল স্মরণ থাকে। ইংরাজীতে প্রেতের এই অবস্থাকে 'স্পিরিট' বলা হয়। হিন্দুশাস্ত্র বলেন, যতদিন পর্য্যন্ত পিণ্ডদান না করা যায়, ততদিন পর্য্যন্ত ঐ স্পিরিট ভূ-বায়ুর সহিত ঘুরিয়া বেড়ায়। এ অবস্থায় স্পিরিট অদৃশ্য বায়বীয় পদার্থ, কিন্তু অনুকূল স্থান পাইলে ঐ স্পিরিট অন্যের ইন্দ্রিয় শরীরে প্রবেশ করিয়া ইন্দ্রিয়ের ন্যায় কর্ম্ম করিতে পারে। মতান্তরে, প্রেতের এই বায়বীয় অবস্থা কিছুদিন মধ্যে দেহ প্রাপ্ত হয়—অবশ্য এই দেহের আকৃতিও বায়ুর ন্যায়। গরুড় পুরাণের উত্তর খণ্ডের ৪৫ অধ্যায়ে লিখিত হইয়াছে যথা,—

ধর্ম্মার্থ কামং চিরমোক্ষ সঞ্চয়-
মস্যাং দ্বিতীয়াং যমমার্গগামিনাম্।
প্রবিশ্যতে অঙ্গুষ্ঠ-সমে স তত্র বৈ
তাং প্রাপ্য দেহং স্বপুরং স্বমন্দিরম্॥
গৃহীত পাশোরুদতে পুনঃপুন
দেশে স্বপুণ্যে নিজদেহ সংস্থিতে।

অর্থাৎ যমমার্গগামীদিগের জন্য ধর্ম্মার্থ কাম মোক্ষ সঞ্চয় স্বরূপ দ্বিতীয় দেহ সংঘটিত হয়। মৃত ব্যক্তি তাহাতে প্রবিষ্ট হইলে, সেই অঙ্গুষ্ঠ পরিমিত দেহে যমদূত কর্ত্তৃক গৃহীতপাশ হইয়া পুনঃ পুনঃ রোদন করিতে থাকে। এই অবস্থা প্রাপ্ত হইয়া প্রেত বা স্পিরিট বৈতরণী নদী পার হইয়া যায়। হিন্দু-শাস্ত্র বলেন, এই অঙ্গুষ্ঠ পরিমিত দেহ ১২ দিনে হইয়া থাকে। তৎপরে উহা অন্যদিকে সরিয়া যায়। যদি ১২ দিনের মধ্যে পিণ্ডদান করা না হয়, তাহা হইলে উহার গতি হইল না। এ কারণ হিন্দুশাস্ত্র বলেন, যদি কোন ব্যক্তির কেহ না থাকে, সেই সকল ব্যক্তির জীবিতাবস্থায় তাঁহাদের নিজ নিজ শ্রাদ্ধ করিয়া যাইতে হইবে,—

জীবতোঽপি মৃতস্যেহ ন ভূতং চৌর্দ্ধদৈহিকম্।
বায়ুভূতঃ ক্ষুধাবিষ্টো ভ্রমতে চ দিবানিশম্॥

গরুড়পুরাণ, উত্তর খণ্ড, ১৪ অধ্যায়।

যদি মানুষ জীবিতকালে নিজের শ্রাদ্ধ নিজে না করিয়া যায় এবং মরণেও বান্ধবেরা পূরকপিণ্ডাদি দান না করে, তাহা হইলে মরণান্তে সে বায়ুভূত ও ক্ষুধাবিষ্ট হইয়া দিবারাত্রি ঘুরিয়া বেড়াইতে বাধ্য হয়। হিন্দু বিজ্ঞানের এ বিষয়ের সত্যতা আজকাল পাশ্চাত্য খণ্ডের মনীষীরা মেসমেরিজম্ প্রভৃতি দ্বারা অনেকটা নির্দ্ধারণ করিয়া দিতেছেন। যাহা হউক, প্রেতাত্মা অঙ্গুষ্ঠ দেহ প্রাপ্ত হইয়া ১২ দিনের মধ্যে সরিয়া গেলে, তৎপরে শ্রাদ্ধ করিয়া কোনই ফল হয় না। কেহ কেহ বলেন, ১২ দিনের স্থলে ১৫ দিন পর্য্যন্ত প্রেতাত্মা অপেক্ষা করে, যদি তাহাকে কেহ পিণ্ড দেয়, তবে সে মুক্তি লাভ করিতে পারে। মোট কথা, দশ দিন হইতে পোনের দিন শ্রাদ্ধের শেষ সময়। মৃত্যুর প্রথম দিন হইতে ত্রয়োদশ দিন পর্য্যন্ত পিণ্ডদান করাই হিন্দু-শাস্ত্রের ব্যবস্থা,—

গর্ত্তে পিণ্ডা দশাহঞ্চ দাতব্যাশ্চ দিনে দিনে।
জলাঞ্জলিঃ প্রদাতব্যাঃ প্রেতমুদ্দিশ্য নিত্যশঃ॥
অহোরাত্রৈশ্চ নবভিঃ প্রোতো নিষ্পত্তিমাপ্নুয়াৎ।
জন্তোর্নিষ্পন্ন দেহস্ত দশমে বলবৎক্ষুধা॥
দেহং প্রাপ্তঃ ক্ষুধাবিষ্টো গৃহদ্বারে চ তিষ্ঠতি।
দশমেঽহনি যঃ পিণ্ড স্তং দদ্যাদামিষেণ তু
ত্রয়োদশেঽহ্নিস প্রেতো নীয়তে চ মহা পথে।
পিণ্ডজং দেহমাশ্রিত্য দিবানক্তং বুভুক্ষিতঃ॥—গরুড়পুরাণ।

* * * *

যাবন্নোৎপাদিতো দেহস্তাবচ্ছ্রাদ্ধৈর্ন প্রীণনম্।
ক্ষুধাবিভ্রমমাপন্নো দশাহেন চ তর্পিতঃ॥
পিণ্ডদানং ন যস্তাভূদাকাশে ভ্রমতে তু সঃ। গ, ৩৪ অধ্যায়।

অর্থাৎ মরণের পরে দশ দিন পর্য্যন্ত প্রেতকে উদ্দেশ্য করিয়া গর্ত্তে বা নিম্নদেশে দশ পিণ্ডদান ও জলাঞ্জলি প্রদান করিতে হইবে। এইরূপে নয়টি দিন রাত্রিতে প্রেতের (স্পিরিটের) দ্বিতীয় দেহ নিষ্পন্ন হইলে দশম দিনে উহার বলবৎ ক্ষুধা জন্মে। এইরূপে প্রেতাত্মা নূতন দেহ পাইয়া ক্ষুধাবিষ্ট হইয়া গৃহের দ্বারে অবস্থান করিতে থাকে, এজন্য দশম দিনের পিণ্ড আমিষ দ্বারা দিতে হয় (হিন্দু বিধবার মৃত্যু হইলে আমিষের অনুকল্পে কাঁচাকলা পোড়াইয়া দিবার ব্যবস্থা আছে)। ত্রয়োদশ দিনে ঐ দ্বিতীয় প্রকারে পরিণত প্রেত, পিণ্ডজ দেহে আশ্রয় লইয়া মহাপথে ক্ষুধিতভাবে যমালয়ে চলিয়া যায়। মহাপথে প্রেতাত্মাকে গমন করিবার সময় বৈতরণী পার হইতে হয়। জমদগ্নি বচন, কালিকাপুরাণ ৪৮ অধ্যায়ে বৈতরণী নদীর ভীষণ বর্ণনা দেখা যায়। পরন্তু পাশ্চাত্য পণ্ডিতেরাও এ বিষয়ের যত সন্ধান পাইতেছেন, তাহাতেও দেখা যায় যে, অনেক প্রেতাত্মা উহাঁদের মেসমেরিজম চক্রে পতিত হইয়া বৈতরণীর অদ্ভুত অদ্ভুত কথা বলিয়াছেন। তাহার সঙ্গে ঐ সকল শাস্ত্রবাক্যে মিল পাওয়া যায়। হিন্দুধর্ম্ম বলিয়াছেন, ঐ নদী পার হইবার সময় কষ্ট অনিবার্য্য, তবে কৃষ্ণবর্ণা গাভী দান করিলে উহা পারের কিছু কষ্টের লাঘব হয়।

এখন আমরা বলিতে চাহি যে, আমরা যে "ত্রয়োদশা" করি, তাহা কি ১৩ দিনে হয়? তবে কেন উহাকে ত্রয়োদশা বলা হয়; এক মাসে শ্রাদ্ধ

করিয়া "তের দশা" (ত্রয়োদশ দিন) বলিতে আমাদের লজ্জা হয় না? এক মাসে শ্রাদ্ধ করিলে, হিন্দুর এই বিজ্ঞান শাস্ত্রকে অগ্রাহ্য করা হয়—হিন্দুধর্ম্মের অপমান করা হয়। এক মাসে শ্রাদ্ধ করিলে এই হয় যে, আমাদিগের পিতৃ-মাতৃদেহ রোদন করিয়া আমাদের নিকট তেরদিন পর্য্যন্ত কিছুই না পাইয়া মহাপথে তাঁহারা ধাবিত হইয়া যান, ঐ পথে চলিয়া গেলে আর তাঁহারা ফিরিয়া আসেন না। তাঁহাদের পরপর অবস্থান্তর হইয়া যায়। এমন সময় এক মাসে আমরা তাঁহাদের শ্রাদ্ধ করিতে বসি। উহা করা বিজ্ঞানসঙ্গত নহে এবং শাস্ত্রসঙ্গত নহে। এই বিজ্ঞান এ কালের বুদ্ধিতে সাহেবরা যখন আরও স্পষ্ট করিয়া আমাদের সম্মুখে ধরিবেন, তখনই আমরা তেরদিনে শ্রাদ্ধ শেষ করিব, এখন আমরা ব্রাহ্মণ মহাশয়দিগের কথামত টাকার শ্রাদ্ধ করিতেছি এবং পূর্ব্বপুরুষদিগকে কাঁদাইতেছি।

কৃষিবার্ত্তা।

(লেখক—শ্রীআশুতোষ দেশমুখ।)

বঙ্গীয় কৃষিপরিষদের নিয়মাবলী জানিবার জন্য অনেকে আগ্রহ প্রকাশ করিয়া পরিষদের উদ্যোক্তাগণকে অনুগৃহীত ও আহ্লাদিত করিয়াছেন। অনুরুদ্ধ হইয়া আমরা পরিষদের পক্ষ হইতে তাঁহাদিগকে ধন্যবাদ দিতেছি। পরিষদের গঠন কার্য্য—সদস্য সংগ্রহ—এখনও শেষ হয় নাই। অথচ সদস্যগণের অভিমত যথাযথভাবে লইয়া নিয়মাবলী গঠন করাই বিধি সঙ্গত। কেবল নিয়মাবলী সম্বন্ধে আলোচনা করিবার একটু সুযোগ ঘটিবে বলিয়া আমরা নিম্নে একটী খসড়া নিয়মাবলী দিলাম। সদস্যগণ অনুগ্রহ করিয়া ইহা পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে আলোচনা করিয়া শীঘ্র বিধিবদ্ধ করিতে অনুমতি দেন ইহাই আমাদের সনির্ব্বন্ধ অনুরোধ। বলা বাহুল্য, নিম্নে প্রদত্ত নিয়মাবলী খসড়া মাত্র; সুতরাং সম্পূর্ণ নহে। সদস্যগণ যথোচিত আলোচনা করিয়া ইহাকে সর্ব্বাঙ্গ-সুন্দর করেন, ইহাই আমাদের প্রার্থনা।

বঙ্গীয় কৃষি-পরিষদের খসড়া নিয়ম।

উদ্দেশ্য—কৃষক সাধারণের মধ্যে বিজ্ঞানসম্মত ও বিশেষ পরীক্ষিত কৃষি-প্রণালী প্রভৃতি স্বেচ্ছাসেবকগণের সাহায্যে প্রচার করা ও পত্রাদির সাহায্যে স্বেচ্ছাসেবক সদস্যগণকে কৃষি-বিষয়ক তথ্য রিপোর্ট প্রভৃতি সরবরাহ করাই বঙ্গীয় কৃষিপরিষদের আড়ম্বরশূন্য উদ্দেশ্য। দেশের বাস্তবিক মহোপকারী বুঝিয়া যাঁহারা জীবনের অতি অল্প সময়ও এই যথার্থ স্বদেশী উন্নতিকল্পে নিয়োগ করিবেন তাঁহারাই কৃষি-পরিষদের সদস্যপদে বৃত হইবেন।

নাম—এই সমিতির নাম 'বঙ্গীয় কৃষি-পরিষৎ' থাকিবে। কার্য্যনির্ব্বাচন-সমিতি—এই পরিষদের সদস্যগণের মধ্য হইতে কার্য্য নির্ব্বাচনার্থ একজন প্রেসিডেণ্ট, একজন ভাইস প্রেসিডেণ্ট একজন কোষাধ্যক্ষ প্রতিবৎসর নির্ব্বাচিত হইবেন। এবং তাঁহাদিগের সহায়তা করিবার জন্য অন্যূন পাঁচ-জন সদস্য লইয়া একটী কার্য্যকরী সমিতি গঠিত হইবে। ইহাদের নির্ব্বাচন কার্য্য ভোট প্রণালীতে হইবে। প্রেসিডেণ্ট প্রভৃতি একাধিকবার নির্ব্বাচিত হইতে পারিবেন।

পরামর্শ প্রণালী—পরিষদের সদস্যগণ একত্র মিলিত হইয়া মিটিংএর দ্বারা পরামর্শ করিবার অধিক সুযোগ পাইবেন না বলিয়া পরে পরে হস্তলিখিত নোট ডাকযোগে প্রেরণ করিয়া কার্য্য নির্ব্বাহক সমিতির সদস্যগণের পরামর্শ গ্রহণ করা হইবে। অন্ততঃ ছয় মাস অন্তর কলিকাতা বা তদ্রূপ কোন কেন্দ্রে সম্মিলিত হইয়া পরামর্শ করিতে হইবে। নূতন প্রেসিডেণ্ট প্রভৃতি নির্ব্বাচন করিতে হইলে সকল সদস্যের মত গ্রহণ করিতে হইবে।

কোষগঠন—সদস্য সাধারণের অভিমত ক্রমে চাঁদার হার নির্দ্ধারিত করিয়া পরিষদের কোষগঠন করিতে হইবে। কোষের টাকা সেভিংস ব্যাঙ্ক বা তদ্রূপ বিশ্বাসযোগ্য কোন ব্যাঙ্কে মজুত থাকিবে। ব্যয়ের সময় সদস্যগণ কর্ত্তৃক নির্ব্বাচিত কোষাধ্যক্ষ ও অপর একজন কার্য্যকরী সদস্যের স্বাক্ষর গ্রহণ করিয়া ব্যাঙ্ক হইতে টাকা উদ্ধৃত করিতে হইবে। অনুগ্রাহক ও পৃষ্ঠপোষকগণ এককালীন অর্থসাহায্য করিয়া আজীবন সদস্যপদে বৃত হইতে পারিবেন।

সদস্য নির্ব্বাচন—যে কেহ পরিষদের উদ্দেশ্য সাধনে সহায়তা করিতে ইচ্ছুক, তিনি ইহার সভ্য হইতে পারিবেন। সভ্যগণকে সর্ব্বসম্মতিক্রমে স্থিরীকৃত হারে চাঁদা দিতে হইবে। সমাজের প্রসিদ্ধ বৃদ্ধগণকে অনারারী

সদস্যরূপে নির্ব্বাচিত করিবার ক্ষমতা কার্য্য নির্ব্বাহক সমিতির থাকিবে। ছাত্রগণ বিনা চাঁদার সভ্য হইতে পারিবেন। ছাত্রসভ্য ও অনারারি সভ্যগণের ভোটের ক্ষমতা থাকিবে না; তদ্ভিন্ন তাঁহাদের অপরাপর বিষয়ে ক্ষমতা থাকিবে।

কার্য্যপ্রণালী—সংগৃহীত অর্থে কেন্দ্রীয় পরিষদের কর্ম্মচারী ও সদস্যগণ কর্ত্তৃপক্ষের কৃষিবিৎ পণ্ডিত ও কৃষিকর্ম্মচারীগণের সহিত পত্রাদি বিনিময় করিয়া সকল বিষয় জানিয়া সদস্যগণকে অবগত করাইবেন। নানা স্থান হইতে বঙ্গের বিভিন্ন প্রদেশের উপযোগী শস্য বা কৃষি সম্বন্ধে যে কোন তথ্য পাইবেন সংগ্রহ করিবেন। কৃষিপ্রদর্শনী, মেলা, উৎপন্ন দ্রব্য কোথায় যথোচিত দরে বিক্রয় হইতে পারে, বাজারে কৃষিজাত কোন্ দ্রব্য অধিক দরে বিক্রয় হয় ও তাহা কোথায় কোথায় চাষ করা চলে, ইত্যাদি কৃষি সম্বন্ধীয় সকল বিষয় সংগ্রহ করিয়া সদস্যগণের ব্যবহারার্থ প্রেরণ করিবেন। গবর্ণমেণ্টের নিকট পরিষদের সভ্যশ্রেণীতে যে সমস্ত কৃষক থাকিবে তাহাদের জন্য সুবিধা দরে বা বিনামূল্যে বিতরিত বীজাদি লইয়া বিতরণ করিবেন। সদস্যগণ মধ্যে মধ্যে রিপোর্ট পাঠাইয়া কিরূপ প্রণালীতে কার্য্য করিলে পরিষদের উদ্দেশ্য সুচারুরূপে সিদ্ধ হইবে তাহার পরামর্শ দিবেন। স্বপ্রণোদিত হইয়া অধিকতর কার্য্যোপযোগী কৃষি যন্ত্রাদি ও কৃষি প্রণালী প্রবর্ত্তনে দৃষ্টান্ত দ্বারা সাধ্যমত চেষ্টা করিবেন। স্থানীয় কৃষি ও কৃষকের অভাব অভিযোগ কেন্দ্রীয় সমিতির সাহায্যে গবর্ণমেণ্টের গোচরীভূত করিয়া প্রতীকারের চেষ্টা করিবেন। স্ব স্ব জেলায় প্রচলিত প্রধান মফঃস্বলের কৃষিপ্রণালী সংগ্রহ করিয়া কেন্দ্রীয় পরিষদে পাঠাইবেন।

পল্লী কৃষক সমিতির জন্য (১) নির্দ্দিষ্ট কার্য্য নির্দ্ধারণ (২) প্রকৃত পক্ষে কৃষিরত সদস্যনির্ব্বাচন (৩) পর্য্যবেক্ষণ (৪) রীতিমত পত্রাদি আদান প্রদান ও সংবাদ-সংগ্রহ, বঙ্গীয়-কৃষি-পরিষৎ এই চারিটী বিষয়ে লক্ষ্য রাখিবেন। নতুবা কোন পল্লী-কৃষক-সমিতি কোন কার্য্যে সফলকাম হইতে পারিবে না।

মাহিষ্য ব্যাঙ্কিং এণ্ড ট্রেডিং কোংর অংশীদারগণের নাম ও অংশের পরিমাণ।

(পূর্ব্বপ্রকাশের পর)

৪২৪ প্রতাপচন্দ্র শাসমল, সাং কালিন্দি, পুরুসোত্তমপুর, মেদিনীপুর ৫০৲
৪২৫ ননীগোপাল দাস, ১ বকুলবাগান রোড, ভবানীপুর, কলিকাতা ২৫০৲
৪২৬ অবনী মোহন দাস ঐ ঐ ২৫০৲
৪২৭ রাজেন্দ্র লাল বিশ্বাস, মোক্তার—বিশ্বাস কোয়ার্টার
গোয়াড়ী কৃষ্ণনগর, নদিয়া ৫০৲
৪২৮ কিশোরীমোহন শাবল, সাং তেঘরি, খলিসাভাঙ্গা পোঃ, মেদিনীপুর ১০৲
৪২৯ রুদ্রনারায়ণ জানা, সাং শিলামপুর খলিসাভাঙ্গা পোঃ, মেদিনীপুর ১০৲
৪৩০ ত্রৈলক্যনাথ জানা, সাং তেঘরি খলিসাভাঙ্গা, মেদিনীপুর ১০৲
৪৩১ ইন্দ্রনারায়ণ জানা, সাং সুবদী কলাগাছিয়া পোঃ মেদিনীপুর ১০০৲
৪৩২ ফকির দাস মাইতি, সাং ঘোড়াদহ, গোমহল, হুগলী ১০৲
৪৩৩ প্রাণকৃষ্ণ সরকার, সাং সদরপুর পোঃ আমলাসদরপুর, নদিয়া ১০৲
৪৩৪ দুর্য্যোধন ধাওয়া, সাং রাণাপাড়া, আমতা, হাওড়া ১০৲

ক্রমশঃ।

বিবিধ প্রসঙ্গ।

উপাধিলাভ। নদীয়া বাঁশবেড়িয়া নিবাসী স্বনামখ্যাত জমিদার ৺কৈলাশ চন্দ্র চৌধুরী মহাশয়ের পুত্র শ্রীমান ভোলানাথ চৌধুরী ৺কাশীধামে কাশীদাসী মহাভারত ও কৃত্তিবাসী রামায়ণের পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া তথাকার পরীক্ষা সভা হইতে "ভারতী" ও "সরস্বতী" উপাধিলাভ করিয়াছেন। ইনি সঙ্গীত বিদ্যায়ও পটু।

গোচিকিৎসা-প্রণালী। বিভিন্ন বিভিন্ন স্থানে গরুর কোন্ কোন্ পীড়ায় কি ভাবে চিকিৎসা করা হইয়া থাকে, কোন্ কোন্ ঔষধ প্রযুক্ত হইয়া থাকে তাহা 'গোপাল-বান্ধব' পুস্তকের ২য় ভাগে সংগৃহীত হইয়া প্রকাশিত হইতেছে। পাঠকগণ দয়া করিয়া স্ব স্ব পল্লীর চিকিৎসাপ্রণালী কলিকাতা হাইকোর্টের উকীল শ্রীযুক্ত প্রকাশচন্দ্র সরকার মহাশয়ের ১৮নং রসা রোড নর্থ, ভবানীপুর, কলিকাতা ঠিকানায় পাঠাইলে বাধিত হইব।

মাহিষ্য-সমাজ।

৩য় ভাগ, ৩য় সংখ্যা—আষাঢ়, ১৩২০।

কৃষি-পরিষৎ।

(২)

উপযুক্তরূপে শিক্ষালাভ করিলেই রাজশক্তির সহায়তায় সামাজিক অনেক প্রকার উন্নতি সাধিত হইতে পারিবে। রাজনৈতিক অধিকারও পাওয়া যাইবে। উপযুক্ততার দাবী সর্ব্বত্রই আদরণীয়। গবর্ণমেণ্টের উদ্দেশ্য—কৃষককুলের উন্নতি ও কৃষির প্রসার, তদ্বিষয়ে নানারূপ অনুষ্ঠান আয়োজন চলিতেছে। দৃষ্টান্তস্বরূপ আমরা Co-operative Credit Society অর্থাৎ যৌথ-ঋণদান-সমিতির উল্লেখ করিতেছি। দুঃস্থ বিপন্ন কৃষক মহাজনের নিকট টাকা কর্জ্জ লইয়া সর্ব্বস্বান্ত হয় কেন? তিন বা ততোধিক ব্যক্তি একত্রিত হইয়া এইরূপ সমিতির প্রতিষ্ঠা করিলে গবর্ণমেণ্ট স্বল্পসুদে টাকা সাহায্য করেন। এই উদ্দেশ্যের অনুকূল "মাহিষ্য-ব্যাঙ্কিং-এণ্ড-ট্রেডিং" কোম্পানীর প্রতিষ্ঠা হইয়াছে। মূলধন এক লক্ষ টাকা, প্রত্যেক শেয়ার দশ টাকা। কিন্তু আজ ১০।১২ বৎসরেও আশানুরূপ শেয়ার বিক্রীত হয় নাই। রেজেষ্ট্রীকৃত যৌথ কারবারের উপকারিতার কথা সকলে এখনও ভালরূপ বুঝে না। বিশেষতঃ ধনকুবেরগণ ইহাতে ভালরূপ আগ্রহ প্রকাশ করিতেছেন না। এই ব্যাঙ্কিং কোম্পানীর বিশেষত্ব আছে—প্রত্যেক অংশীদার তাঁহার লাভের সিকি ভাগ সমাজের উন্নতি সাধন ও শিক্ষা বিস্তার কল্পে "বঙ্গীয়-মাহিষ্য-সমিতি"কে দান করিতে বাধ্য। সুতরাং এই ব্যাঙ্কিং কোম্পানীর রীতিমত শেয়ার বিক্রয় হইলে দেশের মহকুমায় মহকুমায় ইহার কার্য্যালয় খুলিয়া কৃষকগণকে অল্প সুদে টাকা কর্জ্জ দেওয়া যাইতে পারে এবং তদ্দ্বারা কৃষকগণ উপকৃত হইবে। গবর্ণমেণ্টের যৌথ-ঋণদান-সমিতির উদ্দেশ্যের সহিত এই ব্যাঙ্কিং কোম্পানীর উদ্দেশ্য সম্মিলিত হইয়া দুঃস্থ কৃষকগণের কত উপকার করিতে পারে। পক্ষান্তরে অংশীদারগণের

লভ্যাংশের এক চতুর্থাংশ দ্বারা সামাজিক কত মহৎ কার্য্য—শিক্ষা-বিস্তার, সাহিত্যপ্রচার, প্রত্ন-তত্ত্বের চর্চ্চা প্রভৃতি কত উন্নতিকর কার্য্য করা যাইতে পারে! এইরূপে গবর্ণমেণ্টের উদ্দেশ্যের অনুকূল কার্য্য সাধিত হইলে রাজনৈতিক অধিকার লাভ করা সহজ হইবে।

উচ্চ-শিক্ষিত ব্যক্তিগণ কৃষি-কার্য্যে মন দিলে দেশের প্রভূত মঙ্গল সাধিত হইবে। কৃষিই জীবিকানির্ব্বাহের মূল—কৃষির অবনতিতে উদরান্নের জন্য লালায়িত হইতে হইবে, পরের মুখাপেক্ষী হইতে হইবে, ইহা কাহাকেও বুঝাইয়া দিতে হইবে না। ইহা আমাদের পক্ষে যেমন জীবিকানির্ব্বাহের প্রধান অবলম্বন, তেমনই জাতীয় মর্য্যাদা ও রাজ-সম্মান লাভেরও প্রসূতি বলিয়া বিবেচিত হইবে। সুতরাং ইহার উন্নতি সাধনকল্পে কিরূপ আয়োজন করা প্রয়োজন, তাহা গভীর চিন্তার বিষয়।

সম্প্রতি পুনা কৃষি-কলেজের প্রিন্সিপ্যাল মিঃ হ্যারল্ড্ এইচ্ ম্যান সাহেব "এগ্রিকলচার জর্ণাল অব ইণ্ডিয়া" নামক গবর্ণমেণ্ট হইতে প্রকাশিত ইংরাজী ত্রৈমাসিক পত্রিকায় একটী চিন্তাপূর্ণ ও যুক্তিযুক্ত প্রবন্ধ লিখিয়াছেন। তাহাতে তিনি ভারতবর্ষের বিভিন্ন বিভিন্ন স্থানে কৃষক-সমিতি সংস্থাপনের পরামর্শ দিয়াছেন। প্রত্যেক জেলায়, প্রত্যেক মহকুমায়, এমন কি প্রত্যেক গ্রামে এক একটী পল্লী-কৃষক-সভা স্থাপন করা প্রয়োজন। এই কৃষক-সমিতির সভ্যগণ যেন প্রকৃত কৃষক বা কৃষি-কার্য্যে আগ্রহশীল ব্যক্তিসমূহ নির্ব্বাচিত হন। তাঁহারা সমবেত সভায় স্থানীয় অবস্থ ব্যবস্থা বুঝিয়া কৃষিকার্য্য সম্বন্ধে পরামর্শ করিবেন এবং গবর্ণমেণ্টের কৃষি বিভাগীয় উচ্চতম কর্ম্মচারিগণকে তৎসমুদয় জানাইবেন। এইরূপে মহকুমা-সমিতি ও প্রত্যেক মহকুমা-সমিতি হইতে নির্ব্বাচিত প্রতিনিধি লইয়া জেলা-সমিতি সংগঠিত হইবে। মহকুমা ও জেলার ম্যাজিষ্ট্রেট বাহাদুরগণ এই সমস্ত সভার কার্য্য পর্য্যবেক্ষণ করিলে অধিকতর সুফল লাভ করা যাইবে। বৎসরের মধ্যে অন্ততঃ একবার বা দুইবার জেলা-সমিতি সমূহে দেশের গণমান্য ভদ্র কৃষক সকল সম্প্রদায়ের সভ্য লইয়া সাধারণ অধিবেশন হওয়া চাই। এইরূপে স্থানীয় কৃষকগণ উৎসাহিত ও সঙ্গে সঙ্গে শিক্ষিত হইলে উন্নত কৃষি-বিজ্ঞানের প্রচারপক্ষে সুবিধা হইবে। ইত্যাদি।

এইরূপ সভাসমূহ হইতে প্রতিনিধি নির্ব্বাচন করিয়া সমগ্র বঙ্গদেশের কৃষক

বঙ্গীয় কৃষি-পরিষৎ। বাঙ্গালা দেশের কৃষক শ্রেণীর মধ্যে শিক্ষা-বিস্তার, কৃষির উন্নতি-সাধন, উন্নত-নৈতিক-জ্ঞান-প্রচার, রাজনৈতিক অধিকার প্রভৃতি বিষয় লইয়া এই বিরাট সভা কার্য্যক্ষেত্রে অগ্রসর হইবেন। ম্যান্ সাহেবের প্রদর্শিত বিভিন্ন স্থানীয় সভাসমূহ স্থাপনের সঙ্গে সঙ্গে এই বিরাট সভার কেন্দ্র প্রতিষ্ঠিত করিবার প্রয়োজন হইবে। আমরা কলিকাতার ঐরূপ বঙ্গীয় কৃষি-পরিষদের কেন্দ্র স্থান বলিয়া বিবেচনা করিতে পারি। মফস্বলস্থ শাখা সভাসমূহ যে ভাবে কার্য্য করিবেন তাহার প্রণালীপন্থা এই কেন্দ্র-সমিতি হইতে নির্দ্দিষ্ট হইবে এবং ইহা 'বেঙ্গল চেম্বার অফ কমার্স,' 'কলিকাতা ট্রেডার্স আসোসিয়েশন,' 'বেঙ্গল কোল মাইনিং আসোসিয়েশন' বা 'বেঙ্গল টি প্লান্টিং কমিউনিমিটীর' ন্যায় "বেঙ্গল এগ্রিকলচার অ্যাসোসিয়েশন" বা 'বেঙ্গল চেম্বার অফ এগ্রিকলচার' এইরূপ নামে প্রতিষ্ঠিত হইবে। উক্ত সভাসমূহ হইতে যেমন গবর্ণমেন্টের কাউন্সেলে মেম্বর নির্ব্বাচিত হইয়া থাকে, তেমনই আমাদের প্রস্তাবিত এই কৃষি-পরিষৎ হইতেও কৃষক শ্রেণীর পক্ষে অভাব অভিযোগ দাখিল করার জন্য গবর্ণমেন্টের কাউন্সেলে একজন মেম্বর নির্ব্বাচন করার অধিকার পাওয়া যাইতে পারে। সুতরাং কৃষির উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে উচ্চ-শিক্ষার বিস্তার ও তৎসঙ্গে কৃষক-সমিতি স্থাপনে যেমন দেশে কৃষির প্রসার বাড়িতে থাকিবে ও ধনাগমের পথ উন্মুক্ত হইবে, অমনি সঙ্গে সঙ্গে রাজ-সম্মান লাভের ও জাতীয় মর্য্যাদা লাভের পথও সুপরিষ্কৃত হইতে থাকিবে।

আমাদের কৃষি বিষয়ক আন্দোলন করা বিশেষ প্রয়োজন। কৃষক শ্রেণীর পক্ষ হইতে বলিবার লোক কেহই নাই। ভারতবর্ষে এক শ্রেণীর রাজনৈতিক আন্দোলনকারী সম্প্রদায় আছেন; গবর্ণমেন্টও বুঝেন এবং বিলাতের লোকও জানেন যে, তাঁহারা আপনাদিগকে সর্ব্বশ্রেণীর প্রতিনিধি বলিয়া গর্ব্ব করিয়া থাকেন। কিন্তু সকল শ্রেণীর লোক তাঁহাদের সেরূপ প্রতিনিধিত্ব অনুমোদন করেন না—সেই আত্মকৃত প্রতিনিধিগণ এই নিরীহ অগণিত কৃষক শ্রেণীর প্রতিনিধি নহেন—হইতে পারেন না! তাঁহারা কৃষক শ্রেণীর প্রতিনিধিত্বের কোন যোগ্যতাই রাখেন না। ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈদ্য ও কায়স্থ প্রভৃতি যাঁহারা কৃষক শ্রেণীর অন্তর্নিবিষ্ট নহেন, তাঁহারা কখনই কৃষক-গণের পক্ষ হইতে প্রতিনিধি হইতে পারেন না—যোগ্যতাও রাখেন না। কৃষি-বিভাগীয় ইংরাজ রাজপুরুষগণ তাহা বুঝেন, এবং তজ্জন্যই বিগত কৃষি-বৈঠকে তাঁহারা স্থানীয় কৃষক-সমিতি স্থাপনের পরামর্শ করিয়াছিলেন—পুনা

কৃষি-কলেজের প্রিন্সিপ্যাল তাহারই সার মর্ম্ম প্রবন্ধাকারে প্রকাশ করিয়া সাধারণের গোচরীভূত করিয়াছেন। কো-অপারেটিভ ক্রেডিট্ সোসাইটী সমূহের রেজিষ্ট্রার সিভিলিয়ান বুচানান সাহেবও ঐ সংখ্যা জর্নালে লিখিয়াছেন ঃ—

"A popular movement, appealing consciously to the interests of the agricultural classes under general official guidance but supported by the energy of the members of local organisers is eminently practicable. That is the ideal aimed at. It is certain that without that propelling popular force the movement can never have vitality or spontaneity. India is predominantly an agricultural country. Agriculture in its many phases is by far the most important interest and merits the greatest share of attention. Much has been done and more attempted to improve the situation, the picture is still dark enough. The agriculturist, the pillar of the State, is paradoxically its weakest member."

বাস্তবিকই ভারতবর্ষ—বিশেষতঃ বাঙ্গলা দেশ—কৃষিপ্রধান দেশ। কৃষকই এই দেশের জন-সৌধের ভিত্তিস্বরূপ, কিন্তু সেই ভিত্তিই দুর্ব্বল রহিয়াছে—অশক্ত রহিয়াছে—কৃষির উন্নতি ও কৃষককে শিক্ষিত পরিপুষ্ট না করিলে দেশের অমঙ্গলের আশঙ্কা আমাদের রাজপুরুষগণ অনুভব করিতেছেন। তজ্জন্যই প্রবল কৃষি-আন্দোলন ও কৃষক-সম্মিলনী স্থাপনের কল্পনা জল্পনা করিতেছেন। 'বঙ্গীয় কৃষি-পরিষৎ' গঠিত হইলে আমাদের সর্ব্বাঙ্গীণ উন্নতির আশা করিতে পারা যায়।

বঙ্গীয় গবর্ণমেণ্টের কাউন্সেলে মেম্বর হওয়ার জন্য 'টি-প্লান্টিং-কমিউনিটী' অর্থাৎ চা-কর সাহেবদিগের সভা হইতে প্রতিনিধি প্রেরণের ক্ষমতা আছে। এক শত একার অর্থাৎ ৩০০/ বিঘা জমিতে চা-বুনানী আছে এমন চা-বাগানের স্বত্বাধিকারী বা ম্যানেজার ইলেক্টরেট হইতে পারেন—ভোট দিতে পারেন। চা বাগানের স্বত্বাধিকারিগণ সভাসমিতি ও আন্দোলন করিয়া যাহা করিতে পারেন আমরা তাহা পারি না? আমাদের মধ্যে ৩০০/ বিঘা ভূমির চাষবাস করেন এমন লোকও ত রহিয়াছেন, অথচ তাঁহারা ইলেক্টরেট হইতে পারিবেন না কেন? চা ও ধান্য প্রভৃতি শস্যের মধ্যে কোন্‌টী অধিক প্রয়োজনীয় তাহা বিবেচনা করিয়া দেখিলে আমাদের দাবী অপেক্ষাকৃত গুরুতর কি না বিবেচনাসাপেক্ষ। আমাদের কৃষক-সমিতি প্রতিষ্ঠিত হইলে এই বিষয়ে গবর্ণমেণ্টের দৃষ্টি আকর্ষণ করা যাইবে।

জমিদার বা ভূম্যধিকারিগণ মধ্যে যাঁহারা প্রেসিডেন্সী ও বর্দ্ধমান বিভাগের অন্তর্গত, তাঁহাদের মধ্যে যাঁহারা ছয় সহস্র টাকা রাজস্ব বা এক সহস্র পাঁচ শত টাকা রোড বা পাবলিক ওয়ার্ক শেস্ দান করেন তাঁহারা ইলেক্টরেট হইতে পারিবেন। ঢাকা ও চট্টগ্রাম বিভাগের পক্ষে যাঁহারা তিন সহস্র টাকা রাজস্ব ও সাত শত পঞ্চাশ টাকা শেস্ দান করেন তাঁহারা ইলেক্টরেট হইতে পারেন। মাহিষ্য জাতীয় জমিদার এগার হাজার হইলেও বিগত ১৯১২ সালের ২৩শে নভেম্বর তারিখের কলিকাতা গেজেটে মাত্র ছয় জন মাহিষ্য জমিদারের নাম ইলেক্টরেট লিষ্টের মধ্যে স্থান পাইয়াছিল; যথা :—

(১) অমৃত নাথ দাস	জানবাজার কলিকাতা
(২) শ্যামাচরণ বিশ্বাস	” ”
(৩) নিত্যগোপাল বিশ্বাস	” ”
(৪) দুর্গাপ্রিয় চৌধুরী	” ”
(৫) পৃথ্বীনাথ গজেন্দ্র মহাপাত্র খণ্ডরই	মেদিনীপুর
(৬) রাখালচন্দ্র মণ্ডল	রাজসাহী

তৎপরে বাওয়ালীর মণ্ডল বাবুদের আবেদন পত্র পৌঁছিলে তাঁহাদের এক জনের নাম মাত্র ইলেক্টরেট্ তালিকায় সংযোজিত হইয়াছিল। ভাবিয়া দেখুন, মাহিষ্য জমিদারগণের অবস্থা কিরূপ শোচনীয়। জমিদার পক্ষ হইতেও মাহিষ্য জাতি বা কৃষক শ্রেণীর পক্ষে বলিবার লোক কেহই গবর্ণমেণ্টের কাউন্সেলে স্থান পান নাই। পক্ষান্তরে—জমিদার বা ভূম্যধিকারিগণও কৃষকগণের প্রতিনিধি বলিয়া বিবেচিত হইতে পারেন না, কেন না কৃষক প্রজা ও জমিদার এই উভয় শ্রেণীর ভূমি সম্বন্ধীয় স্বত্বস্বামিত্ব লইয়া একটু গোলযোগ আছে। এই উভয় শ্রেণীর মধ্যে ভূমিস্বত্ব পরস্পর বিরুদ্ধভাবাপন্ন।

বঙ্গীয় কাউন্সেলের গঠনে ১৯১২ খৃষ্টাব্দের ২৩শে ডিসেম্বর তারিখের কলিকাতা গেজেটে যে ২৮ জন বেসরকারী সদস্তের জায় দেওয়া হইয়াছে তাহা এইরূপ :—

ইলেক্টরেট	মেম্বর সংখ্যা।
কলিকাতা মিউনিসিপালিটি	১
কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়	১
প্রেসিডেন্সী বিভাগের মিউনিসিপালিটী সমূহ	২

বর্দ্ধমান, রাজসাহী, ঢাকা ও চট্টগ্রামের মিউনিসিপালিটী সমূহ প্রত্যেক বিভাগের ১টী করিয়া ৪

প্রেসিডেন্সী, বর্দ্ধমান, রাজসাহী, ঢাকা ও চট্টগ্রাম বিভাগের ডিষ্ট্রিক্ট ও লোকালবোর্ড সমূহ প্রত্যেক বিভাগে ১টী করিয়া ৫

প্রেসিডেন্সী, বর্দ্ধমান, রাজসাহী ও ঢাকা বিভাগের জমিদার সমূহ প্রত্যেক বিভাগে ১টী করিয়া ৪

প্রত্যেক বিভাগে একটী করিয়া মুসলমান সম্প্রদায় হইতে ৫

বেঙ্গল চেম্বার অফ কমার্স ... ২

কলিকাতা ট্রেডার্স আসোসিয়েসন ... ১

চট্টগ্রাম পোর্ট কমিশন ... ১

কলিকাতা মিউনিসিপালিটীর কতিপয় কমিশনারগণ (অতিরিক্ত) ১

টি প্লান্টিং কমিউনিটী (চা-কর সভা) ১

মোট ... ২৮

জমিদার সম্প্রদায় মধ্যে যাঁহারা উপাধিগ্রস্ত তাঁহাদের রাজকর কম হইলেও ইলেক্টরেট হইতে পারেন। সৌভাগ্যের বিষয়, আমাদের সাহিত্য-সমাজের মধ্যে উপাধি-ব্যাধি-গ্রস্ত জমিদার নাই। এইরূপে দেখিতে পাওয়া যায় যে, বঙ্গীয় গবর্ণমেণ্টের লেজিস্‌লেটিভ কাউন্সেলে কৃষক সম্প্রদায়ের প্রতিনিধি নাই—দুঃখ দুর্গতি বঙ্গেশ্বর বাহাদুরের কর্ণগোচর করাইবার কেহ নাই। এ অবস্থায় বঙ্গীয় কৃষক-সম্মিলনী সংগঠিত হইয়া যাহাতে কৃষির উন্নতি, শিক্ষার প্রসার ও রাজ দরবারে কথা বলিবার অধিকার লাভ করিবার সুযোগ ও আয়োজন করিতে পারা যায় তৎপক্ষে প্রত্যেকেরই হৃদয়তন্ত্রী নৃত্য করা চাই। উৎসাহের সহিত ধীরসংযত অথচ নির্ভীকভাবে, বিপক্ষগণের শত বাধা অতিক্রম করিয়া, এই অতি সুমহৎ চরম লক্ষ্যের দিকে অগ্রসর হওয়া প্রত্যেক স্বজাতি-প্রেমিক ব্যক্তির অবশ্য কর্ত্তব্য। কৃষকের জন্য, কৃষির জন্য, যাঁহার প্রাণে প্রেম আছে, তিনিই ভগবৎ প্রেরণায় এই সুমহৎ উদ্দেশ্যের সহায়তা যতটুকু করিবেন তাহাই ভগবানের চরণে সচন্দন ভক্তিপুষ্পের ন্যায় অর্পিত হইবে। ইহাতে ধর্ম্ম অর্থ কাম মোক্ষ চতুর্ব্বর্গের ফল লাভ হইবে। ধর্ম্মী ধর্ম্ম পাইবেন—স্বধর্ম্ম, অর্থী অর্থ পাইবেন, কামী আশানুযায়ী কামনাপূর্ণ হইবেন—এবং মহাত্মা এইরূপ পরহিতে অন্তে মোক্ষলাভ করিবেন। সোৎসাহে আসুন ভ্রাতৃগণ যাহাতে **বঙ্গীয়-কৃষি-পরিষদ** সংগঠন হয় তাহার জন্য আহ্বান করিতেছি।

শ্রী:—

সমাজের স্বাস্থ্য-রক্ষা।

রাজ্যের স্বাস্থ্যরক্ষা রাজার কর্ত্তব্য, রাজপুরুষদিগের কর্ত্তব্য; প্রজারও অতি কর্ত্তব্য। প্রজা লইয়া রাজার রাজ্য, রাজা লইয়া প্রজারও রাজ্য। আমাদের রাজপ্রতিনিধি ও রাজপুরুষেরা রাজার কার্য্য করিতেছেন; রাজ্যের স্বাস্থ্যরক্ষায় তাঁহাদের দৃষ্টি আছে।

যুক্তপ্রদেশে যেরূপ সর্ব্বত্র সরকারী স্বাস্থ্যরক্ষণী সমিতি বসাইবার ব্যবস্থা হইয়াছে, সকল প্রদেশেই সেরূপ ব্যবস্থার যে আয়োজন হইবে, তাহাতে সন্দেহ নাই। কেবল জেলায় জেলায়—নগরে নগরে নহে, গ্রামে গ্রামে স্বাস্থ্য পরিদর্শনের ব্যবস্থা করা যে আবশ্যক হইয়াছে, তাহা গবর্ণমেণ্ট অনেক দিন হইতেই বুঝিয়াছেন; তাহা রাজপুরুষেরাও অনেক দিন হইতেই বুঝিয়াছেন। জেলায় জেলায় ডিষ্ট্রীক্টবোর্ড, মহকুমায় মহকুমায় লোকাল বোর্ড, নগরে নগরে মিউনিসিপালিটী—এই সমস্ত সভাসমিতি কি জন্য হইয়াছে?

পথে ঘাটে দৃষ্টি রাখা যেরূপ উদ্দেশ্য, জল-নিকাশ ও জলসরবরাহে দৃষ্টি রাখাও সেইরূপ উদ্দেশ্য। নগর গ্রামের জঞ্জাল আবর্জ্জনা দূর করা স্বাস্থ্যরক্ষার জন্য আবশ্যক, ইহা সকল লোকেরই বুঝা আছে। অতএব, গবর্ণমেণ্ট যে প্রজার স্বাস্থ্যরক্ষার দিকে দৃষ্টি রাখিয়া, পূর্ব্বোক্ত সভাসমিতি বসাইয়াছেন, তাহা না বুঝেন কে? দেশের চারিদিকে যে চিকিৎসালয় প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে, তাহাও ত প্রজার স্বাস্থ্যরক্ষার জন্য। রোগব্যাধির উপশম প্রশম হইলেই স্বাস্থ্যরক্ষা হয়। চারিদিকে চিকিৎসক নিযুক্ত করা হইয়াছে, জেলার বড় ডাক্তারকে ইহাঁদের কার্য্যে দৃষ্টি রাখিতে হইতেছে। ছোট বড় সকল চিকিৎসকেরই কর্ত্তব্য প্রজার রোগব্যাধির নিবারণ করা, এবং এইরূপে প্রজার স্বাস্থ্যরক্ষায় সাহায্য করা।

কিন্তু যাঁহারা রোগব্যাধির নিবারণে নিযুক্ত থাকিয়াও স্বাস্থ্যরক্ষায় দৃষ্টি রাখিতেছেন, কেবল তাঁহাদের উপর নির্ভর করিয়াই গবর্ণমেণ্ট নিশ্চিন্ত নহেন। কেবল স্বাস্থ্যরক্ষায় দৃষ্টি রাখাই যাঁহাদের কাজ, এরূপ স্বাস্থ্যরক্ষকেরা সর্ব্বত্র ঘুরিতেছেন। বড় ছোট স্যানিটারি কমিশনরদিগের কাজই ত হইতেছে, স্বাস্থ্য-রক্ষার পথে উন্নতি করা।

গবর্ণমেণ্ট অনেক করিতেছেন, আরও অনেক করিবেন। গবর্ণমেণ্টের ঔদাসীন্য নাই, যত্নই আছে। দেশের লোকের ঔদাসীন্যই অন্তরায় হইয়াছে। স্বাস্থ্যরক্ষার ব্যতিক্রম কেবল শক্তির অভাবহেতু নহে,

হেতু। প্রবৃত্তি থাকিলে যত্ন হয়, প্রবৃত্তি স্থির হইলে যত্ন চেষ্টা অধ্যবসায়ে পরিণত হয়। যাঁহার যেমন শক্তি তিনি যদি স্থানীয় স্বাস্থ্যরক্ষায় সেইরূপ যত্ন রাখেন, তাহা হইলে অনেক কাজ হইতে পারে! অবস্থা ব্যবস্থা দুই একটী দৃষ্টান্ত দ্বারা দেখাইয়া দিতেছি।

ধর, গ্রামে তিন চারিটী পুকুর আছে, সকল পুকুরেই জল আছে। ইহার মধ্যে একটী পুকুর পানীয় জলের জন্য থাকুক, দুইটী লোকের স্নানীয় জলের জন্য থাকুক, একটী গরু বাছুরের জন্য থাকুক। গ্রামের সকল লোকে একমনে একবাক্যে প্রতিজ্ঞা করুন, "পানের জলাশয়ে নাওয়া ধোয়া কাচা কোচার নামটী রাখা হইবে না। উহার জল কেবল পানের জন্য লওয়া হইবে। কলসী ঘড়াও ডুবান হইবে না। ঘাটের পঁইটা হইতে ঘটী বাটী করিয়া জল তুলিয়া কলস ঘড়ায় লওয়া হইবে। কিছুতেই অন্যথা হইবে না।" সকলে মিলিয়া প্রতিজ্ঞা করুন, এই নিয়মের কিছুতেই অন্যথা হইবে না। যিনি অন্যথা করিবেন, তাঁহাকে সমাজচ্যুত করা হইবে।

এইরূপ সকলেই প্রতিজ্ঞা করুন, "স্নানের পুকুরের জল কেহ পান করিবেন না। যিনি যিনি এই নিয়মের অন্যথা করিবেন, তাঁহাকেই সমাজচ্যুত হইতে হইবে। সকলে প্রতিজ্ঞা করুন, পানের বা স্নানের পুকুরে কেহ লতাপাতা, ভাঙ্গা হাঁড়ী কলসী, জঞ্জাল আবর্জ্জনা প্রভৃতি কিছুই ফেলিতে পারিবে না। গ্রামে ওলাউঠা বসন্ত প্রভৃতি সংক্রামক রোগ হইলে, যাহাতে পুকুরের জলে ঐ রোগের কোনরূপ সংক্রমণ হইতে পারে, সেরূপ কাজ কাহাকে করিতে দেওয়া হইবে না। রুগ্ন ব্যক্তির শয্যা বস্ত্রাদি কেহই পুকুরে কাচিতে পাইবে না। যদি কাচিতে হয়, তবে জল তুলিয়া এরূপ স্থানে কাচিতে হইবে, যেখানে ঐ কার্য্য হইলে, কোনরূপ সংক্রমণের ভয় থাকিবে না।" প্রতিজ্ঞা করুন, এইরূপ এবং অন্যরূপ নিয়মের যিনি ব্যতিক্রম করিবেন, তাঁহাকেই সমাজচ্যুত হইতে হইবে।

প্রতিজ্ঞা করুন, গবাদির জন্য রক্ষিত জলাশয়ের জল কোন লোকে পান স্নানের জন্য ব্যবহার করিতে পারিবেন না। গবাদির সরোবর গবাদির জন্যই থাকিবে। কিন্তু গবাদিও রুগ্ন হইলে ঐ সরোবরে নামিতে পাইবে না। কেন না, পশুরোগেরও সংক্রমণ হইয়া থাকে, এবং সংক্রমণে লোকের অনিষ্ট করিতে পারে। প্রতিজ্ঞা করুন, এ নিয়মের যিনি ব্যতিক্রম করিবেন, তিনি সমাজচ্যুত হইবেন।

গ্রামের সম্পন্ন সমর্থ লোকেরা প্রতিজ্ঞা করুন, মধ্যে মধ্যে গ্রাম্য সরোবরের

পঙ্কোদ্ধার ও সংস্কার করিতেই হইবে। যে পুকুরের জলে সর্ব্বসাধারণের প্রয়োজন সিদ্ধ হয়, সে পুকুরের সংস্কারে সকলেরই সম্বন্ধ রাখিতে হইবে। গ্রাম্য চাঁদার গ্রামের বারোয়ারী পূজা হইতে পারে, গ্রাম্য চাঁদায় গ্রাম্য সরোবরের সংস্কার না হইবে কেন?

প্রবৃত্তি থাকিলে পথ হয়। জল যে জীবন; এই জন্যই যে, জলের একটী নামও জীবন; তাহা এখন প্রায় সকলেই ভুলিয়া গিয়াছেন। এই জন্যই ত সর্ব্বনাশ হইতেছে। গ্রামের সকল লোকে একবাক্যে প্রতিজ্ঞা করুন, কেহই জলকে দোষযুক্ত হইতে দিব না।"

নরনারী সকলেরই কর্ত্তব্য, জলকে যথাসাধ্য বিশুদ্ধ রাখিবার চেষ্টা করা। পানের পুকুরে ত কথাই নাই, স্নানের পুকুরেও কাহারই মলমূত্র ত্যাগ করা উচিত নহে; থুথু গয়েরও ফেলা উচিত নহে।

লজ্জার মাথা খাইয়া বলিতে হয়—এ দেশের রমণীরা সরোবর পাইলেই মূত্রত্যাগ করিবার জন্য ব্যস্ত হইয়া থাকেন; দেখিতে পাইবে, দামিনী যামিনী কামিনী ভামিনীরা, সরোবরে নামিয়া এক দিকে জলনির্গম করিতেছেন, অন্যদিকে মুখে জলগ্রহণ করিতেছেন। যেখানে 'লগ্‌গী' করিতেছেন, সেইখানেই কুলকুচা করিতেছেন। বস্তুতঃ যে জল সুন্দরীদের মূত্রে মূত্রময় হইতেছে সেই জলই তাঁহাদের মুখ দিয়া গলার ভিতর যাইতেছে। জল দুষ্ট করা—জলকে অপবিত্র করা—পাপ। এ পাপে ত প্রশ্রয় দেওয়া উচিত নহে।

জলই জীবন, এই জন্য জলের কথা একটু অধিক করিয়া কহিলাম। তারপর জলনিকাশের কথা। গ্রামের সকলে যদি স্ব স্ব ভবনের জলনির্গমনের পথ সদাই মুক্ত রাখেন, তাহা হইলে অনেক উপকার হইতে পারে। দশের তিলে তাল হয়। গ্রামের সকলেই যদি স্ব স্ব ভবনের জল নিকাশে দৃষ্টি রাখেন, তাহা-হইলে সমগ্র গ্রামের জলনিকাশে সাহায্য হইতে পারে। সকলেই প্রতিজ্ঞা করুন, সকলেই স্ব স্ব ভবনের জলনির্গম পথ মুক্ত রাখিবেন। যিনি না রাখিবেন, তিনি সমাজচ্যুত হইবেন।

বাটীর আবর্জ্জনা জঞ্জালের ত কথাই নাই, বাটীর পার্শ্বে ও সম্মুখে জঞ্জাল আবর্জ্জনাও সকলকে মুক্ত করিতে হইবে। প্রত্যহ না হউক, সপ্তাহে অন্ততঃ একবার বাটীর চারিদিকে ছোট ছোট গাছ গুল্ম ঘাস প্রভৃতি ছিঁড়িয়া চাঁচিয়া ফেলিয়া দিতে হইবে। বাটীর ভিতর বাহির প্রত্যহ ঝাঁটা দিয়া জঞ্জাল মুক্ত

করিতে হইবে। সকলে মিলিয়া প্রতিজ্ঞা করুন, এ নিয়মের যিনি ব্যতিক্রম করিবেন, তিনি সমাজচ্যুত হইবেন।

এইরূপ এবং অন্যরূপ অনেক কার্য্যই যে, সহজে সম্পন্ন হইতে পারে, তাহা প্রত্যক্ষ ৫০।৬০ বৎসর পূর্ব্বে দেখিয়াছি, গ্রাম যেন ঝক্‌ঝক্‌ করিতেছে; পথে জঞ্জাল নাই, বাড়ীতে জঞ্জাল নাই, বাটীর পার্শ্বে বন জঙ্গল নাই। তখন মিউনিসিপালটী ছিল না, ডিষ্ট্রীক্টবোর্ড, লোকাল বোর্ড বা ইউনিয়ন ছিল না। অথচ তখন গ্রামগুলি কেমন খট্‌খট্‌ ঝক্‌ঝক্‌ করিত। তখন সকল গ্রামের সকল লোকেই পূজা বিবাহাদি উৎসবের সময়ে স্ব স্ব ভবনের চারিদিকে বন জঙ্গল ত সাফ করিতেনই, পরন্তু নিকটবর্ত্তী বা সম্মুখস্থ পথেরও সংস্কার করিতেন। ধনীমানীরা পূরা গ্রামেরই পথঘাটের উন্নতি করিয়া দিতেন; কাদাপাঁক খালখোন্দল কুত্রাপি থাকিতে দিতেন না। ৺দুর্গাপূজার সময়ে গ্রামখানি যেন ছবিখানির মত হইত।

কিন্তু হায়! "তেহিনো দিবসাগতঃ।" যাঁহার শক্তি নাই, তিনি যেরূপ উদাসীন, যাঁহার শক্তি আছে, তিনিও সেইরূপ উদাসীন। প্রবৃত্তির অভাবই অনিষ্টের মূল; এই কথাই স্থূল। সমিতি-সভার প্রতিষ্ঠায় প্রতিবাদ করিতেছি না, অনুবাদই করিতেছি। নগরে নগরে, মহকুমায় মহকুমায়, জেলায় জেলায় স্বাস্থ্যরক্ষণী সভাসমিতি রাখ। কিন্তু স্ব স্ব সামর্থ্য প্রয়োগে কাহারই ত ঔদাসীন্য করা উচিত নহে। সমাজের স্বাস্থ্যরক্ষা হইলেই রাজ্যের স্বাস্থ্যরক্ষা হইবে।

(দৈনিক-চন্দ্রিকা)

কুলীন মাহিষ্যের সদাচার।

শাস্ত্র বলেন, "আচার হীনং ন পুনন্তি বেদাঃ, সদ্যপাধীত সহষড়্‌ভিরঙ্গৈঃ।" ষড়ঙ্গের সহিত বেদ অধ্যয়ন করিলেও সদাচার-বিহীন ব্যক্তি কখনই পবিত্র হইতে পারেন না, আচারবিহীন জনের অধীত বেদ সকল, মৃত্যুকালে জাতপক্ষ শাবকের নীড় ত্যাগের ন্যায়, তাহাকে ত্যাগ করিয়া প্রস্থান করেন। কূর্ম্ম পুরাণোক্ত 'আচার, বিনয়, বিদ্যাদি নবধা কুল লক্ষণই সর্ব্বজাতির মধ্যে উৎকর্ষের পরিচয়। কুল শব্দের উত্তর অস্ত্যার্থে ইন্‌ প্রত্যয়ে 'কুলীন' পদ, অর্থাৎ আচার বিদ্যাদি নবধা কুলের লক্ষণ যাঁহাতে বিদ্যমান আছে, তিনিই

কুলীন। অনেক অনভিজ্ঞ লোকের ধারণা যে, ব্রাহ্মণ, বৈদ্য ও কায়স্থ ভিন্ন অন্যজাতির কুল নাই। বল্লাল সেন এই তিন জাতিরই কুলমর্য্যাদা বংশগত ভাবে স্থাপন করিয়া গিয়াছেন। সুতরাং এই তিন জাতিরই কুল; অন্যজাতির আবার কুল কি?—এই ধারণার বশে অনেকে অনেক স্থলে বিতর্কও করিয়া থাকেন। কিন্তু এই ধারণা যে নিতান্ত ভ্রমাত্মক, তাহা বিজ্ঞজন অনায়াসে বুঝিতে পারেন। মুষ্টিমেয় বাঙ্গালার ব্রাহ্মণ, বৈদ্য ও কায়স্থ ভিন্ন আর্য্যাবর্ত্ত ব্রহ্মাবর্ত্ত দক্ষিণাবর্ত্ত কোন দেশেই বল্লালস্থাপিত নিয়মের মত বংশগত ভাবে ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্যের কুলবন্ধন নাই। সর্ব্বদেশে আবহমান কাল হইতে ব্যক্তিগত ভাবে কুলীনতা স্থির ছিল, এখনও আছে; মাত্র বল্লালের সময় হইতে বাঙ্গালার ব্রাহ্মণ, বৈদ্য ও কায়স্থ এই জাতিত্রয়ের বংশগত ভাবে কুলীনতা স্থির হইয়া, অত্যন্ত সঙ্কীর্ণতায় দাঁড়াইয়াছে। মাহিষ্যজাতির কুলীনতায় প্রাচীন পদ্ধতি অব্যাহত আছে। যেহেতু এই জাতি বল্লালের কথামত প্রাচীন পুরোহিত ত্যাগও করেন নাই, কৌলিন্যের সঙ্কীর্ণ গণ্ডীর মধ্যেও যান নাই। পশ্চিম প্রদেশীয় জাঠ, রাঠোরাদি ক্ষত্রিয় জাতির ন্যায় ব্যক্তিগত ভাবে মাহিষ্যজাতির কুলীনতা বিদ্যামান আছে। অকুলীন মাহিষ্যের মধ্যে কেহ আচারবিদ্যাদি সম্পন্ন হইলে, কুলীন মাহিষ্য তাঁহার সহিত যৌনসম্বন্ধ স্থাপন করিতে পারেন, তাহাতে মাহিষ্য কুলীনদের কুল নষ্ট হইতে পারে না। তথাপি সর্ব্বোচ্চ কুলীন মাহিষ্যেরা পূর্ব্বে আচার, বিদ্যা, ভূরি অর্থ ও ভূরি সম্পত্তিবান স্বজাতির সহিত যৌনসম্বন্ধ স্থাপন করিতে মোটেই সম্মত হইতেন না, ও তাহাদের সহিত যৌনসম্বন্ধে সম্বন্ধ হইলে কুল নষ্ট হইবে এই রূপ মনে করিতেন; তাহার কারণ কেবল বিচার করিয়া না বুঝা, আর ব্রাহ্মণবৈদ্যগণের বংশগত কৌলিন্যের রীতি দেখিয়া তাহারই অনুকরণে চলা। প্রকৃত পক্ষে উহা দোষের নহে। সুখের বিষয়, এক্ষণে কুলীন শ্রেণীর মাহিষ্য মহোদয়েরা স্বসমাজ ছাড়া অনেক অবস্থাপন্ন মাহিষ্যদের ঘরে কন্যা আদান প্রদান করিতেছেন। প্রথমতঃ কেমিরদিয়াড়ের প্রসিদ্ধ জমিদার বাবুরা চৌদ্দ সহস্র টাকা কুল মর্য্যাদা দিয়া মুক্তাদহের মজুমদার বংশের কন্যা গ্রহণ করেন। এই রূপ ব্যয়ে বিত্তরপুরের ভৌমিক বংশে কন্যা প্রদান ও মথুরা পুরের চৌধরী বংশের কন্যাও গ্রহণ করেন। ক্রমে অন্যান্য অবস্থাপন্ন মাহিষ্যেরা বিস্তর অর্থ ব্যয় করিয়া মুক্তাদহ, মজলিশপুর প্রভৃতি সর্ব্বোচ্চ কুলীন ঘরে কন্যা আদান প্রদান করিতে লাগিলেন। যাঁহারা অনেক দিন ধরিয়া এইরূপ কুলীন ঘরে

অনেক কন্যা আদান প্রদান করিতে পারিলেন, তাঁহারা মৌলিক হইয়া গেলেন; যেমন, মুর্শিদাবাদ—সাগরপাড়া; রাজশাহি—ব্যাংগাড়ি; পাবনা—ফুলবাড়ী; নদীয়া—ক্ষেমিরদিয়াড়; ইত্যাদি। মূল মহোজ্জ্বল কুলীন বংশ নদীয়া—মুক্তাদহের ও মাধপুরের মজুমদার; মথুরাপুরের ও মজলিশপুরের চৌধুরী মহিষবাথানের সরকার; হাসন পুরের চৌধুরী প্রভৃতি (মুর্শিদাবাদে) এবং রাজশাহি অর্জ্জুনপাড়ার সংপ্রতি বিদুরপুরের ভৌমিক। উজ্জ্বল কুলীন যথা;—ব্যাংগাড়ির ভৌমিক বংশ; নদীয়া—হোগলবাড়িয়া রায়, ভৌমিক, চৌধুরী বংশ; বগুড়া—মিঠাপুর চৌধুরী বংশ ইত্যাদি। মৌলিক যথা,—নদীয়া—ক্ষেমিরদিয়ার ভৌমিকবংশ; নতিপোতা সরকার বংশ; বাঁশবাড়িয়া চৌধুরী বংশ, পাবনা—ফুলবাড়ির সরকার বংশ, মুর্শিদাবাদ—সাগরপাড়ার সরকার বংশ; নদীয়া—তালবাড়িয়ার জোয়ারদারবংশ; কুর্শিয়ার জোমারদারবংশ প্রভৃতি।

মহোজ্জ্বল কুলীন মাহিষ্যদের সদাচার অতি পবিত্র। মথুরাপুর মুক্তাদহ, মহিষবাথান, মজলিশপুর, বিদুরপুর প্রভৃতি গ্রামে এই সমাজ। ইহাঁদিগের মধ্যে সধবা, বিধবা, বালক, বৃদ্ধ, যুবা সকলেই উত্তম সদাচার-পরায়ণ। পুংপ্রৌঢ়গণ চাতুর্ম্মাস্য ব্রত, উর্জ্জাদর ব্রত (কার্ত্তিকেনিয়ম সেবা) একাদশ্যদির ব্রতোপবাস যথানিয়মে পালন করেন। বিধবাগণ মৎস্য স্পর্শ করেন না, নিরম্বু একাদশীর উপবাস করেন। পান, খট্টাতল্প, দর্পণাদি ব্যবহার করেন না। এক বিধবা সগোষ্ঠির অন্য বিধবার সংস্পৃষ্ট অন্ন ভোজন করেন না। সদাচারপূতা সধবার স্পৃষ্ট তিল, তণ্ডুল, টিপিটক-ভাজা বা লাজ (খৈ) ভোজন করেন না। আচারবান্ স্নাত পুরুষকেও আপনাদের ব্যবহার্য্য জল পাত্র (ঘটি, ঘড়া আদি) ও পরিধেয় বস্ত্র স্পর্শ করিতে দেন না। প্রৌঢ় বয়স্কা সধবাগণ ও প্রৌঢ় বয়স্ক পুরুষগণ প্রায় সকলেই নিরামিষভোজী। বালক বালিকা এবং যুবকদের মধ্যে তথা অল্পবয়স্ক সধবাদের মধ্যে যাহারা মৎস্য খায়, তাহাদের জন্য প্রাচীর ঘরের কোনও এক কোণে বা আঙ্গিনার এক ধারে একটি চুল্লী (উনোন) থাকে। যে দিন তাহারা মাছ খাইবে, সেদিন তাহারা নিজে সেই চুলোয় পাক করিয়া, কলার পাত কাটিয়া মাছ ভাত খায়। মাছ ভাত খাবার ২।১টি গেলাস বাটি পৃথক্ ভাবে থাকে; তা ছাড়া মাছের বাসন তেমন আড়ম্বরের নাই। এই সমাজে বিবাহোৎসবে মেয়েদের খয়ের বটি প্রস্তুত আলিপনা রচনা (আলেপন), ও গন্ধের ডালা সাজাইবার পদ্ধতি অতি পরিপাটী। ইহাঁরা স্বসমাজ ব্যতীত কোন স্বজাতির বাড়ীতে স্বয়ং বা ব্রাহ্মণের দ্বারা সম্পন্ন

অন্ন ব্যঞ্জন ভোজন করেন না। ইহাঁদের সদাচারে স্থানীয় সদ্ব্রাহ্মণের ঘরের সধবা বিধবাগণ অভিভূতা থাকেন। নদীয়া—মহিষাডেরার অদ্বৈত বংশ প্রভুপাদ ৺প্যারীমোহন গোস্বামী মহাশয় (ইনি ক্ষেমিরদিয়ার বাবুদের বাড়ীর দ্বার পণ্ডিত ও পরে শ্রীধাম নবদ্বীপ চৈতন্য চতুষ্পাঠির অধ্যাপক ছিলেন) এক সময় বলিয়াছিলেন যে—মুথরাপুরের চৌধুরীরা পূর্ব্বে যখন দলবদ্ধ হইয়া, নিয়ম সেবার সময় আমাদের গোস্বামী পাড়ায় আসিতেন, তখন গোস্বামীদের মনে ভয় হইত যে কোন আচার ব্যবহারের গ্লানি দেখিয়া বা ত্রুটি ধরিবে। আমাদের বৃদ্ধগণের মুখে ইহাই শুনিয়াছি।" এই প্রকার সদাচারের গুণেই কুলীনদের অত গৌরব। ইহাঁদের মধ্যে অনেকেরই বিগ্রহ সেবা বিদ্যামান আছে। মথুরাপুর, বিহুরপুর, মহিষবাথান প্রভৃতি গ্রামে বিগ্রহসেবা আছে। উজ্জ্বলকুলীন ও মৌলিক কুলীনদেরও আচার ব্যবহার মহোজ্জ্বলদের অনুরূপ। মহোজ্জ্বল কুলীন ঘরের বিধবারা রন্ধনে যবন কলুর তৈল ও হরিদ্রা ব্যবহার করেন না। যবনদুহিত দুগ্ধ (মুসলমানের দোহা দুগ্ধ) পান করেন না। তিলক, তুলসী মালায় শোভিতা থাকেন। চিত্রপট গোবিন্দ মূর্ত্তি পূজা, তুলসী পরিক্রমা প্রভৃতি বৈষ্ণবাচার পালন করেন। প্রৌঢ়া সধবাগণও (নব বিবাহিতা বধূগণ ব্যতীত) একাদশ্যাদি ব্রতোপবাস ও ঐ সকল সদাচার পালন করেন। ইহাঁদের মধ্যে প্রায় স্ত্রী লোকই কিছু কিছু লিখিতে ও পড়িতে পারেন। দেবতা, ব্রাহ্মণে ও গুরুতে ভক্তি এবং স্বামীশুশ্রূষা উত্তমমত বিদ্যমান আছে। গৃহ সংস্কার, গৃহের সামগ্রী সকল যথাস্থানে বিন্যাস পূর্ব্বক শোভা সম্পাদন করিতেও সুদক্ষা, কারুকার্য্যময় কন্থা ও উলের কাজেও অনেকের পারদর্শিতা আছে। থালা, বাটি, পানীল (গেলাস), বাটা, পিলশুজ, থালি (রেকাব), গাড়ু, পতৎগ্রহ (পিকদানী) প্রভৃতি নিত্য ব্যবহার্য্য তৈজসপত্র গুলি নিত্য নিত্য মাজিয়া ঘসিয়া পরিষ্কার রাখেন। বালকেরা পাঠশাল হইতে আসিবামাত্র সেই পরিধেয় কাপড় ছাড়াইয়া, হাত পা ধোয়াইয়া তবে রান্না ঘরের বারান্দায় উঠিতে ও খাইতে দেওয়া হয়, ইত্যাদি ইত্যাদি। সর্ব্বতোভাবের সদাচার গুণেই এই সমাজের মাহিষ্যদের এত গৌরব যে, পূর্ব্বে ১৪।১৫ হাজার টাকা কুলমর্য্যাদা দিয়া, এই সমাজে কার্য্য করিতে হইয়াছে। প্রবাদ আছে যে, রাজসাহি—অর্জ্জুনপাড়ার ভৌমিকদের বাড়ীতে একবার নবদ্বীপের কোন পণ্ডিত ব্রাহ্মণ অতিথি হয়েন। পণ্ডিতজির কোন কাজে শাস্ত্রাচারের অপব্যবহার দৃষ্ট হওয়ায়, ভৌমিক মহাশয় তাহা নিষেধ করেন।

তাহাতে পণ্ডিতত্রি ভার্তক্রোধী হইয়া, ভৌমিকের সহিত শাস্ত্রযুদ্ধ আরম্ভ করেন। তাহাতে পরাস্ত হইয়া, স্ব-আলয়ে চলিয়া যান এবং বাছিয়া বাছিয়া উদ্ধত প্রকৃতির পণ্ডিত ব্রাহ্মণ যুবক পাঁচজনকে অতিথিরূপে ভৌমিকদের বাড়িতে পাঠাইয়া দেন। ভৌমিক মহাশয়, অতিথিশালায় ব্রাহ্মণ পঞ্চকের আহারের তাবৎ সামগ্রীর সঙ্গে ৫টি কলার ডাগর দিয়াছিলেন। ব্রাহ্মণ পাঁচজন রান্নাঘরে প্রবিষ্ট হইয়া দেখেন যে, চাউল, ডাউল, ঘৃত, দুগ্ধ, পাতা, দাঁত খড়কে সবই আছে, সঙ্গে আছে কলাপাতার ৫টা ডাগর। তাঁহারা দেখিয়া অবাক হইলেন। কেন দেওয়া হইল? পুছিলেও অনভিজ্ঞতা প্রকাশ হইবে। অনেক ভাবাগণার পর জিজ্ঞাসা করাই স্থির হইল।

ভৌমিক মহাশয়কে জিজ্ঞাসা করিলে তিনি বলিলেন,—আহারে বসিলে, আসন হইতে অন্নের পাত বিচ্ছিন্ন থাকে। একবার গ্রাস মুখে দিলেই পাতের অন্ন উচ্ছিষ্ট হয়। অবিচ্ছিন্ন পাতের উচ্ছিষ্ট অন্ন খাওয়াও যে দোষ, খাইতে খাইতে উঠিয়া যাইয়া আবার আসিয়া সেই উচ্ছিষ্ট পাতের অন্ন খাওয়াও সেই দোষ। এই জন্য খাবার সময় আসনের সহিত অন্নপাতের সংলগ্ন রাখা লাগে। তজ্জন্যই কলার ডাগর দেওয়া হইয়াছে। ভোজনের পর আচমন, পদধৌত ও বস্ত্রত্যাগ করা লাগে। পণ্ডিত পঞ্চক প্রথমেই এই অনভিজ্ঞতা প্রকাশ করিয়া, শেষে আর কোন বিচার উত্থাপন করেন নাই। মানে মানে স্বদেশে প্রস্থান করিয়াছিলেন। অর্জ্জুনপাড়ার ভৌমিক বংশের মধ্যে অনেকেই পুটিয়া রাজসরকারে উচ্চপদের কার্য্য করিতেন। রাজচন্দ্র নামক একজন বৃদ্ধ ব্রাহ্মণের নিকটে শুনিয়াছি, ঐ সকল মাহিষ্য কর্ম্মচারীরা রাজধানীতে শ্রাদ্ধাদি দশকর্ম্মের কোন কর্ম্ম উপস্থিত হইলে, পুরোহিতের নিকটে উপস্থিত থাকিয়া ক্রিয়া শুদ্ধভাবে সম্পাদন করাইতেন। সে বিষয়ে কর্ত্তৃপক্ষের একান্ত আগ্রহের সহিত অভিমত ছিল। অর্জ্জুনপাড়া ভৌমিকদের বংশাবলী এখন স্থানে স্থানে বিক্ষিপ্ত হইয়া গিয়াছেন। অনেক স্থানের ভৌমিকোপাধিক মাহিষ্যেরা অর্জ্জুনপাড়ার ভৌমিক বংশ বলিয়া আপনাদিগকে পরিচিত করেন, অথচ তাহাদের মধ্যে তেমন অত্যুত্তম সদাচার পরিদৃষ্ট হয় না। বিদুরপুরের ভৌমিকেরা যে এই প্রাচীনবংশসম্ভূত, তাহা ইহাঁদের আচার ব্যবহার ও সামা-মর্য্যাদা দেখিয়া বিশ্বাস হয়। ইহাঁরা অর্জ্জুনপাড়ার ভৌমিক বলিয়া পরিচয় দেন। অর্জ্জুনপাড়া গ্রাম কুঠিলালপুরের উত্তর বুধপাড়া গ্রামের নিকটে। বুধপাড়া কাঁসার বাসনের কারখানার জন্য প্রসিদ্ধ। আরও এখানে প্রতি

কার্ত্তিকমাসে ৺কালীমাতার পূজা ও তদুপলক্ষে মাসব্যাপী এ৺টী মেলা বসিয়া থাকে। এই কালীমাতা খুব জাগ্রতা দেবী, আকারেও বৃহৎ। দেখিয়াছি, অর্জ্জুনপাড়ায় যেখানে ভৌমিকদের বাড়ী ছিল, তাহা নিবিড় অরণ্যানীতে পরিপূর্ণ হইয়াছে। বাড়ীটি অনেক স্থান লইয়া বিস্তৃত ও বৃহৎ বৃহৎ অনেক গৃহ ছিল, তাহা অনেকগুলি উচ্চ উচ্চ ভিটে দেখিয়া অনুমান করা যায়। যাহা হউক, এই সব সমাজের মাহিষ্যদের সদাচারের খ্যাতি থাকা প্রযুক্তই একটা কথা চলিয়া আসিতেছে যে,—'দাসকৈবর্ত্ত কুলের রাজা'। বাস্তবিক এইরূপ আচারপদ্ধতি যে জাতির মধ্যে স্বতঃসিদ্ধ চিরকাল হইতে বিদ্যমান রহিয়াছে, যে জাতির এতাদৃশ কুলগৌরব দেদীপ্যমান, সে জাতি ক্ষত্রিয়বৈশ্যজাত জাতি ভিন্ন কদাচ শূদ্র হইতে পারে না। দুঃখের বিষয়, এই সব কুলীন বংশের বর্ত্তমান সন্তানগণ পিতৃপিতামহের পরাকাষ্ঠাময় আচার নিয়ম ত্যাগ করিয়া বাবু হইয়া পড়িয়াছেন। ইহাতে তাঁহাদের গৌরবের হ্রাস ভিন্ন বৃদ্ধি হইবে না।

শ্রীদুর্গানাথ দেওয়ান-তত্ত্ববিনোদ।

শোকার্ত্তের নিবেদন!

আজ দুইমাস পূর্ণ হইতে চলিল, বিজয় আমাদিগকে শোকের অগ্নিকুণ্ডে নিক্ষেপ করিয়া অনন্তধামে চলিয়া গিয়াছে। তাহার বয়সমাত্র ২৫ বৎসর হইয়াছিল—তাহার সমুন্নত দেহ, প্রশস্ত গম্ভীর মুখমণ্ডল, অনন্যসাধারণ সর্ব্বতোমুখী প্রতিভা সমন্বিত বিশাল নেত্র, তাহার কমনীয় শরীর, নিষ্কলঙ্ক ও নিষ্পাপ জীবন, অসাধারণ সহৃদয়তা প্রভৃতি চিন্তা করিয়া আমরা কোনরূপেই শান্তিলাভ করিতে সমর্থ হইতেছি না! তাহার দুঃখিনী মাতা এই দুইমাস শোকে ও অনশনে কঙ্কালাবশেষ হইয়াছেন, প্রায়ই সংজ্ঞাশূন্য হইয়া পড়ায় তাঁহারও জীবনের ভরসা কম। বিজয়ের মহাযাত্রার সংবাদ পাইয়াই তাহার মাসী কুলদা সুন্দরী সূতিকাগৃহে ক্রমাগত দুইদিন দুইরাত্রি অনশনে নিরন্তর আর্ত্তনাদ করিতে করিতে রোগগ্রস্থ হইয়া জীবন বিসর্জ্জন করিয়াছেন। তাঁহার স্বামী দুইটী পুত্র লইয়া নিরুপায় হইয়া অশ্রুজলে ভাসিয়া আমার দুঃখ বাড়াইয়া বলিলেন, "বিজয়ের অসহনীয় বিয়োগে আর্ত্তনাদ করিয়াই

মাতামহী কাতর ও পীড়িত হইয়া মৃতবৎ হইয়া একমাস পরে খাড়া হইয়াছেন। তাহার একমাত্র ভ্রাতা শ্রীমান্ লক্ষ্মীকুমার তাহার শোকে অতীব কাতর হইয়া জ্বরাক্রান্ত হয়। সে এই জ্বরাবস্থায় ও অশ্রুজলে ভাসিতে ভাসিতে গুরুতর কাতর হইয়া সকলের ত্রাস উৎপাদন করিয়াছিল। তাহার বয়স ষোল বৎসর মাত্র। এইবার সে মেট্রিকুলেশন প্রথম শ্রেণীতে পাস করিয়াছে—অথচ তাহার মূর্ত্তিমান স্নেহ, আশাভরসার দাদা নাই, ইহাতে তাহার এবং পরিবার-বর্গের অশ্রুজলে ধরাতল ভিজিতেছে। জামাতা অবনীকুমার বিগত ছয় বৎসর কনিষ্ঠ ভ্রাতার ন্যায় বিজয়ের স্নেহ ও বুদ্ধির ছায়ায় বাস করিয়াছে, সে বাহুভাঙ্গা হইয়া অশ্রুজলে ভাসিতেছে। বিগত বৈশাখে এই অবস্থায় তাহার বমনাদি হয়—কিন্তু রক্ষা পাইয়াছে, উহার পরেই তাহার পত্নী, আমার জ্যেষ্ঠ কন্যা চপলা কলেরা রোগে আক্রান্ত হইয়াছিল, অল্পের জন্য বাঁচিয়াছে। এক তাহারই শোকে এত দুর্দ্দশা ঘটাইয়াছে! বিগত দুইমাস এইরূপ শোকে ও দুঃখে মোহাবস্থায় কাটাইয়াছি!

এই দুইমাস মধ্যে আত্মীয় কুটুম্ব বন্ধু প্রভৃতি বহুলোকে কৃপাবশতঃ আমাকে পত্র লিখিয়া সান্ত্বনা করিয়াছেন, অনেকে স্বয়ং আসিয়া আমাকে স্বচক্ষে দেখিয়া গিয়াছেন এবং বিজয়ের বিয়োগে কোন্ স্থানে কি অবস্থা ঘটিয়াছে তাহার প্রজ্জ্বলিত বর্ণনা করিয়াছেন। এই সকল পত্র ও বর্ণনা আমার শোকের বেগ বৃদ্ধি করিয়াছে—অনেক পত্র আমি ভয়ে পাঠ করি নাই। অনেক পত্র বাড়ীর লোকে আমাকে তখন দেখান নাই। অনেকে আমাকে সোজাপত্র লিখিতে সাহসী না হইয়া শ্রীমান্ লক্ষ্মী ও তাহার মাতামহের নামে পত্র দিয়াছেন। আমি বিগত দুইমাস এই সকল পত্রের উত্তর দিতে সমর্থ হয় নাই—এখনও স্বতন্ত্র স্বতন্ত্র ভাবে উত্তর দেওয়ার শক্তি ও ধৈর্য্যলাভ করি নাই; তাই সমাজের আশ্রয় গ্রহণ করিলাম। আশা করি, সকলেই আমার ত্রুটি মার্জ্জনা করিবেন।

এই পঠদ্দশাস্থ পঁচিশ বৎসরের বালকের বিয়োগে সহস্র সহস্র লোক যেরূপ ব্যথিত হইয়াছেন, তাহা বোধ হয় ইতিপূর্ব্বে আর দেখা যায় নাই। ভিন্ন ভিন্ন স্থানীয় শোকাকুল জনগণের উষ্ণ নিশ্বাস আমার হৃদয়ে লাগিয়া আমার পুত্রশোক শতগুণে বর্দ্ধিত করিয়াছে! এই সম্বন্ধে কয়েকটী কথা বলিয়া কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করা যুক্তিযুক্ত;—

সেই বালক ঢাকায় অবস্থান করিবার পূর্ব্বে ১২।১৩ বৎসর সুনামগঞ্জ মহ-কুমায় আমার নিকটে ছিল। এই সময় মধ্যে সে তাহার সহজাত বিনয় ও

চরিত্র-মাধুর্য্যে আপামর সাধারণকে আয়ত্ত করিয়া ফেলিয়াছিল। কাজেই যখন তাহার বিয়োগবার্ত্তা টাউনে পৌঁছিল তখন সে টাউনে শোকের প্রবাহ বহিল। হাই স্কুলের হেড মাষ্টার বাবু প্রমথকুমার দে বি, এ, মূর্চ্ছিত হইয়া ভূতলে পড়িয়া গেলেন। প্যারী বাবু প্রভৃতি বন্ধুলোক যাঁহার যাঁহার স্থানে অজ্ঞান হইয়া পড়িলেন। টাউনের উকীল, মোক্তার, আমলা, শিক্ষক, ছাত্র, পিয়ন প্রভৃতি মধ্যে অশ্রু বিসর্জ্জন করিলেন না এমন লোক রহিলেন না। তত্রত্য শক্তিসম্পন্ন সাহিত্য সমিতির পরিচালকগণ একবারে কাতর ও হতবুদ্ধি হইয়া পড়িলেন। ইঁহারা ১০।১৫ দিন মধ্যে কোন কার্য্য করিতে সমর্থ ছিলেন না—কেহ কেহ ১০।১২ দিন শয্যায় শয়ান থাকিয়া মধ্যে মধ্যে ক্ষিপ্তের ন্যায় লম্ফ দিয়া উঠিয়াছেন। মহকুমাবাসী কবিরত্ন জয়নাথ গোস্বামী লিখেন—"আমার চারিটী পুত্র, স্ত্রী এবং নিজে এই ছয়টী জীবন আমার অধীন, যদি ইহার কতকটা দিয়া বিজয়কে রক্ষা করিতে পারিতাম, তবে আমি প্রস্তুত ছিলাম।" কমলবাবু প্রভৃতি সমাজসেবী লিখিয়াছেন—"যদি দশ হাজার সাহিত্যের জীবন দিয়া বিজয়ের জীবন পাওয়া যাইত, তাহাও সার্থক ছিল।" অনেকে লিখিয়াছেন—"আমার বয়স (৪০ । ৫০ । ৫৫) এত হইয়াছে, এই বয়সে এই সমগ্র দেশে বিজয়ের মৃত্যুর ন্যায় ভয়ঙ্কর দুর্ঘটনা আর কখন ঘটে নাই। কলিকাতা, সুনামগঞ্জ, রংপুর, ঢাকায় এমন সমাজসেবী আছেন, যাঁহাদের হৃদয় সেই বালকের নাম করিয়া কিছু লিখিতে এখনও বিদীর্ণ হয় এবং এই জন্য তাঁহারা স্তব্ধ ও নীরব। বিজয় ঢাকা কলেজ হোষ্টেলে চারি বৎসর এবং এম-এ পড়িবার বেলা প্রাইভেট্ মেসে প্রায় দুই বৎসর, এই ছয় বৎসর অবস্থান করিয়াছিল। এই ছয় বৎসর মধ্যে ঢাকা কলেজের সমস্ত প্রফেসার ও ঢাকার বিদ্বদ্-বৃন্দ মাত্রের হৃদয় আয়ত্ত করিয়া বসিয়াছিল। তাহার বিয়োগে ঢাকার শত শত পণ্ডিত ও বিদ্বান ব্যক্তি মর্ম্মাহত ও ব্যথিত। অনেকে বলিয়াছেন ঢাকা জেলার মুখোজ্জ্বল একরত্ন খসিয়া পড়িল—এমন বুঝি আর হইবে না।

তাহার বিয়োগে ঢাকা সাহিত্যসমাজ একবারে ভগ্নহৃদয়। তাহার বিয়োগবার্ত্তা শ্রবণে এই সমাজের—অন্যূন এক হাজার নরনারী ১।২।৩ দিন পর্য্যন্ত অনশন ও সল্লাশনে যাপন করিয়াছেন—মাসাধিককাল হা হুতাশ করিয়াছেন, মৈমনসিংহ জেলার বহু লোক এইভাবে দুঃখিত ও শোকাতুর। উত্তর বঙ্গের রংপুর ও বগুড়া কেন্দ্র, ফরিদপুর যশোর কেন্দ্র এবং কলিকাতা কেন্দ্র তাঁহার জন্য অতীব শোকার্ত্ত। এইরূপে অন্যূন দশ

সহস্র লোককে সোজা সুজি, এবং তদতিরিক্ত বহু সহস্র লোককে প্রকারান্তরে, ব্যথিত করিয়া সেই বালক মানবলীলা সংবরণ করিয়াছে।

একে পুত্রশোক, তাহাতে বহু লোকের এইরূপ দুঃখ দেখিয়া বিগত দুই মাস স্তব্ধের ন্যায় ছিলাম, কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ় ছিলাম। তাই অশ্রুবর্ষণ ভিন্ন অন্য কোন কর্ত্তব্য পালন করিতে পারি নাই। ইহাতে আমার অপরাধ হইয়াছে। ইতি। শ্রীবসন্ত কুমার রায়।

কয়েকটী বিশেষ কথা।

গত ২৫।৩০ বৎসর ধরিয়া নানাবিধ সংবাদ পত্রে এবং পুস্তক পুস্তকাদিতে মাহিষ্য জাতির কর্ত্তব্য সম্বন্ধে বিশেষভাবে আলোচনা চলিয়া আসিতেছে কিন্তু বড়ই দুঃখের বিষয় তৎপ্রতি এ পর্য্যন্ত কাহারও তাদৃশ অনুরাগ বা সহানুভূতি আকৃষ্ট হইল না! আমার বোধ হয় মাহিষ্য জাতির নিদ্রার কাল এখনও পূর্ণ হয় নাই, বহুদিন পূর্ব্বে শ্রীযুক্ত মহেন্দ্রনাথ তত্ত্বনিধি মহাশয় তাঁহার সেবিকা নাম্নী মাসিক পত্রিকায় এই মাহিষ্য জাতিকে একটী প্রকাণ্ড ভেকের সহিত তুলনা করিয়া অতিশয় আক্ষেপের সহিত বলিয়াছিলেন—"কোলা ব্যাঙকে খোঁচা না মারিলে যেমন সে লাফায় না, চুপ করিয়া থাকে, আমাদের এই মাহিষ্য জাতির প্রকৃতিও ঠিক সেই রূপ"। আমরা দেখিতেছি, বাস্তবিকই তাহাই,—সেন্সাস আসিল আর চারিদিকেই কত সভাসমিতি, কত বক্তৃতা, কতই উদ্‌যোগ এবং আয়োজন, কিন্তু যেমনি সেন্সাস্ কার্য্য শেষ হইয়া গেল, অমনি সব চুপচাপ, কাহারও কোন সাড়া শব্দ নহে!!

নদীয়া মাহিষ্য সমিতির সুযোগ্য সম্পাদক মেহেরপুরের অনারারী ম্যাজী-ষ্ট্রেট্ দারিয়াপুর নিবাসী মাননীয় জমিদার শ্রীযুক্ত বাবু হীরালাল বিশ্বাস মহাশয় ১৯০৯ সালের সেন্‌সাস্ সময়ে নদিয়া জেলার পল্লীতে পল্লীতে ভ্রমণ করিয়া তত্রত্য মাহিষ্য ভ্রাতৃগণকে যেরূপ ভাবে উদ্‌বোধিত করিয়াছিলেন তাহাতে আমাদের মনে হইয়াছিল, নদীয়াবাসী মাহিষ্য ভ্রাতৃগণের নিদ্রার কাল বুঝি পূর্ণ হইয়া আসিল; কিন্তু সে ভাব রহিল কোথায়? জলবুদ্‌বুদের ন্যায় যেমনি উঠিল অমনি নিবিয়া গেল। হাওড়া নিবাসী মাহিষ্য কুলপুরোহিত ডাক্তার শ্রীযুক্ত অক্ষয় কুমার চক্রবর্ত্তী মহাশয় যেমন জাগিলেন তেমনি আবার ঘুমাইয়া পড়িলেন, কমলপুর নিবাসী জমিদার শ্রীযুক্ত বাবু হেমচন্দ্র বৈতালিক,

মেদিনীপুর জেলার কিস্মত রাধাকান্তপুর নিবাসী জমিদার শ্রীযুক্ত বাবু গোপী বল্লভ মণ্ডল, হুগলী রামনারায়ণপুর নিবাসী জমিদার শ্রীযুক্ত বাবু বৈকুণ্ঠনাথ খামারুই, ওরফুলি নিবাসী জমিদার শ্রীযুক্ত বাবু নিরঞ্জন মাইতি প্রভৃতি মহোদয়গণও বিরাট সভাসমিতি স্থাপন পূর্ব্বক মাহিষ্য ভ্রাতৃগণকে জাতীয় প্রেমে অনুপ্রাণিত করিবার জন্য যথেষ্ট চেষ্টা করিয়াছিলেন, কিন্তু মাহিষ্য জাতির অসাড় দেহে শক্তি সঞ্চারিত করিতে না পারিয়া দুঃখে ক্ষোভে এবং অভিমানে তাঁহারা নীরব হইয়া রহিলেন। তারপর সেন্সাসের সময় যে সকল ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র পল্লী সমিতি সংগঠিত হইয়াছিল সে গুলিও ক্রমশঃ অস্তিত্ববিহীন হইয়া পড়িতেছে। এই ত গেল আমাদের অবস্থা। তারপর ভগবানও যেন আমাদের প্রতি বিরূপ, নচেৎ যে সকল মাহিষ্য ভ্রাতা জাতীয় উন্নতি সাধনের নিমিত্ত বদ্ধপরিকর হইয়া আমাদিগকে বিশেষ সহয়তা করিতেছিলেন, ভগবান এত শীঘ্র কেন তাঁহাদিগকে বিচ্ছিন্ন করিয়া লইলেন! দেভোগ নিবাসী পণ্ডিতপ্রবর ভগবতী চরণ প্রধান, বারুইপুরের উকিল বাবু উমাচরণ দাস, মাহিষ্যগগনের উদীয়মান রবি বাবু বিজয় কুমার রায় প্রভৃতি মহাত্মাগণ অসময়ে আমাদিগকে অকুল শোকস্যাগরে ভাসাইয়া চলিয়া গেলেন। ভাই মাহিষ্যগণ আমরা অভিশপ্ত জাতি, কাজেই আমাদের উন্নতি এখনও বহুদূরে অবস্থিত, এখনও আমাদিগকে অনেক শোক তাপ অনেক বাধাবিঘ্ন সহ্য করিতে হইবে। কিন্তু তাই বলিয়া আমাদিগকে হতাশ হইলে চলিবে না। এই সকল মহাপুরুষগণের পদাঙ্ক অনুসরণ করিয়া আমাদিগকে কর্ত্তব্য পথে অগ্রসর হইতে হইবে। সম্মুখে বিশাল কর্ম্মক্ষেত্র এবং আমরাই উহার কর্ম্মী, সুতরাং আর ঘুমাইলে চলিবে না, অতএব আসুন আমরা মোহনিদ্রা পরিত্যাগ করিয়া স্ব স্ব কর্ত্তব্য সম্পাদনে তৎপর হই :—

বর্ত্তমান বৎসরে আমাদিগকে একটী গুরুতর অথচ অতি প্রয়োজনীয় কার্য্য সম্পাদন করিতে হইবে ;—বিগত সেন্সাসে দয়াময় গবর্ণমেণ্ট আমাদিগকে মাহিষ্য বলিয়া গণনা করিয়া লইলেও কোন কোন জেলার ধীবর কৈবর্ত্তগণ উক্ত নামে পরিচয় দেওয়ায় প্রকৃত মাহিষ্য জাতির সংখ্যা নির্ণয় সম্বন্ধে কথঞ্চিৎ গোলযোগ ঘটিবার সম্ভাবনা। এই গোলযোগের প্রতীকার করিতে হইলে আমাদিগের নিজেদের দ্বারাই মাহিষ্য জাতির একটী সেন্সাস্ অর্থাৎ গণনা কার্য্য পরিচালিত হওয়া কর্ত্তব্য ; যদি প্রত্যেক জেলার প্রত্যেক মহকুমার অধীন প্রত্যেক থানার অন্তর্গত গ্রাম সমূহের মাহিষ্য দলপতিগণ

কার্য্যের জন্য একটু স্বার্থ ত্যাগ করেন, তাহা হইলে আমার বিশ্বাস উক্ত কার্য্য অবাধে সংসাধিত হইতে পারিবে। আশা করি, মাহিষ্য সমাজের পাঠকগণ এতদ্বিষয়ে সত্বরেই তাঁহাদিগের মতামত লিখিয়া পাঠাইবেন।

২। দ্বিতীয় কথা এই যে, আমরা পূর্ব্বাপর বলিয়া আসিতেছি যে মাহিষ্য সমাজের আবালবৃদ্ধবনিতা সকলেই যেন একমাত্র মাহিষ্য নামে পরিচয় দেন, কিন্তু আমি স্বচক্ষে দেখিয়া এবং শুনিয়া আসিয়াছি যে কোন কোন স্থানের মাহিষ্যগণ অদ্যাবধি উক্ত নাম ব্যবহার করিতে সঙ্কোচ বোধ করিয়া থাকেন, ইহা অপেক্ষা ঘৃণা লজ্জা এবং দুঃখের বিষয় আর কি হইতে পারে?

৩। তারপর মাহিষ্য সমাজের মধ্যে যাহাতে শিক্ষাবিস্তার হয়, তজ্জন্য প্রতি গ্রামে গ্রামে স্কুল, পাঠশালা, বালিকা-বিদ্যালয় নৈশ-বিদ্যালয় প্রভৃতি স্থাপন করিবার জন্য প্রস্তাব করা হইয়াছিল, কিন্তু সামান্য দুই এক জন ব্যতীত আর কেহই তৎপ্রতি লক্ষ্য করিলেন না, যে জাতি এরূপ অসাড় এবং কর্ত্তব্যজ্ঞানহীন সে জাতির উন্নতি যে সুদূরপরাহত তাহাতে আর বিন্দু মাত্র সন্দেহ নাই।

৪। মাহিষ্য সমাজের মধ্যে কৃষি-বাণিজ্য এবং শিল্পের উন্নতি সাধন জন্য মাহিষ্য ব্যাঙ্কিং এণ্ড ট্রেডিং কোম্পানি নামে একটী কোম্পানি গঠন করা হইয়াছে এবং ইহার কার্য্যও যে আরম্ভ হইয়াছে, তাহা বোধ হয়, প্রত্যেক মাহিষ্যভ্রাতাই অবগত আছেন, কিন্তু আমাদের সমাজ এমনি উদাসীন যে গত কয়েকবৎসর মধ্যে পঁচিশ হাজার টাকার অংশ বিলি হইল না, একলক্ষ টাকা ত দূরের কথা—অথচ আমাদেব সমাজে এগার হাজর জমিদার, এবং কত শত তালুকদার, লাটদার, উকিল, মোক্তার, ডাক্তার প্রভৃতি আছেন বলিয়া আমরা গর্ব্ব করিয়া থাকি। ধিক্ আমাদের গর্ব্বে, ধিক্ আমদের অহঙ্কারে! আমাদের জমিদার মহাশয়গণ নাচ গান প্রভৃতি আমোদ প্রমোদে শত শত টাকা নিমেষ মধ্যে উড়াইয়া দিতেছেন, কিন্তু প্রকৃত সৎকার্য্যের জন্য একটী পয়সা ব্যয় করিতে হইলে কত যে ভ্রূভঙ্গ ভ্রূকুটী করিয়া থাকেন তাহা বোধ হয় অনেকেই অবগত আছেন, হা ভগবান! কবে যে জ্ঞানচক্ষুর উন্মীলন হইবে আমরা তাহারই প্রতীক্ষা করিতেছি।

৫। বঙ্গীয় মাহিষ্য সমিতির জন্য প্রত্যেক গ্রাম হইতে অন্ততঃ একজন করিয়া যাহাতে সভ্য নিযুক্ত হয়েন তজ্জন্য আমরা পুনঃ পুনঃ অনুরোধ করিয়া আসিতেছি, কিন্তু এ পর্য্যন্ত দুই শতের অধিক সভ্য নিযুক্ত হইলেন না। বাৎসরিক একটা টাকার জন্য পশ্চাদ্‌পদ হইলে সমাজ কখনই উন্নতি লাভ করিতে পারে না।

৬। বঙ্গীয় মাহিষ্য সমিতির উদ্দেশ্য প্রচারের নিমিত্ত 'মাহিষ্য-সমাজ' নামক

যে মাসিক পত্রখানি প্রকাশিত হইতেছে তাহা প্রত্যেক মাহিষ্যভ্রাতারই পাঠ করা অবশ্য কর্ত্তব্য, কিন্তু দুঃখের বিষয়, এ পর্য্যন্ত উহার এক হাজারের অধিক গ্রাহক হইল না। মাহিষ্য-সমাজের পাঠকগণ যদি অন্ততঃ ৫ জন করিয়া গ্রাহক সংগ্রহ করিয়া দেন তাহা হইলে সমাজের প্রভূত মঙ্গল সাধন করা হয়।

উপসংহারে নিবেদন, মুর্শিদাবাদ জেলার অধীন প্রত্যেক পল্লীতে যেরূপ গ্রাম্যসমিতি সংগঠিত হইবার চেষ্টা হইতেছে সেইরূপ প্রত্যেক জেলায় প্রত্যেক থানার অধীন গ্রামসমূহে এক একটী পল্লী সমিতি সংগঠিত হওয়া বিশেষ প্রয়োজন, প্রত্যেক পল্লী সমিতির অন্তর্গত এক একটী করিয়া পাঠাগার থাকা আবশ্যক, মাহিষ্য জাতি সম্বন্ধে যেখানে যে সকল সংবাদ পত্র এবং পুস্তক পুস্তিকাদি প্রকাশিত হইবে তাহা এই পল্লী সমিতির ব্যয়ে গ্রাম্য পাঠাগারের জন্য সংগ্রহ করিতে হইবে; পাঠাগারের ব্যয় নির্ব্বাহের জন্য বিবাহ, অন্নপ্রাশন, চূড়াকরণ প্রভৃতি কাজকর্ম্মে এক একটী বৃত্তি স্থাপন করিতে হইবে; সুতরাং এরূপ করিলে একাকী কাহাকেও ক্ষতিগ্রস্ত হইতে হইবে না, অথচ জাতীয় কার্য্য সকল অবাধে সুশৃঙ্খলভাবে চলিতে থাকিবে, আশা করি আমাদিগের এই প্রার্থনা মাহিষ্য-সমাজপতিগণের নিকটে উপেক্ষিত হইবে না, যে যে স্থানে সভাসমিতি সংগঠিত হইবে জানাইলে উহা যথাসময় মাহিষ্য-সমাজ পত্রিকায় প্রকাশিত করা হইবে। আর আর প্রয়োজনীয় বিষয় বারান্তরে জানাইবার বাসনা রহিল।

শ্রীরামপদ বিশ্বাস—সহ-সম্পাদক,
মাহিষ্য ব্যাঙ্কিং এণ্ড ট্রেডিং কোং লিমিটেড।

কৃষিবার্ত্তা।

(লেখক—শ্রীআশুতোষ দেশমুখ)

সরিষাদি তৈলশস্যের সরকারী শেষ আনুমানিক ফর্দ্দ আমাদের হস্তগত হইয়াছে। ইহাতে দেখা গেল, এ বৎসর সর্ব্বশুদ্ধ ১৫৭১০০০ একার জমিতে তিল ব্যতীত অন্য তৈলশস্যের আবাদ হইয়াছে; গত বৎসর হইয়াছিল ১৫৭৪৯০০ একার। ঢাকা রাজসাহী ও প্রেসিডেন্সী প্রধানতঃ এই তিনটী বিভাগেই তৈল, শস্যের চাষ হইয়া থাকে। বিভাগের রাজকর্ম্মচারিগণের যেরূপ রিপোর্ট তাহাতে সাড়ে চৌদ্দ আনা রকমের ফসল আশা করা যাইতে পারে। গত বৎসর সাড়ে তের আনা পাওয়া গিয়াছিল।

আমাদের দেশের মধ্যে মালদহ মুর্শিদাবাদ নদীয়া ও পাবনা জেলাতেই প্রধানতঃ গমের চাষ হইয়া থাকে। সুবৃষ্টির অভাব না হওয়ায় শস্তের অবস্থা গত বৎসর অপেক্ষা ভাল বটে, কিন্তু গড়ে যেরূপ ফল পাওয়া গিয়াছে তাহা অপেক্ষা অনেক কম পাওয়া যাইবে বলিয়া বোধ হইতেছে। এ বৎসর ১৪৬০০০ একার জমিতে গম চাষ হইয়াছে গত বৎসর ১৪৩০০০ একার ছিল।

১৯১০ সালে সাবোর কৃষি কলেজে ২৪ জন ছাত্র প্রবিষ্ট হয়। তাহাদের মধ্যে দুই জন কৃষিকার্য্যে সরকারী চাকরীর কোন আশা না দেখায় কলেজ ছাড়িয়াছেন!

গত বৎসর বিহার গবর্ণমেণ্ট আদর্শ কৃষিক্ষেত্র সমূহের খরচ বাদে কৃষিতত্ত্বের আবিষ্কার কল্পে ৩০৮৮৩৸/০ টাকা খরচ করিয়াছেন।

বিবিধ প্রসঙ্গ।

ব্রাহ্মণ্য-রক্ষায় ব্রহ্মচর্য্য-আশ্রম।—আর্য্যজাতির সনাতন ধর্ম্ম-রক্ষা ব্রাহ্মণের হাতে—এখন সেই ব্রাহ্মণগণকে রক্ষা করিতে না পারিলে, তাঁহাদের ব্রাহ্মণ্য রক্ষা করিতে না পারিলে, তাঁহারা উপযুক্তরূপে শিক্ষিত না হইলে সনাতন ধর্ম্ম রক্ষা হইতে পারে না। সুতরাং আমাদের প্রত্যেক সমাজহিতৈষী ব্যক্তির এদিকে লক্ষ্য রাখা প্রয়োজন। কয়েক বৎসর হইল, কলিকাতা ইটালী নিবাসী শ্রীযুক্ত নরেন্দ্রনাথ দাস মহাশয়ের যত্নে কলিকাতায় "ব্রহ্মচর্য্য-আশ্রম" স্থাপিত হইয়াছে এখানে ব্রাহ্মণ সন্তানগণ শিক্ষার্থী হইয়া অবস্থান করিতে পারেন। সাধারণের চাঁদা ও দানে ইহার ব্যয় সঙ্কুলান হয়। ব্রাহ্মণ সন্তান অনেকেই এখানে থাকিয়া আহার ও বাসস্থান পাইয়া সংস্কৃত ও ইংরাজী শিক্ষিত হইতেছেন। কয়েক জন ছাত্র সংস্কৃত ব্যাকরণ ও কাব্যের আদ্য পাশ করিয়াছেন। এ বৎসর এই আশ্রমের যশোহর পুরন্দরপুর নিবাসী শ্রীমান্ কান্তিভূষণ ভট্টাচার্য্য সংস্কৃত কলেজিয়েট্ স্কুল হইতে ম্যাট্রিকুলেশন পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়াছেন। গত বৎসর মেদিনীপুর জেলা নিবাসী শ্রীমান্ সূর্য্যকুমার চক্রবর্ত্তী সংস্কৃত-কলেজ হইতে কাব্যের মধ্য পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়াছিলেন এবং এখন তথায় ম্যাট্রিকুলেশন দ্বিতীয় শ্রেণীতে অধ্যয়ন করিতেছেন। পুস্তক ক্রয় করিবার অর্থ সংগ্রহ করিতে পারেন নাই বলিয়া কাব্যের উপাধি পরীক্ষার জন্য প্রস্তুত হইতে পারেন নাই।

সুখের বিষয়, কলিকাতা ইটালী নিবাসী স্বধর্মনিষ্ঠ দীনপ্রতিপালক জমিদার শ্রীযুক্ত বাবু যদুনাথ সরকার মহাশয় বিগত ১১ই জুন তারিখে এই ব্রাহ্মণ সন্তানের জন্য প্রায় ৩৩৲ টাকা মূল্যের কাব্যের উপাধি পরীক্ষার উপযোগী পুস্তকগুলি খরিদ করিয়া দিয়া মহানুভবতার পরিচয় প্রদান করিয়াছেন। যদুবাবু যে মহদ্দৃষ্টান্ত দেখাইয়া সমগ্র হিন্দুসমাজের ধন্যবাদের পাত্র হইয়াছেন, আশা করি, আমাদের অন্যান্য সাহিত্য ধনকুবেরগণ এইরূপ আদর্শ বদান্যতা প্রদর্শনে ত্রুটী করিবেন না। ব্রহ্মচর্য্য-আশ্রমের জন্য সকলেরই প্রাণপণ যত্ন করা উচিত।

ধন্যবাদ প্রদান। সাহিত্য-সমাজের জন্য যাঁহারা একটুকুও পরিশ্রম করেন তাঁহারা আমাদের ধন্যবাদের পাত্র।—জেলা হুগলী কুলবাতপুর নিবাসী শ্রীযুক্ত বসন্তকুমার ভৌমিক, জেলা যশোহর চিংড়া নিবাসী ডাক্তার শ্রীযুক্ত দ্বিজবর সর্দ্দার, জেলা নদীয়া মেদিনীপুর নিবাসী শ্রীযুক্ত শ্রীহরি বিশ্বাস, জেলা দিনাজপুর, খাঁপুর নিবাসী শ্রীযুক্ত সাধুচরণ সরকার, জেলা হুগলী ঝিকরা নিবাসী শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ মল্লিক এবং জেলা পাবনা মউবেড়িয়া নিবাসী পণ্ডিত শ্রীযুক্ত দুর্গানাথ দেওরার তত্ত্ববিনোদ মহাশয়গণের নাম উল্লেখ না করিয়া থাকিতে পারিতেছি না। ইহাঁদের নিঃস্বার্থ যত্নে সাহিত্য-সমাজ বিশেষ উপকৃত॥ মেদিনীপুর জেলার সমাজসেবক শ্রীযুক্ত যোগেন্দ্রনাথ পট্টনায়ক, শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্র মাইতি, খালিসাভাঙ্গা নিবাসী শ্রীযুক্ত প্রতাপচন্দ্র শাসমল, সুবদীনিবাসী শ্রীযুক্ত ইন্দ্রনারায়ণ জানা প্রমুখ আরও অনেক মহাত্মা আছেন। গোপেন্দ্র-নিকেতনের শ্রীযুক্ত মহেন্দ্রনাথ মহান্তি মহাশয়ের নবীন উদ্যমে আমাদের হৃদয়ে একটু নূতন আশা আসিয়াছে। এইরূপে যাঁহারা স্বতঃ পরতঃ সমাজের জন্য কার্য্য বা চিন্তা করিতেছেন তাঁহাদের সকলের নিকটে সমক্ষে পরোক্ষে আমরা বঙ্গীয় সাহিত্য-সমিতির পক্ষ হইতে আন্তরিক কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করিতেছি।

উপাধি লাভ। হাওড়া জেলার শ্যামপুর থানার অন্তর্গত কুলটিকরী গ্রামনিবাসী শ্রীযুক্ত রামব্রহ্ম প্রামাণিক মহোদয় আর্য্য-সাহিত্য-সমাজে পরীক্ষা প্রদান করিয়া বাঙ্গালা রচনায়—বিদ্যাবিনোদ, গীতায়—ভক্তিরত্ন ও শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্র প্রামাণিক মহোদয় উক্ত আর্য্য-সাহিত্য-সমাজে পরীক্ষা প্রদান করিয়া কাব্যে—কাব্যরত্নাকর উপাধি প্রাপ্ত হইয়াছেন।

ডেয়ারী ইউনিয়নে সভ্য।—বিগত ১৬ই মে তারিখের বিলাতী

শিক্ষক ও ছাত্রগণের "ডেয়ারী ষ্টুডেণ্টস্ ইউনিয়ন" নামক সভার সভ্যপদে আমাদের প্রিয়সুহৃৎ হাইকোর্টের উকীল শ্রীযুক্ত প্রকাশচন্দ্র সরকার মহাশয় নির্ব্বাচিত হইয়াছেন। এই নির্ব্বাচনে আমরা সুখী হইয়াছি।

জাতীয় ইতিহাস চর্চ্চা।—আভিজাত্যের গৌরব সকল দেশে সকল সময়ে সকল জাতির মধ্যেই উন্নতির উদ্বোধক। আমরা মাহিষ্য জাতি আমাদের পূর্ব্ব পুরুষগণ জগতে বরেণ্য ও গৌরবান্বিত ছিল, কিন্তু তাহার ধারাবাহিক ইতিহাস লিখিত হয় নাই; তমলুকের পবিত্র তীর্থ, বর্গভীমার মন্দির ও বিস্ময় জনক রাজদুর্গের ভগ্নাবশেষ মাত্র অতীত মাহিষ্য গৌরবের স্মৃতি জাগরূক রাখিয়াছে। বাঙ্গলাদেশের তাম্রলিপ্ত রাজ্য বা তমলুক নগরী যে বহুপ্রাচীন জনপদের রাজধানী ও প্রাচীন প্রাচ্য জগতের আধুনিক লণ্ডন বা প্যারিসের গৌরবস্পর্দ্ধিনী ছিল তাহার আর সন্দেহ নাই এবং সেই গৌরবের মাল্য আমাদেরই মাহিষ্য জাতীয় স্বাধীন সম্রাট্ বংশের কণ্ঠদেশ সুশোভিত করিত তাহা এখন আমরা কয়জনে অবগত আছি? কয়জনে তাহা চিন্তা করিবার অবসর অনুসন্ধান করি? সেই গৌরবময়ী কাহিনী লইয়াই **তমলুকের ইতিহাস** লিখিত হইয়াছে। কিরূপে মাহিষ্য জাতি ভারত সাগরীয় দ্বীপপুঞ্জ পর্য্যন্ত বিস্তৃত হইয়া স্বাধীন রাজ্য স্থাপনে সমর্থ হইয়াছিলেন তাহা এই পুস্তক পাঠে অবগত হইতে পারা যায়। ইহা পাঠে আভিজাত্য বহ্নিতে প্রত্যেক বাঙ্গালীর হৃদয় জ্বলিয়া উঠে ও উন্নতির লাভে একাগ্র হয়। মাহিষ্য-সমাজের প্রত্যেকের নিকট নিশ্চয়ই এই গ্রন্থের আদর হইবে। জাতীয় গৌরব অক্ষুণ্ণ রাখিতে হইলে প্রত্যেক মাহিষ্যের ইহার এক এক কপি ক্রয় করিয়া গৃহপঞ্জিকার ন্যায় রক্ষা করা অবশ্য উচিত।

শুভ-বিবাহ।—বিগত ১৪ই আষাঢ় শনিবার নদীয়া জেলার শ্যামনগর নিবাসী শ্রীযুক্ত বাবু নবীনকৃষ্ণ রায় ইঞ্জিনিয়ার মহাশয়ের প্রথমা কন্যার সহিত মেদিনীপুর জেলার বিরুলিয়া নিবাসী আমাদের প্রিয় সুহৃৎ শ্রীযুক্ত আশুতোষ জানা মহাশয়ের ভ্রাতা শ্রীমান্ শরৎ চন্দ্র জানা এম্,এস,সি,র শুভ পরিণয় সম্পন্ন হইয়া গিয়াছে। নদীয়া সমাজের সহিত মেদিনীপুর সমাজের এই প্রথম পরিণয় সম্মিলন হইল। নবীন বাবু ও আশুবাবুকে এইজন্য আমরা ধন্যবাদ প্রদান করিতেছি। এই দৃষ্টান্ত সকলেই অনুসরণ করিবেন আশা করি।

মাহিষ্য-সমাজ।

[তৃতীয় ভাগ, চতুর্থ সংখ্যা—শ্রাবণ, ১৩২০ সাল।]

রামপাল-চরিত কাব্য এবং পালরাজ-বংশ।

[১৯১৩ জানুয়ারী সংখ্যা ঢাকা-রিভিউ হইতে উদ্ধৃত]

রামচরিত কাব্য উদ্ধার করিয়া পূজনীয় মহামহোপাধ্যায় হরপ্রসাদ শাস্ত্রী মহাশয় বাঙ্গালী মাত্রকেই চিরকৃতজ্ঞতাপাশে আবদ্ধ করিয়াছেন। অনেক গুলি শিলালিপি এবং তাম্রশাসন আবিষ্কৃত হইয়া থাকিলেও সমসাময়িক কোনও গ্রন্থের অভাবে অনেকেই পালরাজগণের বিবরণ সম্বন্ধে সন্দিহান ছিলেন। পাল নরপতিগণের শাসনকাল-ঘটিত বহু ঐতিহাসিক কথাই এ যাবৎ অজ্ঞাত রহিয়াছে এবং হয় ত থাকিবে, তথাপি রামচরিত-কাব্য দ্বারা অনেক বিষয়ে তথ্যানুসন্ধানে যে সহায়তা পাওয়া গিয়াছে তাহাতে আর সন্দেহ নাই।

আমাদের বিশ্বাস, এই গ্রন্থ দ্বারা অনেকটা দিক যেন প্রভাতালোকে আলোকিত হইয়া পড়িয়াছে। কাজেই রামচরিত কাব্য ক্রমেই ঐতিহাসিক-গণের বিশেষ আলোচনার বিষয় হইয়া উঠিতেছে। শ্রীযুক্ত শাস্ত্রী মহাশয় যে ভাবে গ্রন্থ খানা মুদ্রিত করিয়াছেন, এবং উহার যে উপাদেয় ভূমিকা লিখিয়াছেন তাহা অতীব প্রশংসার্হ। গ্রন্থের ভাষা বড়ই দুর্ব্বোধ হওয়াতে সমুদয় বিষয় বুঝিয়া উঠা অত্যন্ত কষ্টকর। আমরা মূলকাব্য সম্বন্ধে আলোচনা করিবার পূর্ব্বে গ্রন্থকারের পরিচয় উপলক্ষে দুই চারিটী প্রয়োজনীয় ঐতিহাসিক কথা বলিয়া লইব।

কবির নাম সন্ধ্যাকর নন্দী। শাস্ত্রী মহাশয় নির্দ্দেশ করিয়াছেন ইনি বারেন্দ্রশ্রেণী ব্রাহ্মণ ছিলেন। "The author of the Ramcharit, a Brahman of Varendra Distribution." আমরা শাস্ত্রী মহাশয়ের সহিত এক মত হইতে পারি নাই। রামচরিত কাব্যের শেষ ভাগে 'কবি-প্রশস্তি' নাম দিয়া কতিপয় শ্লোকে কবি স্বয়ং আপনার পরিচয় প্রদান করিয়াছেন।

কবির পিতামহের নাম পিনাক নন্দী এবং পিতার নাম প্রজাপতি নন্দী। এই প্রজাপতি নন্দী স্বয়ং রামপালের সান্ধিবিগ্রহিক ছিলেন। কবি কয়েকটী ছত্রে পিতার গুণগ্রাম বর্ণনা করিয়া নিজের বিদ্যাবত্তার পরিচয় দানার্থ কতকগুলি শ্লোক রচনা করিয়াছেন। ঐ সকল শ্লোকে তিনি রামচরিতকে "কলির রামায়ণ এবং নিজেকে কলিকালের বাল্মীকি" বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন, কিন্তু কোথায়ও নিজ গোত্র বা জাতি অথবা বংশ-পরিচয় বলিয়া যান নাই। পূজনীয় শাস্ত্রী মহাশয় বলেন নন্দী উপাধি "নন্দনা" গ্রাম হইতে হইয়াছে। আমরা জানি বারেন্দ্রকুলবিবরণ মতে নন্দনাবাসী নামে প্রসিদ্ধ একটী বারেন্দ্র ব্রাহ্মণ পরিবার আছেন। এই বংশেই ভারত-বিখ্যাত মনু-টীকাকার কুল্লুকভট্ট জন্মগ্রহণ করেন এবং রাজা শশিশেখরেশ্বর এই প্রসিদ্ধ পরিবারের নেতা। কিন্তু নন্দনাবাসী শ্রেষ্ঠ বারেন্দ্র শ্রোত্রিয়ের বংশে কুল্লুকভট্টের পিতা দিবাকর ভট্ট হইতে অদ্য পর্য্যন্ত কাহারও নন্দী উপাধি দেখা যায় না। নন্দনা গ্রামের গ্রামীণগণ নন্দী না হইয়া নন্দনী হওয়াই স্বাভাবিক। সন্ধ্যাকর দুই তিন স্থলে 'নন্দিরত্ন-সন্তানে' 'নন্দিকুল-কুমুদ' এইরূপ লিখিয়াছেন অথচ নন্দনার নাম গন্ধও নাই। যথাঃ—

কবি-প্রশস্তি

বসুধা শিরোবরেন্দ্রীমণ্ডল চূড়ামণিঃ কুলস্থানং।
শ্রীপৌণ্ড বর্দ্ধনপুরপ্রতিবদ্ধঃ পুণ্যভূঃ বৃহদ্বটুঃ॥ ১ ॥
তত্র বিদিতে বিদ্যোতিনি নন্দিরত্নসন্তানে।
সমজনি পিনাকনন্দী নন্দীব নিধির্গুণৌঘস্য ॥ ২ ॥
নন্দিকুলকুমুদ কানন পূর্ণেন্দুনন্দনোঽভবত্তস্য।
শ্রীসন্ধ্যাকর নন্দী পি(প্র)শুনাস্কন্দী সদানান্দী ॥ ৪ ॥

পূজনীয় শাস্ত্রী মহাশয় রামচরিতের উপক্রমণিকায় যে সকল ব্রাহ্মণকে বারেন্দ্র বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন তাহাদের অনেকেই বহু পূর্ব্ববর্ত্তী; এমন কি অষ্টম শতাব্দীর ধর্ম্মপালের পর্য্যন্ত মন্ত্রী ছিলেন। ইহাতে বুঝা যায় বারেন্দ্র ব্রাহ্মণ গণ সপ্তম শতাব্দী হইতেই যেন বরেন্দ্র ভূমিতে বসতি করিতেছিলেন। তাহা হইলে রাজা আদিশূরকে আরও পূর্ব্ববর্ত্তী বলিতে হইবে সন্দেহ নাই।

বস্তুতঃ সন্ধ্যাকর নন্দী নিজেও পালরাজগণের ন্যায় বৌদ্ধ ছিলেন। আমরা তদীয় গ্রন্থেই ইহার প্রমাণ দেখিতে পাই। তিনি রামচরিত কাব্যের প্রথমেই কোন দেবতাকে প্রণাম না করিয়া 'শ্রীঘনায় নমঃ সদা' বলিয়া

বুদ্ধকে নমস্কার করতঃ মঙ্গলাচরণ করিয়াছেন। আবার গ্রন্থের টীকার প্রারম্ভেও "শ্রীঘনায় নমঃ" বলিয়াছেন।

অমরকোষে বুদ্ধের পর্য্যায়ে "শ্রীঘন" নাম লিখিত হইয়াছে। "মুনীন্দ্রঃ শ্রীঘনঃ শাস্তা" ইতি। অমরসিংহ নিজে বৌদ্ধ ছিলেন। তিনি স্বীয় গ্রন্থারম্ভে কোন দেবতাকেই নমস্কার না করিয়া "যস্য জ্ঞান দয়াসিন্ধোঃ" বলিয়া ভগবান আদি-বুদ্ধকে বন্দনা করিয়াছেন; এবং আদি বুদ্ধের ১৮ আঠারটি পর্য্যায় লিখিয়া তারপর গৌণ বুদ্ধ শাক্যসিংহের নাম ও তাহার ৭টী পর্য্যায় উল্লেখ করতঃ মঙ্গলাচরণ করিয়াছেন। তারপর তিনি একে একে হিন্দু দেবদেবী-গণের নাম লিখিয়াছেন। আদিবুদ্ধই শ্রীঘন। *

হেমচন্দ্রের কোষেও সেইরূপ। হেমচন্দ্র স্বয়ং জৈন ধর্ম্মাবলম্বী ছিলেন; তজ্জন্য তিনি সর্ব্ব প্রথমেই লিখিয়াছেন "দেবাদিদেব-কাণ্ড" অর্থাৎ বড় দেবতাদের অধ্যায়। এই অধ্যায়ে জৈন ও বৌদ্ধ দেবতার নাম লিখিত। তাহার পর 'দেবকাণ্ড' অর্থাৎ ছোট দেবতার অধ্যায়। এই অধ্যায়ে হিন্দুর দেবতা ব্রহ্মা, বিষ্ণু প্রভৃতির বিবরণ।

এরূপ স্থলে আমাদের বৌদ্ধ কবি সন্ধ্যাকরও প্রথমতঃ বুদ্ধকে নমস্কার করিয়া কাব্য আরম্ভ করিবেন ইহা স্বাভাবিক। কাব্যের প্রথম শ্লোকে হিন্দু দেবতা হরিহরকে বন্দনা করা হইয়াছে। এ নমস্কারের কারণ এই যে কাব্যের উপাখ্যানটী এক পক্ষে রামায়ণের কথা; এই রামায়ণের কথা বর্ণন করিতে যাইয়া হিন্দুর দেবতা হরিহরকে বন্দনা করাটা সুবিধা ভিন্ন অসুবিধার কথা নহে। ভবভূতি প্রভৃতি গোঁড়া হিন্দু ব্রাহ্মণ কবিগণ এই ভাবে বন্দনা করেন না।

কবি সন্ধ্যাকর ব্রাহ্মণ-ধর্ম্মোক্ত দেবতা ত বন্দনা করেনই নাই, নিজকে ব্রাহ্মণ-ধর্ম্ম মতাবলম্বী বলিয়াও বলেন নাই; এমন কি পিতা পিতামহ ও নিজের নাম বর্ণনা করিয়া, (এবং নিজেরা ভূতপূর্ব্ব ব্রাহ্মণ হইলেও) ব্রাহ্মণ বলিয়া পরিচয় দেন নাই!! আমরা গোঁড়া ব্রাহ্মণ ভবভূতির পরিচয়ের নমুনা দিতেছিঃ—

---

* "সর্ব্বজ্ঞঃ সুগতো বুদ্ধো ধর্ম্মরাজ স্তথাগতঃ।
সমন্তভদ্রো ভগবান্মার জিল্লোক জিজ্জিনঃ ॥১৩॥
ষড়ভিজ্ঞো দশবলোঽদ্বয়বাদী বিনায়কঃ।
মুনীন্দ্রঃ শ্রীঘনঃ শাস্তা মুনিঃ—শাক্যসিংহস্তু যঃ ॥ ১৪ ॥
স শাক্যসিংহঃ সর্ব্বার্থসিদ্ধঃ শৌদ্ধোদনিশ্চ সঃ।
গৌতমশ্চার্কবন্ধুশ্চ মায়াদেবী সুতশ্চ সঃ ॥ ১৫ ॥"

"দাক্ষিণাত্যে পংক্তিপাবন, ধৃতব্রত, যাজ্ঞিক, সোমপায়ী, ব্রহ্মবাদী একটী ব্রাহ্মণ বংশ আছে। সেই বংশে ভট্ট গোপালের পৌত্র, পবিত্রকীর্ত্তি নীলকণ্ঠ ও জাতুকর্ণীর পুত্র ভবভূতি নামক কবি আছেন।"

মালতীমাধব নাটকের নান্দীতে বন্দনাচ্ছলে প্রথমেই শিবের সমস্ত পরিবার বর্ণিত। মালতীমাধবে শিব, গণেশ, কার্ত্তিকেয়ের ময়ূর প্রভৃতি সবই বর্ণনাচ্ছলে নমস্কৃত।

বৌদ্ধ নন্দী কবি ইত্যাকার ব্রাহ্মণত্বের কিছু মাত্র পরিচয় দেন নাই। যদি নন্দনাবাসী ব্রাহ্মণগণই নন্দী বংশীয় হইয়া থাকেন, তবে বলিতে হয় বারেন্দ্রগণ পূর্ব্বে বৌদ্ধ ছিলেন। হিন্দু ধর্ম্মের বিস্তারের জন্য যাঁহাদের পূর্ব্ব-পুরুষ গৌড়ে আনীত হইয়াছিলেন বলিয়া প্রবাদ, তাঁহারা বৌদ্ধ হইলেন কখন, আবার তাঁহাদিগকে হিন্দুই বা করিলেন কে? রাম-চরিতে দেখা যায়, রাম পালের রাজধানীতে "অনূচান" সাঙ্গ বেদে বিচক্ষণ ব্রাহ্মণ ছিলেন। রাজা ভীমই তাহাদের রক্ষক ছিলেন, তাঁহারাই বা কে?

যাহা হউক আমরা এখন মূলকাব্য অবলম্বনে পালবংশের ইতিহাস সম্বন্ধে আলোচনা করিব।

রাম-চরিত কাব্যের প্রকৃত বর্ণনীয় বিষয় রামপাল চরিত। তবে কবি সন্ধ্যাকর নন্দী শব্দ শাস্ত্রে পাণ্ডিত্য দেখাইবার জন্য শ্লেষ মূলে রঘুবংশীয় রাম-চরিতও অন্য পক্ষে বর্ণনা করিয়াছেন। রামপত্নী সীতাকে রাবণ হরণ করেন, তৎপর রাম বানর ভল্লুকাদি সহায় করিয়া রাবণের সহিত যুদ্ধ করিয়া তাহাকে বধ করেন ও উদ্ধার করেন; তারপর অগ্নি-পরীক্ষা, অযোধ্যা-গমন, সীতার-বনবাস, অশ্বমেধ-যজ্ঞ, সীতার পাতাল-প্রবেশ এবং রাম লক্ষ্মণাদির তিরোধান। এই ত হইল কাব্যের রামায়ণ পক্ষের অর্থ। অন্যদিকে রাম-পালের সীতারূপা বরেন্দ্রভূমি মহাপরাক্রম ভীম আত্মসাৎ করেন, রামপাল নানাদেশ ঘুরিয়া আর্য্যাবর্ত্তবাসী বহু সংখ্যক রাজন্য বর্গের সহায়তায় এবং স্বীয় মাতুল বংশীয় রাষ্ট্রকূটপতি শিবরাজের কৌশলে রাজা ভীমকে পরাজিত করিয়া বরেন্দ্রী উদ্ধার করেন। তৎপর অভিষেক, রামাবতী-নির্ম্মাণ, দেশজয়, মৃত্যু, মদনপালের রাজত্ব। ইহাই রামপাল পক্ষের সংক্ষেপার্থ। শিবরাজই এ কাব্যে হনুমান সাজিয়াছেন।

এই শেষের অর্থ ঐতিহাসিক এবং প্রকৃত প্রস্তাবে মূল্যবান্। সুতরাং আমরা এই পক্ষের অর্থ ধরিয়াই কয়েকটি কথা বলিব। এই কাব্যে মোট

চারিটী পরিচ্ছেদে। বোধ হয় ঐতিহাসিক ঘটনা লিপিবদ্ধ করা হেতু সর্গস্থলে 'পরিচ্ছেদ' নামে কাব্যের অংশ বিভক্ত হইয়াছে। এতন্মধ্যে প্রথম পরিচ্ছেদ ও দ্বিতীয় পরিচ্ছেদের ৩৫টী শ্লোকের টীকা আছে। দ্বিতীয় পরিচ্ছেদের বাকী ১৪টী শ্লোকের এবং ৩য় ও ৪র্থ পরিচ্ছেদের কোনও টীকা নাই।

পূর্ব্বেই উক্ত হইয়াছে যে কাব্যের প্রথমেই হরিহর বন্দনা। বন্দনাতে ২টী শ্লোক গিয়াছে। ৩য় শ্লোক হইতেই কাব্যের মূল বিষয় আরম্ভ হইয়াছে। প্রত্যেক শ্লোকেরই দুই অর্থ। তদনুসারে ৩য় শ্লোকেরও দুইটী অর্থ। আমরা দুইটী অর্থেরই বঙ্গানুবাদ দিতেছি ;—

বাঙ্গলা অনুবাদ—

৩য় শ্লোক। (ক) রামপক্ষে—

সেই সূর্য্য আপনাদের ঐশ্বর্য্য বিস্তার করুন, যে সূর্য্য পদ্মসমূহকে বিকসিত করিয়া লক্ষ্মীকে প্রকাশ করেন, এবং চন্দ্র কৃষ্ণপক্ষে ক্রমশঃ আলোক অভাবে ক্ষীণ হইয়া হইয়া অমাবস্যা দিবসে যে সূর্য্যে যাইয়া প্রবেশ করেন।

(খ) রামপাল পক্ষে—

জলের পতি সমুদ্র আপনাদিগের ঐশ্বর্য্য বর্দ্ধিত করুন, যে সমুদ্র হইতে লক্ষ্মী প্রকাশিত হইয়াছিলেন, প্রলয় সময়ে বিষ্ণু সমস্তলোক উদরসাৎ করিয়া যে সমুদ্রে প্রবেশ করিয়া যোগ নিদ্রা অনুভব করেন।

এই শ্লোকে সূর্য্য ও সমুদ্রকে বন্দনা করিবার প্রয়োজন ৪র্থ শ্লোকে প্রকাশিত হইয়াছে।

৪র্থ শ্লোক। (ক) রামপক্ষে—

সেই সূর্য্যকুলে দীপ স্বরূপ ইক্ষ্বাকু নামক রাজা ছিলেন। তিনি মূর্ত্তিমান ধর্ম্ম ছিলেন ; যাঁহার শুভ্রবর্ণ কীর্ত্তি সমুদ্র পার হইয়া গিয়াছিল এবং সমগ্র পৃথিবীতে শোভা পাইয়াছিল।

(খ) রামপাল পক্ষে—

সেই সমুদ্রের কুলে (সমুদ্র-বংশে) ধর্ম্মপাল নামক তেজস্বী রাজা ছিলেন। যেমন তিক্ত অলাবু জলে ভাসে সেইরূপ যাঁহার "শিলানৌকা" নামক সমুদ্র নৌকাগুলি সমুদ্র পার হইয়া শোভা পাইত। যাহার শিকানৌকাগুলি সমুদ্রতীরস্থ প্রাসাদ হইতে যেন অন্তরীক্ষ লঙ্ঘন করিয়া শোভা পাইত, যাঁহার কীর্ত্তিও সমুদ্র উত্তীর্ণ হইয়া যাইত।

শিলানৌকা এক প্রকার নৌকা ছিল। তৎকালে সমুদ্রগামিনী নৌকার

বহু নাম ছিল। যুক্তি-কল্পতরু হইতে নৌকার নিম্নলিখিত নাম উদ্ধৃত হইল,—"ক্ষুদ্রা, মধ্যমা, ভীমা, চপলা, পটলা, ভয়া, দীর্ঘা, পত্রপুতা, গর্ভরা, মন্থরা, জঙ্ঘনী, তরী, গন্ধরা, গামিনী, প্লাবিনী, ধাবিনী, বেগিনী, উর্দ্ধা, গর্ভিণী ইত্যাদি।" শিলানৌকাও এইরূপ এক শ্রেণীর যুদ্ধ-নৌকা। "সমুদ্র প্রাসাদ হইতে"—এই কথায় বুঝা যায়, ধর্ম্মপালের অন্ততঃ একটী রাজধানী সমুদ্রতীরে ছিল। সেই স্থান হইতে তদীয় রণতরী সমূহ দিক্ বিদিকে যাইত। ধর্ম্মপালের আসল রাজধানী কোথায় ছিল তাহা তাম্রশাসন কি শিলালিপি কিছুতেই এখনও পাওয়া যায় নাই।

৫ম শ্লোকে বলা হইয়াছে, "যেমন বিষ্ণু বরাহরূপে সমুদ্র হইতে পৃথ্বী উদ্ধার করিয়াছিলেন, ধর্ম্মপাল সেইরূপ রাজ্য উদ্ধার করিয়াছিলেন।"

বর্ণিত শ্লোক কয়েকটী দ্বারা জানা যায় যে সূর্য্য-বংশে যেমন ইক্ষ্বাকু, সমুদ্রকুল-সম্ভূত পালবংশে তেমনি ধর্ম্মপাল অতি প্রতাপবান্ নরপতি ছিলেন। ইক্ষ্বাকু হইতে যেমন ইক্ষ্বাকু বংশ বলিয়া একটা নাম হইয়াছে, ধর্ম্মপাল হইতেও সেরূপ পালবংশের নামকরণ হইয়াছে ইহাই বোধ হয় কবির বক্তব্য। তাম্রশাসন হইতে জানা যায় যে, পালবংশের আদি পুরুষের নাম দয়িতবিষ্ণু, ইনি একজন ক্ষুদ্র রাজা ছিলেন। তৎপুত্র বাপ্যটও একজন ক্ষুদ্র রাজা ছিলেন, এই বাপ্যটের পুত্র গোপালকেই প্রজাগণ সকলে মিলিয়া গৌড়ের সিংহাসনে প্রতিষ্ঠিত করেন। গোপাল হইতেই প্রকৃত প্রস্তাবে এই বংশ গৌড়ের সম্রাট্ হন। ধর্ম্মপাল এই গোপালেরই পুত্র। অথচ পাঠক দেখিতে পাইতেছেন, সন্ধ্যাকর নন্দী গোপাল বা তাহার পিতৃ পিতামহের কোনও উল্লেখ করিতেছেন না। আর একটি কথা এই যে দয়িতবিষ্ণু কি বাপ্যট ইহারা কেহই পাল নহেন। গোপালকেও পাল বলা যায় না, যেহেতু তাহা হইলে রাজার নাম হয় 'গো' (পাল), এরূপ কোনও নাম এদেশে প্রচলিত নাই। কাজেই বলিতে হয় প্রথম তিন রাজা পাল ছিলেন না। সম্ভবতঃ গৌড়ের সিংহাসনে প্রথম উপবিষ্ট হওয়াতে গোপালের নামটী চির-স্মরণীয় করিবার জন্য তৎপুত্রকে ধর্ম্মপাল আখ্যা দেওয়া হয় এবং তদবধি এই বংশীয়গণ পুরুষানুক্রমে পাল উপাধি ব্যবহার করিয়াছেন। সন্ধ্যাকরও সে জন্য ধর্ম্ম পাল হইতেই বংশ গণনা করিতেছেন।

পূর্ব্বেই উক্ত হইয়াছে যে দয়িতবিষ্ণু ও বাপ্যট ইঁহারা উভয়েই ক্ষুদ্র সামন্ত রাজা ছিলেন। হাণ্টার সাহেব এই সমুদয় ক্ষুদ্র রাজাদিগকে ভুঞা রাজা

বলিয়াছেন ;—"The Bhuiya or Buddhist Rajas (Founders of the Pal dynasty of the kings of Bengal)..."* প্রকৃত প্রস্তাবে যাঁহাদের মধ্যে ভূঞা উপাধি বিশিষ্ট অনেক রাজা ছিলেন এবং যাঁহারা তৎকালে বীর ভাবাপন্ন থাকার ইতিহাস আছে, এরূপ কোনও জাতীয় ভূঞা বংশ হইতে যে দয়িতবিষ্ণু ও বাপ্যট এবং গোপাল জন্ম গ্রহণ করেন তাহাতে আর সন্দেহ নাই। পূজনীয় শাস্ত্রী মহাশয় লিখিয়াছেন,—"এক গ্রন্থে লিখা আছে বাপ্যটের পিতা কোন এক জন রাজার এক জন যোদ্ধ, পুরুষ ছিলেন এবং ইহারা ক্ষত্রিয় বলিয়া পর্য্যন্ত পরিচয় দেয় নাই।" অনেকে বলেন দয়িত-বিষ্ণু রাঢ়-দেশের একজন ক্ষুদ্র সামন্ত রাজা ছিলেন। পালবংশের আদি বিবরণ জানিতে হইলে ঐ সময় রাঢ় দেশের কোন্ কোন্ স্থানে কাহাদের মধ্যে সামন্ত রাজগণ জন্ম গ্রহণ করেন, সে বিষয়ে অনুসন্ধান হওয়া আবশ্যক। এ দিকে ঢাকা জেলায় হরিশ্চন্দ্র প্রভৃতি ৩। ৪টী ভূঞা রাজার রাজত্ব ছিল একথা হাণ্টার সাহেব বলিতেছেন। "Savar was the Capital of the Bhuniya Raja Haris Chandra ; in 1839 the only traces that remained of his residence was a heap of bricks and earth overgrown with jungles" † অর্থাৎ সাভার ভূঞা রাজা হরিশ্চন্দ্রের রাজধানী ছিল।

দ্বিতীয়তঃ পালবংশকে কবি "সমুদ্র-কুল" বলিয়াছেন। শ্রীযুক্ত কৈলাশ চন্দ্র বিদ্যাভূষণ মহাশয় এ বিষয়ে ঢাকা রিভিউতে একটী প্রবন্ধ লিখিয়াছেন। আমরা প্রবন্ধের শেষভাগের এ বিষয়ে আলোচনা করিতেছি। এখন মূল কাব্যের দিকে দৃষ্টি করা যাউক।

পূর্ব্ব কথিত ৫টী শ্লোকের পর কবি কতিপয় শ্লোকে ধর্ম্মপালের উত্তরাধি-কারী দেবপাল, বিগ্রহপাল, রাজ্যপাল প্রভৃতি কয়েকটী রাজার নাম মাত্র উল্লেখ করিয়া এক নিশ্বাসে রামায়ণ বলার ন্যায় নিজ বর্ণয়িতব্য রামপালের সময়ে উপ-স্থিত হইয়াছেন। রামপালের পিতা (৩য়) বিগ্রহপালের মৃত্যুর পর মহীপাল রাজা হইয়া রাজ্যে অত্যাচার করিতে থাকেন। ফলে সমগ্র প্রজা সাধারণ

* Hunter's Statistical Account of Dacca, page 118.

† Vide Statistical Account of Dacca. page 72 এবং প্রতিভায় প্রকাশিত "সাভারের প্রাচীন কীর্ত্তি" প্রবন্ধ ও প্রবাসী পত্রিকায় শ্রীযুক্ত দীনেশ চন্দ্র সেন মহাশয়ের "ঢাকা জেলার কয়েকটী প্রাচীন স্থান" প্রবন্ধ দেখুন।

ও সামন্ত রাজগণ বিদ্রোহী হইয়া উঠেন। এই সময়ে রাজা ভীমের জ্যেষ্ঠতাত রাজা দিব্বোক গৌড় আক্রমণ করিয়া সমগ্র বরেন্দ্রী অধিকার করতঃ গৌড়ের একচ্ছত্র নরপতি হন। (১। ২৯—৩৯)

তার পর রামপাল মাতুলের আশ্রয়ে থাকিয়া নানা দেশ ঘুরিয়া আর্য্যাবর্ত্তের বহু রাজগণের সাহায্য গ্রহণ করতঃ শিবরাজের কৌশলে দিব্বোকের ভ্রাতুষ্পুত্র মহাবল রাজা ভীমকে পরাজিত করিয়া বরেন্দ্রী উদ্ধার করেন এবং রামাবতী নামক মনোহর পুরী নির্ম্মাণ করাইয়া উহাতে আপন রাজধানী সংস্থাপন করেন। রামপালের পর মদনপাল রাজা হন। সন্ধ্যাকর নন্দী নিজে এই মদনপালের সভাসদ্ ছিলেন। ইহাই কাব্যের মোটামুটি কথা।

রামপাল এবং ভীম এই উভয়েই কাব্যের প্রকৃত লক্ষ্য বিষয়। অন্যান্য কথা আনুষঙ্গিক মাত্র।

কবি সন্ধ্যাকর একজন অতীব হৃদয়বান্ পুরুষ ছিলেন। তদীয় কাব্যে রাজা ভীম সম্বন্ধে যে সকল প্রশংসা বর্ণিত হইয়াছে, কোন ইতিহাসে শত্রুর হস্তে শত্রুর এমন প্রশংসা দেখা যায় না। কবির পিতা প্রজাপতি নন্দী রামপালের সান্ধিবিগ্রহিক ছিলেন এবং তিনি নিজেও রামপালের পুত্র মদনপালের সভাসদ্। রাজা ভীম রামপালের রাজ্যহারী ঘোর শত্রু। ভীম সন্ধ্যাকর নন্দীর তিন পুরুষের মনিবের বিষম বৈরী। এরূপ বৈরীর প্রতি কবির যে প্রগাঢ় ভক্তি ও শ্রদ্ধা তাহা পাঠ করিলে অবাক্ হইতে হয়। ইহাতে বুঝা যায় রাজা ভীম কিম্বা তদীয় বন্ধু বীরবর হরি প্রভৃতি যোদ্ধৃগণকে তদানীন্তন মহাত্মাগণ কোন অংশেই পালদিগের হইতে ন্যূন মনে করিতেন না। তবে রামচরিত অনুসারে দেখা যায় উভয় রাজার মধ্যে ধর্ম্মগত পার্থক্য ছিল। পালরাজগণ বৌদ্ধ ছিলেন, তাঁহাদের মধ্যে জাতি বিষয়ে ততটা আগ্রহ বা বাঁধাবাঁধি ছিল না ; কিন্তু রাজা ভীম প্রকৃত হিন্দু ছিলেন। এই মাত্র প্রভেদ।

কবি রামচরিতের ২য় পরিচ্ছেদের ২৬ শ্লোকে লিখিয়াছেন, রাজা ভীম শৈব ছিলেন। যথা,—

স ভবানী সমুপেতো ভুজঙ্গমবিভূষিতঃ স্বয়ং দেবঃ।
দ্বিজরাজ কেতুরাসীন্মুক্তাপুণ্যস্তু যস্যাস্তঃ॥ ২। ২৬।

টীকা। "যস্ত ভীমস্য তাক্তম্ অপুণ্যমধর্ম্মং যেন দ্বিজরাজ কেতুশ্চন্দ্রশেখরঃ গৌরীসহিতঃ সর্পালঙ্কৃতঃ।"

অনুবাদ। সেই রাজা ভীম সর্ব্বপ্রকার অধর্ম্ম হইতে মুক্ত ছিলেন,

এবং তাঁহার হৃদয়ে সর্পরাজ-বিভূষিত চন্দ্রশেখর দেবদেব মহেশ্বর উমার সহিত সর্ব্বদা বিরাজ করিতেন।

পালগণ যে বৌদ্ধ ছিলেন তাহা প্রমাণ করা অনাবশ্যক। অতএব দেখা যাইতেছে, ঐ সময়ে বরেন্দ্র দেশে প্রকৃত প্রস্তাবে হিন্দু ও বৌদ্ধগণের মধ্যে সংঘর্ষ চলিতেছিল। ২য় মহীপালের অত্যাচারে হিন্দুগণ প্রপীড়িত হওয়াতেই রাজা দিব্বোক গৌড় হইতে বৌদ্ধপ্রাধান্য বিদূরিত করতঃ গৌড়দেশে হিন্দুরাজ্য স্থাপন করেন। রামপাল নানাস্থান হইতে বহু রাজার সাহায্য গ্রহণ করিয়া পরমশৈব হিন্দুনরপতি ভীমকে বিতাড়িত করিয়া আবার বৌদ্ধপ্রাধান্য স্থাপন করিতে প্রয়াসী হন, কিন্তু তিনি কৃতকার্য্য হইলেও প্রকৃত প্রস্তাবে এই সময় হইতেই বৌদ্ধ প্রাধান্য চলিয়া যায়। তাঁহার বংশধরগণ কেহই আর তাদৃশ প্রতাপান্বিত হইতে পারেন নাই।

আসুন পাঠক, এখন আমরা এই বৌদ্ধ কবির হস্তে বরেন্দ্রীর একচ্ছত্র হিন্দুরাজা ভীমের চরিত্র ও শক্তি পরিচয় কিরূপ প্রস্ফুটিত হইয়াছে তাহা অনুধাবন করি।

ভীম সম্বন্ধে কবির শ্রদ্ধার সীমা নাই। তিনি মৌখিক পালদিগের পক্ষে, কিন্তু হৃদয়ে যেন ষোল আনা ভীমের দিকে। তিনি আর এক স্থানে বলিয়াছেন "রাজা দিব্বোক কর্ত্তব্য বোধে পালদের শত্রুতা করিয়াছিলেন।" (এই কর্ত্তব্যবোধ কিসের ? হিন্দুদের প্রতি পালগণের অত্যাচারের নাকি ?) কবি ভীম সম্বন্ধে বলিয়াছেন "তিনি লোভবশতঃ কথনও কোনও কার্য্য করিতেন না।" ভীমের পতনে কবির হৃদয়গত ব্যথা রাশি স্পষ্ট অনুভব করা যায়; রামপালের জয়জনিত আনন্দের কথা কবি মুখে বলিয়াছেন, হৃদয়ে যেন অনুভব করেন নাই; আমরা নিম্নে কয়েকটি শ্লোকের বঙ্গানুবাদ দিতেছি,—

অনুবাদ। বিধিবিড়ম্বনা বশতঃ (অর্থাৎ হায়, কি দুর্দ্দৈব বশতঃ) সেই শত্রুশ্রেষ্ঠ ভীম জীবিতাবস্থায়ই বলপূর্ব্বক রামপাল কর্ত্তৃক ধৃত হইলেন! সেই ভীমের সৈন্যগণ প্রতিপক্ষ (রামপাল) সেনা কর্ত্তৃক হন্যমান হইয়াও অতুল তেজঃসম্পন্ন রহিল; প্রতিপক্ষ কর্ত্তৃক বধ্যমান হইয়াও তাঁহার সৈন্যগণ কিছুমাত্র কাতরতা প্রাপ্ত হইল না!! ২। ১৭।

(ভীম ধৃত হইলেও তদীয় বন্ধু বীরহরি বিপুলবিক্রমে যুদ্ধ করিয়াছেন)।

২য় পরিচ্ছেদের ২০শ শ্লোকে যথা—

অনুবাদ। যুদ্ধ রচনা দ্বারা (?) পৃথিবী প্রাপ্তির আশাধারী রাজা রামপাল কর্ত্তৃক সেই রাজা ভীম, যাহাতে খ্যাতির (যশের) কোন হানি না হয় এই ভাবে অল্প ভয়ে কিছু কাতর অবস্থায় বারণ, শ্রেষ্ঠের পৃষ্ঠে অবতিষ্ঠমান অবস্থাতেই যেন 'দাবা খেলিবার কোঠে' বন্ধনপ্রাপ্ত হইলেন!!

কবির কি আশ্চর্য্য সহানুভূতি! রাজা ভীমের গৌরব ও বীরত্ব এই শ্লোকে কেমন অক্ষুণ্ণ ভাবে রক্ষিত! তাহার পরাজয়ের কত কৈফিয়ৎ! অথচ মহাহৃদয় ভীম কবির প্রভু ও প্রভুর পিতার প্রাণান্তকর শত্রু। সন্ধ্যাকর ভীমকে যত প্রশংসা করিয়াছেন মহাকবি ব্যাস নিজের সন্ততিরূপী ধার্ম্মিক যুধিষ্ঠিরকেও যেন তত প্রশংসা করেন নাই।

পূর্ব্বেই বলিয়াছি, বরেন্দ্রভূমির হিন্দুগণ বৌদ্ধ পালরাজগণের প্রতি অত্যন্ত অসন্তুষ্ট ছিলেন। কাজেই রামপালের সেনানী শিবরাজ প্রথমতঃ যুদ্ধ না করিয়া প্রজাদিগকে বাধ্য করিতে আরম্ভ করেন। তিনি টাকা ও ভূমি ঘুষ দিয়া ভূতপূর্ব্ব পালরাজ্যের (কাজেই বর্ত্তমানে রাজা ভীমের অধীন) বরেন্দ্র-বাসী সামন্তরাজগণকে বাধ্য করিয়াছিলেন। (১ পরিচ্ছেদের ৪৫ শ্লোক)।

দেবেনভুবো বিপুলদ্রবিণস্যচ দানতঃ সুখাচক্রে।
অমুনা হরিনাগ পদাতিলব্ধ বহুল প্রভাবোসৌ ॥১।৪৫।

টীকা। অমুনা দেবেন রাজ্ঞাসৌ সামন্তব্রজঃ হরয়োশ্বাঃ নাগা হস্তিনঃ পদাতয়ঃ এভির্লব্ধো বহুলঃ প্রভাবো যেন স তাটকভুবো ভূমের্বিপুলস্য ধনস্য চ দানতঃ ত্যাগাৎ অনুকূলিতঃ ॥ ১।৪৫।

তিনি হিন্দুদিগের অনুরাগ আকর্ষণের জন্য কি করিলেন তাহা নিম্ন লিখিত শ্লোকে বর্ণিত আছে। যথা—

অনুবাদ। শিবরাজ খড়্গ দ্বারা বরেন্দ্র দেশ ব্যস্ত করিয়া উঠাইলেন। গ্রাম ও বিষয়গুলি ভয়ে ভীত হইয়া উঠিল, তৎপর শিবরাজ দেবতা ও ব্রাহ্মণাদির অধিকৃত ভূমিরক্ষার জন্য,—"এই স্থান কোন্ বিষয়ের অন্তর্গত, এই গ্রামের নাম কি, ইহা কোন্ ভুক্তির অন্তর্ভুক্ত, এইরূপ প্রশ্নপূর্ব্বক ভীমের রক্ষা (Defensive works—জাঙ্গাল?) ভাঙ্গিয়া ফেলিলেন" ১।৪৮

ইহাতেই বুঝা যায় শত্রুমধ্যে ভেদনীতি প্রযুক্ত হইয়াছিল। সকলের দ্রব্য বা ভূমি নষ্ট করা হয় নাই। আর সম্ভবতঃ দেবতা ব্রাহ্মণাদির রক্ষার

জন্যও শিবরাজ ব্যগ্র হইয়াছিলেন। এই ভাবের ঘুষের মহিমায়ই এই হতভাগ্য দেশ নরকে ডুবিয়াছে!

পরবর্ত্তী শ্লোকে আছে "এইরূপে ভীমের 'অবন' (রক্ষা, জাঙ্গাল, অথবা শাসন) সর্ব্বত্র ভাঙ্গা গেল।"

ভীমের প্রশংসা।

টীকা। ইদানীং কীদৃশোঽসৌ ভীম·········বর্ণয়ন্নাহ।

অনুবাদ। সেই ভীম কিরূপ তাহা বর্ণনা করিতেছেনঃ—

অনু। "ভীমের পক্ষীয় ভূপালগণ রক্ষাযোগ্য ব্যক্তি মাত্রের রক্ষক সেই ভীমকে আশ্রয় করিয়া রামপাল রূপ শত্রুকে জয়শীল দেখিয়া আত্মরক্ষার জন্য বন্দোবস্ত করিয়াছিলেন।" ২।২১

অনু। এই জগৎ সেই রাজা ভীমকে লাভ করিয়া অত্যন্ত সম্পদ্‌যুক্ত বলিয়া গণ্য হইয়াছিল; সজ্জনগণ ভীম হইতে যথোচিত দান (অনৃত), কল্যাণ ও ভূমি লাভ করিতেন। ২। ২৪।

অনু। যে ভীম এই সমস্ত জগৎ পরের জন্য উৎসর্গ করিয়াছিলেন, যিনি কল্পবৃক্ষের ন্যায় প্রকৃতিবিশিষ্ট ছিলেন, যাঁহার সেবক ও অবিরল যাচকগণ অস্খলিত পদে আরোহণ করিয়া অবস্থিত হইতেন। ২।২৫ (অর্থাৎ যিনি দরিদ্র কর্ম্মচারীদিগকে ডিস্‌মিস্ করিতেন না এবং যাচকগণ অনবরত আসিলেও যাহার নিকট বিমুখ হইতেন না!)

অনু। যে রাজা ভীম অত্যন্ত যশ দ্বারা দিগ্‌ভিত্তি শোভিত করিয়াছিলেন, যিনি লোভের বশবর্ত্তী হইয়া কোন কার্য্যে উৎসাহ প্রদর্শন করিতেন না; যিনি ধর্ম্মবর্ত্ম অনুসরণ দ্বারা মহাশয়তা লাভ করিয়াছিলেন। ২।২৭

অনু। "এমন যে বন্দীভূত ভীমনৃপতিরূপ শত্রু, তিনি রামপাল কর্ত্তৃক গজযূথ মধ্য হইতে অবতারিত হইলেন।"—কিরূপ রামপাল কর্ত্তৃক? না যে রামপাল 'পৈতৃকরাজ্য বরেন্দ্রভূমি শুভক্ষণ প্রাপ্ত হইয়াছে' (উদ্ধৃত হইয়াছে) এই মঙ্গলময় বার্ত্তা প্রচার করিয়া স্বপক্ষদিগকে উৎসব করিতে আদেশ করিয়াছিলেন। ২।২৮

রামপাল রাজা ভীমকে ধৃত করিয়াও যথোচিত সম্মান করিয়াছিলেন।

উপরে যে সকল শ্লোক উদ্ধৃত হইল তাহা পাঠ করিয়া পাঠক অনায়াসে বুঝিতে পারিয়াছেন কবি সন্ধ্যাকর ভীমের কিরূপ জ্বলন্ত আদর্শ চরিত্র

অঙ্কিত করিয়াছেন। যুদ্ধে পরাজিত হইলেও কাব্যের প্রকৃত নায়ক ভীমই হইয়া দাঁড়াইয়াছেন। ভীমের প্রশংসা করিয়া কবি এতগুলি শ্লোক রচনা করিলেন, অথচ রামপালের সেরূপ কোনও বর্ণনা করেন নাই। যেন খাতিরে খাতিরে কয়েকটী কথা বলিয়াছেন। রাবণের সঙ্গে ভীমের তুলনা শুধু রামপালকে রাম করা হইয়াছে বলিয়া। ব্যাস বা বাল্মীকির মন দুর্য্যোধন বা রাবণের দিকে ছিল না। কিন্তু সন্ধ্যাকরের মন ভীমের দিকে।

যাহা হউক, কাব্যের প্রকৃত বিষয়ে যাহা আলোচিত হইল, তাহাতে একথা স্পষ্ট হৃদয়ঙ্গম হয় যে, কবি সন্ধ্যাকরের সময়ে তৎকালীন সুধী সমাজে রাজা ভীম ও রামপাল উভয়েই অতি পূজার্হ ও শ্রেষ্ঠ পুরুষ ছিলেন। বৌদ্ধ কবিও হিন্দু রাজার চরিত্র এবং অসাধারণ বীরত্ব দর্শনে শতমুখে উহার প্রশংসা করিতে বিরত হন নাই। ইহাতে তৎকালীন বিজ্ঞ সমাজের রুচির একটী সুন্দর চিত্র পরিলক্ষিত হয়।

আমরা এখন সমুদ্রকুল ও সমুদ্রগোত্র সম্বন্ধে কয়েকটী কথা বলিয়া প্রবন্ধের উপসংহার করিব।

কোনও প্রাচীন হিন্দু-গ্রন্থে সমুদ্রকুল নামে কুলের অথবা কাশ্যপ, শাণ্ডিল্যাদি গোত্রের ন্যায় সমুদ্রগোত্রের উল্লেখ নাই। ইহাতে বুঝিতে হইবে রাজপুতদিগের 'অগ্নিকুলের' ন্যায় এই সমুদ্রকুলটী আধুনিক। সন্ধ্যাকর ধর্ম্মপালকে পালবংশের ইক্ষ্বাকুর ন্যায় বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন এবং তাহার সমুদ্রগামী শিলানৌকার সুখ্যাতি কীর্ত্তন করিয়াছেন; আবার ধর্ম্মপালের প্রাসাদ সমুদ্রতটে ছিল একথাও বলিয়াছিলেন। ইহাতে দেখা যায় এই নরপতি নৌবলপ্রধান ছিলেন এবং সমুদ্রের সহিত ইহার সম্পর্ক অধিক ছিল। পূজনীয় শাস্ত্রী মহাশয় খালিমপুরের তাম্রশাসন হইতে দেখাইয়াছেন যে—"ধর্ম্মপাল স্তূপের ন্যায় উচ্চ ছিলেন; তাঁহার বৃহৎ নৌ-বহর ছিল, তিনি অতি সহজে গঙ্গার উপর নৌ-সেতু বসাইতে পারিতেন।" "He had a large army and large navy. He could easily throw a boat-bridge across the Ganges. The Khalimpur grant was issued from Pataliputra, where he seems to have held a great Durbar and thrown a boat-bridge across the river.,—P. 6." রামপালও এইরূপ গঙ্গার উপর নৌসেতু বান্ধিয়াছিলেন।

এই সকল তাম্রশাসনে লিখিত বিবরণ ও রামচরিতের পূর্ব্ব কথিত শ্লোক

হইতে প্রমাণিত হয় এই বংশ প্রথম হইতেই সামুদ্রিক নৌবল-প্রধান ছিলেন এবং তজ্জন্যই সমুদ্রকুল বলিয়া বিখ্যাত হন। ধর্ম্মপালের মহিষী মনুষ্যরূপী সমুদ্র হইতে পুত্র লাভ করাতে এই বংশ সমুদ্রকুল নামে খ্যাত হন এ কথা কল্পনা মাত্র। রামচরিত কাব্যে সেরূপ কিছু লিখিত নাই। বিশেষতঃ ধর্ম্মপালের পুত্র দেবপালের বংশধরগণ রাজা হন নাই। কিন্তু পিতৃব্য বাক্‌পালের সন্তানগণ রাজা হইয়াছিলেন। কাজেই ধর্ম্মপালের স্ত্রীর সহিত বংশের সম্পর্ক কম। আর এক কথা যদি সমুদ্রের ঔরসজ বলিয়া "সমুদ্রকুল" হয়, তবে সে কুল ধর্ম্মপালের পুত্র হইতে হইবে তজ্জন্য ধর্ম্মপালকে, সমুদ্রকুল বলা যায় না। বস্তুতঃ নৌবল-প্রাধান্য হেতুই এই বংশ সমুদ্রকুল নামে আখ্যাত হন। আমরা নানা স্থানেই পালগণের নৌসৈন্যের বর্ণনা দেখিতে পাই। যদি অগ্নি হইতে অগ্নিকুল নাম হইতে পারে তবে সমুদ্রের সংস্রব হেতু সমুদ্রকুল হওয়া স্বাভাবিক। এই সংস্রবকেই পরে সমুদ্রের মানুষরূপ ধারণ বলিয়া কল্পনা করা হইয়াছে।

শাস্ত্রী মহাশয় পালগণের জাতি বিচার উপলক্ষে বহু কথার অবতারণা করিয়াছেন। ইঁহারা কেহই আপনাদিগকে ক্ষত্রিয় বলেন নাই। কেবল নির্ব্বাণপ্রায় পালবংশের শেষ দুই রাজা আপনাদিগকে ক্ষত্রিয় বলিতে প্রয়াসী হইয়াছেন। ইহা হইতেই তিনি অনুমান করেন, পালগণ ক্ষত্রিয় ছিলেন না। সিংহগিরি তদীয় ব্যাসপুরাণে পালগণকে অধম ক্ষত্রিয় বলিয়া লিখিয়াছেন। "But still Simhagiri in his Vyasa Puran imbedded in the Vallalcarita, after recounting all the Kshatriyas in India in the 12th century, speaks of the Palas as the worst of Kshatriyas." এ কথাটি অতি যুক্তিপূর্ণ বলিয়া মনে হয়। প্রকৃত প্রস্তাবে নৌবল প্রধান বৌদ্ধ পালরাজগণ ও বরেন্দ্রবাসী হিন্দুনরপতি রাজা দিব্বোক ও ভীম প্রভৃতি এক জাতীয় ছিলেন। পালগণ বৌদ্ধধর্ম্মে সমধিক আস্থাবান্ থাকাতে জাতি সম্বন্ধে ততটা আগ্রহ প্রকাশ করেন নাই। কিন্তু মূলতঃ দুই ই এক। ধর্ম্মপালের পূর্ব্ববর্ত্তী তিন পুরুষ রাঢ় দেশে সামন্ত নরপতি ছিলেন; আবার বরেন্দ্রীতে দিব্বোক ও তদ্‌বংশীয়গণও সামন্ত রাজা ছিলেন। উভয়েরই অবস্থা একই রূপ। আর সমুদ্রকূলবর্ত্তী রাঢ় দেশে বাপ্যট বা গোপাল প্রভৃতি রাজগণ নৌবল প্রধান হওয়াই স্বাভাবিক। তৎকালীন ঐ রাঢ় দেশের ইতিহাসের প্রতি লক্ষ্য করিলে বাপ্যটকে যে

সমাজের লোক বলিয়া অনুমান করা সঙ্গত হয় তাহা ভাবিয়াও পালবংশ ও রাজা দিব্বোকাদিকে একই বংশসম্ভূত বলাই সমীচীন হইবে।

শাস্ত্রী মহাশয় আরও লিখিয়াছেন যে ভদ্রেশ্বর নামক জনৈক চিকিৎসক রামপালের সময়ে পাকশালার তত্ত্বাবধায়ক ছিলেন। এই ভদ্রেশ্বরের পুত্র সুরেশ্বর স্বরচিত বৈদ্যক-গ্রন্থে আপনাকে "ভীম পালের" সভাসদ্ বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন। শাস্ত্রী মহাশয় এ স্থলে মনে করেন যে এই ভীমপাল ও রাজা ভীম একই ব্যক্তি। অর্থাৎ ভীম যখন পালবংশীয়গণকে তাড়াইয়া তাঁহাদের সিংহাসনে উপবিষ্ট হইলেন তখন সভাসদ্‌গণের তাহাকে 'পাল' উপাধিতে বর্ণনা করা স্বাভাবিক। 'পাল' শব্দের অর্থ পালনকারী। সুরেশ্বর এবং ভীমের সময়ও একই বটে। এখানেও দেখা যাইতেছে পালগণ ও রাজা ভীম এক শ্রেণীর লোক বলিয়াই প্রমাণ পাওয়া যায়। কবি সন্ধ্যাকর রামচরিতে উভয় বংশেরই যেরূপ গৌরবজনক বর্ণনা করিয়াছেন তাহার সহিত সমগ্র বিষয়টী আদ্যন্ত চিন্তা করিলে এ বিষয়ে সন্দেহ থাকে না।

হিন্দুনরপতি দিব্বোক জাতিতে কৈবর্ত্ত ছিলেন একথা সন্ধ্যাকর স্পষ্টাক্ষরে লিখিয়াছেন; অথচ বৌদ্ধ পালরাজগণের জাতির কথা স্পষ্ট করিয়া বলেন নাই। তিনি লিখিয়াছেন :—

বদনগতভারতীকঃ কমলাসনতাং দধৎ প্রজানাথঃ।
বিধিরিব ধাতা জগতো যঃ শ্রীপতিনাভিসম্ভূতঃ॥ ১।১৭।

টীকা। বদন ইত্যাদি। কমলায়াঃ শ্রিয়ং আসনম্ আশ্রয়ঃ। শ্রীপতিঃ পার্থিবো যো নাভিঃ ক্ষত্রিয়ঃ তস্মাৎ সম্ভূতঃ বিধির্বিবেতি শ্লেষোপমা। অত্র শ্রীপতের্বাসুদেবস্য নাভিতোবয়বাৎ উদ্ভূতঃ। শেষং সুগমম্। উভয়ত্রাপিসর্ম্মঃ।১৭।

অনুবাদ। সেই রামপালের মুখে সরস্বতী বাস করিতেন,—তিনি কমলাসনতা (ব্রহ্মারপদ) প্রাপ্ত হইয়াছিলেন, প্রজাদিগের নাথ ছিলেন, বিষ্ণুর নাভি হইতে উৎপন্ন ব্রহ্মার ন্যায় জগতের বিধাতা ছিলেন। নাভি অর্থে ক্ষত্রিয় বুঝায়, অতএব তিনি "ক্ষত্রিয়-সম্ভূত" ছিলেন।

কবি এ স্থলে 'ক্ষত্রিয়' বলিলেন না। তিনি 'নাভি-সম্ভূত' (ক্ষত্রিয়-সম্ভূত) অর্থাৎ 'ক্ষত্রিয় হইতে জাত' বলিলেন। অর্থাৎ পালগণ 'ক্ষত্রিয়-বীর্য্যে' উৎপন্ন, কিন্তু মাতৃকুল ক্ষত্রিয় নহে। কারণ তাহা হইলে তাঁহারা 'ক্ষত্রিয়'

এমন কি ক্ষত্র শব্দ পর্য্যন্ত ব্যবহার না করিয়া নাভি শব্দ ব্যবহৃত। আর ক্ষত্রিয় হইলে চন্দ্র কি সূর্য্যবংশের নামও থাকিত। সুতরাং দেখা যাইতেছে পালগণ ক্ষত্রবীর্য্য-সম্ভূত, কিন্তু ক্ষত্রিয় নহে।

আমরা পূর্ব্বেই রাজা দিব্বোক এবং পালরাজগণকে সমজাতীয় বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছি। রাজা দিব্বোক কৈবর্ত্ত জাতীয় ছিলেন। পালগণও "ক্ষত্রবীর্য্যেণ বৈশ্যায়াং কৈবর্ত্তঃ পরিকীর্ত্তিতঃ" ছিলেন বলা যুক্তি সঙ্গত হয় না কি? ইহাদের "সমুদ্রগোত্র" থাকাতে প্রমাণ আরও দৃঢ়তর হয় সন্দেহ নাই। আর তাহা হইলে রামপাল ও ভীমপালের মৌলিক জাতীয় ঐক্য আসিয়া পড়িল। শাস্ত্রী মহাশয়ও ঠিক এই কথা ভাবিয়াই লিখিয়াছেন— "In none of the early inscriptions do the Palas advance any such pretentions. They were plebeians, and so they thought well to remain." অর্থাৎ "কোনও প্রাচীন লিপিতেই পালরাজগণ ক্ষত্রিয় বলিয়া দাবী করেন নাই; তাঁহারা মধ্য শ্রেণীর লোক ছিলেন এবং সেরূপ থাকাই তাঁহারা ভাল বিবেচনা করিয়াছিলেন।"

আমরা এতক্ষণ রামচরিতের টীকা সম্বন্ধে বলিবার অবকাশ পাই নাই। টীকাকার এবং গ্রন্থকার একই ব্যক্তি ছিলেন। টীকাটী কাব্যের অপরিহার্য্য অবশিষ্ট মাত্র। মূলকাব্যে বর্ণিত রাম ও ভীমের, ভাই, মাতুল, বন্ধু প্রভৃতির নাম যে ভাবে টীকায় সংযোজিত করা হইয়াছে তাহাতে কবি ভিন্ন আর কাহাকেও টীকাকার বলা যায় না। মূল শ্লোকের অনেক স্থলেরই কোনও সরলার্থ হয় না, টীকায় বলপূর্ব্বক তাহার এক একটী অর্থ যোজনা করিয়া কাব্য ভাঙ্গিয়া বুঝাইয়া দেওয়া হইয়াছে। কাব্যের ভাষা যেমন কটমট, টীকার ভাষাও অবিকল তেমনি কটমট। ভাষাদৃষ্টেও গ্রন্থকার ও টীকাকারকে একই ব্যক্তি বলা যাইতে পারে। আর কাব্য ও টীকা উভয়ই "শ্রীধনায় নমঃ" বলিয়া আরম্ভ করা হইয়াছে। এবং প্রতি সর্গের শেষে টীকাকারগণ 'অমুক কাব্যের অমুক বিরচিত টীকার অমুক অধ্যায় সমাপ্ত হইল' এরূপ লিখিয়া থাকেন, এ কাব্যে বা টীকায় কোনও পরিচ্ছেদের শেষে সেরূপ কোনও কথা নাই। এই সকল কারণে গ্রন্থকার ও টীকাকার একই ব্যক্তি বলিয়াই প্রমাণিত হয়। এই টীকাখানার সাহায্যে মূলকাব্য বুঝিতেও গলদ্‌ঘর্ম্ম হইতে হয়। টীকার আর এক টীকা থাকা আবশ্যক।

যাহা হউক সন্ধ্যাকর নন্দীর এই কাব্য ঐতিহাসিকের অতি প্রিয় পদার্থ

হইয়াছে। তাঁহার বর্ণিত বিষয়গুলির সত্যতা সম্বন্ধে সন্দেহের কোনও কারণ নাই। তিনি দূরে বসিয়া গল্প শুনিয়া কাব্য লেখেন নাই। তিন পুরুষ ধরিয়া তিনি ও তদীয় পিতৃ পিতামহ পালবংশের সভাসদ্ ও কর্ম্মচারী ছিলেন, এবং কাব্য বর্ণিত মূল ঘটনা তাঁহার জীবদ্দশাতেই সংঘটিত হয়। ইহা হইতে গুরু'র ঐতিহাসিক প্রমাণ ইউরোপীয় রাজবংশীয় দিগেরও বড় অধিক নাই।

শ্রীবিজয় কুমার রায়।

নিবেদন।

(মিশ্র-পূরবী—কাওয়ালী।)

আমি, সঁপিনু এ মনে তব পদে হরি,
যদি, পাপ স্রোতে পড়ে তারিও,
আমি, জীর্ণ প্রাণ তরি দিনু, দয়া করি
ভবনদী-পারে লইও।
আমি, তব প্রেম-রসে মজিয়া
দিনু, ভালবাসা প্রাণ খুলিয়া,
যেন, ভব-মায়া না লয় ভুলায়ে,
এবে, প্রেম-ডোরে বেঁধে রাখিও।

শ্রীপূর্ণচন্দ্র দাস।

কৃষি-বার্ত্তা।

(লেখক—শ্রীপ্রকাশচন্দ্র সরকার বিএল্)

সাহিত্য-সমাজ পত্রিকার স্তম্ভে বিগত ২।৩ মাস হইতে কৃষি-পরিষদের সূচনা হইতেছে। কাজটি খুবই ভাল। দেশের কৃষির যেরূপ দিন দিন অবনতি ঘটিতেছে তাহাতে এইরূপ কৃষি-সমবায় দেশে স্থাপিত হওয়া কর্ত্তব্য। গভর্ণ-মেণ্টের এগ্রিকালচুরাল্ ক্রেডিট্ সোসাইটী সকল সংস্থাপিত হইয়া বিশেষ আশাপ্রদ সুফল দিতেছে। কৃষি-পরিষদে এরূপ কৃষি সম্প্রদায়ের বাদ প্রতিবাদ

আলোচনা, অনুশীলন, দেশে বৈজ্ঞানিক কৃষিজ্ঞান বিস্তার করিবার জন্ত সমিতি সংস্থাপন ও নূতন নূতন কৃষিজাত খাদ্য সামগ্রীর চাষ প্রবর্ত্তন হওয়া উচিত। কর্পূর, ঘাস, কাউপি, বীন, স্থান থায়েন, কোপি, ব্রোকলি, সুইড্, ম্যানগোল্ড, আল্ফা আল্ফা ক্লোভার, টিমোথী, ইটালিয়ান রাইঘাস, ফেসটুকা, প্রভৃতি, গিনিঘাস, ডেচ্, ভিন্ন প্রকারের আলু, কড়াই, শোঁয়া যুক্ত এবং শোঁয়াহীন (beardless) জই, জব এবং গোধুমের চাষ বিলাতি সার সংযোগে আমাদের দেশে প্রবর্ত্তন করা কর্ত্তব্য। এবিষয়ে আমেরিকা ও বিলাতে অনেক পত্রাদি ও ভিন্ন ভিন্ন পুস্তকাদি আছে তাহা আনাইয়া পাঠ করিলে এবিষয়ে জ্ঞান স্বল্পকাল মধ্যে সমধিক বৃদ্ধি লাভ করিবে সন্দেহ নাই। আশা করি, সমাজ-পৃষ্ঠায় এ সকল বিষয় যথাকালে ধারাবাহিক রূপে চর্চ্চিত হইবে। দেশে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কৃষি-পাঠশালা স্থাপিত হওয়াও বিশেষ কর্ত্তব্য। বিলাত বা আমেরিকায় এরূপ কৃষি-স্কুল, কলেজ কত যে আছে তাহা বলা যায় না। বৈশাখ ও জৈষ্ঠের মাহিষ্যসমাজে তাহা বিবৃত হইয়াছে। আমার এ সম্বন্ধে বঙ্গের কৃষি-বিভাগের ডাইরেক্টার বাহাদুর J. R. Blackwood সাহেবের সঙ্গে বহুকথা হইয়াছিল। তিনি আমার নিকট কি প্রকারে কৃষি-জ্ঞান ও তাহা অর্জ্জনের স্পৃহা আপামর জনসাধারণে বিকীর্ণ হইতে পারে, জানিতে বিশেষ ইচ্ছা প্রকাশ করায় আমি বলি যে, বর্ত্তমান গভর্ণমেণ্টের যেরূপ দিল্লি এবং বাঁকীপুর রাজধানী সংস্থাপনে অর্থের টানাটানি উপস্থিত হইয়াছে; তাহাতে পৃথক কৃষি-স্কুল সংস্থাপন না করিয়া বরং প্রাথমিক এবং মধ্যবাঙ্গালা বিদ্যালয়ে কৃষি-বিষয়ক ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র পুস্তক বালকদের পাঠ্যরূপে প্রবর্ত্তিত করা কর্ত্তব্য। তাহাতে তিনি শিক্ষা-বিভাগের ডাইরেক্টার বাহাদুরের সহিত পরামর্শ করিয়া যাহা করা হিতজনক হয় তাহা শীঘ্রই করিবেন বলিয়া আশ্বাস দিয়াছেন। আমার বিবেচনা হয় যে বঙ্গের ভিন্ন ভিন্ন কেন্দ্রস্থ মাহিষ্য-সমিতি সকল এবিষয়ে তাঁহার নিকট আবেদন-পত্র আশু প্রেরণ করিলে ভাল হয়। ভাই মাহিষ্যগণ, আর ঘুমাইয়া থাকিবেন না। সময় উপস্থিত হইয়াছে। আপনারা কৃষিজীবী সম্প্রদায় কৃষিবিষয়ে আপনারা একবার কৃপা দৃষ্টিপাত করিবেন। হা চাকরী, যো-চাকুরী করিয়া আর দ্বারে দ্বারে ঘুরিবেন না। কৃষি-ব্যবসাকেই আপনারা মূলমন্ত্র করুন। দেখুন, চাউলের কল স্থাপন করিয়া আপনার স্বজাতি-বর্গ চেংলা কলিকাতা অঞ্চলে কিরূপ অর্থবান হইতেছেন। আপনারা এইরূপ ধানভাঙ্গাই কল ধান্যের কেন্দ্রে কেন্দ্রে স্বজাতির অর্থে স্থাপন করুন, ব্যক্তিগত

বা যৌথ অর্থে বিলাত বা আমেরিকার মত কৃষিকার্য্য ও চাষবাস প্রচলন করুন। ভিন্ন ভিন্ন জমী বিশ্লেষণ জন্য দেশে (পরিসভার মত) পরীক্ষাক্ষেত্র স্থাপন করুন। আমাদের দেশের বড়লোকের ছেলেরা বিলাত বা আমেরিকায় কেবলই ব্যবহারবিৎ বা ব্যারিষ্টার হইতেই গিয়া থাকেন। কিন্তু এখন ঐ ক্লান্তপন্থা ত্যাগ করিয়া কৃষিবিদ্যা এবং গোরক্ষা গোপালন প্রভৃতি শিক্ষার জন্ত বা পুলট্রী জনন পালন বিদ্যা শিখিতে যাওয়া কর্ত্তব্য। ইহাতে প্রচুর ধনাগম হইয়া থাকে।

গোরক্ষা, গোজাতির উন্নতি, কৃষির উন্নতিসাধন করাই কর্ত্তব্য। রাজনৈতিক কোনরূপ আন্দোলনের আবর্ত্তনে এতাবৎকাল পর্য্যন্ত মাহিষ্য সমাজ পড়ে নাই। তাই রাজদরবারে ইহাদের রাজভক্ত বলিয়া বিশেষ সুখ্যাতি আছে। যাহাতে আমরা কোনরূপ বিপদের আবর্ত্তনে পড়িয়া বিপর্য্যস্ত না হই, বরং রাজকৃপা পাইয়া কৃষির উন্নতি ও অনুশীলন করিতে পারি, সেইদিকেই সর্ব্বতোভাবে আমাদের মনঃসংযোগ করা কর্ত্তব্য।

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষার ফল—১৯১৩।

(মাহিষ্য ছাত্রগণের নাম)

বি, এ।

নগেন্দ্রনাথ চৌধুরী—কৃষ্ণনগর কলেজ, দিগিন্দ্রনাথ মজুমদার—প্রেসিডেন্সী কলেজ অতুলকৃষ্ণ চৌধুরী—রাজসাহী কলেজ, মহিম চন্দ্র প্রামাণিক—ঐ অন্নদা গোবিন্দ ভৌমিক—ঐ, লালন চন্দ্র দাস—ঐ, উপেন্দ্র নাথ সিহি—ঐ, হরিবংশ রায়—হুগলী কলেজ, অশ্বিনীকুমার রায়—বঙ্গবাসী কলেজ, প্রফুল্লকুমার রায়—সিটি কলেজ (ইনি ফিলজফীতে অনার পাইয়াছেন)

বি, এস, সি।

বিনয়কুমার মণ্ডল—প্রেসিডেন্সী, প্রফুল্লকুমার হালদার—প্রেসিডেন্সী। প্রভাসচন্দ্র বিশ্বাস—কৃষ্ণনগর কলেজ, গুণসিন্ধু সর্দ্দার—বঙ্গবাসী কলেজ, ধ্যানেন্দ্র নাথ সরকার—বঙ্গবাসী কলেজ। উপেন্দ্রনাথ সিহি—রাজসাহী।

আই, এ এবং আই, এস, সি।

প্রবোধ চন্দ্র মণ্ডল—প্রেসিডেন্সি কলেজ, নিশিকান্ত বিশ্বাস—বঙ্গবাসী কলেজ, সুরেন্দ্র মুন্সি—সিটি কলেজ, বিভাব চন্দ্র বিশ্বাস—বঙ্গবাসী কলেজ, প্রভাসচন্দ্র

মধুসূদন—প্রেসিডেন্সী কলেজ, নিকুঞ্জ বিহারী মাইতি—বহরমপুর কলেজ, শিব প্রসাদ বিশ্বাস—কৃষ্ণনগর কলেজ, সুধীর কৃষ্ণ সরকার—রিপণ কলেজ, গোষ্ঠবিহারী চৌধুরী—সিটি কলেজ, রোহিণী কান্ত বিশ্বাস—রাজসাহী কলেজ, দফরাজ খাঁ—মেট্রোপলিটন, নন্দলাল জানা—সিটি, জয়কৃষ্ণ দাস—ঐ, সত্যবান রায়—স্কটিশ চার্চ, গোপীধন মান্না—মেট্রোপলিটান।

ম্যাট্রিকুলেসন।

প্রথম বিভাগ। ভোলানাথ বক্সী—তুমকা জিলা স্কুল, রবীন্দ্রকুমার মণ্ডল—ঘাটাল, খগেন্দ্রনাথ সিকদার—মাণিকগঞ্জ, ভূপতিচরণ মণ্ডল—বালুরঘাট হাই, যতীন্দ্রনাথ বিশ্বাস—মেহেরপুর হাই, খগেন্দ্রনাথ বিশ্বাস—মেহেরপুর হাই, সুরেন্দ্র নাথ বিশ্বাস—গোয়ালন্দ হাই, বিশ্বেশ্বর বিশ্বাস—সাহাজাদপুর হাই, নির্ম্মল চন্দ্র সরকার—(প্রাইভেট্), নগেন্দ্র নাথ বেরা—কাঁথি হাই, রজনীকান্ত ঘোড়ই—ঐ, গোবিন্দপ্রসাদ গিরি—ঐ, কুমার নারায়ণ গিরি—ঐ, গিরীশচন্দ্র জানা—ঐ, বরেন্দ্রকৃষ্ট মাইতি—ঐ, বিজয়কৃষ্ট মাইতি—ঐ, যতীন্দ্রকৃষ্ট মাইতি—ঐ, জীবনকৃষ্ট মাইতি—ঐ, সতীশচন্দ্র মাইতি—ঐ, উপেন্দ্রনাথ মাইতি—ঐ, নগেন্দ্রনাথ মণ্ডল—ঐ, কৃষ্ণমোহন সামন্ত—ঐ, জ্যোতিশ্চন্দ্র কয়াল—হরিনাভী স্কুল, অতুলকৃষ্ট বারুই—মাজু হাই, কালীপদ হালদার—বাওয়ালী। নরেন্দ্র নাথ দাস—ঐ, গোঁসাই চাঁদ সাঁতরা—ঐ। লক্ষীকুমার রায়—সুনামগঞ্জ। রজনীকান্ত সাউ—মুগবেড়্যা হাই, রমণীমোহন শাসমল—ঐ, কামিনীমোহন পুরকাইত—হটুগঞ্জ, মন্মথনাথ পুরকাইত—ডায়মণ্ড হারবার, করুণাময় মণ্ডল—সরিষা, রুক্মিণীকুমার পুরকায়স্থ—সুনামগঞ্জ, ইন্দুভূষণ সিকদার—পাবনা, রজনীকান্ত ধাড়া—সপাটী হাই, দেবেন্দ্রনাথ মণ্ডল—মুগকল্যাণ, নিশিকান্ত ভৌমিক—তমলুক হাই, নীলমণি বেরা—মহিষাদল রাজ হাই, নগেন্দ্রনাথ মাইতি—ঐ, যুধিষ্ঠির মাইতি—ঐ, শ্রীশচন্দ্র সামন্ত—ঐ, হাজারী লাল দাস—সাতক্ষীরা, সতীশ চন্দ্র দাস—ঐ। জীবনকৃষ্ণ কোলে—ঐ, বিজয়কৃষ্ণ মণ্ডল—জয় নগর, সুশীলকৃষ্ণ মাইয়া—ঐ, সুরেন্দ্রনাথ খামারুই—ঐ, ননীলাল ভাণ্ডারী—সরিষা।

দ্বিতীয় বিভাগ। নারায়ণ চন্দ্র বিশ্বাস—আমলা সদরপুর হাই সুরেন্দ্রনাথ বিশ্বাস—মজিদিয়া রেলবাজার, সুভাষচন্দ্র বিশ্বাস—কৃষ্ণনগর কলেজিয়েট স্কুল, সজনীকান্ত ধাড়া—চকদিঘী হাই, সুরেন্দ্র নাথ মল্লিক—

পতিতপাবনী হাই, নরেন্দ্রনাথ দাস—বউবাজার হাই, নগেন্দ্রনাথ মৌলিক—গাইবান্ধা হাই, হরিপদ মণ্ডল—জয়নগর হাই, প্রকাশচন্দ্র বৈদ্য—সরিষা হাই, বিধুভূষণ রায়—ঝিকরা হাই, সতীশচন্দ্র মাল—রসপুর হাই, বসন্তকুমার দেয়াসী ব্রজেন্দ্রনন্দন রায়—জয়পুর হাই, কালীকুমার দাস—ধানকুড়িয়া, হেমেন্দ্র নাথ দাস—ঐ, শশঙ্কধর চৌধুরী—বাগের হাট, জিতেন্দ্রনাথ ভুঁইয়া—বাওয়ালী।

গৌড়াদ্য-বৈদিক ব্রাহ্মণ।

ম্যাট্রিকুলেশন—কান্তিভূষণ ভট্টাচার্য্য—সংস্কৃত কলেজ। রঘুনাথ চক্রবর্ত্তী—ভজিমধাট্টা। বিপিন বিহারী চক্রবর্ত্তী—শশাটী। জিতেন্দ্রনাথ চক্রবর্ত্তী—যাজু বিভূতিচরণ চক্রবর্ত্তী—জগদ্বল্লভপুর। সতীশচন্দ্র চক্রবর্ত্তী—ঐ। ক্রমশঃ।

সারস্বত-ভাণ্ডার।

শিক্ষা না হইলে মানব-জীবন যে কিরূপ ভীষণ মরুভূমিতে পরিণত হয়, তাহা সকলেই সহজেই উপলব্ধি করিতে পারেন। আমরা নিয়তই সারস্বত ভাণ্ডারের প্রস্তাব করিয়া আসিতেছি, দুঃখের বিষয় যে কোন স্বজাতি-প্রেমিকেরই সে দিকে আদৌ দৃষ্টি পড়িতেছে না; অথবা আমাদের কর্ত্তব্যের ত্রুটীবশতঃ নেতৃগণের ও সামাজিকগণের প্রবৃত্তির অভাবে হয় ত কার্য্যে পরিণত হইতেছে না। কিন্তু তাঁহাদের ঐ বিষয়ে চিন্তা করা আবশ্যক, কারণ যত দিন এই ভাণ্ডার স্থাপিত না হইবে এ জাতির উন্নতি সুদূরপরাহত থাকিবে। যে সমস্ত অক্ষম মেধাবী ছাত্রবৃন্দ অক্লান্ত পরিশ্রম করিয়া মেট্রিকুলেশন; এফ এ, প্রভৃতি অতি কষ্টে উত্তীর্ণ হইয়াছে অর্থাভাবে তাহাদের আর অগ্রসর হইবার উপায় নাই, নানা স্থানে চেষ্টা করিয়া বিফল মনোরথ হইয়া—উচ্চ শিক্ষার আশায় জলাঞ্জলি দিয়া—অন্য উপায় অবলম্বন করিতে বাধ্য হইতেছে। এক্ষণে আমাদের সমাজ-হিতকর জাতীয় উন্নতিকর সারস্বত-ভাণ্ডার স্থাপন করিয়া অভাবগ্রস্ত মেধাবী ছাত্রগণের আবশ্যক মত বাসস্থান বা আহারাদির ব্যবস্থা দ্বারা বা কাহাকে সামান্য সাহায্য করিলে তাহারা উচ্চ শিক্ষায় অগ্রসর হইবার সুবিধা পাইয়া আত্মীয়দিগের মধ্যে শিক্ষা-বিস্তার ও সমাজ-হিতকর অনেক কার্য্য করিতে পারেন। শিক্ষার অভাবেই আমাদিগের এই অবনতি। যত দিন আমাদের মধ্যে আত্ম-মর্য্যাদার জ্ঞান না

হইবে বা এইটী বিশেষ প্রয়োজনীয় বলিয়া লোকের ধারণা না হইবে ; ততদিন এই বিপন্ন মাহিষ্য-সমাজের মঙ্গল চিন্তাও সুদূরপরাহত। এজন্য প্রত্যেক মাহিষ্য ভ্রাতৃগণের নিকট বিনীত প্রার্থনা—তাঁহারা যেন নিজ নিজ সাধ্যানুযায়ী আশ্রয়হীন মাহিষ্য-ছাত্রদিগের সাহায্যের জন্য যথাসাধ্য এককালীন বাৎসরিক বা মাসিক দানের ব্যবস্থা করিয়া সমাজ-হিতকর মহৎ কার্য্যের সাহায্য করিয়া এই শিক্ষা-ভাণ্ডারের স্থায়ী প্রতিষ্ঠা করিয়া বিশাল মাহিষ্য-সমাজের প্রকৃত বন্ধুর কার্য্য করেন। আমরা এই পান্থশালায় আসিয়াছি মাত্র, ধন ঐশ্বর্য্য পুত্র কন্যাদির মায়াদি ত্যাগ করিয়া নূতন চটীতে যাইতে হইবে, কেহই এক চটীতে চিরস্থায়ী নয়, কেবল স্মৃতি কিছু দিন মাত্র থাকিবে। পরোপকার পরম ধর্ম্ম এই মহৎ বাক্য স্মরণ করিয়া প্রত্যেক মাহিষ্য ভ্রাতার এই বিশাল সমাজের প্রকৃত উন্নতির জন্য এই সারস্বত-ভাণ্ডারটী স্থাপনের জন্য স্ব স্ব অবস্থানুসারে সাহায্য করিলে অল্প দিনের মধ্যেই স্থায়ী উন্নতির পথ উন্মুক্ত হইতে পারে। অতএব হে মাহিষ্য ভ্রাতৃবৃন্দ আপনাদিগের নিকট করযোড়ে নিবেদন—এই সামান্য সাহায্য দানে অলসতা বা কৃপণতা করিয়া এ উন্নতির পথে কাঁটা দিবেন না ; কারণ আমাদিগকে নানা বিঘ্নবিপত্তি অতিক্রম করিয়া নিজেদের পায়ে ভর দিয়া দাঁড়াইতে হইবে।

শ্রীনরেন্দ্রনাথ দাস,
বঙ্গীয় মাহিষ্য-সমিতির সম্পাদক।

পল্লীসমিতি পরিদর্শন।

বিগত আষাঢ় মাসে আমরা যে কয়টী পল্লীসমিতি পরিদর্শন করিয়াছি, তন্মধ্যে নদীয়া জেলার চাকদহ ষ্টেশনের নিকটবর্ত্তী, খয়রামারি পল্লীসমিতির কার্য্য-প্রণালী দেখিয়া আমারা যারপর নাই আনন্দিত এবং উৎসাহিত হইয়াছি। এই সমিতির সম্পাদক মাননীয় শ্রীযুক্ত বাবু মতিলাল মণ্ডল মহাশয় বয়সে প্রাচীন হইলেও নবীনের ন্যায় অদম্য উৎসাহে যাবতীয় কার্য্য সম্পাদন করিয়া থাকেন, তদীয় সুযোগ্য পুত্র শ্রীযুক্ত সত্যচরণ মণ্ডল মহাশয়ও পিতার অনুগুণে অলঙ্কৃত হইয়া দেশের ও সমাজের মঙ্গল কামনায় যথাসাধ্য চেষ্টা করিতেছেন। পাঁচ বৎসর পূর্ব্বে যে গ্রামে বিদ্যাচর্চার লেশ মাত্রও ছিল না, আজ সেই গ্রামে এখন খুব কম লোকই আছেন যিনি লিখিতে ও পড়িতে শিক্ষা করেন নাই, স্থানীয় বিদ্যালয়টীর অবস্থাও নিতান্ত মন্দ নহে, তবে স্কুলটী মধ্য ইংরাজীতে পরিণত হইলে আরও

সুখের বিষয় হইত। এই সমিতির সভ্যগণের যত্নে একটী গ্রাম্য পাঠাগার স্থাপিত হইয়াছে তাহাতে দেখিলাম জাতীয় পুস্তক এবং সংবাদ পত্র মহাভারত রামায়ণ প্রভৃতি ধর্ম্মশাস্ত্র সকল সংগৃহীত হইয়া অতি যত্নের সহিত সংরক্ষিত হইতেছে, গ্রামস্থ সকল জাতিই অবসর মত এই পাঠাগারে উপস্থিত হইয়া ধর্ম্ম এবং জাতীয় বিষয়ের আলোচনা করিয়া থাকেন। সমিতির এবং পাঠাগারের ব্যয় নির্ব্বাহের জন্য খরচ পত্রাদি কাহাকেও একাকী বহন করিতে হয় না—গ্রামস্থ প্রায় সকলেই সাধ্যানুযায়ী কিছু কিছু করিয়া চাঁদা দিয়া থাকেন, ইহা ব্যতীত বিবাহ অন্নপ্রাশন চূড়াকরণ প্রভৃতি কাজ কর্ম্মেও সমিতির নামে একটী বৃত্তি আদায় হইয়া থাকে, এই গ্রামে প্রায় দেড় শত ঘর মাহিষ্যের বাস; সকলেই যেন এক মন্ত্রে দীক্ষিত, কাহারও সহিত কাহারও মনোমালিন্য নাই, হিংসা বিদ্বেষ নাই, মামলা মোকর্দ্দমার নাম পর্য্যন্তও কেহ কখন শুনিয়াছেন কি না সন্দেহ। বিশেষ কোন কারণে যদি কাহারও সহিত কাহারও মনোমালিন্য উপস্থিত হয় সমিতির সুযোগ্য সম্পাদক শ্রীযুক্ত মতিলাল বাবুই তাহার মীমাংসা করিয়া দেন—এই জন্যই মনে হয় গ্রাম খানিতে মূর্ত্তিমতী লক্ষ্মী যেন স্বয়ং বিরাজ করিতেছেন।

সাধারণ স্বাস্থ্য-রক্ষার প্রতি সমিতির সভ্যগণের যেরূপ যত্ন এবং আগ্রহ পরিলক্ষিত হইল, তাহা অতীব আনন্দ-জনক এবং নয়নমনোমুগ্ধকর। অনেক পল্লীসমিতি পরিদর্শন করিয়াছি, কিন্তু কোথায়ও এরূপ তৃপ্তি অনুভব করিতে পারি নাই—কোন কোন গ্রামের এমনি দুরবস্থা যে ভাল রাস্তা ঘাট ত আদৌ নাই.উপরন্তু যাহা একটু আধটু আছে তাহাও হিংসাবিদ্বেষ বা দলাদলির ঠেলা-ঠেলিতে মেরামতির অভাবে এক প্রকার অব্যবহার্য্য হইয়া পড়িয়াছে, দুর্গোৎসবের সময় হয় ত দশ বিশ হাজার টাকা বৃথা আমোদ প্রমোদে খরচ করিতেছেন, কিন্তু পুকুরের পথে সামান্য এক হাত পরিমাণ জমি হয় ত মাটি দেওয়া অভাবে বাড়ীর মহিলাগণ কাদায় পড়িয়া লট্ পট্ করিতেছেন; ইহা কাহারও দৃষ্টি পথে পতিত হয় না! তার পর রাস্তার দুই পার্শ্বে এবং বাড়ীর চারিধারে পচা গোবর খিচ্ ময়লা প্রভৃতি আবর্জ্জনা সকল এমনি স্তুপাকার করিয়া রাখিয়াছে যে তাহার দুর্গন্ধে কলেরা বসন্ত ম্যালেরিয়া প্রভৃতি রোগের প্রাদুর্ভাব হওয়ায় প্রতি বৎসরই কত শত লোক অকালে কালের করাল কবলে পতিত হইতেছে। আর যাহারা ঐ সকল রোগের হাত হইতে পরিত্রাণ পাইতেছে তাহারও পেট্‌টী মাত্র সার হইয়া অকর্ম্মণ্য অবস্থায় কোন প্রকারে জীবন ভার বহন করিতে থাকে। নদীয়া জেলার খাড়াদী, মুন্সীগঞ্জ, সনাতনপুর, পোলতাডাঙ্গা, প্রভৃতি

পল্লীগুলির অবস্থা ঠিক এইরূপ। কিন্তু উল্লিখিত খয়রামারী গ্রামটী এমনি খট্‌খটে ঝক্‌ঝকে এবং পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন যে গ্রামের ভিতর কোন স্থানেই আমরা পচা-দুর্গন্ধময় পদার্থ দেখিতে পাই নাই; কলেরা, বসন্ত, ম্যালেরিয়া প্রভৃতি সংক্রামক ব্যাধির ভয়ে গ্রামের অধিবাসীদিগকে কখন জর্জ্জরীভূত হইতে হয় নাই, সকলেই হৃষ্টচিত্তে এবং সবল দেহে দৈনিক কার্য্য সকল সম্পাদন করিয়া সন্ধ্যা সমাগমে একত্র মিলিত হইয়া হরিগুণানুবাদ কীর্ত্তন করিয়া থাকেন। আমরা আশা করি, প্রত্যেক পল্লীসমিতির অন্তর্ভুক্ত গ্রাম সমুহের সমাজপতিগণ এইরূপ আদর্শে কার্য্য করিয়া দেশের এবং সমাজের কল্যাণ সাধন করিবেন। এইরূপ প্রণালীতে সমাজগঠন করা বিশেষ কিছুই কঠিন ব্যাপার নহে, ইচ্ছা করিলে অতি অল্প সময় মধ্যেই অনায়াসে সাধন করা যাইতে পারে, তবে চাই কেবল একটু মনোযোগ এবং স্বার্থত্যাগ। এই সমিতি পরিদর্শনকালে চাকদহ মাহিষ্য সমিতির সভাচার্য্য পণ্ডিত শ্রীযুক্ত শ্রীহরি স্মৃতিরত্ন ও ক্ষেত্রহরি ভট্টাচার্য্য এবং উক্ত সমিতির সম্পাদক ও সহকারী সম্পাদক শ্রীযুক্ত তারিণী চরণবিশ্বাস ও বিহারী লাল বিশ্বাস ভ্রাতৃদ্বয় নূতন পাড়া নিবাসী শ্রীযুক্ত গোকুল কৃষ্ণ বিশ্বাস, নদিয়া মেদিনীপুর পল্লীসমিতির প্রধান পৃষ্ঠপোষক শ্রীযুক্ত বাবু শ্রীহরি বিশ্বাস প্রভৃতি মহাশয়গণ উপস্থিত থাকিয়া আমাদিগকে যেরূপ ভাবে যত্ন এবং সাহায্য করিয়াছেন, তজ্জন্য আমরা তাঁহাদিগকে আন্তরিক ধন্যবাদ প্রদান করিতেছি। নদীয়া জেলার চাকদহ থানার অধীন গঙ্গাপ্রসাদপুর, পোড়াডাঙ্গা, মুকুন্দ নগর, ঝাউচড়া, দুয়ারডাঙ্গা, হোমনাপোতা, হেড়েরখাল, নূতনপাড়া, কেলেগোড় প্রভৃতি আরও অনেক গ্রামে পল্লীসমিতি সংগঠিত হইয়াছে, সময়াভাবে আমরা সে গুলি পরিদর্শন করিতে পারি নাই, আগামী আশ্বিন মাস মধ্যে ঐ সকল স্থানের মাহিষ্য ভ্রাতৃগণের সহিত দেখা সাক্ষাৎ করিবার বাসনা রহিল। খয়রামারি পল্লীসমিতির সম্পাদক শ্রীযুক্ত বাবু মতিলাল মণ্ডল, সহকারী সম্পাদক শ্রীযুক্ত বাবু সীতানাথ মণ্ডল এবং অন্যান্য সভ্যগণ শ্রীযুক্ত সয়ারাম মণ্ডল, শ্রীযুক্ত ক্ষেপাচাঁদ দাস, শ্রীযুক্ত বিনোদচন্দ্র খাঁড়া, শ্রীযুক্ত পাঁচুলাল দাস ও শ্রীযুক্ত পাবনচন্দ্র দাস। অন্যান্য পল্লীসমিতিগুলির কার্য্যকারী মহাশয়দিগের নাম ক্রমশঃ প্রকাশিত হইবে।—শ্রীরামপদ বিশ্বাস।

মুর্শিদাবাদ গৌড়াদ্য-বৈদিক-ব্রাহ্মণ সমিতি।—বিগত ৩০শে জ্যৈষ্ঠ শুক্রবার অপরাহ্ণে ৪ ঘটিকার সময় খাগড়া নিবাসী জমিদার শ্রীযুক্ত বাবু হরিদাস বিশ্বাস মহাশয়ের বাটীতে উক্ত সমিতির বার্ষিক অধিবেশন হইয়াছিল,

মুর্শিদাবাদ নিবাসী প্রায় দুই শতাধিক ব্রাহ্মণ এবং প্রধান প্রধান মাহিষ্যগণ নিমন্ত্রিত হইয়া সভায় যোগদান করিয়াছিলেন। ভ্রান্তি-বিজয় প্রণেতা পণ্ডিত শ্রীযুক্ত হরিশ্চন্দ্র চক্রবর্ত্তী মহাশয় সভাপতির আসন গ্রহণ করেন। পণ্ডিত ব্রজেন্দ্রকুমার বিদ্যাবিনোদ এবং সভাপতি মহাশয় ব্রাহ্মণদিগের কর্ত্তব্য সম্বন্ধে সুদীর্ঘ বক্তৃতা করেন। সভাস্থলে স্থিরীকৃত হইল যে, বর্ত্তমান মাস মধ্যেই বহরমপুর সহরে যাহাতে একটী "গৌড়াদ্য-বৈদিক ব্রাহ্মণ ছাত্রাবাস" প্রতিষ্ঠিত হয় তজ্জন্য সকলকেই চেষ্টা করিতে হইবে। মাহিষ্য ব্যাঙ্কিং এণ্ড ট্রেডিং কোম্পানির সহকারী সম্পাদক শ্রীযুক্ত বাবু রামপদ বিশ্বাস মহাশয় উক্ত কোম্পানির উদ্দেশ্য সকলকেই বুঝাইয়া দিলে উপস্থিত ব্রাহ্মণগণ কোম্পানির উন্নতি সম্বন্ধে যত্নবান্ থাকিবেন বলিয়া স্বীকৃত হইলেন।

শ্রীঅশ্বিনীকুমার চক্রবর্ত্তী, শিক্ষক, গেড়ামরা স্কুল, মুর্শিদাবাদ।

রাজসাহী গৌড়াদ্য-বৈদিক ব্রাহ্মণ সমিতি।—বিগত ১৩১৯ সালের মাঘ মাসে সিংহাগড়দহ নিবাসী শ্রীযুক্ত শরৎ চন্দ্র তলাপাত্র মহাশয়ের কনিষ্ঠ ভ্রাতা শ্রীযুক্ত গিরিশচন্দ্র তলাপাত্র মহাশয়ের শুভ বিবাহের পাকস্পর্শ উপলক্ষে নাটোর ও রামপুর বোয়ালিয়ার ব্রাহ্মণ মহোদয়গণ সমবেত হইয়াছিলেন দরিদ্রবালকগণের শিক্ষার বন্দোবস্ত ও সমিতির ব্যয়ভার সঙ্কুলানের জন্য অবস্থানুসারে ৶০ দুই আনা ।০ আনা ।৶০ আনা ॥০ আট আনা ও সভাপতি মহোদয়ের ১৲ টাকা হিসাবে মাসিক চাঁদা ধার্য্য করা হইয়াছে এই সমিতি গঠন কালে সমবেত ব্রাহ্মণ মণ্ডলী ১৲ এক টাকা মূল্যের একখানি ষ্ট্যাম্পে একরার পত্র লিখিয়া দিয়া এইরূপ প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হইয়াছেন যে, আমরা কেহ কখনও যদি আমাদের এই নবগঠিত সমিতির অবাধ্য হইয়া কোন কাজ করি বা সমিতির কোনও আদেশ অমান্য করি বা অন্যায়পূর্ব্বক কাহারও যজমান গ্রহণ করি; তাহা হইলে এই একরার সূত্রে গভর্ণমেণ্ট সরকারে ১০০৲ এক শত টাকা জরিমানা স্বরূপ প্রদান করিব। বর্ত্তমান সনের ১৪ই বৈশাখ এই সমিতির প্রথম অধিবেশন হয়। ইহাতে আমাদের স্বজাতীয় ব্রাহ্মণগণের ও মাহিষ্যগণের তথ্যপ্রদ ভ্রান্তি-বিজয়, তমলুকের ইতিহাস প্রভৃতি কয়েক খানা পুস্তক ও সমাজিক মাসিক পত্র ক্রয় করিবার মত স্থিরীকৃত হয়। এই সভা বঙ্গীয় মাহিষ্য সমিতির সহিত একই সূত্রে ও উদ্দেশ্যে পরিচালিত হইবে।

শ্রীযদুনাথ তলাপাত্র—সহ-সম্পাদক।

মাহিষ্য-সমাজ।

[তৃতীয় ভাগ, পঞ্চম সংখ্যা—ভাদ্র, ১৩২০ সাল।]

মাহিষ্য কৈবর্ত্ত।

সংহিতা পুরাণ শাস্ত্রে আছে নিরূপণ,
ক্ষত্রবীর্য্যে বৈশ্যাগর্ভ্ভে মাহিষ্য জনম।

মাহিষ্যের কেহ কেহ সময় ক্রমেতে
কার্য্যান্তরে করে বাস কিম্বর্ত্ত দেশেতে—
কৃষিকার্য্য-বৃত্তিধারী জীবিকা-নির্ব্বাহকারী,
'কৈবর্ত্ত' হইল আখ্যা তথা বাস তরে ;
বাহুবলে রাজ্যেশ্বর কেহ দেশান্তরে।

মহীকে কর্ষণ জন্য প্রথম উপাধি
'মাহিষ্য' বলিয়া লোকে ঘোষে নিরবধি ;
কিংবৃত্তি+অণ — চাষ তদ্ধেতু কৈবর্ত্ত, দাস ;
যথা কৃষ্ণ রাশিনাম রাখে কেহ যদি,
নিদ্রাভঙ্গ 'রাম' নাম পরে তত্ত্বনিধি।

মাহিষ্য—কৈবর্ত্ত চাষী—এক নিঃসন্দেহ ;
যেরূপ 'মণ্ডল' আখ্যা পূর্ব্বে পায় কেহ,
তদন্তর কার্য্য মত 'সর্দ্দার' উপাধি যুক্ত ;
সেরূপ কৃষাণ, দাস, হালিক কৈবর্ত্ত,
একই মাহিষ্য জাতি হতেছে কীর্ত্তিত।

শ্রীহৃষীকেশ দাস।
৪২।১০ ডাক্তার লেন, কলিকাতা।

বরান্তরের ভুঁইয়া বংশের বিবরণ।

(২১ শে ও ২৮ শে আষাঢ় ১৩১৯ এডুকেশন-গেজেট হইতে উদ্ধৃত)

বিগত বর্ষার প্রারম্ভে কোন একজন উচ্চ শিক্ষিত ভদ্রলোক বরান্তর অঞ্চলের তিনটী বংশের বিবরণ ও বংশপত্র সংগ্রহ করিয়া দেওয়ার জন্য আমাদিগকে অনুরোধ পত্র লিখিয়াছিলেন। বরান্তরের ভুঁইয়া বংশ ঐ তিনটী বংশের অন্যতম। উক্ত বংশের বর্ত্তমান বৃদ্ধ ও প্রবীণ নেতা আমাদের একজন বিশিষ্ট বন্ধু। তিনি এতকাল স্ববংশের যে বিবরণটুকু ও বংশ পত্র খানা পক্ষপুটে আবৃত করিয়া অনর্ঘরত্নের ন্যায়, দরিদ্রের ধনের ন্যায়, লোকচক্ষুর অন্তরালে রাখিয়াছিলেন, আমাদের বিশেষ অনুরোধে তিনি তাহার একখণ্ড প্রতিলিপি প্রেরণ করিয়াছেন। তাঁহার বিশেষ অনুরোধে উক্ত বংশপত্র ও বিবরণটুকু আমি নিজেই প্রকাশিত করিতে বাধ্য হইলাম। বিবরণটুকু নিতান্ত ক্ষুদ্র ও অসম্পূর্ণ; কিন্তু উহাদ্বারা এবং বংশ পত্রখানা দ্বারা পূর্ব্ব ময়মন্‌সিংহের একটু সুন্দর ঐতিহাসিক আলোক প্রাপ্ত হওয়া যায়।

পূর্ব্ব ময়মন্‌সিংহের ইতিবৃত্তের প্রতি ইদানীং অনেকের দৃষ্টি পতিত হইয়াছে। ১৩১৮ শ্রাবণের নব্যভারতে শ্রীমৎ পণ্ডিত সেবানন্দ ভারতী মহাশয় রাজা নবরঙ্গ রায় ও ভোগবেতাল রাজ্যের ইতিবৃত্ত লিখিয়াছেন। শ্রীযুক্ত ভুবনেশ্বর চৌধুরী নামক একজন দক্ষ লেখক ঐ ভোগবেতাল বা চারিপাড়ার রাজা নবরঙ্গ রায়ের প্রতি লোকের দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়াছেন। এদিকে আবার প্রতিভার সুলেখক শ্রীযুক্ত পূর্ণ চন্দ্র ভট্টাচার্য্য নবরঙ্গ রায়ের সবিস্তার বিবরণ উদ্ঘাটিত করিয়া ক্রমশঃ প্রতিভায় প্রকাশ করিতেছেন। অন্য একজন লেখক না কি মুরশিদাবাদে বসিয়া পূর্ব্ব ময়মন্‌সিংহস্থ জঙ্গলবাড়ীর সেই প্রসিদ্ধ ঈশা খাঁ মসনদ্ আলি বংশের বিবরণ লিখিতেছেন। ভাটী রাজ্যের যে উত্তরাংশে এক দিন রাজা নবরঙ্গ রায় ও পরে ঈশা খাঁ মসনদ্ আলী প্রভাব বিস্তার করিয়াছিলেন, সেই স্থানেই কতক কাল পরে বরান্তরের ভুঁইয়াদের পরাক্রম বিস্তৃত হইয়াছিল। উল্লিখিত রাজা নবরঙ্গ রায়ের বৃত্তান্তের সঙ্গে ভুঁইয়াদের আদি বিবরণ বিশেষ ভাবে জড়িত। তাই আজ বরান্তরের ভুঁইয়াদের বিবরণ জানা আবশ্যক হইয়া উঠিয়াছে।

ময়মনসিংহের উত্তর পূর্ব্ব সীমা যে রেখায় শ্রীহট্টের সুনামগঞ্জ মহকুমাকে আলিঙ্গন করিয়াছে, ঐ স্থান হইতে কিছু পশ্চিমে, একটী ক্ষুদ্র নদীর পশ্চিম তীরে, বরান্তর নামে একখানা গণ্ডগ্রাম বিদ্যমান। আপাততঃ উহাতে দৃষ্টি আকৃষ্ট করিবার কিছুই নাই। ঐ গ্রামেই বরান্তরের ভুঁইয়াদের আদি বসতিস্থান এবং ঐ স্থানেই এখনও ভুঁইয়াবংশীয় অনেকে বাস করিতেছেন। যদিও ইহঁাদের অবস্থা এখন শোচনীয়, তথাপি সুদূরবিস্তৃত চতুঃপার্শ্ববর্ত্তী স্থানে ইঁহাদের পূর্ব্ব প্রভাবের স্মৃতি এখনও বিলুপ্ত হয় নাই।

বরান্তর অঞ্চল এখনও জলভুয়িষ্ট দেশ। বর্ষাকালে ঐ স্থানের তরঙ্গায়িত জলরাশি ধূধূ করিতে থাকে। সে তরঙ্গময় জলের বিশালতা দিগন্ত পর্য্যন্ত বিস্তৃত বলিয়া মনে হয়। উহা উত্তর দিকবর্ত্তী খাসীয়া পর্ব্বতমালার পাদদেশে প্রতিহত হইয়া থাকে।

এখনও এই সকল দেশে বর্ষাকালে বাড়ীর নিয়েই জলের গভীরতা ১২।১৪ হাতের ন্যূন থাকে না। চতুর্দ্দিকে বাঁশ ও বেনার বেড়ার দ্বারা বেষ্টিত না থাকিলে, কোন বাড়ীই দূরাগত ভীষণ তরঙ্গমালার আঘাত সহ্য করিতে পারে না এবং ৪।৫ বৎসর ক্রমাগত ঐরূপ অরক্ষিত অবস্থায় থাকিলে শেষে তাহার আর কোন চিহ্ন প্রাপ্ত হওয়া যায় না। খাসিয়া পর্ব্বত হইতে প্রবাহিত জলরাশির সঙ্গে আগত পাল যদি প্রতি বর্ষে অন্যূন এক অঙ্গুলি পরিমিত পতিত হওয়া ধরা যায়, তবে মনে করিতে হয়, ৪০০ বৎসর পূর্ব্বে এই সকল স্থানে যাঁহারা বসতি করিতেন বর্ষায় তাঁহাদের বাড়ীর চতুর্দ্দিকে অন্যূন ২০।২৪ হাত গভীর জল থাকিত। এই সকল দুর্গম দেশই সেই প্রাচীন "ভাটী" রাজ্যের উত্তর খণ্ড— এই স্থানে ভিন্ন ভিন্ন সময়ে ভিন্ন ভিন্ন বংশীয় ভূঞ্যাগণ শাসন করিতেন।

ভুঁইয়াগণ তাঁহাদের বংশের যে বিবরণ প্রদান করিয়াছেন ভাষাংশে কিছু সংশোধিত করিয়া প্রায় তাহাই অবিকল নিম্নে উদ্ধৃত করা হইল। আলোচনার সুবিধার্থে নিম্নে পাদ টীকার আকারে আমাদের মন্তব্য মধ্যে মধ্যে উপনিবদ্ধ করা হইল। বুঝিবার পক্ষে সুবিধা হইবে বিবেচনায় বিবরণের অগ্রভাগেই বংশ পত্রখানা উদ্ধৃত করা হইল :—

বংশ-পত্র।

বরান্তরের ভুঞা বংশ।
——(:০:)——
মহামানিক্য রায় (১)
কামদেব রায় (২)
হাওরী রায় (৩)
কনক রায় (৩)
রাঘব ওরফে কালু ভুঞা রায় (৪)
শুভঙ্কর ভুঞা (৫)
দামোদর ভুঞা (৬)
বুদ্ধিমন্ত খাঁ (৭)
চন্দ্রকৃষ্ণ খাঁ (৮)
পুরুষোত্তম ভুঞা (৯)
জগন্নাথ ভুঞা (১০)

সিংহজিৎ ভুঞা (১১)
রামনারায়ণ ভুঞা (১২)
রামগোপাল ভুঞা (১৩)
শুকদেব ভুঞা (১৪)
গণেশ ভুঞা (১১)
কুশল ভুঞা (১২)
হরিপ্রসাদ (১৩)
ভোলানাথ (১৪)
রঘুবর (১৫)
মতীরাম (১৫)
লক্ষ্মীনারায়ণ (১৫)
রাম (১৬)
কিশোর
রামজয় (১৭)
নগরবাসী (১৮)
সোণারায়
রামজীবন
দুর্গাপ্রসাদ (১৬)
শ্যামকান্ত (১৬)
রামকেশব (১৬)
পদ্মলোচন (১৭)
ব্রজমোহন
কৈলাস
সুভদ্রা
রামলোচন (১৭)
রামকান্ত (১৭)
কৃষ্ণকান্ত (১৭)
রাধাকান্ত (১৭)
রামধন (১৭)
দেবেন্দ্র
৩ কন্যা
মহেন্দ্র (১৮)
সুরেন্দ্র
কামাখ্যানাথ
২ কন্যা
রামচন্দ্র
রামহরি
হুকুমচাঁদ (১৮)
ঈশ্বর (১৯)
নবকিশোর
কৃষ্ণমণি
চন্দ্রমণি
সূর্য্যমণি
রামকমল
রাজচন্দ্র
৬ কন্যা
গোলক
১ কন্যা
কালী (১৮)
যতীন্দ্র (১৯)
নরেন্দ্র (১৯)
দ্বারকা
রাজকুমার
রামনাথ
প্রকাশ
শকুন্তলা
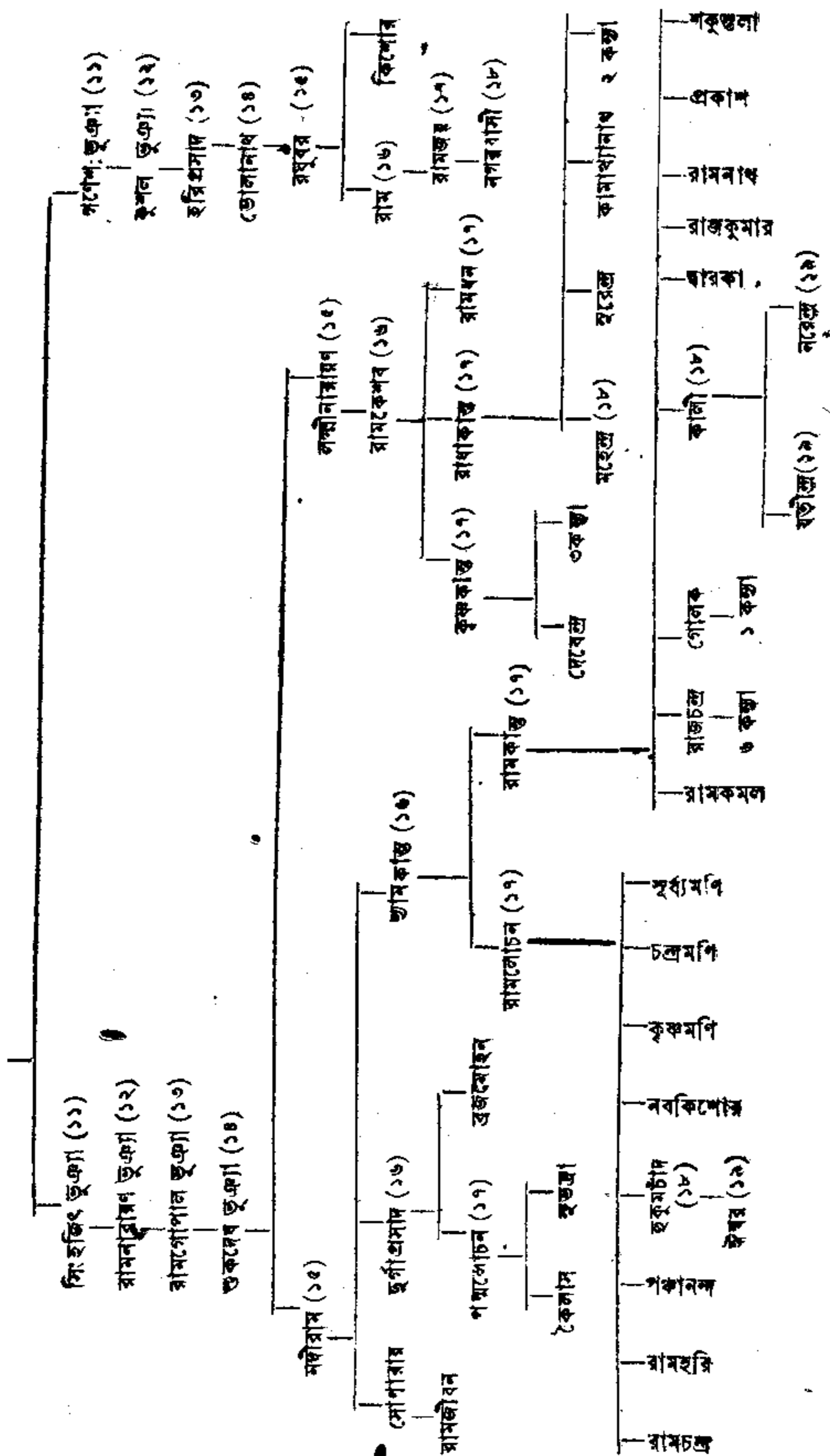
এই পর্য্যন্ত ১৯ পুরুষ। এই পুরুষীয় সমস্ত নাম দেওয়া গেল না। নামের দক্ষিণে বন্ধনীর মধ্যে যে অঙ্ক লিখিত হইয়াছে তাহা মূল পুরুষ হইতে সেই সেই ব্যক্তি কত পুরুষ তাহা দেখাইবার জন্য।

এই বংশ পত্রোক্ত মহামাণিক্য রায়ই ভুঞ্যাদের আদি পুরুষ। নি রাঢ় দেশ [ক] হইতে নিজ পুরোহিত গুণাকর চক্রবর্ত্তী দুই জন ভৃত্য, এক জন নাপিত, এক জন ধোপা ও কতিপয় রক্ষক সহ ময়মনসিংহ জেলার পূর্ব্বাংশস্থ চারিপাড়া গ্রামে রাজা নবরঙ্গ রায়ের রাজধানীতে আসিয়া উপস্থিত হন।

[ক] এই রাঢ় দেশ নিম্ন লিখিত কারণে তমলুক বলিয়া আমার প্রতীতি হয়। তমলুক হইতে গঙ্গার পশ্চিম তটবর্ত্তী কতক স্থান গঙ্গারাঢ় নামে কথিত হইত। উপরোক্ত রাঢ় শব্দে মেদিনীপুর জেলা বা তৎসন্নিহিত কোন না কোন স্থান হইবে। পাঠককে বংশ-পত্রোক্ত প্রথম ১০টী নাম এবং ১১ শ হইতে ১৫শ পুরুষ পর্য্যন্ত নাম গুলির সঙ্গে তমলুক রাজবংশের শেষ ২৮ টী নামের মধ্যে প্রথম ২০।২২ টী নাম তুলনা করিতে বলি। তমলুক বংশের কালুভুঞ্যা রায় ধিতাই ভুঞ্যা রায়, ভাঙ্গর ভুঞ্যা রায়, জগন্নাথ ভুঞ্যা', রাম ভুঞ্যা রায় প্রভৃতি নামের সঙ্গে এই ক্ষুদ্র ভুঞ্যা বংশের মহামাণিক্য রায়, হাওরী রায়, কন্দক রায়, রাঘবেন্দ্র ওরফে কালুভুঞ্যা, শুভঙ্কর ভুঞ্যা, জগন্নাথ ভুঞ্যা, সিংহজিৎ ভুঞ্যা, রঘুবর ভুঞ্যা প্রভৃতি নামের শব্দ ও প্রকৃতি গত ঐক্য চিন্তা করিতে অনুরোধ করি। উভয় বংশই একই "মাহিষ্য" সম্প্রদায়-ভুক্ত। উভয় বংশই বাঙ্গালার এক একটী প্রান্তে অবস্থিত। তমলুক-বংশ একটী প্রাচীন অধিরাজ-বংশ এবং ইহাঁরা একটী ক্ষুদ্র ভুঞ্যা বংশ মাত্র। কিন্তু সকল গুলি অবস্থা চিন্তা করিলে মনে হয়, উভয় বংশের কেন্দ্র স্থান অতি নিকটবর্ত্তী ছিল। মনুর বিধানানুসারে ব্রাহ্মণের নাম কুশলযুক্ত দুর্ব্বল হইবে, আর যোদ্ধার নাম বলবীর্য্য-ব্যঞ্জক হইবে। জঙ্গলমহাল ছোটনাগপুর, মেদিনীপুর, বাঁকুড়া প্রভৃতি রাজন্যবংশীয়দিগের বংশ পত্রগুলি পরীক্ষা করিলে দেখা যায়—তাহাদের নাম যেন মনুর বিধান মতেই অনুষ্ঠিত হইয়াছিল। তমলুকের সেই ধিতাই ভুঞ্যা প্রভৃতি, বিষ্ণুপুরের সেই বীর হাম্বীর প্রভৃতি, গোপভূমির সেই ইছাই ঘোষ ভল্লুকপদ প্রভৃতি বীরগণের নাম একই আকারে গঠিত। বরান্তরের ভুঁইয়াদের নামে ঠিক ঐ প্রকৃতির ছায়াই পতিত হইয়াছে। ইহাতে মনে করি এই বংশের আদি কেন্দ্র গঙ্গারাঢ়ে বর্ত্তমান ছিল।

রাজা তাঁহার পরিচয় গ্রহণান্তে [খ] তাঁহাকে স্বজাতীয় এক জন উচ্চবংশীয় রাজপুত্র জানিয়া নিজ কন্যাদান করেন এবং স্বকীয় রাজধানীতে স্থাপন করেন।

মহামাণিক্য রায় কিছুকাল রাজধানীতে বাস করিয়াই তথায় বাস করিতে অসম্মতি প্রকাশ করেন। রাজা 'সাধিয়া ভজিয়া' কোন মতেই তাঁহাকে স্বগৃহে রাখিতে সমর্থ না হইয়া নিজ রাজ্যেরই এক অংশ দান করতঃ রাজধানী হইতে দূরে বরান্তর গ্রামে তাঁহাকে স্থাপিত করেন। এই জন্যই দেশে প্রসিদ্ধ প্রবাদ চলিয়াছে—"সাধিয়া ভজিয়া বরান্তর" [গ]।

[খ] এই পরিচয় গুলির দ্বারাও অনুমান হয় নবরঙ্গ রায় তখনও রাঢ়দেশীয় বা গঙ্গারাঢ়ীয় স্বজাতি সমাজ ভুলিয়া যান নাই।

[গ] ভুঞ্যাদের এই কথাটী চিরপ্রচলিত একটী কারিকার সম্পূর্ণ বিরুদ্ধ। কারিকাটী নিম্নে উদ্ধৃত হইল। এদেশে আপামর সাধারণ লোক এই কারিকা মুখে মুখে বলিয়া থাকে। কারিকাটী এইঃ—

"ভোগবেতাল বংশীকুড়া, ছাতী ইছা বোয়াল জুড়া,
দামিয়া তেড়িয়া একঘর, সাজিয়া ভজিয়া বরান্তর।"

অর্থাৎ (১) ভোগ (২) বেতাল (৩) বংশী কুড়া (৪) ছাতী—বরাখিয়া প্রভৃতি প্রত্যেকে এক এক ঘর, দামিয়া ও তেড়িয়া মিলিয়া (৭) একঘর, (৮) বরান্তরের ভুঞ্যারা সাধিয়া ভজিয়া একঘর হইয়াছেন। ভুঞ্যারা এই সাধা ভজাটা নবরঙ্গ রায়ের স্কন্ধে চাপাইয়া দিতেছেন।

প্রবাদ এই, রাজা নবরঙ্গ রায় ভাটী রাজ্যে ক্ষমতা বিস্তার করিবার পর ঐ অঞ্চলস্থ ৫।৭ জন স্বজাতীয় ক্ষুদ্রতর ভুঞ্যা মিলিত করিয়া একটী দলের (Confederacy) প্রতিষ্ঠা করেন, এবং দলবর্ত্তী লোক দিগকে ভিন্ন ভিন্ন কেন্দ্রের ভার প্রদান করেন। তাঁহার পরবর্ত্তী কালে এই দলটী ক্রমশঃ বিস্তার লাভ করিয়াছিল ইহাঁদেরই নাম কারিকা আকারে গ্রথিত ঐ দেশে সর্ব্বত্র প্রচলিত হইয়া রহিয়াছে। এই দলপতিগণের বসতি স্থানগুলি এবং প্রায় সমস্তগুলি দলপতি বংশই মধ্যবিত্ত ভূম্যাধিকারিরূপে এখনও বিদ্যমান। ইহাদের বসতি স্থানগুলির অবস্থান চিন্তা করিলেই রাজা নবরঙ্গ রায়ের ক্ষমতার বিস্তৃতি সহজে হৃদয়ঙ্গম হইবে। (১) ভোগ (২) বেতাল (৩) দামিয়া এবং (৪) তেরিয়া কেন্দ্র ময়মনসিংহ জেলার কিশোরগঞ্জ মহকুমায় অবস্থিত ঐ সকল

এই গ্রাম বর (আশীর্ব্বাদ) স্বরূপ প্রদত্ত হয় বলিয়া বরান্তর নামে প্রসিদ্ধ হইয়াছিল [ঘ]।

মহামাণিক্য রায়ের পুত্র কামদেব রায়। ইনি মহামাণিক্যের মৃত্যুর পর তাঁহার অধিকার প্রাপ্ত হন এবং খাসিয়া পর্ব্বতের পাদতলস্থ বংশীকুড়া পর্য্যন্ত প্রভাব বিস্তার করেন। উক্ত কামদেব রায়ের পত্নী গর্ভবতী হইয়া দশম মাসে একটা চর্ম্মাবৃত থলী * প্রসব করেন। দাসীগণ তাহা এক গর্ত্তে নিক্ষেপ করে। কতকগুলি কাক জুটিয়া ঐ চর্ম্মথলী চঞ্চুর আঘাতে ছিঁড়িয়া ফেলে। তৎপর উক্ত চর্ম্মথলী হইতে কতকগুলি ছোট ছোট শিশু বাহির হইয়া কিলিমিলি করিতেছে দেখা গেল। দৈবে কামদেব রায় ঐ স্থানে উপস্থিত হইয়া প্রকৃত বৃত্তান্ত অবগত হইয়া একটা পাত্রে উঠাইয়া অন্তঃপুরে প্রেরণ করেন। কামদেব রায়ের পত্নী গণিয়া উক্ত পাত্রে আঠারটী সন্তান * প্রাপ্ত হন। তিনি বৈদ্যগণের উপদেশানুসারে বহু যত্নে ধাত্রীগণের সাহায্যে শিশুগুলিকে বাঁচাইয়া পোষণ করিতে

স্থান হইতে প্রায় দুই দিনের পথ উত্তরে নেত্রকোণা মহকুমায় বরান্তর গ্রাম এবং তাহার দেড় দিনের পথ উত্তরে ঐ মহকুমারই খসিয়া পর্ব্বতের হেশনায় বংশীকুড়া অবস্থিত। কাজেই এই পয়ারটী পূর্ব্ব ময়মনসিংহের ইতিহাসে প্রচুর আলোক বিক্ষিপ্ত করিয়াছে। ইহাতে নিঃসন্দেহ প্রতীতি হয়, মুসলমান অধিকারের পূর্ব্বে পূর্ব্ব ময়মনসিংহের বহুস্থানই ঐ সম্প্রদায়ের ভুঁইয়াগণের শাসনাধীন ছিল। ঐ দেশে সেনদিগের প্রভাব বিস্তৃত ছিল না। সেই জন্য এখনও পূর্ব্ব ময়মনসিংহকে "বল্লাল শূন্য" বলে। সেই জন্য এখনও পূর্ব্ব ময়মনসিংহে রাঢ়ী শ্রেণীয় ব্রাহ্মণের ঘটক কুলীনের বসতি নাই; চন্দ্রদ্বীপ ও যশোর সমাজীয় কুলীন মৌলিক কায়স্থের বসতি নাই।

[ঘ] ভুঞাদের বোধ হয়, অন্যঃ (নূতনঃ) বরঃ বরান্তরম্ এইভাবে গ্রামের ব্যুৎপত্তি দেওয়া ইচ্ছা। এই সকল ব্যুৎপত্তির বিশেষ কোন মূল্য নাই।

* ধৃতরাষ্ট্র পত্নী গান্ধারী মাংসপিণ্ড প্রসব করিয়াছিলেন। তাহা হইতে ১০০ পুত্র ও এক কন্যা প্রাপ্ত হয়েন। সূর্য্যবংশীয় রাজা সগর ষষ্টিসহস্র সন্তান লাভ করিয়াছিলেন। এই ঘটনা যদি সত্য বলিয়া গ্রহণ করা হয়। তবে ইহাও সত্য হইতে পারে। একই গর্ভে তিনটী পর্য্যন্ত সন্তান প্রসূত হইয়াছে ইহা অনেকেই জানেন। এক্ষণে উপরোক্ত উপাখ্যান গ্রহণ করা না করা পাঠকের ইচ্ছাধীন, কিন্তু প্রাচীন বংশবিবরণে ঐরূপ আছে।

থাকেন। কিন্তু শৈশবেই আঠারটী পুত্রের মধ্যে ষোলটী প্রাণত্যাগ করে। ছুইটী পুত্র জীবিত থাকে। উহাদের মধ্যে একের নাম হাওরী রায় ও অন্যের নাম কন্দক রায়। হাওরী রায় একজন বলবান ও ক্ষমতাপন্ন লোক হইয়া পিতার অধিকার প্রাপ্ত হন; কন্দক রায় দুর্দ্দান্ত হইয়া অত্যাচার পরিত্যাগ করেন এবং কাহারও মতে আসগোড়াইল, কাহারও মতে পুকুরপার, গ্রামে যাইয়া নিরুদ্দেশ হন। হাওরী রায়ের এক পুত্র জন্মে। এই পুত্রের নাম রাঘব ওরফে কালু ভুঞ্যা রায়। ইহাঁর সময় হইতেই এই বংশে ভুঁইয়া উপাধি প্রচলিত হইয়াছে। ইনি এই বংশের উর্দ্ধতন পঞ্চদশ পুরুষ। ইনি অল্প বয়সেই দেবতা সিদ্ধি করেন এবং অদম্য হইয়া উঠেন। দেবতা তাঁহার বশীভূত মনে করিয়া ভয়ে কেহই তাঁহার সম্মুখীন হইত না এবং তাঁহার নামে পূজা দিত। তিনি সত্বর বলবান অনুচর সমূহ সংগ্রহ করিয়া বহুদূর পর্য্যন্ত ক্ষমতা বিস্তার করেন এবং তাঁহার সেনা ও নৌশ্রেণী ঐ অঞ্চলে ভীতিপ্রদ হইয়া উঠে। তিনি একজন ভুঁইয়া বলিয়া দেশে গণ্য হন। ক্রমশঃ তাঁহাকে লোকে ভাটী রাজ্যের ভুঁইয়া বলিয়া গ্রহণ করিতে বাধ্য হয়। প্রবাদ আছে, তাঁহার নামে নৌকা শুকনা দিয়া চলিত। এই সময় হইতে বরাস্তর অঞ্চলে এখন পর্য্যন্ত একটা ব্যবহার চলিতেছে। কোন নৌকা ঠেকিলে, নৌকা জল হইতে শুকনায় কি শুকনা হইতে জলে নামাইতে হইলে, নৌকা টানিবার সমকালে মাজী মাল্লাগণ "হারে, ভাটীর ভুঞ্যা কালুরায়" শব্দে ডাক ছাড়িতে থাকে!! এই একটী ক্ষুদ্র ডাকের মধ্যে কালুরায় ভুঁঞ্যার কত কাহিনীই জড়িত। রাঘব ওরফে কালু ভুঁইয়া রায় সমগ্র ভাটীর না হইলেও ভাটীর উত্তর খণ্ডের ভুঞ্যা হইয়াছিলেন।

দামোদর ভুঁইয়া (৬) পর্য্যন্ত এতদঞ্চলে এই বংশ ক্ষমতাপন্ন ভুঞ্যা ছিলেন। বুদ্ধিমন্ত খাঁ (৭) তৎপুত্র (৮) চন্দ্রকৃষ্ণ খাঁ নবাবের অনুগত ছিলেন। (৯) পুরুষোত্তম ভুঁইয়া, (১০) জগন্নাথ ভুঞ্যা এবং (১১) সিংহজিৎ ভুঞ্যা প্রভাবশালী লোক ছিলেন। সিংহজিৎ ভুঞ্যা কিছু অদম্য প্রকৃতির লোক হওয়াতেই নবাবের সরকারে একজন দরবারী স্বরূপ হাজির থাকিতে বাধ্য হইয়াছিলেন। তাঁহার উপর কোন্ কার্য্যের ভার ছিল তাহা লিখিত নাই, তিনি প্রচুর অর্থ রাখিয়া গিয়াছিলেন; ইহাতেই বুঝায় তাঁহার হাতে কোন আয়জনক কার্য্যের ভার ছিল।

সিংহজিৎ ভুঁঞ্যার মৃত্যুর পর তাঁহার পুত্র রাম নারায়ণ ভুঁঞ্যা পিতার স্থানে স্বয়ং নবাব দরবারে উপস্থিত না হইয়া নিজের শ্যালক এক মজুমদার

মহাশয়কে [ঙ] নিজ প্রতিনিধি রূপে দরবারে স্থাপন করেন এবং স্বয়ং সুখভোগ করিবার উদ্দেশে বাটীতে বসেন, কিন্তু তাঁহার অদৃষ্টে সুখভোগ ঘটে নাই।

রামনারায়ণের হস্তে তাঁহার পিতা সিংহজিৎ ভুঁঞ্যার অর্জ্জিত প্রচুর অর্থ ছিল জানিয়া তাঁহার দস্যুপ্রকৃতি ভৃত্যবর্গ তাঁহাকে বধ করিয়া সমস্ত অর্থ নিজেদের মধ্যে বাঁটিয়া লওয়ার জন্য একটী গুরুতর ষড়যন্ত্র করে। এই ষড়যন্ত্রের ফলে তাহারা উদ্ধত হইয়া উঠে। ভুঞ্যার পত্নী এই ষড়যন্ত্রের সংবাদ জানিতেন না। তিনি ভৃত্যাদিগের প্রধান প্রধান ব্যক্তিকে উদ্ধত ব্যবহার করিতে দেখিয়া এক দিবস বিশেষ তিরস্কার করেন। তাহাতে ষড়যন্ত্র প্রকাশ পাইল মনে করিয়া ভৃত্যগণ সেই রাত্রেই বহির্বাটিতে শয়ান অবস্থায় তরবার দ্বারা ভুঞ্যার মস্তক ছেদন করিয়া ফেলে এবং চীৎকার করিতে থাকে যে "দস্যুদল আপতিত হইয়া ভুঞ্যাকে কাটিয়া গেল"।

ভুঞ্যা পত্নী তখন তিন চারি মাসের গর্ভবতী ছিলেন। এত ভৃত্য কর্ত্তৃক বেষ্টিত থাকা অবস্থায় দস্যুগণ এত সহজে ভুঞ্যার শিরশ্ছেদ করিল এবং করিয়াই চলিয়া গেল। এই কথা শুনিয়া ভুঞ্যাপত্নী বিশেষ চিন্তান্বিত হইলেন, বহির্ব্বাটীতে যতদূর সম্ভব সাবধানে যাইয়া স্বামীর মৃতদেহ ও প্রধান প্রধান ভৃত্যের কিরূপ একটা ভাব দেখিয়া রোদনাদি সম্বরণ করিয়া বিশেষ বুদ্ধিমত্তার সহিত বলিলেন;—"তোমাদের কোন দোষ নাই; আমার অদৃষ্টে এইরূপ ছিল ব'লয়াই দৈবে এরূপ ঘটিয়াছে"। তৎপর স্বামীর দেহ রক্ষা করিবার বিধান করিয়া গৃহান্তরে প্রবেশ করিলেন। তিনি অন্তর অঙ্গনে প্রবেশ করিয়াই বিশ্বস্ত লোক দ্বারা নিজপিতা চন্দ্র সাগর (চন্দ্র-শেখর?) মজুমদার সমীপে সংবাদ পাঠাইলেন। পরদিবস তাঁহার পিতা লোকজন সহ তাঁহার নিকট আসিয়া উপস্থিত হইলেন। ভুঞ্যাপত্নী সেই দিবসই যথাসম্ভব অর্থাদি লইয়া পিতার সঙ্গে পিত্রালয়ে চলিলেন। যাইবার সময় স্বামীর একখানা হস্ততল কাটিয়া লইয়া চলিলেন। অবশিষ্ট ধন ও দ্রব্যাদিসমেত গৃহ দস্যু-ভৃত্যগণের হস্তে পতিত হইল।

ভুঞ্যাপত্নী পিতৃভবনে যাইয়াই অন্ত একজন কনিষ্ঠ ভ্রাতা ও পিতার প্রধান বিশ্বস্ত লোকজন সহ নবাব-দরবারী জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার নিকট চলিলেন। এই জ্যেষ্ঠ ভ্রাতাই তখন তাঁহার মৃতস্বামীর প্রতিনিধিরূপে নবাব দরবারে বাস করিয়া

[ঙ] বিশেষ কারণবশতঃ পরিচয় প্রদান করা গেল না।

প্রতিষ্ঠা লাভ করিয়া বসিয়া ছিলেন। ভুঞ্যাপত্নী ভ্রাতার নিকট উপস্থিত হইয়া সাশ্রুলোচনে সমস্ত বৃত্তান্ত জানাইলেন এবং তৈলের কৌটা খুলিয়া মৃতপতির ছিন্ন হস্ততল বাহির করিয়া দেখাইলেন। উহা দেখিয়া মজুমদার অতীব শোকাতুর ও জড়বৎ নিস্পন্দ হইলেন। পরে নবাব সমীপে যাইয়া সমস্ত ঘটনা বিবৃত করিলেন। তৎক্ষণাৎ দস্যু ভৃত্যবর্গকে ধরিয়া আনিবার জন্য ৫০ জন অশ্বারোহী ও পদাতিক প্রেরিত হইল। তাহারা স্বল্পকাল মধ্যেই সদলবল দস্যু ভৃত্যগণকে ধরিয়া আনিল। প্রধান ভৃত্য ইন্দা ও বিন্দা অপরাধ স্বীকার করিল ও তাহাদের প্রাণদণ্ড হইল। ধৃত অবশিষ্ট ভৃত্য দস্যুগণ সম্বন্ধে হুকুম হইল—ভুঞ্যাপত্নীর জন্য তাহারা বাজারে ভৃত্যরূপে [চ] বিক্রীত হইবে। ভুঞ্যাপত্নী তদনুসারে তাহাদিগকে বাজারে বিক্রয় করাইয়া স্বগৃহ নিষ্কণ্টক করিলেন।

ভুঞ্যাপত্নী এইরূপে বৈরনির্যাতন করিয়া শূন্যপ্রায় স্বভবনে উপনীত হইলেন। অতঃপর দশম মাসে তিনি একপুত্র প্রসব করিলেন। পুত্রের নাম হইল রাম গোপাল ভুঞ্যা (১৩)। এই সময়ে ভুঁইয়াপত্নীর নগদ অর্থাদি কিছুই ছিল না। রামগোপালের পুত্রের নাম শুকদেব ভুঞ্যা (১৪)।

এই সময়েই তাহাদের একজন পুরাতন কর্ম্মচারী ভাগ্যক্রমে জমীদার হইয়া উঠেন। এবং নবাব সরকার হইতে ভুঁইয়াদের সম্পত্তি নিজনামে বন্দোবস্ত করিয়া আসেন [ছ] ভুঞ্যাগণ ইহাতে নিতান্ত নিরুপায় হইয়া কতক ভয় প্রদর্শন [ছ] ও কতক খোসামদ দ্বারা ২।১ খান মৌজা মাত্র উদ্ধার করেন। কিন্তু ক্রমে

[চ] পূর্ব্বে নবাব সরকারে দস্যুদিগের প্রতি এই আকারের দণ্ড বিহিত হইত। ষ্টুয়ার্ট কৃত বাঙ্গালার ইতিহাসে লিখিত আছে—নবাব মুরশিদ কুলি খাঁ ভূষণা মহম্মদপুরের প্রসিদ্ধ দস্যু জমীদার সীতারাম রায়কে ঠিক এই আকারেরই দণ্ড দান করিয়াছিলেন। নবাব সীতারাম রায়কে সপরিবারে ও সানুচর গ্রেপ্তার করিয়া মুরশিদাবাদে আনয়নকরতঃ সীতারাম রায়কে ও তাঁহার অনুচরবর্গকে শ্রেণীবদ্ধ ভাবে শূলে আরোপিত করেন এবং তাহার স্ত্রীগণ ও পরিবারবর্গকে মুরশিদাবাদের বাজারে প্রকাশ্যে দাস দাসী রূপে বিক্রয় করিয়া ফেলেন।

[ছ] প্রবাদ এই ;—যখন ভুঁইয়াগণ সমস্ত অবস্থা জানিয়া এই জমীদার ভবনে উপস্থিত হইলেন, তখন ইহাঁদিগকে সমাদরে সিধাপত্র দেওয়া হইল ; কিন্তু যখন ইহাঁরা কতকভূমি উদ্ধার করিবার জন্য আসিয়াছেন ইহা জানান হইল, তখন জমীদার ইহাঁদের সিধাপত্র বন্ধ করিয়া দিলেন—দেখা করাও বন্ধ

তাহাও হস্তচ্যুত হয়। তাহার পর সামান্ত জমীজমার দ্বারা ভুঞ্যাগণ জীবিকা-নির্ব্বাহ করিতেছেন।

এই ঘটনার পর এই বংশে উল্লেখযোগ্য কোন ঘটনা দেখা যায় না। এই বংশের বর্ত্তমান নেতা শ্রীযুক্ত রাজচন্দ্র ভুঁইয়া মহাশয় অধস্তন (১৮) পুরুষ ইহঁার বয়স প্রায় সত্তর বৎসর। ইনি অতীব দূরদর্শী ও বুদ্ধিমান লোক বলিয়া সম্মানিত।

শ্রীবসন্তকুমার রায় এম্ এ, বি, এল্।

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষার ফল ১৯১৩।

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর)

ম্যাট্রিকুলেশন।—হরিচরণ চৌধুরী যমশেরপুর হাইস্কুল নদিয়া নরপতি বিশ্বাস শিকারপুর, সুরেশচন্দ্র বিশ্বাস শিকারপুর, নৃসিংহপ্রসাদ চৌধুরী আমলাসদরপুর হাইস্কুল বিপ্রদাস চৌধুরী ঐ, সুভাষচন্দ্র বিশ্বাস কৃষ্ণনগর কলেজিয়েট স্কুল, রাইমোহন বক্সী বহরমপুর, রমণীমোহন শাসমল মুগবেড়িয়া হাই, বিভুবিলাস বেরা ঐ। গৌরহরি দাস—সিঙ্গুর মহামায়া, বনমালী দে, পূর্ণচন্দ্র মাইতি ঐ। কৃষ্ণচন্দ্র চক্রবর্ত্তী—কৈকালা।

আই এ।—শশিভূষণ মাইতি বহরমপুর কলেজ, প্রিয়নাথ দাস মেদিনীপুর কলেজ, গিরিশচন্দ্র মাইতি মেট্রোপালিকান কলেজ। নিরঞ্জন পাল কলি, সি,এম,এস। দেবেন্দ্রনাথ সরকার, বহরমপুর কৃষ্ণনাথ।

করিলেন;—ইহাতে দীর্ঘকায়, বহুস্মান্ ও বলশালী ভুঁইয়াগণ ক্ষুব্ধ হইয়া বলপূর্ব্বক চতুর্দ্দিক হইতে দ্রব্যসম্ভার আনয়ন করিয়া আহারের যোগাড় করিলেন ও সিংহনাদ করিতে লাগিলেন। তাহাতে জমীদার ভয়ে বাহির হইয়া উহাদের শ্রেষ্ঠ ব্যক্তিকে বলিলেন—"তোমাকে আমি শিশুকালে কোলে করিয়া মানুষ করিয়াছি, তোমার এত ঔদ্ধত্য করা উচিত নহে"। তিনি উত্তর করিলেন—"আমাদের আর উদরান্নের উপায় নাই, এখন কি ডাকাইতি করিয়া জীবিকানির্ব্বাহ করিতে বল?" ফলে ভুঁইয়াগণ কিছু ভূমি পাইয়া নিরস্ত হইলেন। এই বঙ্গভূমির বহুতর প্রাচীন বংশ এই আকারে হৃতধন হৃতমান ও হৃতসর্ব্বস্ব হইয়া গিয়াছে—তাহাদের

রঘুনন্দন ভট্টাচার্য্য ও তাঁহার নব্যস্মৃতি।

(পূর্ব্ব-প্রকাশিতের পর)

(২)

প্রাগুল্লিখিত বিষয়গুলির সুমীমাংসার জন্য শনৈঃ শনৈঃ অগ্রসর হওয়া যাউক।

বিশ্বস্রষ্টা বিশ্বেশ্বরের সর্ব্বাতিশায়িনী বিশ্বসৃষ্টি-বিষয়িনী লোকত্রিমোহিনী নিপুণা বুদ্ধি-বৃত্তি যে ভারতবর্ষেই নিরবচ্ছিন্নভাবে সম্পূর্ণ বিরাম লাভ করিয়াছে, সর্ব্বাবয়বের মধ্যে অন্তর্নিহিত ভাবাবলীর দর্পণ স্বরূপ মুখমণ্ডলের ন্যায় যে ভারতবর্ষে এই সসাগরা স-দ্বীপা সমগ্রা পৃথিবীর পৃথক্ পৃথক্ মহাদেশ দেশ প্রদেশাদির পৃথক্ পৃথক্ নৈসর্গিক ব্যাপার সর্ব্বদা অবিরোধে বর্ত্তমান, যে ভারতে গ্রীষ্মবর্ষা শরদ্ধেমন্ত শীতবসন্ত এই ষড় ঋতুর মিত্রষড়ষ্টক সংমিলন, যে ভারতের বনৌষধির—বনস্পতির—বল্লরীর ফলে ফুলে পত্রে পল্লবে মুকুল মঞ্জরীতে মূলে বল্কলে তিক্ত-অম্ল-কটু-কষায়-লবণ-মধুর—এই ষড়রসের আবির্ভাব, যে ভারতের বন উপবন, পর্ব্বত প্রান্তর ধন্বন্তরীর অব্যর্থ অমোঘ ভেষজালয় যে ভারত উর্ব্বরতায় অন্নপূর্ণার অত্যুচ্চ স্বর্ণমন্দির, যে ভারতের "মাটি মুঠা ধরিতে কড়ি মুঠা হয়", যে স্থানের ছাই ভস্ম—অমূল্যরত্ন, যে দেশের উদাত্ত অনুদাত্ত—স্বরিত স্বরে উচ্চারিত বেদের সূক্ত সিংহব্যাঘ্রাদি হিংস্র জন্তুকেও প্রশান্ত করিতে সমর্থ, যে দেশের বিজন বনভূমিতে পর্ণকুটীরে সর্ব্বত্যাগী উঞ্ছবৃত্তি অকিঞ্চনের মুখে বেদান্ত সাংখ্য পাতঞ্জল ন্যায় বৈশেষিক-মীমাংসা—যে পবিত্রাশ্রমে "মন্বত্রি-বিষ্ণু হারীত যাজ্ঞবল্ক্যোশনাঙ্গিরাঃ। যমাপস্তম্ব সম্বর্ত্তা কাত্যায়নো বৃহস্পতিঃ, পরাশর ব্যাস শঙ্খ লিখিতা দক্ষগৌতমৌ, শাতাতপো বশিষ্ঠশ্চ ধর্ম্মশাস্ত্র প্রয়োজকাঃ—যে দেশে হিমবান্, নিষধ, বিন্ধ্য, মাল্যবান প্রভৃতি দেবতাত্মা নগধিরাজ বিরাজিত, যে দেশে ভগবৎ-করুণা—বরুণা-অসি আত্রেয়ী ভারতী গঙ্গা যমুনা চ সরস্বতী, সরযূর্গণ্ডকী পুণ্যা শ্বেতগঙ্গাচ কৌষিকী প্রভৃতি দেবনদী—যদন্তর্বর্ত্তী ব্রহ্মাবর্ত্ত, কুশাবর্ত্তাদি স্বতঃপূত জনপদ, যে দেশে "নিষাদর্ষভ-গান্ধার ষড়জ মধ্যম ধৈবত পঞ্চম',—এই সপ্ত স্বরের মোহন বাঁশরীর মধুর ঝঙ্কারে আব্রহ্মস্তম্ব পর্য্যন্ত স্তম্ভিত; যে দেশের মানব জাতির আধ্যাত্মিক জীবনের—প্রকৃত মানবত্বের ক্রমোবিকাশরূপ ব্রহ্মচর্য্য, গার্হস্থ্য, বানপ্রস্থ, ভৈক্ষ্য এই আশ্রম চতুষ্টয়ের সুপ্রতিষ্ঠা; ধর্ম্ম অর্থ কাম মোক্ষ এই

চতুর্ব্বর্গ সাধন, যে আশ্রমের পরিশ্রম-লব্ধ মহাধন ;—যে ভারতের স্বরূপগৌরব বর্ণনে ব্যাসবাল্মিকী কালিদাস প্রভৃতি বাণীকণ্ঠ কবিগণের সর্ব্বতোমুখী অমরলেখনীও পরাঙ্মুখী হইয়া নীরবে মহামহিমা ব্যক্ত করিতেছে—অধিক কি যে পুণ্যভূমির এতাদৃশ ও তথাকথিত বিশুদ্ধ সত্ত্বগুণাবির্ভাবের একমাত্র হেতুভূত প্রকৃতিপ্রপঞ্চের সমীকরণে—সামঞ্জস্য বিধানে—সাম্যাবস্থায় দুর্ল্লভ স্বর্গসুখ তুচ্ছ করিয়া "অদ্যাপি দেবা ইচ্ছন্তি জন্ম ভারত-ভূতলে ; অধিক কি যে ভারত—নিখিল নিয়ম-নিয়ন্তা হইয়া সত্ত্ব-সদ্‌গুণের সুসৌষ্ঠব সংসাধনে —"এতদ্দেশ প্রসূতস্য সকাশাদগ্র জন্মনঃ। স্বংস্বং চরিত্রং শিক্ষেরণ্ পৃথিব্যাং সর্ব্বমানবাঃ" এইরূপ দুন্দুভি নিনাদে এই বিশাল-বিশ্ব-বিদ্যালয়ের—জগদ্‌গুরুর মহামহিমান্বিত সর্ব্বজনাভিনন্দিত বন্দিত বরাসন, সদর্পে সার্থক অধিকার করিয়াছে ;—অধিক কি যে ভারত—যে ধর্ম্মময় ভারত—জলে স্থলে অন্তরীক্ষে চেতাচেতনে স্থাবর জঙ্গমে জড় চৈতন্যে সেই—"যতো বাচো নিবর্ত্তন্তে অপ্রাপ্য মনসা সহ" সেই অবাঙ্‌মনসোগোচর অতীন্দ্রিয় "মহতো মহীয়ান্ অণোরণীয়ান্ পরমেশ্বরের চিৎশক্তির অস্তিত্ব অনুভব করিয়া তাঁহাকে "জগন্নিবাস" বলিয়া মস্তক অবনত করিয়াছে ; আহারে, বিহারে, শয়নে, উপবেশনে, নিদ্রায় জাগরণে, এমন কি প্রত্যেক শ্বাস প্রশ্বাস প্রক্রিয়ায় অহরহ অবিচ্ছেদে সেই বিশ্বেশ্বরের অজপা "হংসঃ মন্ত্র-জপরূপ নিত্যোপাসনা বলিয়া ঘোষণা করিয়াছে, যে ভারত আপাত ঐহিক সুখবিলাস-ভোগবাসনাকে "মুক্তিমিচ্ছসি রে তাত বিষয়ান্ বিষবৎ ত্যজ" বলিয়া তর্জ্জন গর্জ্জন সহকৃত বর্জ্জন করিতে উপদেশ দিয়াছে—"ত্যজেদেকং কুলস্যার্থে গ্রামস্যার্থে ত্যজেৎ কুলং, গ্রামং জনপদস্যার্থে আত্মার্থে পৃথিবীং ত্যজেৎ" বলিয়া আত্মরক্ষার্থে সুদৃঢ়ভাবে বদ্ধপরিকর হইয়াছে—সেই ভারত—"মন্ত্রং বা সাধয়েরং শরীরং বা পাতয়েরং" এই ভীষ্মপ্রতিজ্ঞায় অচল অটল 'স্থাণুরিব' ভারত—বিজাতির শাণিত তরবারির মুখে "পরধর্ম্মো ভয়াবহ"তায় আত্মহারা বলিয়া মনে করা অমার্জ্জনীয় পাপের শোচনীয় পরিণাম ভিন্ন আর কি হইতে পারে ? লোকতঃ পর-পদ-দলিত—নির্য্যাতন-প্রাপ্ত হইলেও শ্বাস প্রশ্বাস প্রক্রিয়াকে যাহারা উপসনার অনুষ্ঠান বলিয়া থাকে, তাহারা প্রকৃত প্রস্তাবে বস্তুতঃ অনুশীলন রহিত, অনুষ্ঠান-বর্জ্জিত হইতেই পারে না— সুতরাং— পুর্ব্বকথিত অননুশীলনের ফল অননুষ্ঠানের শোচনীয় ফল—তথা সুপ্রাচীন সংহিতা সমষ্টির দারুণ দুর্দ্দশার পাপ অবসর ঘটিতেই পারে না।

"কর্ম্মেন্দ্রিয়াণি সংযম্য য আস্তে মনসা স্মরণ্।
ইন্দ্রিয়ার্থান্ বিমূঢ়াত্মা মিথ্যাচারঃ স উচ্যতে॥"

অর্থাৎ যে বিমূঢ় হতভাগ্য ব্যক্তি কর্ম্মেন্দ্রিয়গুলিকে সংযত করতঃ মনে মনে উহাদের ভোগ্য বিষয় সকলের অনুধ্যান করিতে থাকে, তাহাকে মিথ্যাচারী বলিয়া থাকে। শ্রীশ্রীগীতার আভাসে ইহাই বুঝিতে পারা যায় যে, মনই যত কিছু পাপ পুণ্যের একমাত্র নিমিত্তীভূত। তাহা হইলে বাহ্য কর্ম্মানুষ্ঠানাদির নিরোধে, পক্ষান্তরে মনে মনে বাহ্যকর্ম্মানুষ্ঠানের অন্তর্লক্ষ্যের অধ্যাস অনুধ্যানে, মানস-মননে প্রকৃতকর্ম্মানুষ্ঠানের ফলজনকত্বের ব্যতিক্রমও হইতে পারে না। ইহা যুক্তিযুক্ত ও ন্যায়সঙ্গত।

যেমন ক্ষেত্র-নিহিত শস্যাদির বীজ কালবশতঃ শীতঋতুর সংকোচন আকুঞ্চন প্রভাবে এবং নিদাঘের নিদারুণ শোষণ প্রভাবে বাহ্যক্রিয়া অঙ্কুরোদ্গমাদি পক্ষে অক্ষম হইলেও স্বকীয় কার্য্যকারিণী অঙ্কুরোদ্গমোপযোগিনী শক্তি হারায় না, বীজ বাহ্যক্রিয়া বিরহিত—মৌনব্রতাবলম্বী হইয়া—ভাবে বিভোর হইয়া যেন মহা ভাবুকতার পরিচয় দিতে থাকে। আবার প্রাবৃটের নব-নীরধর-ধারা ধরাতল অভিষেক করিতে না করিতেই অমনি জাগ্রত হইয়া বাহিরে স্ব স্বরূপে দেখা দেয়, —বর্ষার সলিল-সম্ভার মন্থর-সান্দ্র-জীমুতের মেদুরগম্ভীর মন্দ্রমন্ত্রে আমন্ত্রিত হইয়া যেন অভীষ্ট দেবতার অভয় সম্বোধনে তন্ময়-ধ্যানাবস্থিত তদ্গত সাধকের মত নেত্রোন্মীলন করে।—তেমনই আসুরিক বলদৃপ্ত দুর্বৃত্তের অত্যাচারের অবসানের পুণ্য দিনে শান্তিবারি বর্ষণের অমৃত-যোগে ভারতের প্রসুপ্ত কর্ম্মশক্তি আবার স্ফুর্ত্তির অপেক্ষায় উদ্গ্রীব হইল। বিপ্লব-ব্যসন-বাত্যায় দিশাহারা মাতৃহারা বৎস সকল ঝঞ্ঝাবসানে আপন আপন মাতাকে চিনিয়া লইবার জন্য সমন্তাৎ চাহিয়া দেখিল—বৎস ও ধেনুগণের মধ্যে যেরূপ জন্য-জনকত্ব ভাবটি, তাহাদের পরস্পরের পুনঃসম্মিলনের প্রধান হেতু; তদ্রূপ ধর্ম্মসংহিতা-স্মৃতি প্রভৃতির সহিত তদুদিত—আচার-পদ্ধতি-ব্যাপারানুষ্ঠান বৎসগণের পরস্পরের জন্যজনকত্ব—বাধ্য-বাধকতাভাব—নিবদ্ধ আছে। বৎসপ্রায় হিন্দু-ধর্ম্মানুষ্ঠান—শান্তির সময়ে চাহিয়া দেখিল—যে তাহাদের প্রসূতি সেই আদ্যা বর্ষিয়সী মহীয়সী স্বর্গীয়া পয়স্বিনী সুরভি নহে—ইহা **রঘুনন্দিনী চোরা গাই।**

ভারতের মত ধর্ম্মৈকজীবন দেশে বাহ্য অনুষ্ঠানের-অনমুশীলনের বিষময় ফল, তাহার ধর্ম্মময় কর্ম্মজীবনকে সংহার করিতে পারে না। যে ভারতে দেবদুর্ল্লভ অমৃতের চির-উৎস বেদ-বেদান্তাদিদর্শন-পুরাণ সংহিতা—ধর্ম্মকর্ম্মের

অবসাদ বিষকে বিনষ্ট করিবার জন্য নিত্য উচ্ছলিত—সেই চিরাভ্যস্ত চিরাস্বাদিত পূত পীযুষ-প্রস্রবণের প্রস্যন্দিনী ধ্বনি সকলের কর্ণকে সুশীতল করে, মনকে মাতাইয়া ভুলাইয়া দেয়। সকলকেই আপনার দিকে আপনার পথে টানিয়া তাহারই অন্বেষণেই নিযুক্ত করে। তাহার অন্বেষণে দিগভ্রান্তির আশঙ্কা বিরল। তথাপি যদি কোন ভাগ্যবান মহাপুরুষ সেই অমৃতকুণ্ডের অমৃতাভিষেকে কৃতার্থ হইয়া, উদারতার উদ্বোধনে উদ্বুদ্ধ হইয়া, সেই উৎসের বোধ করাইবার জন্য—সেই অমৃতকুণ্ডের স্নিগ্ধসিঞ্চনে স্নানাবগাহনে তর্পিত করিবার জন্য—সম্বোধন করেন, তিনি ত স্বর্গের দেবতা—তিনি ত প্রাণের সখা। সহৃদয় পাঠক পাঠিকাগণ! "এ বড় কঠিন ঠাঁই"—এই স্থানটি বড়ই বিষম স্থান। এতদূরে আসিয়া এমনস্থানে এমন দায়িত্বপূর্ণ ব্রতে ব্রতী হইয়া আত্মরক্ষা—আত্মপ্রতিষ্ঠা করা বড়ই শক্ত ব্যাপার! এই নিঃস্বার্থ-ধর্ম্মপ্রচারকের কার্য্যে এই নিঃস্বার্থ পরোপকারিতায়—পরার্থ-পরতায়—"আমার আমি তোমায় দিয়া তোমার হইলাম আমি" হইতে হইবে। আকারে প্রকারে ভাবে ভঙ্গীতে ইঙ্গিতে ইশারায় "আমিত্বের" নাম গন্ধ থাকিলেও তিনি আর স্বর্গের দেবতার—প্রাণের সখার ষোড়শোপচার পূজার ষোল আনার অধিকারী হইতে পারিলেন না।

(ক্রমশঃ)

করিব কি?

এই কর্ম্মময় জগতে, মাহিষ্য জাতির কার্য্য চিন্তাই এক্ষণে চিন্তার বিষয়। সামান্য সামান্য চিন্তাই একযোগে মহাচিন্তা ও তাহার উপরে অনন্ত চিন্তা। মাহিষ্য নামটী মহী+কর্ষণ—ইহা হইতে হইয়াছে। এস্থলে যাহারা মাটী কোপায়, হলযোগে মাটী কর্ষণে জমীর উর্ব্বরতা বৃদ্ধি করে, তাহাদের কত ক্ষমতা। এবং ঐ জমী চাষাবাদ করিয়া যে শস্য উৎপাদন করে তাহার মূল্য কত। সমস্ত শস্যাদির আকরই মাটী, এবং ঐ মাটীর কর্ষণই মাহিষ্যের মুখ্য কার্য্য। পূর্ব্বে যে মাহিষ্যের সুক্ষাদিদেশ আর্য্য সমাজের মুকুটমণি ছিল অসীম ক্ষমতায় এখন প্রধানতঃ সেই মাহিষ্যেরাই দুর্দ্দিনে মাটী হইতে যত্ন সহকারে সমস্ত জাতির আহারীয় দ্রব্য উৎপন্ন করিতেছে। এক্ষণে বলা যাইতে পারে যে, আহার জীবের জীবন ধারণে প্রধান সহায়; তাহা এই মাহিষ্যগণের চেষ্টায়ই উৎপন্ন হইতেছে। জগতে কৃষক যদি না থাকে তাহা হইলে একদণ্ডও কেহ বাঁচিতে পারে কি? জীবনদাতার এ উপকার কেহই বিস্মৃত হইতে পারেন না।

দেহ মাটীর, কারণ মাটীতে মিশাইয়া যায়,—ঐ মাটী লইয়া কত মাহিষ্য কৃষকগণ মাটী হইতেছে; কিন্তু কি উদার-প্রকৃতি, কোন ভ্রূক্ষেপ নাই, কোন অহঙ্কার নাই, লজ্জাভয়াদি কিছুই নাই; কেবল নীরবে অপরের খাদ্য যোগাইতে নিয়ত ব্যস্ত। যাহাদের কার্য্য পরোপকার, যাহারা পরের জন্যই দেহ ধারণ করিয়াছে, তাহারা মানব নয় দেবতা।

যে পূর্ব্ব পুরুষের বীর্য্যে এই মহাজাতির উৎপত্তি, বাস্তবিকই তিনি দেবতা। তাঁহার পর যে সকল মহাপুরুষ জন্ম গ্রহণ করিয়াছিলেন তাঁহারাও মহা শৌর্য্য ও বীর্য্য সম্পন্ন মহাত্মা ছিলেন সন্দেহ নাই। নানা কারণে এক্ষণে ঐ মহাপুরুষ-গণের বংশধরগণ অধীনপ্রকৃতি ও হীনবীর্য্য হইয়া পড়িয়াছেন। এই জন্যই আর পূর্ব্ব খ্যাতি, বিশেষরূপে নাই। এই পতনের একতম কারণ একতার অভাব। আবার বলহ্রাসের সঙ্গে সঙ্গে পৃষ্ঠপোষক নাই, এই দুর্ব্বলের চিন্তা—কাপুরুষের ভাবনা—আরও মাটী করিয়াছে। মনের লঘুতা আসিলে আর তেজোবীর্য্য থাকে না। ক্রমে ক্রমে অবনতি হইতে থাকে, আর অবনতিও হইতেছে। এই নীচ ভাবনা আসিলে অবনতি হইয়া থাকে।

হে মাহিষ্যগণ, হতাশ হইবার কোন কারণই নাই; যখন কাণ্ড ঠিক আছে, তখন শাখা প্রশাখার জন্য চিন্তা কি ? মাহিষ্যগণ! বংশধরগণের কল্যাণে তৎপর হও; কে কোথায় কি অবস্থায় আছে, অনুসন্ধান কর। পরস্পর পরস্পরকে উৎসাহিত কর, একত্রে মিলিত হও, পূর্ব্ব কার্য্য স্মরণ কর—আপনা হইতে পূর্ব্ব বলে বলীয়ান্ হইবে; পূর্ব্ব তেজ ফিরিয়া আসিবে; সেই প্রাতঃস্মরণীয় পূর্ব্ব পুরুষগণের নাম বজায় থাকিবে।

বিশ্বরাজ্যে কিছুই নষ্ট হয় না। ব্যবহার দোষে কিছু ক্ষয় হয় মাত্র, কিন্তু পুনরায় স্থায়ী ব্যবহার হইলে আবার সতেজ হইয়া থাকে। আজ প্রায় দশ বার বৎসর হইতে মাহিষ্য জাতির সেই পূর্ব্ব পুরুষগণের তেজের বিষয় স্মরণ পথে আসিয়াছে। দেখ! স্মরণ হওয়ায় আজ কত দূর আশা বাড়িয়াছে। যাহা একেবারে নাই ভাবনা হইয়াছিল, তাহার কতদূর উন্নতি হইয়াছে। কোথায় কত মাহিষ্য আছে, তাহার কত সন্ধান হইতেছে। হীনতা কত কমিতেছে, উন্নতি-লাভ করিতে কতদূর ব্যগ্র হইতেছে। কৃষিকার্য্য এক প্রকার উঠিয়া যাইতে বসিয়াছিল, কিন্তু এখন তাহার কত আন্দোলন চলিতেছে। কত শত বৎসর ধরিয়া যে, অবনতি হইয়াছিল, এই সামান্য কয় বৎসর মধ্যে কত উন্নতি হইয়াছে। কয়েক জন মাহিষ্য-সমাজ-গুরু মিলিয়া এতদূর করিয়াছেন। এক্ষণে

সমস্ত সাহিত্যগণ, তাঁহাদের শিষ্যত্ব পাইলে ও সমযোগে চেষ্টা করিলে আর পূর্ব্ব তেজ পাইতে বিলম্ব কোথা ?

ওহে স্বজাতি-প্রাণ! কিছুতেই উদ্দেশ্য ছাড়িও না; ঠিক সরল ভাবে কার্য্য করিতে থাক, আবার পূর্ব্বাবস্থা আসিবে, তাহার কোন চিন্তা নাই। যাহাতে সকলকে সকলে চিনি, সকলের জন্য ব্যথিত হই ও সকলের দ্বারা সকলে উপকৃত হই, এই কর। কেহ কোন গুপ্ত ভাব রাখিও না, প্রকাশ্যে সকলে সকলের সহিত মিলিত হও, এক পরামর্শে কার্য্য কর। ১০। ১২ বৎসরে যাহা হইয়াছে, আগামী পাঁচ বৎসর মধ্যে তাহার দ্বিগুণ হইবে তাহাতে কোন সন্দেহ নাই।

প্রধান অভাব লেখা পড়া শিক্ষার, মনোভাব প্রকাশে ক্ষমতার এইটী অগ্রে আবশ্যক; ইহার উপায় আগে স্থির কর। তাহার পর—কৃষি কার্য্য শিক্ষা ও তাহাতে মনোযোগ দাও। এই কার্য্য রীতিমত সাধনা করিতে হইবে। ইহার জন্য প্রস্তুত হও—মনকে দৃঢ় কর—কার্য্য নিশ্চই সফল হইবে। হতাশ হইয়া উদ্দেশ্য ছাড়িয়া দেওয়া—আবার অন্য একটী ধরা—এইটী প্রাকৃত লোকের কার্য্য। অনেকেই এইরূপ, পরিশেষে তাহার জন্য অনুতপ্ত হয়। যখন ধরিয়াছি দেহ থাকা পর্য্যন্ত ছাড়িব না, তাহার শেষ ফল দেখিব, এইটী ধর্ম্ম। ইহা না করিলে—অধৈর্য্য হইলে—শেষ দেখাও হইবে না, ফলের আশাও থাকিবে না। এবং অধার্ম্মিক হইতে হইবে।

হিংসাপর নিন্দুকগণই সাহিত্যগণের বন্ধু, তাহারাই সাহিত্যগণকে জাগাইয়াছে, নিদ্রা ভাঙ্গাইয়াছে। তাহারা এতদিন আন্তরিক যে ভয় করিত, ছলে বলে কৌশলে যে জন্য বড়কে ছোট করিবার চেষ্টা করিত এখন তাহা অন্তর হইতে বাহিরে আনিয়াছে, আন্দোলন করিতেছে। যখন ভিতর হইতে বাহিরে আসিয়াছে, আন্দোলন চলিতেছে, তাহার আর স্থায়ীত্ব নাই, অতি অল্প সময় মধ্যে আর থাকিবে না। কিছুদিনের মধ্যে নিন্দুকগণকে বাস্তবিক বন্ধু হইতে হইবে। এক দিকে নিন্দা ও অভাব, অন্য দিকে উদ্দেশ্য বজায় চেষ্টা—এই তুলাদণ্ড ঠিক হইলেই আর চিন্তা নাই। কিছুতেই হতাশ হইবার আবশ্যক নাই, কেবল চেষ্টা একতাবন্ধন ও বিদ্যাশিক্ষা—উপস্থিত এইগুলিই সাহিত্যর কার্য্য।”

শ্রীচন্দ্রকুমার দাস,
পরুই—বেহালা।

পল্লী-সমিতি।

মালদহ মাহিষ্য সমিতি হইতে শ্রীযুক্ত বাবু রাধামাধব দাস এবং শ্রীযুক্ত বাবু মনোহর চন্দ্র মণ্ডল মহাশয়গণ লিখিয়াছেন—মালদহ মাহিষ্য সমাজ প্রধানতঃ ৫টী সভা বা সমিতিতে বিভক্ত আছে, এই প্রধান পাঁচটীর অন্তর্ভুক্ত আবার ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র শাখা বা পল্লী সমিতি আছে যথা :—

নয় সভা,—কেন্দ্রস্থান গানিপুর। সাত সভা—চণ্ডীপুর। তিন সভা—কোতোয়ালি। অষ্ট গ্রাম—বিরামপুর। বাউলি—চাঁদপুর।

আমাদের এই সভা বা সমিতির মধ্যে অর্থাৎ স্বজাতিভ্রাতৃগণ মধ্যে কোন ফৌজদারী মোকর্দ্দমা ঘটিলে তাহা আদালতে যাইতে পারে না, যদিও জেদ বশতঃ কেহ গিয়াছেন, তাহাকে সাক্ষীর অভাবে হারিতে হইয়াছে, সুতরাং সাহস করিয়া আর কেহ আদালতে যাইতে পারে না, দেওয়ানি সংক্রান্ত কোন কোন মোকর্দ্দমা আদালতে যাইয়া থাকে বটে, তবে তাহাও খুব কম। এখানে সামাজিক আন্দোলন একরূপ চলিতেছে তবে তাহার ভাব কিন্তু পুরাতন, এতদঞ্চলে উচ্চশিক্ষিত লোকের সংখ্যা অতি কম, যে দুই একজন আছেন তাঁহারা ব্যবসা বাণিজ্যের উন্নতি বিধানের চেষ্টা করিতেছেন, চাকরীর প্রতি লক্ষ্য অতিশয় কম। উচ্চশিক্ষার জন্য বিশেষ চেষ্টা হইতেছে, বহুদিন হইতে স্থানে স্থানে যে নিম্নপ্রাথমিক বিদ্যালয়গুলি চলিয়া আসিতেছিল তাহার কোন কোনটী এক্ষণ মধ্যইংরাজীতে উন্নীত হইয়াছে, গানিপুর, কল্যাণপুর এবং চণ্ডীপুর স্কুল গৃহ সকল পাকা করিবার বন্দোবস্ত হইতেছে, গবর্ণমেণ্ট প্রদত্ত ৬০০৲ টাকা এবং বাকী টাকা বিবাহবৃত্তি এবং চাঁদা করিয়া আদায় করা হইতেছে, এই কার্য্যে সকল জাতিরই সমান সহানুভূতি পরিলক্ষিত হইতেছে। মালদহ জেলায় আমাদের পুরোহিতের সংখ্যা ক্রমশই হ্রাস প্রাপ্ত হইতেছে, এমন কি স্থানে স্থানে নাই বলিলেও হয়। যাহাতে আমাদিগের পুরোহিত কুল একেবারে নির্ম্মূল না হয় তাহা প্রত্যেক জেলার মাহিষ্য ভ্রাতৃগণেরই চেষ্টা করা কর্ত্তব্য।

কাদুয়া পল্লী সমিতি ঃ—মেদিনীপুর জেলার কাথি মহকুমার রামনগর থানার অন্তর্গত কাদুয়া গ্রামে একটী পল্লীসমিতি প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে দক্ষিণশীতলা নিবাসী বাগ্মীপ্রবর শ্রীযুক্ত বাবু কামদেব খাটুয়া মহাশয় এই সমিতির প্রথম বীজ রোপণ করিয়াছিলেন, শিক্ষা-বিস্তার সমাজ-সংস্কার

এবং অন্যান্য জাতীয় হিতকর কার্য্য করাই এই সমিতির মুখ্য উদ্দেশ্য। সমিতির বিশিষ্ট সভ্যগণ :—শ্রীযুক্ত বাবু সুন্দর নারায়ণ কর, শ্রীযুক্ত বাবু কৈলাস চন্দ্র হাজরা, শ্রীযুক্ত বাবু প্রতাপ চন্দ্র মাইতি, শ্রীযুক্ত বাবু গদাধর পাত্র শ্রীযুক্ত বাবু বিশ্বনাথ আদক, এবং মাহিষ্যযুবক শ্রীমান্ ক্ষীরোদচন্দ্র কর নিকট-বর্ত্তী গ্রাম সমূহে পল্লীসমিতি সংস্থাপন করিবার জন্য বদ্ধপরিকর হইয়াছেন।

মুর্শিদাবাদ জেলায় লালগোলা থানার অধীন সাহাবাদ গ্রাম নিবাসী পূজ্যপাদ পণ্ডিত শ্রীযুক্ত ভাগবত ভূষণ চক্রবর্ত্তী মহাশয়ের উদ্যোগে নিম্ন-লিখিত পল্লী সমিতিগুলি স্থাপিত হইয়াছে এবং প্রত্যেক সমিতি হইতেই যাহাতে কিছু কিছু করিয়া মাহিষ্য ব্যাঙ্কিং এণ্ড টেডিং কোংর অংশ বিলি হয়, তজ্জন্য তিনি বিশেষ যত্নবান রহিয়াছেন। চক্রবর্ত্তী মহাশয়ের এইরূপ নিস্বার্থ স্বজাতিপ্রেমে আমরা যার পর নাই মুগ্ধ হইয়াছি এবং তাঁহাকে আন্তরিক ধন্যবাদ প্রদান করিতেছি। সমিতি গুলির নাম যথা :—**সাহাবাদে মাহিষ্য সমিতি** ঃ—সভাচার্য্য—পণ্ডিত শ্রীযুক্ত ভাগবত ভূষণ চক্রবর্ত্তী, সম্পাদক—শ্রীযুক্ত বাবু যোগেন্দ্রনাথ দাস। **ফরিদপুর মাহিষ্য সমিতি** ঃ—সভাচার্য্য শ্রীযুক্ত পণ্ডিত হরিশ্চন্দ্র চক্রবর্ত্তী ও সতীশচন্দ্র চক্রবর্ত্তী, সম্পাদক—শ্রীযুক্ত বাবু মনোহরচন্দ্র দাস, ডাক্তার—হলধর দাস। মমরাজপুর মাহিষ্য সমিতি—সভাচার্য্য পণ্ডিত শ্রীযুক্ত অমৃত লাল চক্রবর্ত্তী, সম্পাদক—শ্রীযুক্ত বাবু রামানন্দ দাস। ৫। ঘোড়ঢাকা মাহিষ্য-সমিতি—সভাচার্য্য পণ্ডিত শ্রীযুক্ত কৃষ্ণলাল চক্রবর্ত্তী, রসিক লাল চক্রবর্ত্তী।—সম্পাদক বাবু ব্রজলাল মণ্ডল ৬। রামনগর মাহিষ্য সমিতি—সভাচার্য্য পণ্ডিত শ্রীযুক্ত ধনঞ্জয় চক্রবর্ত্তী সম্পাদক শ্রীযুক্ত মহেন্দ্রনাথ মণ্ডল—দ্বারিকানাথ সরকার। ৭। বসুপাড়া মাহিষ্য সমিতি এই সমিতির সভ্য শ্রীযুক্ত বাবু বঙ্কবিহারী মণ্ডল, শ্রীযুক্ত বাবু প্রতাপচন্দ্র দাস, শ্রীযুক্ত বাবু কেদার নাথ দাস, শ্রীযুক্ত বাবু গৌরচন্দ্র দাস, শ্রীযুক্ত বাবু অটল চন্দ্র দাস, প্রত্যেকেই মাহিষ্য ব্যাঙ্কিং এণ্ড ট্রেডিং কোম্পানির অংশ গ্রহণ করিবেন বলিয়া আমাদিগকে উৎসাহিত করিয়াছেন। আমরা তজ্জন্য এই সকল মহোদয়-গণকে আন্তরিক ধন্যবাদ প্রদান করিতেছি।

নদীয়া চিথোলিয়া মাহিষ্য-সমিতি—নদীয়া জেলায় কুষ্টিয়া মহা-কুমার অধীন চিথোলিয়া পল্লী সমিতির ম্যানেজার ডাক্তার শ্রীযুক্ত বাবু যোগেন্দ্র-নাথ বিশ্বাস মহাশয় নদিয়াবাসী মাহিষ্য ভ্রাতৃগণকে সামাজিক কার্য্যে উদাসীন দেখিয়া স্থানে স্থানে পরিভ্রমণ পূর্ব্বক সভাসমিতি স্থাপন করিয়া তাঁহাদিগকে

জাতীয় প্রেমে অনুপ্রাণিত করিতেছেন। বাস্তবিক নদিয়া জেলায় এরূপ শিথিলভাবে অবস্থিত দেখিয়া আমরাও যার পর নাই দুঃখিত ও মর্ম্মাহত হইয়াছি। নদিয়া সমাজ শিক্ষায় এবং সভ্যতায় অন্যান্য জেলার মাহিষ্য সমাজ অপেক্ষা অনেকাংশে উন্নত বলিয়া স্বীকার করিলেও এরূপ একতাবিহীন এবং উদাসীন ভাব আর কোন সমাজে দেখিতে পাওয়া যায় কিনা সন্দেহ। বারান্তরে এই জেলার মাহিষ্য-সমাজ সম্বন্ধে কিঞ্চিত আলোচনা করিবার বাসনা রহিল।

শ্রীরামপদ বিশ্বাস।

পাল-রাজগণ সম্বন্ধে

বিগত আষাঢ় সংখ্যা সাহিত্য পত্রিকায় শ্রীযুক্ত যতীন্দ্রনাথ রায় প্রণীত "ঢাকার ইতিহাসের" সমালোচনা প্রসঙ্গে শ্রীযুক্ত দীনেশ চন্দ্র সেন মহাশয় লিখিয়াছেন,—

"যতীন্ বাবুর মুখে সাভারের নিকটস্থ কোণ্ডাবাসী রাজবংশীয় মাহিষ্যগণের বৃত্তান্ত অবগত হইয়া আমি 'প্রবাসী'তে তাঁহাদিগকে হরিশ্চন্দ্র রাজার বংশধর বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছিলাম। আলোচ্য গ্রন্থের ২৭শ পৃষ্ঠায় গ্রন্থকার সে কথার উল্লেখ করিয়াছেন। সম্প্রতি এই বিষয়টি লইয়া একটু সাহিত্যিক দাঙ্গা হাঙ্গামা হইয়া গিয়াছে। পাল রাজারা ও কাম্বোজিয়া নৃপতিগণ যে তাদৃশ উচ্চজাতীয় ছিলেন না তাহা এ দেশের চিরাগত প্রবাদ। কিন্তু ব্রাহ্মণেতর জাতীয় ব্যক্তিগণ যখনই রাজতক্তে বসিয়াছেন, তখনই তাঁহারা আপনাদিগকে ক্ষত্রিয় বলিয়া পরিচয় দিয়া আসিয়াছেন। অতি নীচ শবর ও চণ্ডালাদি জাতি পর্য্যন্ত রাজসিংহাসন লাভ করিয়া তাম্রশাসনে আপনাদিগকে ক্ষত্রিয় বলিয়া পরিচয় দিয়াছেন ঐতিহাসিকগণের তাহা অবিদিত নাই। * * * * পালরাজারা কি জাতীয় এবং তাঁহারা কোন্ কোন্ জাতীয়া কন্যার পাণিপীড়ন করিতেন, তাহা জানিতে চাহিলে, মুল পঞ্চাননের কারিকা পাঠ করা উচিত। * * * * * উচ্চবর্ণের শিক্ষিত লেখকগণই হস্তে লেখনী পাইয়া বিচিত্র প্রকারে আত্ম-গৌরব ঘোষণা করিতে পারেন, কিন্তু অপেক্ষাকৃত অল্প শিক্ষিত নিম্নতর জাতির লোকেরা যে বংশাবলী উপস্থিত করিয়াছেন, তাহা মূলতঃ অবিশ্বাস করিবার কোনও কারণ পাইতেছি না।"

দীনেশ বাবুর উপরি উক্ত মন্তব্য পাঠে বুঝা যায় তিনি পালগণকে মাহিষ্য বলিয়াই স্বীকার করেন।

কৃষিবার্ত্তা।

(লেখক—শ্রীপ্রকাশচন্দ্র সরকার বি এল্)

কলার মোরব্বা একটি উপাদেয় খাদ্য সামগ্রী। অর্দ্ধপক্ক কলার খোশা ছাড়াইয়া দ্বিখণ্ড করিয়া ২।৩ সের জলে কড়ায় করিয়া, খড়ের উপর রাখিয়া, ভাপ্রায় সিদ্ধ করিয়া অপর পাত্রে রাখিয়া দিবে। দেড় সের চিনির রস প্রস্তুত করিয়া একটা লেবুর রস দিয়া সিদ্ধ কলাগুলিকে ২।৩ মিনিট ফুটাইয়া নামাইয়া শিশিতে ভিনিগার দিয়া রাখিবে। তাহাতে বহুদিন পর্য্যন্ত থাকিবে। চিনির রস এনামেল্ বা মৃৎ কড়ায়ে প্রস্তুত করিবে।

আমাদের দেশের মত দেশ আর কোথাও নাই। আমাদের দেশের প্রত্যেক গৃহস্থের নারিকেল গাছ ২।১০টা করিয়া থাকে। ডাব, ঝুনা ছোবড়া পাতা, কাঠি বেচা প্রভৃতি ব্যবসা হইয়া থাকে। নারিকেল তৈলের ও দুগ্ধের ব্যবহার আমাদের দেশে কম নহে। জার্ম্মেনী আমেরিকা প্রভৃতি দেশের লোকে আমাদের দেশ হইতে শুষ্ক নারিকেল লইয়া গিয়া তাহা হইতে মাখম প্রস্তুত করিয়া বিশেষ লাভবান হইতেছেন, কিন্তু আমরা যে তিমিরে সেই তিমিরে।

আমাদের দেশের কৃষকগণের বহু পরিমাণ পেয়ারার বাগান আছে। এ দেশে কাঁচা ও পাকা পেয়ারা বেচা বই আর কোন প্রকার পেয়ারাকে ব্যবহারে আনিতে পারি না। পেয়ারার জেলির কারখানা আমাদের দেশে কয়টা আছে? ইহা একটি বেশ লাভজনক ব্যবসা। কিন্তু আমাদের দেশে শত শত মণ পেয়ারা পাখিতে নষ্ট করে, গাছের গোড়ায় পড়িয়া মাটী হয়। ভাল পাকা পেয়ারা খোশা ছাড়াইয়া ফালি করিয়া কাটিয়া, মাটীর হাঁড়িতে সিদ্ধ করিয়া, পাত্‌লা কাপড়ে মাড়ী ছাঁকিয়া সম পরিমাণ চিনির রসে পাক করিয়া, ক্যানা মরিলে, ১০০টা পেয়ারার জেলিতে ১০টা লেবুর রস ও সৌগন্ধি পদার্থ দিয়া কার্ক্ দিয়া শিশিতে বন্ধ করিয়া শির্কা বা ভিনিগার মিশাইয়া রাখিয়া দিবে। আবশ্যক মত ব্যবহার করিবে।

চইর চাষ :—ইহা মাগুরা, যশোহর, বাকরগঞ্জ খুলনা প্রভৃতি জেলায় খুবই হয়। ইহা লঙ্কার পরিবর্ত্তে তরকারী আদিতে ব্যবহৃত হইতে পারে কিন্তু লঙ্কার দোষ বিবর্জ্জিত। সরস সকল প্রকার মাটীতেই ইহা জন্মিতে পারে। ভাব-মিশ্রের মতে অগ্নি-উদ্দীপক, পাচক, কটু রস, লঘু ও উষ্ণ বিশিষ্ট। সংস্কৃত ভাষায় ইহাকে গজ পিপ্পলি বলে। ইহা রৌদ্রের উত্তাপ সহ্য করিতে পারে না। খোঁচা কলমে চারা প্রস্তুত করিয়া আঁব কাঁঠালের গাছের নিম্নে গর্ত্তে সার দিয়া বর্ষার প্রারম্ভে এই চারাগুলি পুতিতে হয়। ৮।৯ বৎসর পরে চই লতা বিস্তৃত হইলে অঙ্গুষ্ঠ পরিমাণ মোটা হইলে বাজারে বেচা যাইতে পারে। ছাই ও পচা গোবরের সারই এই গাছের পক্ষে বিশেষ উপযোগী। সময়ে সময়ে ঘাস নিড়াইয়া দিতে হয়। সরস ও ছায়াময় ভূমিতে এই গাছ জন্মে। ৪।৫ বৎসরের কমে চইলতা কাটা সম্ভবপর হয় না, ৮।৯ বৎসরের চইলতা ১৬।১৮ টাকায় একটি গাছ বিক্রয় হইয়া থাকে। ইহা কৃষকদের পক্ষে কম লাভ জনক চাষ নহে। বৈশাখ মাসেই চই রোয়ায় জমি ও মৃত্তিকা প্রস্তুত করিতে হয়।

গোমূত্র সাররূপে আমাদের দেশে ব্যবহৃত হয় না কিন্তু পাশ্চাত্য দেশে পশু মুত্রে দশ গুণ জল মিশাইয়া গাছে প্রয়োগ করিলে বিশেষ ফল পাওয়া গিয়াছে। ইহার দ্বারা গাছের উৎপাদিকা শক্তি বর্দ্ধিত হয় এবং গাছ সতেজ হয়। আমাদের দেশের কৃষকগণ ইহা ব্যবহার করিলে বিশেষ ফল পাইতে পারেন।

মাহিষ্য ব্যাঙ্কিং এণ্ড ট্রেডিং কোম্পানী লিমিটেড।

বর্ত্তমান ১৯১৩ সালের মার্চ্চ মাস পর্য্যন্ত হিসাবে উক্ত কোম্পানীর সমস্ত খরচপত্র বাদে ৮৩৬৷৶১০ লাভ হইয়াছে। যাঁহারা অংশের সমস্ত টাকা পরিশোধ করিয়াছেন, তাঁহারাই কেবল এই লভ্যাংশের অধিকারী হইবেন। আগামী মাসে বিশেষ বিবরণ প্রকাশিত হইবে, যাঁহারা এখনও অংশের টাকা পরিশোধ করেন নাই, তাঁহারা যেন সত্বর সমস্ত টাকা পরিশোধ করেন।

মাহিষ্য ব্যাঙ্কের এজেন্ট ঃ—নদিয়া চিথোলিয়া মাহিষ্য-সমিতির সম্পাদক ডাক্তার শ্রীযুক্ত বাবু যোগেন্দ্রনাথ বিশ্বাস এবং রাজসাহী গৌড়াদ্য বৈদিক ব্রাহ্মণ সমিতির সহঃসম্পাদক শ্রীযুক্ত বাবু যদুনাথ তলাপাত্র মহাশয়গণ মাহিষ্য ব্যাঙ্কিং এণ্ড ট্রেডিং কোম্পানির এজেন্ট নিযুক্ত হইলেন।

মাহিষ্য-সমাজ কার্য্যালয়ে বিক্রেয় পুস্তকের তালিকা।

সুকবি শ্রীযুক্ত ক্ষিতিনাথ দাস প্রণীত বিবাহিত যুবক যুবতীর শিক্ষার জন্য দুইখানি নূতন গ্রন্থ (১) দাম্পত্য চিত্র—অপূর্ব্ব নাট্যকাব্য মূল্য ৸০ আনা, সুন্দর বাঁধাই ১৷০ (২) বৌ-কথা-কও—সরল সামাজিক গদ্য কাব্য মূল্য ৷৵১০ আনা। কবি শ্রীযুক্ত রেবতীরঞ্জন রায় প্রণীত (৩) প্রেমের স্বপন মূল্য ৷০ আনা। (৪) মাহিষ্য-বিবৃতি (যন্ত্রস্থ)। (৫) ভ্রান্তি-বিজয়—(যন্ত্রস্থ) (৬) The Mahishyas—মূল্য ১৲ টাকা। (৭) মাহিষ্য-সমাজ—সামাজিক পুস্তক—১৩১৭ সালে প্রকাশিত কেবল মাত্র ডাকমাশুল ৵০ দুই আনা পাঠাইলেই পাইবেন। (৮) মহিষাদল রাজবংশ ৷৷০ আনা। (৯) ব্রাহ্মণ-সংহিতা ৷৷০ আনা। (১০) মাহিষ্য-প্রদীপ ৵০ আনা। (১১) মাহিষ্যপ্রকাশ ১৲ টাকা। (১২) দিয়াশলাই-প্রস্তুতপ্রণালী ৵০ আনা। (১৩) মাহিষ্যতত্ত্ববারিধি ৸০ আনা। (১৪) আচার্য্য ব্রাহ্মণ ১৲ টাকা। (১৫) আর্য্যপ্রভা—ভগবতীচরণপ্রধান ১৲ টাকা। (১৬) গৌড়াদ্যবৈদিক ব্রাহ্মণ-পরিচয় ⁄০ আনা। (১৭) সার্ভে ও সেটেলমেণ্টে প্রজার কর্ত্তব্য ৷০ আনা। (১৮) বঙ্গীয় মাহিষ্য-পুরোহিত ৷০ আনা। (১৯) তমলুকের ইতিহাস ১৲ টাকা। (২০) রাণী রাসমণি ৷৷০ আনা। (২১) উচ্ছ্বাস ৷৷০ আনা।

মাহিষ্য-সমাজ।

[তৃতীয় ভাগ, ষষ্ঠ সংখ্যা—আশ্বিন, ১৩২০ সাল।]

সাহিত্য-সভা ও সঙ্গীত সম্বন্ধীয় একটি পুরাতন প্রবন্ধের কথা।

আজকাল সাহিত্য-পরিষৎ ও সাহিত্য-সভা প্রভৃতি উপলক্ষে দেশব্যাপী আলোচনা চলিয়াছে। এই সকল সভাসমিতির মুখ্য নীতি এবং উদ্দেশ্য সম্বন্ধে কোন কথা বলিতে চাই না। তবে এরূপ সভা-সমিতি সম্বন্ধে আমরা চিন্তা করি নাই তদ্রূপ নহে। তিন বৎসর পূর্ব্বে এই সম্বন্ধে আমরা যাহা চিন্তা করিয়াছিলাম, যাহা প্রকাশ্যে বলিয়াছিলাম, সাধারণের অবগতির জন্য তাহার একাংশ উদ্ধৃত করিয়া কিছু আলোচনা করা গেল। এইরূপ আলোচনা দ্বারা ঐ সকল বিষয়গত চিন্তাস্রোতের সহায়তা হইবে বলিয়া আশা করি।

আজ ১৯১৩ খৃঃ সেপ্টেম্বর মাস। আমরা সাহিত্য সভা গঠনাদি কালীয় বিষয় সম্বন্ধে ১৯১০ খৃঃ জুলাই মাসে একটি ইংরেজী প্রবন্ধ প্রকাশ করিয়া বিতরণ করি। প্রবন্ধের শিরোনামা ছিল—"Moral Education, Preservation of Indian Music, and Development of Bengalee Literature in Eastern Bengal."

বিষয় গুলি ব্যাপক হইলেও উহার মধ্যে কিরূপে সাহিত্যসভা গঠিত ও চালিত হওয়া বাঞ্ছনীয় সেই সম্বন্ধে আমরা বিস্তৃত অভিমত প্রকাশ করিয়াছিলাম। এই প্রবন্ধ সম্বন্ধে পূর্ব্ববঙ্গ এবং আসাম গভর্ণমেণ্টের উচ্চ রাজকর্ম্মচারিগণের অনেকে নিজ নিজ মন্তব্য প্রকাশ করিয়া পত্র লিখিয়াছিলেন। এই সকল মন্তব্যের মধ্যে ৪।৫ খানা হইতে কিছু কিছু উদ্ধৃত করা হইল।

সাধারণতঃ দেখিতে পাওয়া যায়, নৈতিক শিক্ষার অভাবেই অনেক সুবুদ্ধি যুবক প্রকৃত কর্ত্তব্য ধরিতে না পারিয়া বিপথগামী হয়, ইহাদের শিক্ষার মূল

সূত্রেই দোষ রহিয়া গিয়াছে। ইহা সংশোধিত না হইলে সুফলের আশা নাই। এই সম্বন্ধে উক্ত প্রবন্ধে আমরা বলিয়াছিলাম :—

"No doubt the people of the Country are mostly ignorant and an imperceptively thin layer of literate people is engrossed in reaping the best advantage of the situation, the Government of the Country is keeping itself aloof from all efforts at moral training. Consequently there is none to think of moral education. But the Government has its justification. The Government is doing so out of a generous and scrupulous regard for our sentiment, biogotry, prejudice, superstition, and intolerance of interference in such matters. We donot know that by our acquisance in such aloofness on the part of the Government we have simply betrayed our ignorance of the value of moral training. No one maintains that the Government should interfere with the religious observances of the people ; but apart from the ritualistic and exclusive phase, there is left ample margin in each religious system which may be treated as containing general principles of human conduct applicable to all classes alike. This portion can easily be utilised for supplying moral food to the boys. To sit tight over question like this and allow things to go from bad to worse is good neither for the people nor for the Government. No doubt the Government has adopted the policy of aloofness from the best of motives, but it is also necessary that food be supplied to the moral nature of men under its care. I think that a Government like that of ours which has to rule a seething mass of population of diverse races, colours and creeds cannot be conceived to be guided by the principles of any particular faith. It must rise and has risen far above all contentions of castes and creeds. It has to identify itself with the interest of all castes and creeds and help their gradual progress, but at the same time it has to see that their bigotry or intolerance does not run beyond limit, does not interfere with ordinary principles of human conduct, and ordinary rights of citizenship. It is on this principle of

humanity and justice that the burning of widows in the funeral pyres with their deceased husband, and the like customs were prohibited by the benign Government. The recent events have demonstrated that improper advantage has been and is being taken of certain social privileges and rights, and tyranny has been practised in the name of religion and certain aspect of social organisation to deprive people of their natural right to act freely. This is infringing on the rights of ordinary citizenship and working against moral principles. It therefore becomes necessary under such circumstances on the part of the Government to take measures to restrain the repetition or continuance of such tyranny, otherwise the State becomes endangered. Of course under such circumstances restraint may assume the form of penal legislation which would have been unnecessary, had the people concerned received proper moral education and known that such conduct of theirs is inconsistent with the ordinary rights and obligations of citizenship.

To our shame be it said that superstition and ignorance easily add sanctity to crimes in our country where more than 90 per cent of the population are quite illeterate. We know *Pindarism* and *Thuggism* were semi-religious institutions connected with certain features of Tantric rituals. It is therefore no wonder that we find amongst us men who maintain that offence against moral principles when subordinated to the so-called higher interests of the country is no offence at all, and is calculated to ennoble the culprit.

Such doctrine is the product of a morally degenerate mind with a mere white-wash of religious study. We know that a mind without moral training is quite unfit for the study of higher religious works, and when such mind studies religion with a motive suited to its nature can bring dis grace to any system of religion, morality or philosophy. The introduction of the holy Gita and Vedanta into the society of criminals to draw evil inspirations therefrom by putting misinterpretation, is an achievement reserved

for a class of men whom the sooner we learn to condemn the better.

There is no sanction whatever for commiting crimes either in the Gita or in any of the Dharmasastras of the Hindus. Neither is it true that the military races of the world have ever been murderers or criminals, nor that the commitment of crimes is an index to or evidence of possessing martial spirit. The military races of the world are men of discipline, honour, courage, feeling and manners. Arjoon to whom the Gita is addressed is a highly developed moral Khatriya. He is all tenderness, humanity, virtue, generosity, manliness and courage. There is no trait of a murderer or criminal in him. It is the degenerate who prescribe the Gita or the Bible to the criminals to draw criminal inspirations therefrom. Such men will no doubt consider moral education to be inconsistent with patriotism. Such moral delinquency is likely to be cured more by amendment of criminal laws than by moral instruction. In order to eliminate gradually this diseased element from our society it is necessary that moral training and soundest education be imparted to our youths."

নীতি-শিক্ষা দ্বারা জাতীয় চরিত্র গঠিত হইলেই সভা সমিতি প্রভৃতি দ্বারা সাহিত্য-সঙ্গীতাদি শাস্ত্রের উন্নতি বিধান করা সম্ভবপর হয়। যে সময়ে ভারতবর্ষের জাতীয় নীতি উৎকর্ষ লাভ করিয়াছিল, তখনই ভারতবর্ষে কাব্যনাট্য ও গান্ধর্ব্ব বিদ্যার চরম উন্নতি হইয়াছিল। পূর্ব্ববঙ্গের সাহিত্য-চর্চ্চা সমষ্টিগত সাহিত্য-চর্চ্চার প্রকাণ্ড অংশ বিশেষ, পূর্ব্ববঙ্গের সাহিত্য এইজন্য একটী বিশেষ আলোচ্য বিষয়। পূর্ব্ববঙ্গের সাহিত্যসভা গঠনাদি সম্বন্ধে উক্ত প্রবন্ধে আমরা নিম্নলিখিত মন্তব্য প্রকাশ করিয়াছিলাম :—

"In order to improve the literature of Eastern Bengal, a well organised literary society should exist in Dacca. The promoters of the society should try to induce the leading literary and learned men of the Province to join it. The members should be nominated with special reference to literary qualifications and fitness. It should try to secure

sway its deliberations. It must be a purely literary society. No attempt should be made to hold its sittings in different centres. Literary men do not grow in abundance everywhere and repeated sittings in different centres do not ferlitise the field of local literature. The celebrated literary and scientific societies of Europe have not been known to rove over the country in that fashion, and make demonstration *as if they were political bodies.*

The principal work of the society should be solution of difficulties that stand in the way of progress of Bengali literature in Eastern Bengal. It should aim at the collection of manuscript and Bengali works, preparation of a good catalogue of such collections, establishment of a suitable library and reading room, and subscription of news-papers. Every facility should be given to the members to deliver lectures written or oral on literary matters periodically. New authors should be encouraged and introduced to the Director of Public Instruction whenever necessary. It should try to insist on the study of grammar, lexicography, Sanskrit and English literature, and the like before embarking as writer. Discipline is the primary thing. I believe a large number of youths of Eastern Bengal is available for the purpose of training and discipline. No writer of the Province should be aloof from the Society, if sought for I think in this way a good begining can be made. It should be impressed on the minds of the youths of the Province, that in order to be good writers they are simply to study, think, observe and proceed in the style suggested by their nature and surroundings. They must put their own houses in order and not take shelter under the roof of a neighbour, however kind. To be good writer it requires only discipline, study, observation and thinking. It does not require so artificial a garb. The great defect in the nature of the people of Eastern Bengal is want of a spirit of enterprise for writing. We know of great Pundits of Eastern Bengal who have left no works, whilst very inferior section of Pundits of other parts

of the country, have left many things. The spirit of concealing merits has done much injury to us."

এই প্রণালীর শাসনে সাহিত্যসভা গঠন করিলে সুফল হইবার আশা করা যায়।

পূর্ব্ববঙ্গে লেখকের সংখ্যা নিতান্ত অল্প। এই অবস্থা আলোচনা প্রসঙ্গে আমরা বলিয়াছিলাম :—

"We must not forget other draw-backs. Many youths of the present day in Eastern Bengal rarely care to study Sanskrit and English literature, the two great feeders of Bengali literature, in a way in which they ought to study them. A large number of youths seems to be quite incapable of bearing the strain of further study. What they write in Bengali is mostly reflection of what they once heard, but which failed to make adequate impression. They will neither think, nor study, nor observe.

Another defect is that we forget our own nature whilst in the field of writing. We, the people of Eastern Bengal, are of philosophic disposition, highly imaginative, grave, sincere emotional and loving. The very nature of our country has made us so. Our rice-fields are watered by the mightiest and most majestic flows of water. We drink from the eddies, whirlpools, and roaring billows of the mightiest streams in the land. We live under the shade of the mighty Himalayas which touch the very skirts of Dacca with the arm of Khasi and Garo Hills levelled down in the south to the high lands of Madhupurgarh running across the district of Mymensing. It should be noted that apart from artistic excellence and high finish of style and language the writings of Rai Kali Prasanna Ghose Bahadur are truly loyal in spirit to the nature of the people of Eastern Bengal.

No doubt Calcutta also had her classical Bengali. But the change from the classical to that in which the light literature of the day is clothed was a very rapid one. We could not have similar development of our language within so short a period : the result was that to meet the popular demand we

had to introduce the language of Calcutta quarter bodily in Eastern Bengal for the purpose of literature. It was not our mother tongue, and in order to use it we had to unlearn much. It was not intelligible to a large body of us. In adapting themselves to the new condition, our youths sank into mere imitators, and they could make no progress."

প্রবন্ধের এই সকল অংশ সম্বন্ধে ভূতপূর্ব্ব পূর্ব্ববঙ্গ ও আসাম গভর্ণমেণ্টের প্রধান কর্ম্মচারিগণ মধ্যে অনেকেই অনুকূলে একটু বিস্তৃত মন্তব্য প্রেরণ করিয়াছিলেন। তাহার অধিকাংশ পত্র ডেমি-আফিসিয়েল্ হওয়ায় অবিকল উদ্ধৃত করিতে পারিতেছি না। তবে তদানীন্তন দক্ষ ডিরেকটর মিঃ সার্প্ তাঁহার বিস্তৃত পত্রে লিখিয়াছিলেন :—

"আপনি নৈতিক শিক্ষা সম্বন্ধে যেরূপ মন্তব্য প্রকাশ করিয়াছেন, তাহার অধিকাংশ কথাই ঠিক বলিয়া আমার ধারণা। নৈতিক শিক্ষা গভর্ণমেণ্টের গুরুতর বিবেচনাধীন আছে।

"ঢাকায় সাহিত্য আলোচনার সভা স্থাপন সম্বন্ধে ইতিপূর্ব্বেই রায় কালীপ্রসন্ন বিদ্যাসাগর মহাশয়ের সঙ্গে আমি আলাপ করিয়াছিলাম, এবং তাহার ফলে তিনি একটা সভার প্রতিষ্ঠা কল্পে কিছু করিয়াও ছিলেন; কিন্তু তাঁহার স্বাস্থ্য ভগ্ন হওয়ায় বিশেষ কিছু করিতে সমর্থ হন নাই। এইরূপ সভা স্থাপন করিতে হইলে এবং তাহা ফলপ্রদ করিতে হইলে পূর্ব্বেই একটু বিশেষ চিন্তা করিয়া সভার প্রণালী প্রভৃতি ঠিক করা সঙ্গত হয়।

"ঢাকায় এইরূপ সভা স্থাপন করিতে হইলে যত সংখ্যক যোগ্য গ্রন্থকার থাকা আবশ্যক, তাহা ঢাকায় আছে বলিয়াও বোধ হয় না। তবে ক্রমশঃ কিছু একটা হইবে সন্দেহ নাই।"

মিঃ সার্পের পত্রের শেষ মন্তব্য সম্বন্ধে কোন কথা বলিবার উপায় নাই। ঢাকা জেলায় উপযুক্ত সংখ্যক লেখক নাই, ইহা রায় কালীপ্রসন্ন বিদ্যাসাগর জানিতেন এবং আমরাও জানি।

যাহা হউক, আমরা নূতন ক্রমে কোন সাহিত্য সভা গঠনের প্রস্তাব করি নাই, রায় কালীপ্রসন্ন বিদ্যাসাগর প্রতিষ্ঠিত সভাই অভীপ্সিত ভাবে ও প্রণালীতে কার্য্য করে ইহাই আমাদের উদ্দেশ্য ছিল। তিনি বাঁচিয়া থাকিলে অবশ্য এই অংশে অনেক কাজ হইত।

এই স্থলে একটি কথা না বলিয়া পারা যায় না। সমবেত ভাবে প্রাচীন

সংস্কৃত শিক্ষা ও নব্যশিক্ষায় ঢাকা জেলা কলিকাতারই অব্যবহিত নিম্নে। বাঙ্গালার অন্য কোন জেলা এই সম্বন্ধে ঢাকার সমকক্ষ হওয়া দূরে থাকুক, নিকটবর্ত্তীও নহে। এইরূপ উন্নত হইলেও ঢাকা জেলায় গ্রন্থকারের সংখ্যা অতি অল্প। কলিকাতা, ২৪ পরগণা, এবং তাহার সন্নিহিত দুই একটী জেলার কোন কোন অংশে লেখক পাওয়া যায়। ঐরূপ স্থান ভিন্ন বিদ্যাবুদ্ধি সমুন্নতিতে অন্যান্য জেলা ঢাকার তুলনায় পশ্চাৎপদ। সে সকল স্থানে লেখক নাই, বা যৎসামান্য সংখ্যায় বিদ্যমান আছেন। আশ্চর্য্যের বিষয়, সেইরূপ পশ্চাৎপদ স্থান সমূহেও সাহিত্যপরিষদের শাখা প্রশাখা সমূহ বিস্তৃত হইয়া শত শত লেখক ও গ্রন্থকারের নাম আবিষ্কার করিতেছে!! লেখক লইয়াই সাহিত্যের সভা, সেই লেখকের অসদ্ভাব স্থলে কিরূপে এত সাহিত্যপরিষদের শাখা বিস্তৃত হইতেছে দেখিয়া অনেকের মনে অনেক চিন্তা আসিয়া পড়িতেছে।

আমাদের প্রবন্ধ সম্বন্ধে ভূতপূর্ব্ব গভর্ণমেণ্টের অন্যতম পরিচালক মিঃ লায়ন্, মিঃ নেথান্, মিঃ বোনহাম্ কার্টার বিস্তৃতভাবে নিজ নিজ মত প্রেরণ করেন। তাহাতে আশা হইয়াছিল, ঢাকাতে প্রবন্ধের প্রতিপাদ্য বিষয়গুলি সম্বন্ধে সমুচিত ফল লাভ হইবে। কিন্তু বিধি-বিড়ম্বনায় তাহা ঘটে নাই। পূর্ব্ববঙ্গের কতকগুলি ভ্রান্ত ও অবিমৃষ্যকারী লোকের দুর্ব্বুদ্ধিবশতঃ ঢাকা আবার অন্ধকারে মগ্ন হইতে চলিয়াছে।

ঢাকায় সঙ্গীতের উন্নতি সম্বন্ধে আমরা উক্ত প্রবন্ধে যাহা লিখিয়াছিলাম এবং যাহাতে মিঃ লায়ন্ ও ষ্টেসন্টন্ প্রভৃতি অনুকূল মত প্রকাশ করিয়াছিলেন, তাহা নিম্নে উদ্ধৃত হইল :—

Preservation of Indian Music in Eastern Bengal.

There is no denying of the fact that music exercises a most soothing and balming effect on human mind, and is calculated to restore mental equilibrium when circumstances conspire to disturb it. And as such no nation could dispense with music. Every nation has invented its own system of music, and India is no exception to the rule. The captivating power of Indian music over Asiatic mind can be best gauzed from the fact that the hardy Afghan and rough Tartar conquerors of India were amazingly influenced by it; whilst some rulers of Persian descent, as in Lucknow, liked it

so much that they developed a new phase of it to the surprise of the masters of Indian music. The condition of Indian music during the Mahomedan period may be summarised as follows :—The Indian music proper—the song consists of three parts :—the *dhrupada*, the *Kheal*, and *Toppa*, each having an accompaniment of stringed and drumming instrument suited to itself. The first is the genuine Hindu music or song proper, grand and magnificent carried to a high pitch of perfection. The second is a lighter and quickened form with a slight admixrure of Persian system. The third is still lighter development believed to be more Persian in character. Each of the systems has been cultivated by a school of veteran *Ostads* of its own.

At the commencement of the Mahomedan invasion of India, the Hindu music in Northern India suffered a great deal, and was on the wane. It was fortunate for Indian music proper (the Dhrupada and Kheal) that it could influence the minds of the Mahomedan conquerors of India, but for whose patronage it would pass into a matter of tradition. The Pathan rulers very much appreciated Indian music ; some of them were good singers. But it was reserved for Akbar the Great to raise it by his august patronage to the position from which it has come down again to a certain extent. The chief of the master musicians of the day was Tan Sen a Mahomedan convert, who was originally a shepherd Brahmin tending his cattle in the forests of Brindaban near Mathura, and who was taught to sing by a Hindu ascetic Haridas Swamin of that place. The rivals of Tan Sen were Braja Baera, Gopal Nayaka and a few others. The standard *dhrupads* and *Kheals* of the present day are mainly compositions of Tan Sen, Braja Baera and others of that day celebrity. The great Emperor Akbar whose genious was of the most versatile character lavished patronage on these masters of Hindu melodies. It is from this time that Agra and Delhi became centres of Hindu musicians in Northern India.

From the time of Akbar it became a state etiquette to

patronise good musicians in all the royal courts of India. In Bengal, however, the powerful kings of Malla race of Banavishnupur, in the district of Bankura, became ardent patrons of Hindu Music proper. So great was the patronage extended to the musicians by the successive Malla sovereigns of Banavishnupur, that Hindu music proper took a very deep root there. The old city of Banavishnupur now merely the head quarter of a subdivision of that district, still supplies best Ostads of *dhrupad* aud *Kheal*, and is still flattered with the title of Second Delhi. Banavishnupur still holds its proud position as the seat of orthodox system of Hindu music in Bengal.

The Mahomedan courts of Dacca and Murshidabad however fell under the latter day influence of Delhi and specially of 'Lucknow, where laterly Toppa was being developed in an enchanting manner, and that class of drum called *Tabala*, its best accompaniment rose to a high state of perfection. This School of music mixed as it is with Persian strain carried great favour with the pleasure seeking and indolent Mahomedan Nawabs and Omras of Dacca and Murshidabad. The deep, grand, but difficult music of orthodox Hindu style found less favour here than in other places. The influence of Banavishnupur was well felt at Murshidabad, but at Dacca it was felt faintly. Dacca was being delighted with gay, light, sonorous, luxurious and almost voluptuous strain of *Tappa* which at once appeals to to the sense, and the sweet sound of *Tabala* warbling along with a song, like a bird, at the skilful touch of Dacca Ostads as is no where to be found iu other parts of this country. After the powers of the Mahomedan grandees had come to a close music rapidly declined in Dacca.

The Dacca music in its decaying condition received a new impetus the other day from an unexpected quarter. Maharaja Bir Chandra Manikya Bahadoor, the grandfather of the present Maharaja of Hill Tipperah, had a genius for music and fine arts. He conceived a passion for raising his Capital Agartola to the level of the famous Bana-

vishnupur in musical matters. Though his resources were too limited for the purpose, he succeeded in gathering round him a galaxy of *Ostāds* of the first quality. Frequent intercourse of the Dacca *Ostáds* with *Ostàds* of other parts of India on the occasion of their visits to Agartala through Dacca greatly influenced the style of the Dacca music though it now bids fair to "pass into a matter of tradition" unless preserved.

My acquaintance with some of the best *Ostáds* commenced in connection with the musical school of Babu Gagan Chandra Choudhury of Dacca, a distinguised disciple of Ostad Shadhu Babu, who had been in his turn disciple of Khairati Meah of Delhi, and Hushanbox of Murshidabad who made Dacca their home, and whose system of *Tabálā* playing prevails in Dacca. I am grieved to say that most of the veteran *Ostâds* of the country both singers and players on instrument with whom I came in contact at that period, have passed away one by one. It ought to be noted that there is no other seat of orthodox music in the province except in Dacca. It is high time to adopt some measure to enable the surviving Dacca *Ostads* to hand on their knowledge to their pupils. For this purpose a school of music should be established at Dacca, and I think if the Government takes the inititive it will be liberally supported by the people of the country. A building, a set of musical instruments, a staff of 4 or 5 *Ostād* professors are all that is necessary to make the school a success.

Those of the few surviving *Ostâds* who will be unable to serve as professors should be provided with a subsistence allowence where necessary to enable them to hand on their knowledge to their disciples at home. In order to encourage them some distinction should be conferred on them; and if necessary new order may be created, and titles like "Nayaka" be conferred on them in pursuance of the policy of the ancient rulers of the country.

Such favours would produce most satisfactory results. I do not know whether the dream of the English gentry

discoursing on Indian music in the orthodox way with the native *Ostàds* would ever be realised ; but we know that the policy of cultivating Indian music as pursued by the Moghul and Pathan sovereigns produced most satisfactory results. Such favours will place the music loving public under deep obligation. The encouragement of Indian music will afford the best opportunity both to the rulers and the ruled freely to mix with great advantage to both. The relation between disciples and *Ostads* as well as among class friends in the region of music is still a sacred and real one. The soothing and balming effect of music cannot be exaggerated.

I have already said that the number of surviving *Ostáds* is very small now in the city and in its vicinity. The best known may be mentioned below :—Babu Kailas Chandra Roy, a *dhrupadist* of Gandhira a village about 7 miles to the west of the city of Dacca ; Imdad Ali, Prasanna Bonik, Bhagaban Das, Gagan chowdhury and a few others of the city.

মিঃ লায়ন্ এবং পূর্ব্ববঙ্গ গর্ভর্ণমেণ্টের অফিসিয়েটিং ডিরেক্টর মিঃ ষ্টেপল্টন্ ১৯০৮-৯ সনের শিক্ষা রিপোর্টে ঢাকার সঙ্গীত রক্ষার সম্বন্ধে মন্তব্য করিয়াছিলেন। আমাদের প্রবন্ধে তাহা উল্লিখিত হইয়াছিল। কাজেই মিঃ ষ্টেপল্টন্ বিদায় লইয়া বিলাত যাত্রা করিবার সময় আমাদের প্রবন্ধ পাইয়া ভূমধ্য সাগর হইতে পত্র লিখিয়া জানাইলেন :—

Dear Sir,

I have to ackonwledge with many thanks the well-reasoned pamphlet which I received with your note of Sept. 24. I am glad to see that the remarks made in the education report for 1908—9 on the importance of encouraging Bengalee music and literature have been appreciated by some of those most intrested in the subject, and I trust you will be able to induce the local Government to help the movement by all means that lie in their power.

যদি পূর্ব্ববঙ্গের কতিপয় অবিমৃষ্যকারী লোক পূর্ব্ববঙ্গের অলক্ষ্মীর আহ্বানে ঢাকার উন্নতি পথের অন্তরায় না হইতেন, তবে এই সকল উন্নতির পথ বেশ প্রশস্ত হইবার কথা ছিল।

নবাব মুর্শিদকুলী খাঁ যে মুহূর্ত্তে সদলবলে ঢাকা পরিত্যাগ করিয়া মুর্শিদাবাদ যাত্রা করিয়াছিলেন, সেই মুহূর্ত্তেই ঢাকা, পূর্ব্ববঙ্গ, অতল অন্ধকারে ডুবিয়াছিল। বহুকাল পরে বিধি সদয় হইয়া ঢাকার অন্ধকার যবনিকা উত্তোলন করিলেন, কিন্তু দৈবে কতিপয় হিতাহিত জ্ঞানশূন্য লোকের দুর্ব্বুদ্ধির ফলে, সে অন্ধকার যবনিকা আবার পতিত হইতে চলিল। পূর্ববঙ্গ বাসী লোকের মুখে যে বিপুল উৎসাহের, আশা ভরসার আলো দেখা গিয়াছিল, এখন আর তাহা দেখা যায় না।

যাহা হউক, যখন আমরা এই প্রবন্ধ প্রকাশ করি, তখন ঢাকায় সাহিত্য-পরিষৎ প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল কি না ঠিক স্মরণ নাই। ঢাকায় কোন সাহিত্য-সমিতির সঙ্গে আমি কখনও যোগ দেওয়ার সময় প্রাপ্ত হই নাই। কিন্তু আমার পুত্র বিজয় কুমার রায় বি, এ,—যে বিগত চৈত্রে আমাকে অকুল শোক সাগরে ভাসাইয়া অনন্ত ধামে চলিয়া গিয়াছে, সেই পুত্র ঢাকা সাহিত্য পরিষদের সভ্য হইয়া উহার ইতিহাস বিভাগে কিছুকাল কার্য্যশীলতা দেখাইয়াছিল। তাহার সঙ্গে আলাপে পরিষৎ সম্বন্ধে আমার জ্ঞান হইয়াছিল এবং দূরে থাকিয়াও পরম্পরায় তাহার সম্বন্ধে উক্ত সভায় নিজকে স্বার্থ বিশিষ্ট মনে করিতাম। এই মাত্র। উক্ত পরিষৎ সহ বিজয় কুমারের সম্বন্ধ স্থাপিত হওয়া সম্বন্ধে বারান্তরে কিছু বলিবার ইচ্ছা রহিল। এখনও তাহার কথা মনে করিতে হৃদয়ে আঘাত লাগে। তাহার উৎসাহেই আমি আলোচিত প্রবন্ধটি লিখিয়া বিতরণ করিয়াছিলাম।

শ্রীবসন্তকুমার রায়, এম-এ, বি এল।

অপূর্ব্ব সন্দেহ।

পত্রিকার সম্পাদক, পাঠক, পর্য্যালোচক মহাশয়গণের নিকট আমি একটি অপূর্ব্ব সন্দেহ প্রকাশ করিতে সাহসী হইয়াছি। আশা করি, সে বিষয়ে যিনি যতদূর জানেন, তিনি তাহা এই পত্রিকাতে প্রকাশ করিয়া বা পত্র দ্বারা জানাইয়া আমার সন্দেহ দূর করতঃ, বঙ্গবাসী ক্ষত্রিয় বৈশ্যের দৈব পৈত্র্য কর্ম্মের শক্তি প্রদায়ক হইবেন। আমার অপূর্ব্ব সন্দেহটি এই—

"বঙ্গদেশস্থ ক্ষত্রিয় বৈশ্যগণ কোন বেদ অনুসারে দৈবপৈত্র্য কার্য্য করিবে?" এরূপ প্রশ্ন উত্থাপন হইবার কারণ এই যে, বাঙ্গলা ১৩০০ সালের পূর্ব্বে এই নিক্ষত্রিয়া পৃথিবীতে ক্ষত্রিয়বৈশ্যের অভাব বলিয়াই ভট্টাচার্য্যদের মুখে শুনা যাইত। ব্যবস্থাপক ব্রাহ্মণগণ কুড়ি বৎসরের পূর্ব্বে কোন কার্য্যোপলক্ষে কথোপকথন সময়ে 'কলিতে ক্ষত্রিয় বৈশ্য আছে' একথা শুনিলেই হঠাৎ অগ্নিশর্ম্মা হইয়া আসনে পুনঃ পুনঃ চপেটাঘাত করতঃ উচ্চৈঃস্বরে বলিতেন, 'কলৌ ক্ষত্রিয়বৈশ্যৌ ন স্তঃ।' কেহ কেহ বা চৈতন্যকে ডম্বুরবাদকবৎ করিয়া তারস্বরে বলিতেন; 'ইদানীন্তন ক্ষত্রিয়াণাং শূদ্রত্বমাহমনুঃ। তেন মহানন্দি পর্য্যন্তং ক্ষত্রিয় আসীৎ। এবঞ্চ ক্রিয়ালোপাৎ বৈশ্যানামপি তথা। এবমম্বষ্ঠাদীনামপি জাতি প্রসঙ্গাদুক্তং।' কলিতে ক্ষত্রিয় বৈশ্য নাই, কেবল ব্রাহ্মণ ও শূদ্র এই দুইটি মাত্র জাতি আছে। এখন আর সেকাল নাই। ক্ষত্রিয় বৈশ্য বংশজাতগণ ব্রহ্মহত্রাভিমানিদিগকে শূদ্রকল্প নিশ্চয় করিয়া, পণ্ডিতের সহায়ে হিন্দু-শাস্ত্র পর্য্যালোচনা দ্বারা নিজ নিজ জাতীয় গৌরব বিস্তার করিতে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হইয়াছে। কিন্তু শূদ্রযাজীর ব্যবস্থামতে তাহাদের ক্রিয়া কলাপ কোন কোনটি শূদ্রবৎ, কোন কোনটি বা পুরোহিতবৎ অনুকরণে চলিয়া আসিতেছে। তাহাও আবার কালভেদে স্থানভেদে অসাদৃশ হইতে দেখা যায়। এ অবস্থায় পৃথক্‌রূপে প্রক্রিয়া গ্রন্থের সৃষ্টি না হইলে এ বিশৃঙ্খলা নিবারণের অন্য উপায় দেখা যায় না। (১) কেহ কেহ বলেন, যাজকের দোষে কর্ম্মকাণ্ডে এইরূপ বিশৃঙ্খলা ঘটিয়াছে। (২) কেহ কেহ বলেন, চিরপরম্পরা যেখানে যেমন চলিয়া আসিতেছে, তাহাই চলিবে। আমি এই দুই কথার পক্ষ সমর্থন করিতে পারিলাম না।

কার্ত্তিক মাহাত্ম্যে (২৫ অঃ ২৭) লিখিত আছে:—

পরস্যনিন্দাং পৈশুন্যং ধিক্কারং চ করোতি যঃ।
তৎকৃতং পাতকং প্রাপ্য স্বপুণ্যং প্রদদাতি সঃ।

যে পরের নিন্দা বা খলতা বা ধিক্কার করে, সে নিজের পুণ্য পরকে দিয়া তাহার কৃত পাপ প্রাপ্ত হয়। প্রয়োগপারিজাত স্মৃতিতে লিখিত আছে:—

ন যত্র সাক্ষাদ্ বিধয়ো ন নিষেধাঃ শ্রুতৌস্মৃতৌ।
দেশাচার কুলাচারৈ স্তত্র ধর্ম্মোনিরূপ্যতে।

বেদ ও স্মৃতিতে যে বিষয়ে সাক্ষাৎ বিধি বা নিষেধ নাই, সেখানে দেশাচার

বিধির পোষণ না করিয়া সাক্ষাৎ বিধির অনুসন্ধান করিতে গিয়া মীমাংসা গ্রন্থে এই বিধি পাইলাম :—

'স্বকুল পরম্পরায়া অধ্যয়ন বিষয়ঃ শাখাবিশেষঃ স্বাধ্যায়ঃ। যো যৎশাখা বিশিষ্ট স্তেনৈব স এব শাখা বিশেষোঽধ্যেতব্যঃ।'

নিজকুল পরম্পরা অধ্যয়ন বিষয় শাখা বিশেষের নাম স্বাধ্যায়। যে যে শাখা বিশিষ্ট সে সেই শাখা বিশেষকে অধ্যয়ন করিবে। বশিষ্ঠ স্মৃতি এই মর্ম্মে লিখিয়াছেন :—

'পারম্পর্য্যাগতো যেষাং বেদঃ সপরিবৃংহণঃ।
তচ্ছাখং কর্ম্মকুর্ব্বীত তচ্ছাখাধ্যয়নং তথা॥
স্বীয় শাখোজ্ঝিতা যেন ব্রহ্মতেনোজ্ঝিতং পরং।
ব্রহ্মহৈব সবিজ্ঞেয়ঃ সদ্ভির্নিত্যং বিগর্হিতঃ॥
যস্ত শাখাং পরিত্যজ্য পারক্যামধিগচ্ছতি।
স শূদ্রবদ্ বহিষ্কার্য্যঃ সর্ব্বকর্ম্মসু সাধুভিঃ॥
অধীত্য শাখামাত্মীয়াং পরশাখাং ততঃ পঠেৎ॥'

শাখার সহিত যে বেদ যাহাদের পুরুষপরম্পরাক্রমে আসিয়াছে, তাহারা সেই শাখা অধ্যয়ন করিবে এবং সেই শাখোক্ত কর্ম্ম করিবে। যে নিজ শাখা অধ্যয়নে অবহেলা করে, সে ব্রহ্মকেও উপেক্ষা করে। তাহাকে ব্রহ্মঘাতী বলা যায়, সাধু সকল কর্তৃক সে নিত্য নিন্দিত হয়। যাহার যে শাখা সে তাহা পরিত্যাগ করিয়া, যদি পরকীয় অর্থাৎ অন্যের শাখা অধ্যয়ন করে, সে সাধুগণ কর্তৃক সকল বৈদিক কর্ম্মে শূদ্রের ন্যায় বহিষ্কৃত হইবে। অতএব অগ্রে নিজ শাখা অধ্যয়ন করিয়া তাহার পর পরের শাখা-পাঠ করিবে।

এই সকল উক্তি পাঠে এরূপ বোধ হয় যে, কুলক্রমাগত শাখোক্ত কর্ম্মগুলি কেবল ব্রাহ্মণ বংশজাত ব্যক্তিগণের প্রতি বিধি হইয়াছে। শূদ্রাহ্নিকাচার তত্ত্বে এইরূপ পাওয়া যায়।

'আর্য্যক্রমেণ সর্ব্বত্র শূদ্রাবাজসনেয়িনঃ।
অস্মাচ্ছূদ্র স্বয়ং কর্ম্ম যজুর্ব্বেদীব কারয়েৎ।'

মনুর বিধান অনুসারে শূদ্রেরা সকল স্থানে বাজসনেয়ী। সেই হেতু শূদ্র নিজে যজুর্ব্বেদীর ন্যায় কর্ম্ম করিবে। এইটি শূদ্রের পক্ষে প্রত্যক্ষ বিধিবাক্য। ক্ষত্রিয় বৈশ্যের জন্য এরূপ বিধিবাক্য না জানা প্রযুক্ত পণ্ডিত

মণ্ডলীর নিকট প্রশ্ন করিতে হইতেছে। না জানা অবস্থায় একটি বিধি মনে হয় যে ;—

"কেবলং শাস্ত্রমাশ্রিত্য ন কর্ত্তব্যো বিনির্ণয়ঃ।
যুক্তিহীন বিচারেতু ধর্ম্মহানিঃ প্রজায়তে॥"

কেবল শাস্ত্রকে আশ্রয় করিয়া কর্ত্তব্য নির্ণয় করা যায় না, যুক্তিহীন বিচারে ধর্ম্মহানি হইয়া থাকে। এখন শাস্ত্রবিধি অজানা অবস্থায় যুক্তি দ্বারা এরূপ বুঝা যায় যে, মনু মহাত্মা চারি জাতিকে কার্য্য স্থলে দ্বিজ ও শূদ্র এই দুই ভাগে বিভক্ত করিয়াছেন।

ব্রাহ্মণঃ ক্ষত্রিয়ো বৈশ্য স্ত্রয়োবর্ণা দ্বিজাতয়ঃ।
চতুর্থ একজাতিস্তু শূদ্রো নাস্তি তু পঞ্চমঃ॥

ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় বৈশ্য তিন বর্ণ দ্বিজ, এবং চতুর্থজাতি একমাত্র শূদ্র, পঞ্চম জাতি নাই। তাই প্রথমের স্বাধ্যায় অনুসারে শাখোক্ত কর্ম্ম দ্বিজজাতির বিধি। দ্বিতীয় বাজসনেয়ী যজুর্ব্বেদীয় গৃহ্য দ্বারা কর্ম্ম করা শূদ্র জাতির বিধি নির্ণয় করা যাইতে পারে ; ক্ষত্রিয় বৈশ্যের পৃথক্ বিধির আবশ্যক হয় না। ক্ষত্রিয় বৈশ্যের লক্ষণে স্বাধ্যায় বেদাধ্যয়ন থাকিলে, তাহা যে তাহার নিজস্ব নহে, কুলক্রমাগত পুরোহিত হইতে পাইয়াছে। এ বিষয় উদ্বাহ তত্ত্বের গোত্র নির্ণয় লিখনানুসারে বেশ বুঝিতে পারা যায়।

"বংশপরম্পরা প্রসিদ্ধমাদি পুরুষ ব্রাহ্মণ রূপং গোত্রং, তেন কাশ্যপ গোত্রং যস্য স কাশ্যপ গোত্রঃ। প্রবরস্তু গোত্রপ্রবর্ত্তকস্য মুনের্ব্যাবর্ত্তকো মুনিগণ ইতি মাধবাচার্য্যঃ। এবঞ্চ যদ্যপি রাজন্যবিশাং প্রাতিস্বিক গোত্রা ভাবাৎ প্রবরাভাব স্তথাপি পুরোহিত গোত্রপ্রবরৌ বেদিতব্যৌ।"

এই বিধি অনুসারে ক্ষত্রিয়বৈশ্য কর্ম্ম করিবার জন্য পূর্ব্ব পুরুষীয় পুরোহিত হইতে গোত্রপ্রবর ও বেদশাখা প্রাপ্ত হইয়া দ্বিজশ্রেণীভুক্ত হইয়াছে। এ কাল পর্য্যন্ত পূর্ব্ব পুরুষানুক্রমাগত যাহার যে বেদ মতে কার্য্য চলিয়া আসিতেছে, তাহাই তাহার পক্ষে যথার্থ বিধি বলিয়া গণ্য হইয়াছে। ব্যবহারেও দেখা যায়, যে দেশের ব্রাহ্মণেরা যে বেদ শাখা মত কার্য্য করেন, ক্ষত্রিয়বৈশ্যদেরও সেই বেদশাখা মত কার্য্য করাইয়া থাকেন। পশ্চিম-দেশে ব্রাহ্মণেরা যাজনাধ্যয়নে ঋগ্বেদ অধিক প্রচলন করেন বলিয়া তদ্দেশ-বাসী ক্ষত্রিয়বৈশ্যের কর্ম্মে অধিক ঋগ্বেদ দেখা যায়। দক্ষিণ প্রদেশে

কার্য্য দেখা যায়। বঙ্গদেশে কনোজ ভিন্ন বৈদিক, রাঢ়, বারেন্দ্র, মধ্যশ্রেণী ব্রাহ্মণ কুলে সামবেদ প্রচার অধিক বলিয়া, ক্ষত্রিয়বৈশ্যগণ সামবেদানুসারে কার্য্য করিতেছে, পুরোহিতেরাও করাইতেছেন। তন্মধ্যে যাহারা আপনাদিগকে শূদ্র ভাবাপন্ন বলিয়া ক্ষত্রিয়বৈশ্যাভিমান হীন হওতঃ শূদ্রযাজীর যাজ্য হইয়াছে, তাহাদের মধ্যেই কোন কোন কর্ম্মে যজুর্ব্বেদানুষ্ঠান দেখা যায়।

আবার ব্রাহ্মণ জাতীয় কোন কোন নবীন পণ্ডিত "যজুঃসর্ব্বত্রগীয়ন্তে" এই একপাদ মাত্র স্মরণ করিয়া প্রাচীন আখ্যান বলিয়া থাকেন। পূর্ব্বে যজুর্ব্বেদীয় কর্ম্মকাণ্ডের সংগ্রাহক পণ্ডিত শম্ভুনাথ কর ছিলেন। তাহা অতি বিস্তৃত ও কর্ম্ম সকল দীর্ঘকাল সাধ্য বোধে, বৈশ্যদের কার্য্য করাইবার জন্য বৈশ্যবংশীয় বৈদ্যজাতি নরপতি লক্ষণ সেন স্বীয় সভাসদ পণ্ডিত দ্বারা দুই খানি পুস্তক সংগ্রহ করিতে আদেশ দেন। তদাজ্ঞানুসারে প্রথম সভাপতি হলায়ুধ যজুর্ব্বেদী শ্রাদ্ধ বিষয়ে ও তাঁহার ভ্রাতা দ্বিতীয় সভাপতি পশুপতি যজুর্ব্বেদী সংস্কার বিষয়ে পুস্তক সংগ্রহ করেন। উক্ত পুস্তকদ্বয় স্মার্ত্ত রঘুনন্দন ভট্টাচার্য্যের ব্যবস্থাধীন। বঙ্গীয় ক্ষত্রিয় বৈশ্য শূদ্র উক্ত দুই পুস্তকানুসারে যজুর্ব্বেদীয় কর্ম্ম করিবে—বঙ্গদেশে শম্ভুকরের মতে নহে। এ বিষয় কতদূর সঙ্গত শাস্ত্রানুধায়ী পাঠকগণ বিচার করিয়া বলিবেন।

অতএব জিজ্ঞাস্য—ক্ষত্রিয় বৈশ্যগণ বঙ্গদেশে পুরোহিত মতানুসারে সামবেদীয় কর্ম্ম করিবে? কি "যজুঃ সর্ব্বত্র গীয়তে" বিধি অনুসারে লক্ষণ সেনের সভাসদ হলায়ুধ পশুপতির মতানুগামী হইবে?—সদ্ ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য, সকলের নিকট আমার এই অভিমত প্রার্থনা।

অভিমতপ্রার্থী শ্রীসাগরচন্দ্র কবিরত্ন,
রাজারামপুর, নন্দপুর পোষ্ট, মেদিনীপুর।

বঙ্কিমচন্দ্র সম্বন্ধে সমালোচনায় মন্তব্য-প্রকাশ।

বিগত বৈশাখের নব্যভারতে "বিশ বৎসর অন্তে" শীর্ষক প্রবন্ধে প্রবীণ সম্পাদক মন্তব্য প্রকাশ করিয়াছিলেন,—'এবার চট্টগ্রাম সাহিত্য সম্মিলনীতে অক্ষয়চন্দ্র বঙ্কিমচন্দ্রের প্রতি যে বিদ্বেষ-বিষ ঢালিয়া আসিলেন, তাহা কি তাঁহার যোগ্য হইয়াছে?'

"দলাদলিতে দেশ ছাইয়া ফেলিয়াছে, আপন দলভুক্তদের গা চাটাচাটি, অন্ত দলের নিন্দা, ইহাই যেন সাহিত্যের পরিণাম!"

এই শেষ মন্তব্যের বিরুদ্ধে কিছুই বলিবার নাই; কতক কাল যাবৎ আমরা দেখিতেছি, নব্য সাহিত্যিকদিগের মধ্যে দলাদলির ভাব বিশেষ প্রবল। এক একটী দল এক একটী দলপতি ঠিক করিয়া তাহার চতুর্দ্দিকে নৃত্য করিয়া বেড়াইতেছেন। তাহা দেখিলে বৃদ্ধ গোবিন্দ অধিকারীর সেই "রাই আমাদের, রাই আমাদের, আমরা রাই এর, রাই আমাদের; বৃন্দাবন বিলাসিনী রাই আমাদের" গীত ও কৃষ্ণগতপ্রাণ কিশোরবয়স্কা ব্রজগোপীদের সেই আনন্দ নৃত্যের কথা স্মরণ হয়।

কিন্তু অক্ষয় চন্দ্র স্বকীয় মন্তব্যে বঙ্কিমের প্রতি বিদ্বেষ-বিষ ঢালিয়াছেন কি না খুব সন্দেহ বলিয়া বোধ হয়। এই সম্বন্ধে আমরা সংক্ষেপে কয়েকটী কথা বলিতে চাই।

বিগত আষাঢ়ের নব্যভারতে অক্ষয় চন্দ্রের উক্ত মন্তব্য লক্ষ্য করিয়া আরো একটী প্রতিবাদাত্মক প্রবন্ধ বাহির হইয়াছে। এই প্রবন্ধকার অক্ষয়চন্দ্র সরকার মহাশয়কে বঙ্কিম চন্দ্রের প্রতি 'বিদ্বেষবিষ-ঢালন'কারী বলিয়া নির্দ্দেশ করেন নাই, কিন্তু অক্ষয়চন্দ্র স্বাভাবিক 'প্রাচ্য ভাবাপন্নতা' বশতঃ, প্রাচ্য প্রতীচ্য সন্ধিতে উৎপন্ন, নবভাব ও নব আদর্শশালী বঙ্কিম সাহিত্য আদৌ বুঝিতে অধিকারী নহেন, এই ভাবের কথা বলিয়াছেন। ইনি বলিয়াছেন:—"বঙ্কিমের কাব্য প্রাচ্য আদর্শে লিখিত হয় নাই, বঙ্কিম প্রাচ্য প্রতীচ্যের সন্ধি স্থলে জন্মিয়াছিলেন, তিনি সেই ভাবেই কাব্য লিখিয়াছেন; কাজেই উহা **প্রাচ্য ভাবাপন্ন লোকেদের** পক্ষে প্রীতিকর না হওয়ার কথা!"

কথাটা তীব্র ভাবের হইলেও অনেকটা সত্য বলিয়া মনে হয়। যাঁহারা এই কালে নিরেট্ ভারতীয় আদর্শে লিখিত উচ্চ বাঙ্গলা কাব্য দেখিতে চাহেন প্রচলিত বাঙ্গলা কাব্য সাহিত্যে তাঁহাদের আশা পূর্ণ হইবার নহে। এখন অধিকাংশ বিষয়েই দেশীয় লোকেদের ভাব, রুচি, প্রবৃত্তি ও আদর্শ পরিবর্ত্তিত হইয়াছে। তবে সরকার মহাশয়ের মনের অবস্থা বোধ হয় আমরা কতকটা বুঝিতে সমর্থ হইয়াছি, কেন না আমরাও বার্দ্ধক্যের সীমানায় যাইয়া পৌছিয়াছি, আমরাও কাব্য সাহিত্য প্রাচ্য আদর্শে লিখিত দেখিবার পক্ষপাতী, এবং সেই জন্য আমরাও নব্য বা মিশ্রিত আদর্শে লিখিত কাব্য সাহিত্য পড়িয়া

অনেকে বলেন, আমাদের এই অরুচির অনুকূলে না কি বলিবার অনেক কথা আছে। ইহাঁরা বলেন, যে চিত্র মানব চরিত্রের আদর্শ সৌন্দর্য্য বিভূষিত, তাহা প্রাচ্য হইলেও চিরদিনই সুন্দর থাকিবার কথা। আমাদেরও বিশ্বাস, রাম সীতা সাগরিকা উদয়ন প্রভৃতি প্রাচ্য ভাবের আদর্শ চিত্রগুলি আদর্শ সৌন্দর্য্য-ভূষিত বলিয়াই, বোধ হয়, এখনও খুব ভাল লাগে; এমন কি চিরদিনই ভাল লাগিবার কথা। বোধ হয়, এই আদর্শে বাঙ্গলা কাব্য নাট্য রচনা করিতে পারিলে নিতান্ত মন্দ হইবারও কথা নহে।

প্রবন্ধলেখক কিন্তু আমাদের এই আশা করিতে দিবেন না। তাঁহার মতে প্রাচ্যপ্রতীচ্য মিশ্র ভাবই এই যুগের মূল ভাব; বঙ্কিম এই ভাবেরই প্রতিভাশালী মহাকবি। সকলেরই এখন বঙ্কিমের ভাব ও প্রণালীতে কাব্য রস নির্ব্বাহ ও আস্বাদন করিতে হইবে। তাই বিজ্ঞ লেখক মহাশয় বঙ্কিমকে একেবারে সরকার মহাশয়ের সমালোচনা অধিকারের চতুঃসীমার বাহিরে ফেলিয়া বলিয়াছেন—"বঙ্কিম বাবু স্বাধীন সাহিত্যিক, অনুসরণকারী লেখক নহেন। যাঁহারা মহাকবি, প্রতিভাশালী লেখক, তাঁহারা সাহিত্য সৃজন করেন, অনুসরণ করেন না!" নব্য আদর্শের প্রতি কেমন শ্লাঘাময় ভাব!!

অবশ্য এই তুলাদণ্ডে ওজন করিলে কালিদাস, ভবভূতি এবং শ্রীহর্ষ প্রতিভাশালী মহাকবির অন্তর্ভুক্ত হন না; তাঁহাদের চিত্রিত চরিত কখনই বঙ্কিমের আদর্শ হইতে পারে না। ঐ সকল কবিকে সৃজনকারী বলা যায় না, নিশ্চয়ই অনুসরণকারী বলিতে হয়। তাঁহারা রামায়ণ মহাভারতের চিত্র অনুসরণ করিয়াছেন শাকুন্তল, উত্তরচরিত, রত্নাবলী নাটক ঠিক ভরতমুনির নাট্য সূত্রও ধনঞ্জয়ের কারিকা অনুসারে রচিত হইয়াছিল। কালিদাস আবার ভরত-মুনির সাবেক নিয়ম এতই মানিতেন যে, তিনি বিক্রমোর্ব্বশী নাট্যের ভূমিকায় 'লক্ষ্মী-স্বয়ম্বর' নামক নাট্য উর্ব্বশী প্রভৃতির দ্বারা অভিনয় করাইবার জন্ম ভরত মুনি ইন্দ্র সভায় আহূত হইয়াছিলেন উল্লেখে কাব্য সূচনা করতঃ গৌরব করিয়াছেন। পুরাতন কবিগণ যে খুব আনুকরণিক ছিলেন, তাহা তাঁহাদের কাব্য নাট্যের বান্ধা রীতির নমুনা দেখিলেই বুঝিতে পারা যায়। ইহাঁদের অঙ্কিত চিত্র এবং রীতির আদর্শে বঙ্কিমের কাব্য লিখা কখনই সম্ভবপর হইতে পারে না—ইহা প্রবন্ধের মত। অথচ সরকার মহোদয় সেই সাবেক আদর্শের সঙ্গে তুলনা করিয়াই বঙ্কিমের বিরুদ্ধ সমালোচনা করিয়াছেন!! তাহা নব্য সমাজ মানিবেন কেন?

প্রবন্ধলেখকের যুক্তিতে আমাদের একটা সমস্যায় পড়িতে হইয়াছে। কেন না আমরা দেখিতে পাই, যে বিষবৃক্ষ বঙ্কিমের শ্রেষ্ঠ কাব্য বলিয়া গণ্য, সেই বিষবৃক্ষেরই প্রধান প্রধান চরিত্র, ভবভূতির উত্তরচরিত এবং শ্রীহর্ষের রত্নাবলীর আদর্শে গঠিত বলিয়া বোধ হয়!! উভয় নাট্যেরই আখ্যান, চরিত ও সৌন্দর্য্য বিষবৃক্ষে যত দূর সম্ভব গৃহীত হইয়াছে বলিয়া মনে হয়!! নিম্নে কথাটা সংক্ষেপে ভাঙ্গিয়া বলিতেছি।

যাঁহারা উত্তরচরিত ও রত্নাবলী ভালরূপে পড়িয়াছেন, তাঁহারা বোধ হয় দেখিতে পাইবেন, বিষবৃক্ষের সূর্য্যমুখী উত্তরচরিতের সীতা; বিষবৃক্ষের কুন্দনন্দিনী রত্নাবলী নাটিকার সাগরিকা; বিষবৃক্ষের নগেন্দ্র উত্তরচরিতের রাম; অবশ্য রাম, সীতা ও সাগরিকা বিষবৃক্ষে নিতান্ত মানবীকৃত ও ভাঙ্গা গড়ার অধীন হইয়াছে; কিন্তু মূলে ও তাহার মানবীকরণে যে ঐক্য আছে, তাহা চিনিতে কোন ক্লেশই হয় না।

উত্তরচরিত ও রত্নাবলীর ছায়া বিষবৃক্ষে কতদূর গৃহীত ও মিশ্রিত হইয়াছে তাহা সংক্ষেপে দেখাইতেছি; বিজ্ঞ পাঠক তুলনা করিয়া দেখিবেন। আমরা কেবল সংক্ষেপে ইঙ্গিতে দেখাইব—বিস্তৃতভাবে সাদৃশ্য দেখাইবার স্থান নাই।

বিষবৃক্ষের সূর্য্যমুখী যে পতিপরায়ণা স্নেহাকুলা সীতা, তাহা তর্ক করিয়া বুঝাইতে হইবে না। সূর্য্যমুখীর পলায়নে, বনদর্শনে, ব্রহ্মচারীর সমাগমে সীতা-বনবাসের পালাই লুক্কাইত। ব্রহ্মচারীই বাঙ্গালী বাল্মীকি। যে দৃশ্যে নগেন্দ্র ঈষদন্ধকারে অদৃশ্যপ্রায়া সূর্য্যমুখীকে পাইতেছেন ও হারাইতেছেন এবং মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িতেছেন সেই "ছায়া" নামক দৃশ্যের সঙ্গে, পাঠক উত্তর-চরিতের সেই ছায়া নামক অঙ্ক; যে স্থলে গোদাবরীগহ্বর হইতে উত্থিতা সীতা অদৃশ্য রহিয়াই পাণিস্পর্শ দ্বারা সীতাবিরহকাতর রামকে বার বার সঞ্জীবিত করিতেছেন, সেই বিচিত্র দৃশ্য, স্মরণ করুন। সূর্য্যমুখী ও নগেন্দ্র রামসীতার নিকট কত ঋণী, সে সম্বন্ধে আর অধিক কিছু বলিতে হইবে না।

রত্নাবলীর পালা কুন্দনন্দিনীর আখ্যানে অবিকল পুনরুক্ত হইয়াছে। সিংহল-রাজকন্যা সাগরিকার জাহাজ তুফানে ভাঙ্গিয়া যাওয়ায় সাগরিকা কাষ্ঠফলকে ভাসিয়া তীরে লাগেন। রাজা উদয়নের মন্ত্রী তাঁহাকে পাইয়া রক্ষার জন্য উদয়নের মহিষী বাসবদত্তার হস্তে অর্পণ করেন। বাসবদত্তা

চক্ষের অন্তরালে রাখেন। দৈবে সাগরিকা ও উদয়নের দেখা হয়, এবং উভয় মধ্যে প্রীতি সঞ্চারিত হয়। মহিষী নানারূপ অন্তরায় উপস্থিত করিয়াও তাহাতে বাধা দিতে সমর্থ হন না। শেষে নিজেই সাগরিকাকে সজলনয়নে রাজার হস্তে অর্পণ করেন। সাগরিকার প্রীতি সফল হয়। এই আখ্যানের সঙ্গে কুন্দের আখ্যান তুলনা করুন। কুন্দও নৌকাডুবিতে প্রাপ্ত, নগেন্দ্র কর্ত্তৃক তদীয় মহিষী সূর্য্যমুখী হস্তে ন্যস্ত, পরে নগেন্দ্র কর্ত্তৃক পরিণীত।

অবশ্য বড় কবির পক্ষেও ছোট কবির আখ্যান ভাগ গ্রহণে দোষ হয় না। চরিত্র চিত্রণে ও রস নির্ব্বাহেই কেবল অনুকরণ অনুকরণীয়তার পরীক্ষা হয়। এখন এই সম্বন্ধে একটু দেখিতে হইবে।

ভবভূতি ও শ্রীহর্ষ ভারতীয় প্রেমবিজ্ঞানের বিধান অনুসারে নিজ নিজ নাটকে প্রেমিক চরিত্র যোজনা করিয়াছেন; সেই বিধান অনুসারে এক শ্রেণীর নায়ক নায়িকা আছেন, যাঁহারা পরস্পরের প্রেমে দ্রবীভূত হইয়া এতই বিবশ ও একীভূত হইয়া পড়েন যে, জীবনে তাঁহাদিগকে কোনক্রমেই পৃথক্ করা যায় না; এইরূপ নায়কের পক্ষে জীবনে অন্য নায়িকা গ্রহণ করা দূরে থাকুক, অন্য নায়িকা মুহূর্ত্তের জন্য চিন্তা করাও অস্বাভাবিক হইয়া দাঁড়ায়। রামসীতা এই জাতীয় নায়কনায়িকা। এই জন্য রাম সীতাবিয়োগে হিরণ্ময়ী সীতা বামভাগে রাখিয়া ধর্ম্মচর্য্যা করেন। এই প্রকৃতির নায়িকা স্বতঃ সমুজ্জ্বল; অন্য নায়িকার সংঘর্ষে তাঁহার চিত্র উজ্জ্বল করা যায় না। এই জন্য রামায়ণে ও উত্তরচরিতে সীতার সপত্নী যোজনারূপ কোন অস্বাভাবিক ব্যাপার সংঘটিত হয় নাই। সেরূপ যোজনায় রামসীতা প্রকৃতির ধ্বংশ হয়, উৎকর্ষ লাভ হয় না।

প্রাচ্য নিয়মে আর এক প্রকার নায়ক আছেন, যাঁহারা নব্য নায়িকা কর্ত্তৃক আকৃষ্ট হইয়াও পূর্ব্ব নায়িকার প্রতি আজীবন সহৃদয় ব্যবহার করেন। যথা কালিদাসের দুষ্মন্ত, শ্রীহর্ষের উদয়ন প্রভৃতি। শ্রীহর্ষ এই জাতীয় নায়ক নায়িকা লইয়া রত্নাবলী রচনা করিয়াছেন।

বঙ্কিম উত্তরচরিতের রামসীতা এবং রত্নাবলীর সাগরিকা আদর্শ গ্রহণ করিলেও নায়কনায়িকা সম্বন্ধে ভবভূতি ও শ্রীহর্ষ যে বিচার প্রণালী গ্রহণ করিয়াছিলেন, বঙ্কিম সে বিচারের দিক্ দিয়াও যান নাই। ইহাতেই চরিত্রানুকরণের সঙ্গে সঙ্গে একটা "বিকরণ" যোগ হইয়াছে, নূতন প্রণালীর

চরিত স্পষ্ট হইয়াছে। এই সৃষ্ট চরিত্র সীতাসখী তমসা, মুরলা, বাসন্তী প্রভৃতির ন্যায় উদাত্ত ভাবের, না লঘু ও তরল ভাবের হইয়াছে, তাহা পাঠক চিন্তা করিবেন।

বঙ্কিম নিজ প্রতিভা দ্বারা বুঝিতে পারিয়াছিলেন, এক রামের গলায় সীতা ও সাগরিকা ঝুলাইয়া ঠেকা কার্য্য করা হইয়াছে। তাঁহার হাতে যে সীতা ফলিয়াছিল তাহাই অধিকতর মনোজ্ঞ হইয়াছিল। সীতা মারিলে সর্ব্বস্বই জলে যায়; এই জন্যই বোধ হয় তিনি ঠেকিয়া সাগরিকা মারিয়া সীতা বাঁচাইয়াছেন। তাঁহার এই ঠেকা-বোধ বা সমস্যাজ্ঞানটী তাঁহার প্রতিভার প্রধান সাক্ষী হইয়াছে। প্রতিভাহীন কবি ঠেকিতেন না। অতি বড় প্রতিভাশালী কবি ভবভূতি এবং শ্রীহর্ষও ঠেকেন নাই।

এই সব সৃজন ও নব প্রণালী অবলম্বনের ফলে বিষবৃক্ষ উল্লিখিত দুইটী আদর্শ নাটক হইতে কিরূপ কি হইয়াছে পাঠকগণ বিবেচনা করিবেন। আমাদের ক্ষুদ্র বিবেচনায় উত্তরচরিত ও রত্নাবলীর আদর্শে স্বতন্ত্র স্বতন্ত্র দুই খানা উপন্যাস লিখিলে ভাল হইত। দুইটা একত্র জোড়া দেওয়া ভাল হয় নাই, জোড়াও লাগে নাই।

প্রতিভাশালী মহাকবি হইলে কেবলই সৃজন কর্ম্মে থাকিতে হইবে এমন নহে। প্রেমিক হৃদয়ের যে কতকগুলি সুকুমার বৃত্তি আছে; তাহার কোন্‌টা কি ভাবে স্পর্শ করিলে রস নিষ্পত্তি হয়, পূর্ব্বে তাহার একটা দর্শন শাস্ত্র আবিষ্কৃত হইয়াছিল। উহাকেই অলঙ্কার শাস্ত্রোক্ত নায়কনায়িকা-বিচার ও রসবিচার বলে। কালিদাস, ভবভূতি ও শ্রীহর্ষ এই শাস্ত্রটা বিশেষ পরিশ্রমপূর্ব্বক অভ্যাস করিয়াছিলেন। যে পর্য্যন্ত মানবপ্রকৃতি সম্যক্ পরিবর্ত্তিত না হয়, সে পর্য্যন্ত সেই সকল দার্শনিক সূত্র অগ্রাহ্য হইবে না। দর্প করিয়া অগ্রাহ্য করিলেও শেষে বিচারে ঠেকিতে হইবে। বাল্মীকি এবং ভবভূতির যুগোচিত মানবপ্রকৃতি এখন পর্য্যন্ত বজায় দেখিতে পাই। এই জন্যই ঐ সকল কাব্য আমরা এখনও বুঝি ও ভালবাসি।

ধর্ম্ম, নীতি, অর্থনীতি, রাজনীতি শিক্ষা দেওয়া কাব্যের কার্য্য নহে, কিন্তু অপূর্ব্ব রসাত্মক আনন্দ বিশেষ প্রদান করাই উহার কার্য্য। (দশরূপক)। এই মীমাংসা এখন সর্ব্বত্রই গৃহীত হইতেছে। অর্থনীতি, রাজনীতি, বিপ্লবাদি দেশগত ও কালগত অস্থায়ী ভাবজনিত উত্তেজনা প্রকৃত কাব্যের বস্তু নহে।

উপযোগী; যাহা শান্তির কালে জাতীয় স্বাস্থ্যের অবস্থায় লিখিত হয়, সেই কাব্যের, নায়কাদির, মূলসূত্র চিরদিন একরূপই থাকে।

যাহা হউক, আমাদের বোধ হয় এক বিষবৃক্ষ আলোচনা করিলেই বুঝা যায়;—"বঙ্কিমের কাব্যে উচ্চ শিক্ষা ও শিল্প আছে, কিন্তু **আদর্শ চিত্র নাই। বঙ্কিম বাবু এ সকল আদর্শ** তাঁহার প্রতিভার আঘাতে **ভাঙ্গিয়াছেন, গড়িতে পারেন নাই।"**

আমরা বঙ্কিমের প্রতি ষোল আনা শ্রদ্ধা পোষণ করি। কিন্তু বাঙ্গলা সাহিত্যের আদর্শ বিচার স্থলে তদীয় কাব্যের ত্রুটি প্রদর্শন করাও হিতকর মনে করি। এরূপ বিচারে উত্তেজনা প্রকাশ না করিয়াও পারা যায়।

শ্রীবসন্তকুমার রায় এম্, এ, বি, এল্।

—:—

বিবিধ প্রসঙ্গ।

বঙ্গে বন্যা ও জাতীয় প্রেম।

এ বৎসরের অতিবৃষ্টির কারণ দামোদর নদীর ভীষণ বন্যায় বাঁধ ভাঙ্গিয়া জলপ্লাবনে বর্দ্ধমান, হুগলী ও হাওড়া জেলায় অধিকাংশ লোক ধনে প্রাণে মারা যাইতেছে, বঙ্গোপসাগরের ভীষণ জলোচ্ছ্বাসেও মেদিনীপুরের কাঁথী মহকুমার অধিবাসিগণ বিপদগ্রস্ত হইয়া পড়িয়াছে, ঘরবাড়ী ভাঙ্গিয়া পড়িয়াছে, খাদ্যসামগ্রী ভাসিয়া চলিয়া গিয়াছে। গরু, বাছুর মরিয়া ভাসিয়া গিয়াছে, শস্যক্ষেত্রের ত কথাই নাই। বঙ্গে এরূপ দুর্দ্দিন আর কখনও হয় নাই। নিরাশ্রয়, অনশনক্লিষ্ট প্রজাবর্গের প্রাণরক্ষার জন্য দেশের লোকে মিলিয়া ফণ্ড করিয়া চাঁদা তুলিয়া চাউল বস্ত্রাদি যোগাইতেছেন, মহামান্য গবর্ণমেণ্টও সাহায্য করিতেছেন, মাড়োয়ারী ধনকুবেরগণ জলস্রোতের ন্যায় অজস্র অর্থ ব্যয় করিয়া মহানুভবতার পরাকাষ্ঠা দেখাইতেছেন। পাঠকগণ অবগত আছেন, মেদিনীপুর, হুগলী ও হাওড়া জেলাতেই মাহিষ্য-জাতীয় লোকেরই বাস অধিকাংশ; মাহিষ্য-জাতীয় বহু পরিবারই এই দুর্দ্দিনে বিপন্ন। অতএব বঙ্গের বিভিন্ন স্থানীয় মাহিষ্যনেতৃগণ কি করিতেছেন? এ সময়ে তাঁহাদের কর্ত্তব্য কি? আপনাদেরই যে স্বজাতীয় বহু পরিবার ঘরবাড়ী হীন অনশনক্লিষ্ট হইয়া মৃত্যুর করাল কবলে পতিত হইতেছে।। কলিকাতা ৩৮নং পুলিশ হাসপাতাল

রোড ঠিকানায় বঙ্গীয় সাহিত্য সমিতির সম্পাদক মহাশয়ের নিকট যে যাহা পারিবেন সংগ্রহ পূর্ব্বক মণিঅর্ডার যোগে প্রেরণ করিবেন। বন্যার জল কমিয়া গেলেই যাঁহাদের গৃহাদি নাই, তাঁহাদের গৃহ নির্ম্মাণের জন্য সাহায্য করিতে হইবে। সুতরাং টাকা কড়ি, কাঠ, বাঁশ, বস্ত্র চাউল যে ভাবেই হউক, বিপন্ন লোকদিগকে সাহায্য করা এসময়ে অবশ্য কর্ত্তব্য। এই দান সাহিত্য-সমাজ পত্রিকায় স্বীকৃত হইবে। স্বজাতি প্রেমের পরীক্ষার এই দিন আসিয়াছে।

কাঁথিতে বন্যা ও বি এন্ শাসমল।—সরকারী রিপোর্টে প্রকাশ হইয়াছিল—বিগত বন্যায় কাঁথীর কিছু অনিষ্ট হয় নাই। কিন্তু মেদিনীপুরের ব্যারিষ্টার উদরাচেতা শাসমল মহাশয় স্বয়ং নৌকা করিয়া কণ্টাই সহর হইতে মফস্বলে গিয়া বিপন্ন লোকদিগকে রিলিফ ফণ্ড হইতে বস্ত্র ও আহার সরবরাহ করিয়াছেন এবং স্বচক্ষে পল্লীসমূহের অবস্থা পর্য্যবেক্ষণ পূর্ব্বক অমৃত বাজার পত্রিকায় বন্যাপ্লাবিত স্থানের সঠিক বিবরণ প্রেরণ করিয়াছেন। লোক-জন যদিও মৃত হয় নাই বটে, কিন্তু ঘরবাড়ী অনেক পড়িয়া গিয়াছে, আহার্য্য ভাসিয়া গিয়াছে, গরু ছাগল মরিয়াছে এবং বিবিধ প্রকারে লোকজন বিপদ্‌গ্রস্ত হইয়াছে। আমরা মাহিষ্যজাতীয় বিলাতফেরত এই ব্যারিষ্টার মহাশয়ের কার্য্যে বিশেষ সুখী হইয়াছি এবং অন্তরের সহিত ধন্যবাদ প্রদান করিতেছি।

নব্যভারতে তমলুকের ইতিহাস।—নব্যভারত পত্রিকার বিগত ভাদ্র সংখ্যায় তমলুকের ইতিহাসের সংক্ষিপ্ত সমালোচনা যে ভাবে প্রকাশিত হইয়াছে তাহাতে আমরা হাস্য সম্বরণ করিতে পারি নাই। বঙ্গবাসী, সময় ও সাহিত্য-সংবাদ পত্রিকায় ইহার ঐতিহাসিকত্বা বিশেষরূপে প্রশংসিত হইয়াছে— কিন্তু নব্যভারতের সমালোচক মহাশয়ের মাহিষ্য জাতীয় গৌরব কাহিনী পাঠে এত গাত্রজ্বালা কেন? তমলুকের ইতিহাস যে বাঙ্গালীর গৌরব!

পুস্তক-পরিচয়।

সেটেলমেণ্ট প্রজাসহচর।—মূল্য ॥০ আনা। আমাদের পরম শ্রদ্ধাস্পদ সুহৃৎ তালুকগোপালপুর চৈতন্য চতুষ্পাঠীর অধ্যাপক শ্রীযুক্ত শ্রীধর চন্দ্র তত্ত্বরত্ন কর্ত্তৃক সঙ্কলিত। ইহাতে সেটেলমেণ্ট পরীক্ষা সংক্রান্ত অতি প্রয়োজনীয় বিষয় সমূহ আলোচিত হইয়াছে। কয়েকটী চিত্রও সংযোজিত আছে। প্রজা সাধারণের পক্ষে এমন সুন্দর উপদেশপূর্ণ গ্রন্থ বিরল।

মাহিষ্য-সমাজ।

[তৃতীয় ভাগ, সপ্তম সংখ্যা—কার্ত্তিক, ১৩২০ সাল।]

১৯১১ সেন্‌সাস্ রিপোর্টে মাহিষ্য-জাতি।

সেন্‌সাস্ সুপারিন্‌টেন্‌ডেণ্ট শ্রীযুক্ত ওমালী সাহেবের নিকট হইতে বাঙ্গলা-দেশের আদম সুমারীর বিবরণ বেঙ্গল গবর্ণমেণ্টের হাতে আসিয়া বিগত (১৯১৩) ১৪ই জুলাই তারিখে ৩৪৩৫ নং রিজলিউশনে মঞ্জুর হইয়া প্রচারিত হইয়াছে। উক্ত রিজলিউশনের ১৩ দফায় গত সেন্‌সাসে জাতি বিষয়ক প্রবল আন্দোলনের কথা উল্লিখিত হইয়াছে। "বঙ্গীয় কতকগুলি জাতি সেন্‌সাসে তাঁহাদের নূতন নূতন দাবী উপস্থাপিত করিয়াছিলেন। কিন্তু কেবলমাত্র 'চাষী কৈবর্ত্ত' জাতি "মাহিষ্য" বলিয়া সেন্‌সাস্ রিপোর্টে অভিহিত হইবার অধিকার পাইয়াছে।"

সেন্‌সাস রিপোর্টের একাদশ অধ্যায় ৪৪০ পৃষ্ঠায় আরম্ভ হইয়া ৫২০ পৃষ্ঠায় জাতিবিষয়ক বহুবিধ প্রত্নতত্ব ও তথ্য আলোচনা লইয়া শেষ হইয়াছে। ইহা এত বিস্তৃত ও গবেষণাপূর্ণ যে গবর্ণমেণ্ট ওমালী সাহেবকে যথেষ্ট ধন্যবাদ প্রদান করিয়াছেন। এই সেন্‌সাসে অনেক জাতি ক্ষত্রিয়ত্ব ও বৈশ্যত্ব দাবী করিয়া বা সম্পূর্ণ একটী নূতন নামের জন্য প্রার্থনা করিয়া সেন্‌সাস্ কর্ত্তৃপক্ষগণকে বড়ই বিচলিত করিয়াছিলেন। তাঁহারা প্রায়ই পণ্ডিতগণের ব্যবস্থা সংগ্রহ করিয়া আবেদনের সহিত পেশ করিয়াছিলেন। এইরূপ জাতি সমূহের একটী তালিকা বক্ষ্যমাণ রিপোর্টের ৪৪১ পৃষ্ঠায় প্রদত্ত হইয়াছে ঃ—

জাতি	বাসভূমি	যে নামের জন্য দরখাস্ত করিয়াছে।
	[ক]	
বাভন	বিহার	ব্রাহ্মণ
বেব্বার	সারণ	ব্রাহ্মণ
নমশূদ্র	বাঙ্গলা	নমশূদ্র ব্রাহ্মণ

জাতি……………………বাসভূমি……………………যে নামের জন্য দরখাস্ত করিয়াছে।

[খ]

হাড়ি	মৈমন্‌সিংহ	হৈহয় ক্ষত্রিয়
কোচ	মৈমন্‌সিংহ	কোচ ক্ষত্রিয়
কুর্ম্মী	বিহার	কুর্ম্মী ক্ষত্রিয়
মালো (ঝালো ও মালো)	বাঙ্গলা	(১) ব্রাত্য ক্ষত্রিয়, (২) ঝালো ব্রাত্যক্ষত্রিয় ও মালো ব্রাত্যক্ষত্রিয়, (৩) ঝল্ল ক্ষত্রিয় ও মল্ল ক্ষত্রিয়, (৪) ঝালো (ব্রাত্য ক্ষত্রিয়) ও মালো (ব্রাত্য ক্ষত্রিয়), (৫) ঝল্লবর্ম্মন্ বা ঝালো বর্ম্মা ও মল্লবর্ম্মন্ বা মালো বর্ম্মা।
নাপিত	পূর্ব্ববঙ্গ	(১) ক্ষত্রিয়, (২) পরামাণিক বা শীলদাস, (৩) কায়স্থ বা পারশব।
পোদ	বাঙ্গলা	(১) ব্রাত্য ক্ষত্রিয়, (২) পুণ্ড্র ক্ষত্রিয়।
পুণ্ডারী	বাঙ্গলা	পুণ্ড্র ক্ষত্রিয়।
রাজবংশী	পূর্ব্ববঙ্গ	(১) ক্ষত্রিয়, (২) রাজবংশী ক্ষত্রিয়, (৩) ক্ষত্রিয় রাজবংশী, (৪) ব্রাত্য ক্ষত্রিয়, (৫) পতিত ক্ষত্রিয়, (৬) ভঙ্গ ক্ষত্রিয়।
রাজবংশী	কুচবিহার	(১) রাজবংশী ক্ষত্রিয়, (২) ক্ষত্রিয় রাজবংশী।
ঐ	পূর্ণিয়া	ভঙ্গ ক্ষত্রিয়

[গ]

বারুই	বাঙ্গলা	বৈশ্য বারুজীবী বা বারুজীবী
গন্ধবণিক	পূর্ব্ববঙ্গ	বৈশ্য গন্ধবণিক
গৌড়	কটক	বৈশ্য গোপ
গোয়ালা	বাঙ্গলা	বৈশ্য বল্লভ গোপ
হলধর	মধ্যবঙ্গ	বৈশ্য

জাতি	বাসভূমি	যে নামের জন্য দরখাস্ত করিয়াছে।
কর্ম্মকার	বাঙ্গলা	কর্ম্মকার বৈশ্য বা কর্ম্মকৃতি
সদ্গোপ	বঙ্গ	বৈশ্য সদ্গোপ
	পূর্ব্ববঙ্গ	(১) বৈশ্য গোপ, (২) পূর্ব্ববঙ্গীয় সদ্গোপ,
সাহা	বাঙ্গলা	(১) বৈশ্য, (২) বৈশ্য সাহা, (৩) সাধু বণিক বা সাহা বণিক।
সুবর্ণবণিক	বাঙ্গলা	বৈশ্য
সূত্রধর	বাঙ্গলা	বৈশ্য সূত্রধর
তাম্বূলি	হাওড়া	তাম্বলি বৈশ্য
তিলি	পূর্ব্ববঙ্গ	বৈশ্য
	[ঘ]	
বৈষ্ণব	বাঙ্গলা	ব্রহ্ম বৈষ্ণব
ভুঁইমালী	পূর্ব্ববঙ্গ	ভুমিদাস
চাষাধোপা	বাঙ্গলা	সচ্চাষী
দোয়াই	ঢাকা	শূদ্র বা পতিকর
গঙ্গাই (গণেশ)	পূর্ণিয়া ও উত্তর বঙ্গ	তাঁতুবাই
যোগী বা যুগী	বাঙ্গলা	যোগী
জোলা	বাঙ্গলা	শেখ
কলু	বাঙ্গলা	তৈলী
কুমার (কুম্ভকার)	ময়মন্‌সিংহ	রুদ্রপাল
সাগিড় পেশা	মেদিনীপুর	মধ্যশ্রেণী কায়স্থ
সোণার	গয়া	কণৌজিয়া ছত্রী

এই সেন্‌সাসে এই সমূহ জাতির পৃথক্ পৃথক্ নূতন নামের জন্য প্রার্থনা অগ্রাহ্য হইয়াছে। কেবল মাত্র চাষী কৈবর্ত্ত জাতির 'মাহিষ্য' নামের ব্যবহার-প্রার্থনা মঞ্জুর হইয়াছে। ৪৪১ পৃষ্ঠায় এসম্বন্ধে লিখিত হইয়াছে :—

"Another expedient is to adopt an entirely new name which points to a respectable origin. As a case in point may be mentioned Mahishya, a designation recently assumed by the Chasi Kaibarttas, a cultivating community, in order

to distinguish themselves from the Jalia Kaibarttas, who follow what Hindus regard as a degrading occupation, viz. fishing. Mahishya is a name derived from *mahisha* (meaning a buffalo), which was given to a mixed caste by the Sanskrit law-givers, and was probably applied to a caste or tribe of cattle-keepers and graziers : it is mentioned in the *Goutama Dharma Sutra* (a work not later than 300 B.C.), in which a Mahishya is described as born of a Vaisya woman by a Kshattriya father."

সত্যই একই কৈবর্ত্ত নামে অভিহিত দুইটী সম্পূর্ণ পৃথক জাতি বাঙ্গলা দেশে বর্ত্তমান থাকায় বিশুদ্ধ চাষী কৈবর্ত্ত জাতি সময়ে সময়ে বড়ই লাঞ্ছিত হন বলিয়াই তাঁহাদের শাস্ত্রোক্ত প্রকৃত মাহিষ্য নামের প্রচলন করা প্রয়োজনীয় হইয়া পড়িয়াছে। তজ্জন্যই বিগত কয়েক বৎসর হইতে এই চাষী কৈবর্ত্ত জাতির মধ্যে প্রবল আন্দোলন চলিয়াছে। এই সেন্‌সাসে চাষী কৈবর্ত্ত শব্দের পরে (মাহিষ্য) শব্দ ব্যবহৃত হইল, কিন্তু এবারেও গণনাকারী ও বিদ্বেষবুদ্ধি সম্পন্ন কতিপয় ব্যক্তির দোষে সকল স্থলে গণনা-কাগজে ঠিক মাহিষ্য বা চাষী-কৈবর্ত্ত শব্দ লিখিত হয় নাই। কোন কোন স্থলে কেহ কেহ কেবল মাত্র 'কৈবর্ত্ত' এই শব্দটী মাত্র লিখিয়াছে। আবার অনেক জালিক কৈবর্ত্ত কেবল কৈবর্ত্ত শব্দ লিখাইয়া সেন্‌সাস্ কাগজে প্রকৃত মাহিষ্যের সংখ্যা সম্বন্ধে বড়ই গোলযোগ ঘটাইয়াছে। সেইজন্য রিপোর্টে তিন রকম কৈবর্ত্ত দেখা যায়— ১) চাষী কৈবর্ত্ত (২) জেলিয়া কৈবর্ত্ত (৩) কৈবর্ত্ত। চাষী কৈবর্ত্ত ও জেলিয়া কৈবর্ত্ত যে সম্পূর্ণ বিভিন্ন জাতি তাহা রিপোর্টে লিখিত হইয়াছে, যথা :—The two sub-castes are entirely distinct, for they do not eat, drink or smoke together and intermarriage is out of the question." তথাপি subcaste কথার ব্যবহারে চাষীকৈবর্ত্ত জাত দুঃখিত হইবেন নিঃসন্দেহ।

ওমালী সাহেব ভয় পাইয়াছেন, পাছে চাষী কৈবর্ত্ত জাতির মধ্যেই আবার দুইটী ভিন্ন সম্প্রদায় হইয়া পড়ে—একটী মাহিষ্য, অপরটী চাষীকৈবর্ত্ত। কেন না বাগানের বা মাঠের ফসল জন্মাইয়া নিজে বাজারে বিক্রয় করিলে সে "মাহিষ্য নামের উপযুক্ত হইবে না, সে 'চাষী-কৈবর্ত্ত' বলিয়া পরিচয় দিবে"—এইরূপ

separate sub-castes at no distant date, viz. Chasi Kaibarttas and Mahishyas. চাষী কৈবর্ত্তের মধ্যে নাকি শিক্ষিত ব্যক্তিরাই উচ্চ-জাতিত্বের দাবী করিয়া মাহিষ্য নাম গ্রহণ করিতেছে। স্থানে স্থানে মাহিষ্যেরা এক মাসের পরিবর্ত্তে পনর দিন অশৌচ গ্রহণ করিতেছে রিপোর্টে একথাও লিখিত হইয়াছে।

ওমালী সাহেব আরও বলিয়াছেন যে—জেলিয়া কৈবর্ত্ত একটু অবস্থাপন্ন বা শিক্ষিত হইলেই জালিক বৃত্তি পরিত্যাগ করে এবং চাষী কৈবর্ত্ত হইবার জন্য চেষ্টা করে। তাহাদের মধ্যে কেহ কেহ মৎস্য-ব্যবসায় পরিত্যাগ পূর্ব্বক অগ্রাহ্য আত্মীয় জালিকগণের সহিত সম্বন্ধ ছাড়িয়া দিয়া মাহিষ্য বলিয়া পরিচয় দিতে আরম্ভ করিয়াছে; সুতরাং ইহা চাষী কৈবর্ত্ত দিগের পক্ষে বিপজ্জনক হইয়াছে—যে উদ্দেশ্যে তাহারা মাহিষ্য নাম গ্রহণ করিল তাহা বুঝি বিফল হয়! There is a danger therefore that the very name which the Chasi Kaibarttas have adopted in order to distinguish them from Jalias, will also be assumed by the latter. এই সেন্‌সাসে কতকগুলি পাটনীও মাহিষ্য বলিয়া দাবী করিয়াছিল, কিন্তু আবার সেন্‌সাসের চারিদিন মাত্র পূর্ব্বে তাহারা কোন প্রাচীন পুস্তকে কৈবর্ত্তদিগকে লক্ষ্য করিয়া নৌবাহী বলিয়া নির্দ্দেশ থাকায় তাহারা "মাঝী কৈবর্ত্ত" নামে অভিহিত হইবার দরখাস্তও করিয়াছিল। যাহা হউক, জালিক ও পাটনীদিগের মাহিষ্য নামের জন্য দরখাস্ত অগ্রাহ্য হইয়াছে।

হাওড়া জেলা হইতে রিপোর্ট আসিয়াছিল যে, তথায় কৈবর্ত্ত চারি সম্প্রদায়ে বিভক্ত;—(১) উত্তর-রাঢ়ী, (২) দক্ষিণ-রাঢ়ী; (৩) জেলিয়া ও (৪) মালা। ইহাদের পরস্পরের সহিত কোন সম্বন্ধ নাই। তাহাদের প্রত্যেকেরই পুরোহিত ব্রাহ্মণ ভিন্ন ভিন্ন। উত্তর ও দক্ষিণরাঢ়ী উত্তম; তাহারা পরস্পর এক হুকায় তামাক খায়। অপর দুইটীর মধ্যে একটী মৎস্য ব্যবসায়ী ও অপরটী নৌজীবী। পূর্ণিয়া জেলায় চাষী কৈবর্ত্ত জাতি তিন শ্রেণীতে বিভক্ত (১) শাঁখ-বেচা, (২) পান-বেচা, ও (৩) টীকাদার। এই সকল বিভিন্ন সম্প্রদায়ের মধ্যে বৈবাহিক আদান প্রদান চলে না।

রিপোর্টে অনেক কথা আছে; ক্রমে ক্রমে প্রকাশ করা যাইবে। শিক্ষার অবস্থা বিগত দশ বৎসর অপেক্ষা অনেক উন্নত। বৈদ্যজাতি সর্ব্বশ্রেষ্ঠ স্থান অধিকার করিয়াছে। ইহাদের মধ্যে শতকরা ৭৮ জন লোক শিক্ষিত—ইহাদের

স্ত্রীলোকেও শতকরা ৩৫ জন লেখাপড়া জানে। তৎপরে সুবর্ণবণিক (৪৫), আগরওয়ালা (৪২), ব্রাহ্মণ (৪০), কায়স্থ (৩৫) এবং গন্ধবণিক (৩১) [শতকরা গড় প্রত্যেক জাতির পার্শ্বে লিখিত হইল।] সুবর্ণবণিক জাতীয়া স্ত্রীলোকের শতকরা ১৬, কায়স্থ স্ত্রী ১৩ এবং ব্রাহ্মণী ১১ জন লেখাপড়া জানে।

চাষী কৈবর্ত্ত জাতি শিক্ষায় অনেক অগ্রসর হইয়াছে। এখন এই জাতির মধ্যে তবুও ৯ জনের মধ্যে ১ জন মাত্র লিখিতে পড়িতে পারে। চাষী কৈবর্ত্ত জাতি জেলিয়াদিগের অপেক্ষা ২৸০ গুণ অধিক পরিমাণে শিক্ষিত। ১৯০১ সালের সেন্সাসের সহিত তুলনায় চাষী কৈবর্ত্ত জাতির শিক্ষার অনুপাত সন্তোষজনক না হইবার একটী কারণ—এবারে অনেক জেলিয়া কৈবর্ত্ত চাষী বলিয়া রিটার্ণ করিয়াছে।

মোটের উপর চাষী কৈবর্ত্ত জাতির সংখ্যা বাঙ্গালায় ২০৩৬১২৯, ইহার মধ্যে লেখাপড়া জানা লোক সংখ্যা ২২০৩৯২ জন। তন্মধ্যে ৮০৯৯ জন স্ত্রীলোক মাত্র লেখাপড়া জানে। ১৯০১ খৃষ্টাব্দের সেন্সাসে হাজারকরা একজনও স্ত্রীলোক ইংরাজী জানিত না; বর্ত্তমান সেন্সাসে হাজার করা একজন ইংরাজী শিক্ষা করিয়াছে বলিয়া দেখা গেল। মোটের উপর এই জাতীয় ১৪৭৪৮ জন ইংরাজী ইংরাজী জানে, তন্মধ্যে ১২২ জন স্ত্রীলোক। জেলিয়া কৈবর্ত্ত অনেক চাষী বলিয়া রিটার্ণ করিয়াছে বলিয়া জন সংখ্যা সঠিক বলিয়া বিশ্বাস করা যায় না। ময়মনসিংহের ২৫৩ জন পুরুষ ও ৩৩৭ জন স্ত্রী 'গজেন্দ্র দাস' বলিয়া রিটার্ণ করিয়াছে। আসামের সেন্সাস রিপোর্টে শ্রীহট্ট জেলায় কতিপয় হালুয়া দাস মাহিষ্য নাম চাহে না বলিয়া উল্লিখিত হইয়াছে। বাঙ্গলার রিপোর্ট ছাড়া আসামের রিপোর্টে নিম্নলিখিত রূপ সংখ্যা পাওয়া যায়:—

কৈবর্ত্ত	২০৮৪৩	প্রায়ই ব্রহ্মপুত্র উপতকায়
মাহিষ্য (চাষী কৈবর্ত্ত)	৬৫৩১২	} সুর্ম্মা উপত্যকায়
জেলিয়া কৈবর্ত্ত	৪৫০৯৮	

আসামের রিপোর্টে আছে—"The Kaibarttas are divided into two functional groups which for all intents and purposes are separate castes: the Chasi and the Jalia * * * The Chasi Kaibarttas are permitted to return themselves as Mahishyas."

মাহিষ্য নাম এখনও সর্ব্বত্র সমানভাবে প্রচারিত হয় নাই বলিয়া রিপোর্টের ভাষায় বুঝিতে পারা যায়। সুতরাং মাহিষ্য নেতৃগন দেখিবেন, যাহাতে চাষী

কৈবর্ত্তমাত্রেই মাহিষ্য বলিয়া পরিচয় দেয়। ১৯০১ খৃষ্টাব্দের রিপোর্টে গেট সাহেব বলিয়াছিলেন,—মাহিষ্য নাম এখনও ইহাদের অন্তঃপুর পর্য্যন্ত পৌঁছায় নাই। বাস্তবিক কি তাই? বিগত ১০।১২ বৎসর মধ্যেও কি পৌঁছিল না?

প্রবন্ধ-লেখকগণের প্রতি।

আমাদের প্রিয়সুহৃৎ কোন একজন উচ্চশিক্ষিত চিন্তাশীল দূরদর্শী প্রবীণ ব্যক্তি সেদিন বলিয়াছেন—"মাহিষ্য-সমাজ পত্রিকায় জাতি-বিষয়ক উৎপত্তি ও বর্ণতত্ত্ব এবং অশৌচ-মীমাংসা সম্বন্ধে প্রবন্ধগুলি ভাল বাহির হয়, কিন্তু জাতীয় চরিত্রের উন্নতি সাধনের মূল নীতি সমূহের উপর লক্ষ্য করিয়া এক সম্পাদক ব্যতীত অন্য কোন লেখক কিছুমাত্র আভাস দেন না। হিন্দুর জাতি বিভাগ উহার প্রত্যেক বিষয়েই বিজড়িত—হিন্দুর জাতিতত্ত্ব না বুঝিলে জাতীয় ইতিহাস চর্চ্চার কোন সুফল পাওয়া যায় না। ভারতের রাজশাসন-নীতির সহিত এই জাতিতত্ত্বের ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক—এই সম্পর্ক পরিত্যাগ করিলে হিন্দু সমাজের অস্তিত্ব থাকার সন্দেহ আছে। কিন্তু নিরেট জাতিতত্ত্ব আলোচনা করিয়া কি লাভ? উচ্চশিক্ষিত সাহিত্যিক ও ঐতিহাসিকগণ এই প্রশ্নের সমাধান করিতে পারেন কি? কেহ কেহ অবশ্য একপ্রকার উত্তর করিবেন, সে উত্তর আমাদের প্রীতিপ্রদ হইবে না। মুশলমানগণ এই সে দিন পর্য্যন্ত ভারতের ভাগ্যবিধাতা ছিলেন; এখনও নিজাম প্রভৃতি করদ ও মিত্র রাজন্যরূপে দেশশাসক মুসলমানগণ ভারতে রহিয়াছেন বলিয়া ভারতের রাজকার্য্যে, শাসন-শৃঙ্খলায়, রাজ্য-পরিচালনে তাঁহারা ইংরাজ রাজপুরুষগণের সহায়তা করিবার জন্য স্বতন্ত্রভাবে বিশেষ অধিকার লাভ করিতেছেন। কিন্তু হিন্দুর মধ্যে যাহারা একদিন বাঙ্গলার দণ্ডমুণ্ডের কর্ত্তা ছিলেন; এই সেদিনের মোগল শাসনকাল পর্য্যন্ত যাঁহারা স্বাধীন রাজদণ্ড পরিচালনা করিয়া আসিয়াছেন; ইংরাজ রাজপুরুষগণও বুঝেন—যে প্রাচীন শাসকসম্প্রদায়ের জাতি হিন্দুর অন্যান্য জাতি অপেক্ষা রাজকার্য্য পরিচালনে শিষ্ট ও সুপারগ, তাঁহারা এখন নীরব ও মুহ্যমান এবং এই জাতীয় সেই প্রাচীন রাজবংশগুলি অতি দীনভাবে অবস্থান করিতেছেন; অথচ তাঁহাদের পক্ষে বলিবার একটী লোকও রাজ দরবারে স্থান পান নাই। অনেকে বলিবেন, উপযুক্ততা নাই। এই খানেই নিরেট জাতিতত্ত্বের কোন কথায় উত্তর দেওয়া যায় না, এই খানেই সামাজিক

তত্ত্বের গভীর গবেষণার কথা চাই। এ পর্য্যন্ত সাহিত্য-সমাজ পত্রিকায় কোন লেখক তাহা আলোচনা করেন নাই।”

কেবলমাত্র সংবাদপত্রে নিরেট জাতিতত্ত্বের বাদ প্রতিবাদ করিলে চলিবে না, এখন চাই ঃ—

(১) উচ্চশিক্ষা লাভে নিয়মিত সুযোগ ও সুবিধা লাভ,

(২) রাজকার্য্যে পর্য্যাপ্ত পরিমাণে সাহিত্য কর্ম্মচারীর নিয়োগ,

(৩) গবর্ণমেণ্টের কাউন্সিলে এই জাতীয় প্রতিনিধি নির্ব্বাচনাধিকার,

(৪) কৃষিকার্য্যের উন্নতি সাধন ও বিস্তার,

(৫) দেশশাসকগণ, ইংরাজগণ ও অন্যান্য উচ্চপদস্থ ব্যক্তিগণকে প্রাচীন ইতিহাস ও গৌরবের নিদর্শন প্রদর্শন।

সমাজ নেতৃগণ যাহাতে এই সকল বিষয়ে চিন্তা করেন, কার্য্য করেন, তৎপ্রতি লক্ষ্য করিয়া প্রবন্ধ লেখা আবশ্যক।

ইতিমধ্যে কয়েকজন উৎসাহী যুবকের প্রবন্ধ প্রাপ্ত হওয়া গিয়াছে; কিন্তু স্থানাভাবে প্রকাশিত হয় নাই বলিয়া দুঃখিত আছি। পক্ষান্তরে তাহাদের প্রবন্ধগুলি উপরোক্ত উদ্দেশ্যের অনুকূলও নহে। তজ্জন্য তাঁহারা আমাদিগকে ক্ষমা করিবেন আশা করি। যাঁহারা সময়ে সময়ে প্রবন্ধ প্রেরণ করিয়া আমাদিগকে উৎসাহিত করেন, তাঁহারা সকলেই আমাদের ধন্যবাদের পাত্র।

মেদিনীপুর রাজারামপুর নিবাসী প্রবীণ পণ্ডিত শ্রীযুক্ত সাগর চন্দ্র কবিরত্ন, বিরুলিয়া নিবাসী শ্রীযুক্ত আশুতোষ জানা, ঢাকা নান্নার নিবাসী শ্রীযুক্ত রেবতীরঞ্জন রায়, ফরিদপুর হাবাসপুরের শ্রীযুক্ত সুদর্শনচন্দ্র বিশ্বাস, পাবনা মোবেড়িয়ার শ্রীযুক্ত দুর্গানাথ দেওরায় তত্ত্ববিনোদ, হুগলী কুলবাতপুর নিবাসী শ্রীযুক্ত বসন্তকুমার ভৌমিক, উগারদহ নিবাসী শ্রীযুক্ত নারায়ণ চন্দ্র কাব্যরত্ন প্রভৃতি লেখকগণের নাম বিশেষ উল্লেখযোগ্য। বিগত দুই বর্ষে তাঁহারা জাতিতত্ত্ব, শিক্ষা ও বৈজ্ঞানিক আলোচনা বিষয়ক প্রবন্ধে সাহিত্য সমাজের কলেবর অলঙ্কৃত করিয়াছেন। আমাদের প্রিয়সুহৃৎ খোলাহাটী নিবাসী যুবক শ্রীযুক্ত রাধাবিনোদ চৌধুরী মহাশয় মাসিক সাহিত্য ও সাময়িক সাহিত্যের প্রতি বেশ লক্ষ্য রাখিয়া সময়ে সময়ে আমাদের সাহায্য করিতেছেন। রাধাবিনোদ বাবুর লেখার শক্তিও আছে, তবে সাহিত্য-সমাজ তাঁহার একটীও প্রবন্ধ লাভ করিবার সুযোগ পায় নাই। ভোগপুর সাহিত্য একাডেমীর ছাত্র

বিবরণী প্রদান করিয়া নীরব হইয়াছেন। কলিকাতা ভবানীপুরের শ্রীমান্ গুরুদাস আদক, সাতক্ষীরার শ্রীমান্ সতীশ চন্দ্র দাস, বলরামবাটীর শ্রীমান্ মন্মথ নাথ চক্রবর্ত্তী, নদীয়া আঠারখাদা নিবাসী শ্রীযুক্ত দেবেন্দ্রনাথ বিশ্বাস প্রভৃতি সুলেখক, ইঁহারাও নীরব। দুঃখের বিষয়, যে যুবক পিতৃপদাঙ্ক অনুসরণপূর্ব্বক "অবনতির ইতিহাস" লিখিয়া আমাদের জাতীয় ইতিবৃত্তের অনেক কথা ব্যক্ত করিয়াছেন,—প্রাচীন গৌরবের ইতিহাস অপেক্ষা সে ইতিহাস সমাজের পক্ষে কার্য্যকরী হইয়াছে—যাঁহার প্রতিভায় সাভারের প্রাচীন কীর্ত্তির প্রতি ঐতিহাসিকগণের দৃষ্টি নিপতিত হইয়াছে, যাঁহার রামপাল চরিত ও পালরাজ বংশের ইতিবৃত্ত সমালোচনায় বাঙ্গলার ঐতিহাসিক তথ্যে নূতন আলোক বিকীর্ণ হইয়াছে, সেই প্রতিভাবান্ লেখক বিজয়কুমার রায় আমাদিগকে কাঁদাইয়া অমর ধামে মহাপ্রস্থান করায় সাহিত্য-সমাজের বিশেষ ক্ষতি হইয়াছে। তাঁহার সামান্য কালের সেবার ঋণ সমাজ পরিশোধ করিতে সমর্থ হইবে না। যাঁহার নিকট অনেক আশা করিয়াছিলাম তিনি চলিয়া গিয়াছেন।

কয়েকজন সুলেখক প্রচ্ছন্নভাবে কার্য্য করিতেছেন তাঁহাদের নামোল্লেখ করা যুক্তিযুক্ত নহে বলিয়া এস্থলে উল্লেখ করা হইল না। তন্মধ্যে কয়েক জনের দুই একটী প্রবন্ধে তাঁহাদের নামও প্রকাশিত হইয়াছে। উদীয়মান কয়েক জন লেখকের প্রবন্ধ প্রাপ্ত হইয়াছি, এ স্থলে তাঁহাদের নামোল্লেখ করা যাইতেছে:—শ্রীযুক্ত বটকৃষ্ণ দাস—সিতি, নরেন্দ্র নাথ দাস—মহিষাদল, গুরুদাস বিশ্বাস—সদরপুর, হরেকৃষ্ণ মণ্ডল—ডায়মণ্ডহারবার, ক্ষেত্রমোহন চৌধুরী—ঢাকা, ফণিভূষণ সরকার—আজিমগঞ্জ, সুরেন্দ্রনাথ সরকার—জলপাই-গুড়ি, রামহরি বৈতালিক—কমলপুর, সতীশ চন্দ্র বিশ্বাস—রামনাথপুর, শ্রীপতি নাথ হাজরা—ঝাড়িবেড়্যা, গোবিন্দ চন্দ্র বর্ম্মমণ্ডল—নওগাঁ, বৈকুণ্ঠ নাথ পাল—ব্রজমোহন পুর, কেদার নাথ মৌলিক—রামনগর, প্রসন্নকুমার সমাদ্দার—তেকালা, শিবপ্রসাদ কুতি—দুর্গাপুর ও প্রবীণ চন্দ্র দাস—রাধাপুর ইত্যাদি। ইহারা উদ্যম সহকারে চেষ্টা করিলে কালে সুলেখক হইতে পারিবেন।

পরিশেষে আমাদের সানুনয় নিবেদন—জাতীয় উন্নতি সাধনের উদ্দেশ্যের অনুকূল রচনা বা প্রবন্ধ যাহাতে প্রাপ্ত হই, তজ্জন্য লেখকগণকে বিশেষভাবে অনুরোধ করিতেছি। বৃথা কতকগুলি পদ্যপ্রবন্ধ বা নৈসর্গিক দৃশ্যের বিবরণ লিখিয়া সমাজের কলেবর পূর্ণ করা অভিপ্রেত নহে।

বৈশ্য-তর্পণবিধি।

বস্ত্র পরিধান।—স্নানান্তে উত্তমরূপে মস্তক ও গাত্র মুছিয়া ফেলিয়া ধৌত ও পরিস্কৃত বস্ত্র পরিধান করিবে। ছিন্ন, মলিন, দগ্ধ, মূষিক দ্বারা ছিদ্রীকৃত, সেলাই করা, অক্ষালিত, রজক গৃহাগত বস্ত্র, রক্তবস্ত্র ও কটিনিঃসৃত (ছাড়া) বস্ত্র পরিধান করিবে না। রেশমী, মেষলোমজ এবং ছাগলোমজ বস্ত্র পরিধান করিতে পারা যায়; কিন্তু এই সকল বস্ত্র অন্ন আহারের পূর্ব্বে ছাড়িয়া রাখিতে হইবে। ছাড়িয়া না রাখিলে ধৌত না করিয়া উহা পরিধান করতঃ পূজাদি কার্য্য করিতে পারা যায় না। এবং দীক্ষিত ব্যক্তি ইষ্টমন্ত্র পড়িয়া ত্রিকচ্ছ করিয়া বস্ত্র পরিধান পূর্ব্বক যজ্ঞোপবীতের ন্যায় উত্তরীয় ধারণ করিবেন। যাঁহাদের যজ্ঞোপবীত স্কন্ধদেশে আছে, তাঁহারা পৃথক উত্তরীয় ধারণ না করিলেও চলিতে পারে।

স্নাতক ব্যক্তির আর্দ্রবাসা হইলে নাভিমাত্র জলে স্থিত হইয়া এবং শুষ্কবাসা হইলে একপদ জলে ও একপদ স্থলে স্থাপন পূর্ব্বক তর্পণ করিতে হইবে। তাম্রপাত্র পিতৃতর্পণে প্রশস্ত।

যজ্ঞোপবীত ধারণের ন্যায় উত্তরীয় ধারণ করিবে।

"ব্রহ্মবাণী সহস্রাণি শিববাণী শতানিচ।
বিষ্ণোর্ণাম সহস্রেণ শিখাবন্ধনং করোম্যহং॥"

এই মন্ত্র পাঠ পূর্ব্বক শিখাবন্ধন করিবে।

বৈশ্য অর্দ্ধচন্দ্র তিলক ধারণ করিবে। তিলক রচনার জন্য মৃত্তিকা চন্দনাদির অভাবে কেবল জল দ্বারাও তিলক করিয়া দেবতা অর্চ্চনা করিতে পারিবে।

বাম হস্তে লোমরহিত স্থানে তিল রাখিবে। স্নানবস্ত্রে রাখিবে না। কোন পাত্রে রাখিতে পারা যায়। দক্ষিণ হস্তের অঙ্গুষ্ঠ এবং অনামিকা অঙ্গুলি দ্বারা তিল গ্রহণ করিবে। উদ্ধৃত জলে তর্পণ করিতে হইলে তর্পণ জলে তিল মিশ্রিত করিয়া লইলেই হইবে।

তিলের অভাবে সুবর্ণ বা রজতপৃষ্ঠ জলে তর্পণ করা কর্ত্তব্য। তদভাবে কুশাদি স্পৃষ্টজলে মন্ত্রপাঠ পূর্ব্বক তর্পণ করা যাইতে পারে।

স্নানান্তে আচমন, তিলক ধারণ, শিখা বন্ধনাদি করিয়া প্রথমে প্রাচীনাবীতী অর্থাৎ যজ্ঞোপবীত বা উত্তরীয় দক্ষিণ স্কন্ধে স্থাপন করতঃ দক্ষিণাস্য হইয়া তীর্থ আবাহন করিবে।

১। দৈবতীর্থে (সর্ব্ব অঙ্গুলির অগ্রভাগে) যব দ্বারা দেবতাদিগের তর্পণ করিবে এবং দৈবতীর্থে যব দ্বারা ঋষিদিগেরও তর্পণ করিবে।

২। মনুষ্যতীর্থে (কনিষ্ঠ অঙ্গুলির মূলভাগে) যব দ্বারা মনুষ্য তর্পণ করিবে।

৩। পিতৃতীর্থে (অঙ্গুষ্ঠ ও তর্জ্জনীর মধ্যভাগে) তিল দ্বারা পিতৃতর্পণ করিবে। দেবতর্পণ ও ঋষিতর্পণ পূর্ব্বাস্য, মনুষ্যতর্পণ উত্তরাস্য, পিতৃতর্পণ দক্ষিণাস্য হইয়া করা কর্ত্তব্য।

শিখামোচন মন্ত্র—

"ঐঁ গচ্ছন্তু সকলদেবা ব্রহ্মা বিষ্ণু মহেশ্বরাঃ।
তিষ্ঠ ত্বমাচলা লক্ষ্মীঃ শিখামুক্তং করোম্যহম্॥"

আবশ্যক হইলে এই মন্ত্র পাঠ পূর্ব্বক শিখামোচন করিবে।

তিলক ধারণ বিধি।

অঙ্গুলির দ্বারা তিলকাদি করিবে; কিন্তু যেন নখস্পর্শ না হয়।

(১) অঙ্গুষ্ঠ দ্বারা তিলক করিলে দেহে সুখ বৃদ্ধি হয়। (২) মধ্যমা দ্বারা আয়ু বৃদ্ধি হয়। (৩) অনামিকা দ্বারা অর্থ বৃদ্ধি হয় এবং (৪) তর্জ্জনী দ্বারা মুক্তিলাভ হয়।

তিলকধারণ মন্ত্র যথা;—

কেশবানন্তগোবিন্দ বরাহপুরুষোত্তম।
পুণ্যং যশস্যমায়ুষ্যং তিলকং মে প্রসীদতু।"—(মৎস্যসূক্ত)।

তিলক ধারণ—

"ললাটে কেশবং বিদ্যাৎ, কণ্ঠে শ্রীপুরুষোত্তম।
বামবাহৌ বাসুদেবং, দক্ষিণে দামোদরন্তথা॥
নাভৌ নারায়ণঞ্চৈব, মাধবং হৃদয়ে তথা॥
গোবিন্দং দক্ষিণপার্শ্বে, বামে চৈব ত্রিবিক্রমং॥
বিষ্ণুং বামকর্ণমূলে, দক্ষিণে মধুসূদনং।
শিরোমধ্যে হৃষিকেশং,, পদ্মনাভঞ্চ পৃষ্ঠতঃ॥
হরের্দ্বাদশ নামানি পঠিত্বা তিলকানি তু।
যঃ কুর্য্যাদ্বৈষ্ণবো নিত্যং, স প্রেমভক্তিমাপ্নুয়াৎ॥"

(পদ্মপুরাণ)

হস্তের তিলক-প্রক্ষালিত জল মস্তকে দিয়া বাসুদেবকে স্মরণ করিবে।

১। যজ্ঞোপবীত বামস্কন্ধে স্থাপন করিলে উপবীতী কহে।

২। কণ্ঠদেশে বিলম্বিত যজ্ঞসূত্রকে নিবীতী কহে।

৩। যজ্ঞোপবীত বা উত্তরীয় দক্ষিণস্কন্ধে স্থাপন করিলে প্রাচীনাবীতি কহে।

রবি ও শুক্রবারে, সপ্তমী, দ্বাদশী, রাত্রি, সংক্রান্তিতে এবং অমাবস্যা, নিমিত্তক শ্রাদ্ধ ভিন্ন অপর শ্রাদ্ধ দিনে ও জন্মদিনে তিলশূন্য জল দ্বারা তর্পণ করিবে। তীর্থে, তিথি বিশেষে এবং গঙ্গাতে প্রেতপক্ষে নিষিদ্ধ দিবসেও তিল দ্বারা তর্পণ করিতে পারা যায়।

স্নানান্তে তর্পণ পূর্ব্বে আচমন করিবে ;—

"ঐঁ অপবিত্রঃ পবিত্রোবা সর্ব্বাবস্থাং গতোঽপিবা।
যঃ স্মরেৎ পুণ্ডরীকাক্ষং স বাহ্যাভ্যন্তরঃ শুচিঃ॥"

ঐঁ বিষ্ণুঃ, ঐঁ বিষ্ণুঃ, ঐঁ বিষ্ণুঃ এই বলিয়া তিন বার জলপান করিবে।

পূর্ব্বাভিমুখ হইয়া তীর্থ আহ্বান করিবে।

"গঙ্গে চ যমুনাচৈব গোদাবরী সরস্বতী।
নর্ম্মদা সিন্ধু কাবেরী জলে অস্মিন্ সন্নিধিং কুরু॥"
"ঐঁ কুরুক্ষেত্রং গয়া গঙ্গা প্রভাসপুষ্করাণিচ।
পুণ্যান্যেতানি তীর্থানি তর্পণকালে ভবন্তিহ॥"

প্রাংমুখো নাভিমাত্র জলেস্থিতঃ জলে জানুদ্বয় মধ্যে করঃ দৈবতীর্থেণ সযত্নেন কেবলং জলেন প্রথমং দেবতর্পণং কর্ত্তব্যং॥

পূর্ব্বমুখ সাধারণ উত্তরীয় ধারণং—

ঐঁ ব্রহ্মাতৃপ্যতাম্, ঐঁ বিষ্ণুস্তৃপ্যতাম্, ঐঁ রুদ্রস্তৃপ্যত্যাম্, ঐঁ প্রজাপতিস্তৃপ্যতাম্—এই বলিয়া প্রত্যেককে এক এক অঞ্জলি জল দৈবতীর্থ দ্বারা প্রদান করিবে। পরে নিম্নোক্ত মন্ত্রে দেবতীর্থ দ্বারা এক অঞ্জলি জল দিবে :—

"ঐঁ দেবা যক্ষাস্তথা নাগা গন্ধর্ব্বাপ্সরসোঽসুরাঃ।
ক্রূরাঃ সর্পাঃ সুপর্ণাশ্চ তরবো জৃম্ভগাঃ খগাঃ॥
বিদ্যাধরাঃ জলধারাস্তথৈবাকাশগামিনঃ।
নিরাহারাশ্চ যে জীবাঃ পাপে ধর্ম্মেরতাশ্চ যে।
তেষামাপ্যায়নায়ৈতদ্দীয়তে সলিলং ময়া॥

মুনি তর্পণ।

তদন্তর উত্তরমুখ হইয়া নিবীতী (মালাবৎ গলদেশে উত্তরীয় ধারণ)

হইয়া নিম্নলিখিত মন্ত্র ২ বার পাঠ করিয়া কায়তীর্থ (কনিষ্ঠ অনামিকার মূল) দ্বারা ক্রোড়াভিমুখে দুই অঞ্জলি জল দিবে। যথা ;—

"ঐঁ সনকশ্চ সনন্দশ্চ তৃতীয়শ্চ সনাতনঃ।
কপিলশ্চাসুরীশ্চৈব বোঢ়ু পঞ্চশিখস্তথা॥
সর্ব্বে তে তৃপ্তিমায়ান্তু মদ্দত্তেনাম্বুনা সদা॥"

ঋষিতর্পণ।

ততঃ পূর্ব্বমুখ ও উপবীতী হইয়া দৈবতীর্থ (একত্রীকৃত তর্জ্জনী, মধ্যমা ও অনামিকা অঙ্গুলিত্রয়ের অগ্রভাগ) দ্বারা নিম্নোক্ত এক একটী মন্ত্র পাঠ করতঃ প্রত্যেককে এক এক অঞ্জলি জল দিবে।

১। ঐঁ মরীচিস্তৃপ্যতাম্, ২। ঐঁ অত্রিস্তৃপ্যতাং, ৩। ঐঁ অঙ্গিরাস্তৃপ্যতাং ; ৪। ঐঁ পুলস্তস্তৃপ্যতাং ; ৫। ঐঁ পুলহস্তৃপ্যতাং ; ৬। ঐঁ ক্রতুস্তৃপ্যতাং ; ৭। ঐঁ ভৃগুস্তৃপ্যতাং ; ৮। ঐঁ প্রচেতাস্তৃপ্যতাং ; ৯। ঐঁ বশিষ্ঠস্তৃপ্যতাং ; ১০। ঐঁ নারদস্তৃপ্যতাং।

তৎপরে দক্ষিণাভিমুখে প্রাচীনাবীতী হইয়া নিম্নোক্ত মন্ত্র দ্বারা প্রত্যেককে পিতৃতীর্থ (অঙ্গুষ্ঠ ও তর্জ্জনীর মধ্য) দ্বারা এক এক অঞ্জলি জল দিবে। যেহেতু সপ্ত প্রকার পিতৃগণ আছেন। যথা ;

ঐঁ অগ্নিস্বত্তাঃ পিতরস্তৃপ্যন্তামেতৎ সতিলোদকং তেভ্যঃ স্বধা।

ঐঁ সৌম্যাঃ	,,	,,	,,	,,
ঐঁ হবিষ্মন্তঃ	,,	,,	,,	,,
ঐঁ উষ্মপাঃ	,,	,,	,,	,,
ঐঁ সুকালিনঃ	,,	,,	,,	,,
ঐঁ বর্হিষদঃ	,,	,,	,,	,,
ঐঁ আজ্যপাঃ	,,	,,	,,	,,

ততঃ দক্ষিণমুখে চতুর্দ্দশ যমতর্পণ করিবে।

"ঐঁ যমায়, ধর্ম্মরাজায়, মৃত্যবে, চাণ্ডকায়চ।
বৈবস্বতায়, কালায়, সর্ব্বভূতক্ষয়ায় চ॥
ঔডুম্বরায়, দধ্নায়, নীলায়, পরমেষ্ঠিনে।
বৃকোদরায়, চিত্রায়, চিত্রগুপ্তায় বৈ নমঃ॥"

এই মন্ত্র তিনবার পড়িয়া তিন অঞ্জলি জল দিবে।

অনন্তর দক্ষিণমুখে পিতৃতর্পণ করিবে, এবং কৃতাঞ্জলি হইয়া পিতৃলোকের আবাহন করিবে। যথা, ঐঁ আগচ্ছন্তু মে পিতরং ইমং গৃহ্নন্ত্বপোঽঞ্জলিম্।

পিতৃতর্পণ।

গোত্র, সম্বন্ধ ও নাম উল্লেখপূর্ব্বক মন্ত্রপাঠ করিয়া পিতা, পিতামহ, প্রপিতামহ, মাতা, পিতামহী, প্রপিতামহী, মাতামহ, প্রমাতামহ, বৃদ্ধপ্রমাতামহ এই নয়জনের প্রত্যেককে যথাক্রমে তিন তিন অঞ্জলি জল দিবে এবং মন্ত্রও তিনবার পাঠ করিবে।

মাতামহী, প্রমাতামহী, বৃদ্ধপ্রমাতামহী এই তিনজনকে এক একবার মন্ত্র পাঠ করিয়া এক এক অঞ্জলি জল দিবে। পিতামহ হইতে বৃদ্ধপ্রমাতামহী পর্য্যন্ত একাদশ পুরুষের মধ্যে কেহ জীবিত থাকিলে, তাঁহাকে ত্যাগ করিয়া তাঁহার উপরি তন পুরুষকে ধরিয়া, একাদশ সংখ্যাপূরণ করিয়া লইতে হইবে।

"বিষ্ণুর্নমঃ অমুক গোত্র, পিতঃ অমুক ধন তৃপ্যতামেতৎ সতিলোদকং তস্মৈ স্বধা।" এই বলিয়া পিতাকে (পিতৃতীর্থ দ্বারা) তিন অঞ্জলি জল দিবে। এইরূপে পিতামহ প্রভৃতিকে ও প্রত্যেককে তিন তিন অঞ্জলি জল দিবে। কেবল মাতামহী ও প্রমাতামহীকে এক এক অঞ্জলি জল দিবে। এই সময়ে পিতৃব্যাদির তর্পণ করিবে।

এইরূপ বাক্যে পিতামহাদি পুরুষগণকে তর্পণ করিয়া "অমুক গোত্রা" মাতা অমুকী দেবী বা দেই তৃপ্যতামেতৎ সতিলোদকং তস্মৈ স্বধা;" এই বাক্যে মাতা আদি স্ত্রীলোকগণকে তর্পণ করিবে। সমর্থ হইলে এইরূপ বাক্যে পিতৃব্য, ভ্রাতা, মাতুল, বিমাতা, ভগিনী, পিতৃস্বসা মাতৃস্বসা ও সপিণ্ড প্রভৃতিকে এক এক অঞ্জলি জল দ্বারা তর্পণ করিবে।

রাম তর্পণ। পূর্ব্বমুখ হইয়া,

"ঐঁ আব্রহ্ম ভুবনালোকা দেবর্ষি পিতৃমুনিমানবাঃ।
তৃপ্যন্তু পিতরঃ সর্ব্বে মাতৃমাতামহাদয়ঃ॥
অতীত কুলকোটীনাং সপ্তদ্বীপ নিবাসিনাং।
ময়া দত্তেন তোয়েন তৃপ্যন্তু ভুবনত্রয়ং।

এই মন্ত্র তিনবার পাঠ করিয়া তিন অঞ্জলি জল দিবে॥

লক্ষ্মণ তর্পণ।—ঐঁ আব্রহ্মস্তম্ভ পর্য্যন্তং সতিলোদকং জগৎ তৃপ্যতু।

এই মন্ত্র তিনবার পড়িয়া তিন অঞ্জলি জল দিবে।

ভীষ্মতর্পণ।—প্রত্যহ না করিলেও চলে, তবে ভীষ্মাষ্টমীতে অবশ্য কর্ত্তব্য।

"ঐঁ বৈয়াঘ্রপদ্য গোত্রায় সাঙ্কৃতি প্রবরায় চ।
অপুত্রায় দদাম্যেতৎ সলিলং ভীষ্মবর্ম্মণে॥"

এই মন্ত্র তিনবার পড়িয়া তিন অঞ্জলি জল দিবে। পরে ভীষ্মকে নমস্কার করিবে।

"ঐঁ ভীষ্ম শান্তনবো বীরঃ সত্যবাদী জিতেন্দ্রিয়ঃ।
আভিরদ্ভিরবাপ্নোতু পুত্রপৌত্রোচিতাং ক্রিয়াং॥"

"ঐঁ যেহ বান্ধবা বা অবান্ধবা বা যেহন্যজন্মনি বান্ধবাঃ।
তে তৃপ্তিমখিলাং যান্তু যে চাস্মত্তোয়কাঙ্খিণঃ॥"

"ঐঁ অগ্নিদগ্ধাশ্চ যে জীবা যেহপ্যদগ্ধাঃ কুলে মম।
ভূমৌ দত্তেন তৃপ্যন্তু তৃপ্তা যান্তু পরাং গতিম্॥"

এই বলিয়া ভূমিতে এক অঞ্জলি জল দিবে।

"ঐঁ যে চাস্মাকং কুলে জাতা অপুত্রা গোত্রিণোমৃতাঃ।
তে তৃপ্যন্তু ময়া দত্তং বস্ত্র নিষ্পীড়নোদকং॥"

এই মন্ত্র বলিয়া স্নানবস্ত্র নিঙড়াইয়া সেইজল ভূমিতে দিবে। কেবল সংক্রান্তি পুর্ণিমা, অমাবস্যা, দ্বাদশী, এবং শ্রাদ্ধদিবসে বস্ত্র নিষ্পীড়নোদক দিবে না; স্থলে উঠিয়া ভূমিতে জল দিবে।

পিতৃস্তুতি।— পিতা স্বর্গ পিতা ধর্ম্মঃ পিতাহি পরমং তপঃ।
পিতরি প্রীতিমাপন্নে প্রীয়ন্তে সর্ব্বদেবতা॥"

এইরূপ মন্ত্র পাঠ করিয়া পিতার স্তব করিবে॥—

পিতৃ নমস্কার।—

"পিতৃন্নমস্যে দিবি যে চ মূর্ত্তাঃ স্বধাভুজঃ কাম্যফলাভিসন্ধৌ।
প্রদানশক্তাঃ সফলেপ্সিতানাং বিমুক্তিদা যেহনভিসংহিতেষু॥"

"দুর্লভং মানুষমিদং যেন লব্ধং ময়া বপুঃ।
সম্ভাবনীয়ং ধর্ম্মার্থে তস্মৈ পিত্রে নমোনমঃ॥"

ধর্ম্মকার্য্যের উপযোগী এই দুর্লভ দেহ আমি যাঁহার প্রসাদে লাভ করিয়াছি, সেই পিতাকে পুনঃ পুনঃ নমস্কার।

সূর্য্যের অর্ঘ।—ঐঁ নমো বিবস্বতে ব্রহ্মণ ভাস্বতে বিষ্ণুতেজসে।
জগৎ সবিত্রে শুচয়ে সবিত্রে কর্ম্মদায়িনে॥"

(ইদমর্ঘং নমঃ)

সূর্য্যের প্রণাম।—"ঐঁ জবাকুসুম সঙ্কাশং কাশ্যপেয়ং মহাদ্যুতিং।
ধ্বান্তারিং সর্ব্বপাপঘ্নং প্রণতোঽস্মি দিবাকরং॥"

বিষ্ণুর প্রণাম।—"নমো ব্রহ্মণ্য দেবায় গোব্রাহ্মণ হিতায় চ।
জগদ্ধিতায় কৃষ্ণায় গোবিন্দায় নমোনমঃ॥"

লক্ষীর প্রণাম।—"ধনদায়ৈ নমস্তুভ্যং নিধিপদ্মহৃতায় চ।
ভবন্তু তৎপ্রসাদান্ মে ধনধান্যাদি সম্পদঃ॥"

হরিবোল, হরিবোল, হরিবোল॥

তিলোদকং। তিল না থাকিলে কেবল উদকং বলিবে। গঙ্গাজল হইলে গঙ্গোদকং; অন্য তীর্থ জল হইলে সেই তীর্থের উল্লেখ করিবে।

ডাক্তার শ্রীবসন্তকুমার ভৌমিক্।

পুস্তক-পরিচয়।

গোপাল-বান্ধব। হাইকোর্টের উকীল শ্রীযুক্ত প্রকাশচন্দ্র সরকার বি, এল, প্রণীত—৩৮৩ পৃষ্ঠায় সম্পূর্ণ—মূল্য ১৲ এক টাকা মাত্র। ১৮ নং রসারোড নর্থ, ভাবানীপুর, কলিকাতা ঠিকানায় প্রাপ্তব্য।

ইহা বাঙ্গালা সাহিত্যের একটী নূতন জিনিষ। গোজনন, গোচিকিৎসা গো-ব্যবসায়, দুগ্ধ ব্যবসায় ও ডেয়ারি ফার্ম্মিং সম্বন্ধে কোন পুস্তক এ পর্য্যন্ত বাঙ্গালা ভাষায় প্রকাশিত হয় নাই। গোজাতি দ্বারা ভারতের প্রত্যেক গৃহস্থ কি ভাবে উপকৃত, তাহা বলিয়া বুঝাইতে হইবে না; কিন্তু দুঃখের বিষয় সেই গোজাতির দিন দিন অবনতি হইতেছে; কি করিয়া বৈজ্ঞানিক প্রণালীতে উহার উন্নতিসাধন করা যাইতে পারে, তাহা এই পুস্তকে বিশেষ ভাবে বিবৃত হইয়াছে। এরূপ পুস্তকের বহুল প্রচার একান্ত বাঞ্ছনীয়। আমরা প্রকাশ বাবুর ন্যায় উচ্চ শিক্ষিত ব্যক্তিগণের নিকট হইতে এইরূপ নানাবিধ উপাদেয় পুস্তক পাইবারই আশা করি। বঙ্গভাষার স্বর্ণমন্দির এইরূপ গ্রন্থেই পূর্ণ হউক।

---o---

বঙ্গীয় সাহিত্য-ছাত্র-সম্মিলনী।

বিগত ৫ই আশ্বিন, রবিবার, অপরাহ্ণ ৪ ঘটিকার সময়, রিপণ কলেজ গৃহে বঙ্গীয় সাহিত্য-ছাত্র-সম্মিলনীর ত্রয়োদশ বার্ষিক সাধারণ সভার অধিবেশন হইয়াছিল। হাইকোর্টের সুযোগ্য উকিল প্রেমচাঁদ রায়চাঁদ স্কলার মাননীয় শ্রীযুক্ত বাবু মন্মথনাথ রায় এম্. এ, বি, এল্, মহোদয় সভাপতির আসন গ্রহণ করিয়াছিলেন। ডাক্তার এস্, সি, দাস, এল্-আর-সি পি-এস্ (এডিনবর্গ), ডাক্তার শ্রীসুরেন্দ্রনাথ সর্দ্দার এল্-এম্-এস্, সাহিত্য-সমাজ-সম্পাদক পণ্ডিত শ্রীযুক্ত সেবানন্দ ভারতী, ভ্রান্তিবিজয়-প্রণেতা পণ্ডিত শ্রীযুক্ত হরিশ্চন্দ্র চক্রবর্ত্তী, তমালিকা-সম্পাদক শ্রীযুক্ত শ্রীধরচন্দ্র অধিকারী ভক্তিরত্ন প্রমুখ সমাজসেবীগণ এবং প্রায় চারিশত সাহিত্য ছাত্র সভায় যোগদান করিয়াছিলেন। সাতক্ষীরা সাহিত্য ছাত্র-সম্মিলনীর অন্যতম সভ্য এবং বঙ্গবাসী কলেজের এফ্ এ ক্লাসের ছাত্র শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্র দাস "ছাত্রজীবন ও জাতীয় কর্ত্তব্য" সম্বন্ধে একটী সুন্দর প্রবন্ধ পাঠ করেন, তাহার কতকাংশ পরে উদ্ধৃত করিয়া দেওয়া হইল। রিপণ কলেজের দ্বিতীয় বাৎসরিক ক্লাসের ছাত্র শ্রীযুক্ত উপেন্দ্রনাথ কাঞ্জী ইংরাজীতে যে বক্তৃতা করিয়াছিলেন, তাহাও অতিশয় হৃদয়গ্রাহী হইয়াছিল। সভাস্থলে সর্ব্বসম্মতিক্রমে নিম্নলিখিত বিষয়গুলি গৃহীত হইল :—

(ক) গরীব সাহিত্য-ছাত্রদিগের লেখাপড়া শিক্ষার সহায়তাকল্পে সম্মিলনী যথাসাধ্য চেষ্টা করিবেন। এই কার্য্য সাধন করিবার নিমিত্ত একটী সাহিত্য ষ্টুডেন্স লাইব্রেরী খোলা আবশ্যক; তাহাতে ছাত্রদিগের পাঠোপযোগী পুস্তকাদি সংগৃহীত হইয়া রক্ষিত হইবে এবং আবশ্যক হইলে তাহা গরীব সাহিত্য ছাত্রদিগকে পাঠ করিতে দেওয়া হইবে।

(খ) গরীব ছাত্রদিগের অসুখে ঔষধ এবং পথ্যাদির বিনামূল্যে ব্যবস্থা করিবার জন্য চেষ্টা করা হইবে। এই কার্য্যের জন্য ডাক্তার এস, সি, দাস এবং সুরেন্দ্রনাথ সর্দ্দার উভয়েই যথাসাধ্য সাহায্য করিতে প্রতিশ্রুত হওয়ায় সম্মিলনী তাঁহাদিগকে আন্তরিক ধন্যবাদ প্রদান করিতেছেন।

(গ) নিম্নলিখিত ছাত্রগণ লইয়া কার্যকারী সভা (Executive Committee) গঠিত হইল :—

সম্পাদক— শ্রীযুক্ত বাবু ধনপতি দাস এম্-এ ; ল কলেজের ছাত্র
সহ-সম্পাদক—,, ,, সতীশচন্দ্র দাস, বঙ্গবাসী কলেজ
,, —,, ,, গুণসিন্ধু সর্দ্দার, বি, এস্-সি—ল কলেজ
কোষাধ্যক্ষ—,, ,, শরচ্চন্দ্র জানা এম্, এস্-সি, রিসার্চ স্কলার
সভ্যগণ—শ্রীযুক্ত সুশীলকুমার মণ্ডল এম্-এ ক্লাসের ছাত্র
,, ক্ষীরোদ চন্দ্র মাইতি, বি-এস্-সি ; ল কলেজের ছাত্র
,, প্রমথনাথ সিকদার ,, ,,
,, জ্যোতির্ম্ময় হালদার বি-এ ,,
,, রামদাস বিশ্বাস এফ্-এ ক্লাস, রিপণ কলেজ
,, জ্ঞানেন্দ্রনাথ বিশ্বাস ,,
,, মেঘনাথ জানা ,,
,, হীরালাল দাস বি-এ ক্লাস

(ঘ) প্রত্যেক ছাত্র মাসিক অন্ততঃ ৴০ আনা চাঁদা দিবেন।

মন্তব্য।—বঙ্গীয় সাহিত্য-ছাত্র-সম্মিলনী যে নবীন উদ্যমে কার্য্যক্ষেত্রে অগ্রসর হইতেছেন, তাহা অবশ্য সুখের বিষয়। উচ্চশিক্ষা লাভ করার সহিত কৃষিকার্য্যের দিকে লক্ষ্য করাও যে কর্ত্তব্য, তাহা সম্মিলনীতে আলোচনা করা হইয়াছে দেখিয়া আমরা প্রীতিলাভ করিয়াছি। জাতীয় ইতিহাস চর্চ্চা করা ছাত্রজীবনের একটী অপরিহার্য্য কর্ত্তব্য। ইতিহাস অবনতি ও উন্নতির কারণ নির্দ্দেশ করিয়া জাতির ভবিষ্যৎ পন্থা দেখাইয়া দিতে পারে। এজন্য আমরা ছাত্রগণকে বিশেষ ভাবে ইতিহাস পাঠ করিতে অনুরোধ করি। জাতীয় সাহিত্যের পরিপুষ্টি করাও জীবনের একটী লক্ষ্য হওয়া উচিত। তজ্জন্যও ছাত্রজীবনে প্রস্তুত হইতে হইবে। সম্মিলনী হইতে অন্ততঃ একখানি ইংরাজী মাসিক পত্র প্রকাশিত হইয়া ছাত্রগণের মধ্যে প্রচারিত হওয়া প্রয়োজন। তাহাতে পরস্পরের রচনাশক্তি ও ভাবের আদান প্রদান চলিতে পারে। বাঙ্গালা-রচনা সাহিত্য-সমাজে প্রকাশিত হইবে।

আমি বিলাতের ঐতিহাসিক ফ্লিট সাহেব ও ভিন্সেণ্ট স্মিথ সাহেবের সহিত পত্র আদান প্রদান দ্বারা আমাদের গৌরবজনক ইতিবৃত্তের কথা জানাইয়াছি। তাঁহারা আমাদিগকে পালি ভাষার পুস্তকে বিস্তর ঐতিহাসিক কথা আছে বলিয়া জানাইয়াছেন। অতএব সাহিত্য-ছাত্রগণের মধ্যে কাহারও

কাহারও এখন পালি ভাষা বিশেষ রূপে শিক্ষা করা প্রয়োজন বলিয়া আমার মনে হয়। প্রচলিত বাঙ্গালা সাহিত্যে আমাদের পূর্ব্বগৌরবের বেশী কিছু দেখিতে পাওয়া যায় না। কেবলমাত্র এক গৌড়রাজমালায় একটু আভাস আছে; তাহাও সংস্কৃত রামচরিত কাব্যের কথা। 'তমলুকের ইতিহাস' মাত্র একখানি ঐতিহাসিক গ্রন্থ গত কয়েকমাস প্রকাশিত হইয়াছে। এরূপ আরও কতকগুলি ইতিহাস, উপন্যাস, কাব্য ইত্যাদি লিখিত হওয়া প্রয়োজন। তমলুকের ইতিহাসের একটী সুন্দর ইংরাজী অনুবাদও বিশেষ আবশ্যক। অতএব এই সমস্ত বিষয়ে সম্মিলনী লক্ষ্য করিবেন কি?

আশা করি, বঙ্গীয়-সাহিত্য-ছাত্র-সম্মিলনী কেবলমাত্র কলিকাতাস্থিত ছাত্রগণকে লইয়া সীমাবদ্ধ থাকিবে না। ইহার কার্য্যক্ষেত্র সমস্ত বঙ্গদেশে বিস্তৃত হওয়া প্রয়োজন। ইহার অধিবেশন বঙ্গের বিভিন্ন বিভিন্ন স্থানে হওয়া উচিত। এক আনা মাসিক চাঁদা দিতে মফঃস্বলের ছাত্রগণও সক্ষম হইবেন নিঃসন্দেহ। অতএব যাহাতে কলিকাতা ও মফঃস্বলের সকল ছাত্রগণই ইহার সভ্য হইতে পারেন, তাহার ব্যবস্থা করা হউক।—সাহিত্য সমাজ-সম্পাদক।

ছাত্র-জীবন ও জাতীয় কর্ত্তব্য।

"সাহিত্য ছাত্র! ইতিহাস উদ্‌ঘাটন কর! চেয়ে দেখ, জগতের কত কত জাতি বীরের ন্যায় উন্নতির চরম সীমায় উত্থিত হইতেছে, আবার কিছুকাল পরে অবনতির চরম সীমায় পতিত হইতেছে। এই জলবুদ্বুদের ন্যায় উত্থানপতন একবার চক্ষুরুন্মীলন করিয়া ভাল করিয়া লক্ষ্য কর। দেখিতে পাইবে, এই উত্থানপতন কাহাদের উপর নির্ভর করিতেছে। ভবিষ্যৎ জাতীয় জীবন গঠনের উপাদান সেই জাতীয় ছাত্রগণের উপরেই কি নির্ভর করিতেছে না? হয়ত তুমি বলিবে "আমি এখন বালক—ক্ষুদ্র আমার দ্বারা কি হইবে?" কিন্তু হে বালক! তুমি ভবিষ্যতে যে মানবে পরিণত হইবে তাহার সমস্ত শক্তিই তোমার মধ্যে নিহিত রহিয়াছে। আজ তুমি ক্ষুদ্র বালক ছাত্র, দুদিন পরে এই সংসারে বালকের পিতা অভিভাবক শিক্ষক; আজ তুমি যুবা ছাত্র, দু'দিন পরে সমাজের নেতা—সমাজপতি দশজনের মধ্যে একজন হইয়া সমাজে বিচরণ করিবে। "Child is the father of man"—"বালক মানবের পিতা" এ কথাটি বিস্মৃত হইও না। তুমি যদি ভবিষ্যতে প্রকৃত মানব

হইতে চাও, তবে তার সূত্রপাতই এইখানে। তুমি যদি অমৃত ফলের আশা কর, তাহা হইলে কি মাটীতে কণ্টকী ফলের বীজ রোপণ করিবে, না সেই অমৃত ফলের বীজ রোপণ করিবে? যে ফলের আশা কর, সেই ফলের বীজ অবশ্য তোমাকে রোপণ করিতে হইবে। আবার উপযুক্ত সময়ে উপযুক্ত ক্ষেত্রে বীজ উৎপন্ন হওয়া আবশ্যক। বাল্যে ছাত্রজীবনে হৃদয়-ক্ষেত্র কোমল ও সরস থাকিতে যদি জাতীয় জীবনের বীজ রোপণ কর, তাহা হইলে উপযুক্ত যত্ন ও পরিশ্রমরূপ সলিল সিঞ্চনে তাহা সহজে অঙ্কুরিত হইবে। নতুবা সংসারে পুড়িয়া পুড়িয়া হৃদয়ক্ষেত্র ঝামা হইলে তাহাতে বীজ দিলে কি আর গজাইবে? তাই বলিতেছি বালক—হে ছাত্র! তোমার হৃদয় কোমল সরস থাকিতে জাতীয় জীবনের বীজ উপ্ত কর। তুমি বলিবে "আমি এখন ক্ষুদ্র—এখন আমার ছাত্র জীবন; স্বজাতি সমাজের উন্নতি করিবার শক্তি আমার কোথায়? কিন্তু যে ক্ষুদ্র বীজের মধ্যে ক্ষুদ্র অঙ্কুর নিদ্রিত অবস্থায় থাকে, দেখ, তাহা হইতে পরিণামে মহান্ বটবৃক্ষের উৎপত্তি হয়, সেইরূপ তোমার ক্ষুদ্র হৃদয়ে ক্ষুদ্র শক্তি এখন নিদ্রিতাবস্থায় আছে, তাহা জাগ্রত হইয়া পরিণামে মহাশক্তির উৎপত্তি হইবে। ভাই মাহিষ্য বালক! মাহিষ্য ছাত্র! শারদীয়া মহাপূজার সমাগমে এদীন লেখক দীন নেত্রে কাতর ক্রন্দনে তোমাদের কাছে প্রার্থনা করিতেছে:—ভাই! মায়ের আহ্বান অবহেলা করিও না। ঐ দেখ মা দশভূজা দশদিকে দশ হস্ত প্রসারিত করিয়া তোমাদের দশ ভাইকে আহ্বান করিতেছেন। ভ্রাতৃগণ, যদি মহাশক্তির পূজা করিতে চাও, তবে তোমরা দেশের উচ্চতম কেন্দ্র হইতে দলে দলে প্রচারকরূপে ছুটিয়া যাও, ক্ষুদ্র পল্লীর প্রান্ত পর্য্যন্ত যাও, বঙ্গের ঘরে ঘরে যাও। আবালবৃদ্ধবনিতা স্বজাতি ভ্রাতৃগণের যে যেখানে ঘুমঘোরে আছে সকলকে জাগরিত কর। এক সঙ্গে মিলিত হও, এক সঙ্গে কথা বল, এক সঙ্গে সকলের মন সকলে জান, মাহিষ্যকে এক তন্ত্রে এক মন্ত্রে দীক্ষিত কর। আতশী কাচে বিভিন্নমুখীন সূর্য্যরশ্মি এক মুখী হইয়া যদি এক কেন্দ্রে সন্নিবেশিত হয় তাহা হইলে তাহা হইতে মহানলের উৎপত্তি হয়, তাহাতে জগত বিদগ্ধ করা যায়, সেইরূপ আমাদের ন্যায় ক্ষুদ্র শক্তি যদি বিভিন্ন মুখী না হইয়া একমুখী হইয়া এক কেন্দ্রে সম্মিলিত হয় তাহা হইলে এই সম্মিলনে অনেক মহৎ কাজ করা যাইবে।

জন্মগ্রহণ করিয়াছ, সেই জাতির পরিচয়েই তোমার নিজের পরিচয়। কিন্তু হায়! আমরা নিজ কর্ম্মফলে আমাদের জাতীয় গৌরব হারাইয়াছি। আজ আমাদের এত অধোগতি হইয়াছে যে, পরিচয়ে নিজের জাতির উল্লেখ করিতে আমাদের লজ্জা হয়। আজ আমাদের জাতীয় গৌরব এত ম্লান হইয়াছে যে, অনেকে জাতির নাম গোপন করিয়া কায়স্থ প্রভৃতি বলিয়া পরিচয় দিতে কুণ্ঠিত নহেন। তোমার এ অধোগতি হইল কেন? তুমি তোমার জাতির উৎপত্তি বৃত্তি ইতিহাস আলোচনা কর নাই। তোমার পূর্ব্বপুরুষগণের অমিত বলবীর্য্য পরাক্রম আধিপত্যের কথা জান না। তাই তুমি মনে কর, আমাদের অজ্ঞ নিরক্ষর ভ্রাতৃগণ যেমন সুদূর পল্লীর কোন্ প্রান্তে পড়িয়া স্বহস্তে হল চালনা করিয়া বিংশ শতাব্দীর গালাগালি "চাষা" নামে ঘৃণিত, আমরা চিরকালই বোধ হয় ঐরূপ ঘৃণিত নিম্নস্তরে ছিলাম! তাই এই বিংশ শতাব্দীর সভ্যতালোকে নিজের জাতির পরিচয় দিতে লজ্জিত। আজ তোমরা হীনভাবে হিন্দু সমাজের এক প্রান্তে পড়িয়া আছ, কিন্তু চিরকাল তোমাদের এত দুরবস্থা ছিল না। এক সময়ে তোমার স্বজাতীয়গণের শাসনদণ্ডে আসমুদ্র সমগ্র বঙ্গদেশ প্রকম্পিত ছিল। উড়িষ্যা, তমলুক, ময়না, মহিষাদল, কুতুবপুর, তুর্কা, সুজামুঠা, লাট ও কঙ্কদ্বীপ, বরেন্দ্রী, সাভার ভোগবেতাল প্রভৃতি রাজ্যের ধ্বংসাবশেষ অদ্যাপি সেই অতীত গৌরবের সাক্ষ্য প্রদান করিতেছে। মাহিষ্য জাতি ইতিহাস উদ্ঘাটন কর, ঐ দেখ, হান্টার, বেভারলী, ফ্রেডারিক প্রভৃতি নিরপেক্ষ ইংরাজ ঐতিহাসিকগণ তোমাদের প্রাচীন শৌর্য্য বীর্য্য প্রভুত্ব কীর্ত্তিকলাপের কি জলন্ত চিত্র প্রদর্শন করিতেছেন। আজ যদি বাঙ্গালায় কোন টডের আবির্ভাব হইত তাহা হইলে দেখিতে পাইতে, রাজস্থানের স্বাধীনতাপ্রিয় রাজপুত জাতির সহিত যদি কোন বাঙ্গালী জাতির তুলনা হইতে পারে, তবে সে তোমার এক মাত্র স্বজাতীয় মাহিষ্যক্ষত্রিয় জাতি। তোমাদেরই না পূর্ব্বপুরুষগণ তমলুক রাজ্যের রাজন্যবর্গের শীতল আতপত্র ছায়ায় আসমুদ্র সমগ্র দক্ষিণবঙ্গ বহু শতাব্দী ধরিয়া সুখে নিদ্রা গিয়াছিল? তোমাদেরই না পূর্ব্বপুরুষ এক সময়ে তমলুক বন্দর হইতে সমুদ্র পথে দিগ্বিজয়ে বহির্গত হইয়া সুমাত্রা যাভা বালী প্রভৃতি ভারত সাগরীয় দ্বীপপুঞ্জে উপনিবেশ স্থাপন করিয়াছিলেন? তোমাদের পূর্ব্বপুরুষগণের রণতরী না এক সময়ে 'ভ্রমিত ভারতসাগরময়।'

যব বালীদ্বীপে উপনিবেশ স্থাপন করিয়া জগতে অতুল কীর্ত্তির নিদর্শন রাখিয়া গিয়াছেন। সে গৌরবগর্ব্বে আমাদের কয়জনের হৃদয় উদ্দীপ্ত অনুপ্রাণিত হয়!

* * *

আজ ভারতবাসী "ঔপনিবেশিক স্বায়ত্তশাসনে"র জন্য লালায়িত, কিন্তু যে দিন মাহিষ্য-ক্ষত্রিয় জাতি—আমাদের সিংহবীর্য্য পূর্ব্ব পুরুষেরা উত্তাল তরঙ্গময় সমুদ্রবক্ষ অর্ণবযানে বিদীর্ণ করিয়া বরুণের প্রাসাদে পূত হইয়া, বহুদূরবর্ত্তী দ্বীপপুঞ্জ অধিকার করিয়াছিলেন, উপনিবেশী হইয়া-হইয়াছিলেন, উপনিবেশে হিন্দুর ধর্ম্মরাজ্য স্থাপন করিয়াছিলেন,—তখন জগতে হিন্দু মাহিষ্য ক্ষত্রিয় ভিন্ন অন্য উপনিবেশী ছিল না। সেই অতীত যুগে বালি দ্বীপে যে হিন্দু মাহিষ্য রাজ্যের প্রতিষ্ঠা হইয়াছিল, ৬ বৎসর পূর্ব্বেও সেই মাহিষ্য ক্ষত্রিয় রাজ্য বর্ত্তমান ছিল। মাহিষ্যগণ! তাহা কখন কর্ণগোচর করিয়াছ কি? মাহিষ্য জাতি—এ গৌরবে কেবল তুমি গৌরবান্বিত নহ—সমগ্র ভারতবাসী—সমগ্র বাঙ্গালী জাতি—গৌরবান্বিত!

জাতির গৌরবে নিজের গৌরব, জাতির পরিচয়ে নিজের পরিচয়। অন্যের কাছে তোমার জাতির পরিচয় কালে তোমার লজ্জা, ঘৃণা, ভয় হয় কেন? তোমার অসংখ্য নিরক্ষর ভ্রাতৃগণ সুদূর পল্লীর প্রান্তে পড়িয়া স্বহস্তে হল চালনা করিয়া বিংশ শতাব্দীর গালাগালি "চাষা" নামে অভিহিত হইতেছে বলিয়া? তাই কি তোমাদের অনেকে জাতির পরিচয় কালে নিজের জাতির উল্লেখ করিলে পাছে ঘৃণিত অসভ্য চাষার দলে প'ড়তে হয় এই জন্য নিজের জাতি গোপন করিতে তৎপর? অহো—কি পরিতাপ! সিংহের সন্তানে আজ শৃগালের প্রবৃত্তি! অহো কাল মাহাত্ম্য! মহাকাল তোমাকে নমস্কার! পূর্ব্বপূর্ব্ব যুগে যে কার্য্য দেবতার কার্য্য বলিয়া পরিগণিত ছিল— আজ তাহা অসভ্য চাষার কার্য্য বলিয়া ঘৃণিত। পরের জন্য আত্মজীবনের সুখ স্বচ্ছন্দতা বিসর্জ্জন দিয়া পরের আহার্য্যের জন্য শস্যোৎপাদন করা কি ঘৃণিত অসভ্যের কাজ না দেবতার কাজ? যে কার্য্য দেবতা-ব্রাহ্মণের অনুষ্ঠেয় আর্য্যজাতির কাজ—যাহাতে শূদ্রের অধিকার ছিল না, আজ তাহা ঘৃণিত অসভ্যের কাজ! ভ্রাতৃগণ! শাস্ত্র উদ্ঘাটন কর! শাস্ত্রে তোমার জাতীয় বৃত্তি কৃষি বাণিজ্যের যেরূপ উৎকর্ষ বর্ণিত হইয়াছে, তাহা শ্রবণ করিলে শ্রেষ্ঠবৃত্তি সম্পন্ন জাতি বলিয়া তোমার হৃদয় আনন্দে পুলকিত হইবে। শাস্ত্র স্বহস্তে হল চালনা ব্রাহ্মণ

"স্বয়ঞ্চ বাহয়েৎ ক্ষেত্রে ধান্যৈশ্চ স্বয়মর্জ্জিতৈঃ।
কুর্য্যাৎ বিবাহ যাগাদি পঞ্চযজ্ঞাংশ্চ নিত্যশঃ॥"

দ্বিজগণ স্বয়ং স্বহস্তে ক্ষেত্র কর্ষণ করিবেন এবং স্বহস্তার্জ্জিত ধান্য দ্বারা বিবাহ যাগাদি ও পঞ্চযজ্ঞ নিত্য সম্পাদন করিবেন।

"ক্ষত্রিয়োপি কৃষিংকৃত্বা দেবান্ পিতৃংশ্চ পূজয়েৎ।"

ক্ষত্রিয়গণও কৃষিকর্ম্ম করতঃ দেবতা ও পিতৃগণকে পূজা করিবেন। অর্থ শাস্ত্রও বলিয়াছেন—"তদর্দ্ধং কৃষিকর্ম্মণি। তদর্দ্ধং রাজসেবায়াং।" কৃষি-কর্ম্মে লক্ষ্মীর অর্দ্ধদৃষ্টি। রাজসেবাতে মাত্র একপাদ দৃষ্টি। শাস্ত্রানুসারে কৃষিবৃত্তি যখন ব্রাহ্মণেরও আশ্রয়ণীয় এবং মাহিষ্য জাতির শাস্ত্রীয় স্বকীয় বৃত্তি, তখন যে সকল মাহিষ্য কৃষিবৃত্তি যুক্ত তাঁহাদের লজ্জিত হইবার কোন কারণ নাই। মাহিষ্যগণ! তোমার সজাতীয় ভ্রাতৃগণ আজ কুক্কুরবৃত্তি অবলম্বন না করিয়া অধিকাংশ কৃষি কার্য্যে রত আছেন ইহা তোমার কম গৌরবের নহে। ক্ষত্রিয়বৃত্তিধারী প্রভুত্বকারী জাতিমাত্রেই অসৌভাগ্যের সময়ে কৃষিবৃত্তিই অবলম্বন করিয়া থাকেন, তথাপি তাহারা শ্ববৃত্তি অবলম্বন করেন না। ইহার জলন্ত দৃষ্টান্ত রাজপুতনায় রাজপুত জাতি—শত শত প্রমর বংশীয় রাজপুত আজ স্বহস্তে হল চালন করিতেছেন, তথাপি দাসত্ব করিতে চান নাই। রাজপুতনাতে রাজপুত জাতির বহুলোক যেমন কৃষিজীবী সেইরূপ বাঙ্গালার অধিকাংশ মাহিষ্য কৃষিজীবী। ইহা অবস্থার বিপর্য্যয়ে ঘটিয়া থাকে। বীরজাতি মাত্রেই বিপদে কৃষিবৃত্তিধারী হন। বাঙ্গালার আধুনিক সভ্যতা অভিমানী শ্ব-বত্তি-সম্পন্ন জাতি কৃষিবৃত্তিকে ঘৃণা করে, উহা অসভ্য ধরণের ব্যবসা বলিয়া মনে করে, উহা যে আর্য্যের উচ্চ জাতির বৃত্তি তাহা বুঝে না। মাহিষ্যগণ, চেয়ে দেখ রাজবারার বীরভূমিতে কৃষিবৃত্তি নিন্দনীয় নহে! সেখানে চাকরির মর্য্যাদা নাই—কৃষিরই মর্য্যাদা। তাই বলি মাহিষ্য ভ্রাতৃগণ, যতই জ্ঞানী হও, পণ্ডিত হও, উচ্চশিক্ষাপ্রাপ্ত হও, কৃষিকে পরিত্যাগ করিও না। মনে রাখিও, "স্বধর্ম্মে মরণং শ্রেয়ঃ পরধর্ম্মো ভয়াবহঃ।"

শ্রীসতীশচন্দ্র দাস।

* * *

বিবিধ প্রসঙ্গ।

ভাগবতীয় কথা। আমরা কলিকাতায় অনেক কথকের নিকট ভাগবত শুনিতে যাইয়া কথক মহাশয়দের নিকট বাজে কথাই অধিক শুনিতে পাই—তাহাতে কথকতার উপর বিতৃষ্ণা জন্মাইয়া যায়। সম্প্রতি কলিকাতায় শ্রীযুক্ত বাবু নরেন্দ্রনাথ দাস মহাশয়ের বাটীতে নদীয়া জেলার অন্তর্গত মনিখালি গ্রাম নিবাসী পূজ্যপাদ শ্রীযুত বিভূতি ভূষণ ভাগবত-ভূষণ মহাশয়ের কিন্নরকণ্ঠে ও সুমধুর হৃদয়গ্রাহী বক্তৃতায় ভাগবত ব্যাখ্যাশ্রবণ করিয়া কৃতবিদ্য শ্রোতাগণ পরমানন্দ অনুভব করিয়াছেন। আশা করি, মাহিষ্য-সমাজ পত্রিকার স্বজাতিপ্রেমিক গ্রাহকগণ আমাদের পুরোহিত কুলতিলক ভাগবত ভূষণ মহাশয়কে উৎসাহ দান করিবেন। কথকের ঠিকানা জানিতে হইলে মাহিষ্য সমাজ কার্য্যালয়ে জ্ঞাতব্য।

গ্রাহকগণের প্রতি।—মাহিষ্য-সমাজ পত্রিকার বর্ত্তমান বৎসরের মূল্য এখনও অনেকের নিকট পাওনা রহিয়াছে, দয়া করিয়া পাঠাইয়া দিবেন অথবা ভিঃ পিঃ করিতে লিখিবেন। যাঁহারা কাগজ লইতে অনিচ্ছুক পূর্ব্বে আমাদিগকে জানাইলে বাধিত হইব, নতুবা ভিঃ পিঃ ফেরত দিলে আমাদের বিস্তর ক্ষতি করা হয়।

সারস্বত-ভাণ্ডারের জন্য সংগৃহীত চাঁদার তালিকা।

রাজসাহী—সন্ন্যাসবাড়ী নিবাসী শ্রীযুক্ত আনন্দচন্দ্র তালুকদার মহাশয় তাঁহার পুত্র শ্রীমান্ অঘোর চন্দ্র তালুকদারের শুভ বিবাহোপলক্ষে ... ২৲

রাজসাহী—কর্ণপুর নিবাসী শ্রীযুক্ত রমণীমোহন জোয়ার্দ্দার মহাশয় তাঁহার ভ্রাতা শ্রীমান্ মনোমোহন জোয়ার্দ্দারের শুভ বিবাহ উপলক্ষে ... ২৲

রাজসাহী তিরাইল নিবাসী—শ্রীযুক্ত ব্রজমোহন মজুমদার মহাশয় তাঁহার পুত্রের শুভ বিবাহ উপলক্ষে ... ... ২৲

মোট ৬৲ টাকা

সংগ্রাহক শ্রীরমেশচন্দ্র তালুকদার, ১৬/২এ, বাগবাজার ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

মাহিষ্য-সমাজ।

[তৃতীয় ভাগ, অষ্টম সংখ্যা—অগ্রহায়ণ, ১৩২০ সাল।]

বঙ্কিমবাবুর সাহিত্যগত রাজনীতি।

(প্রবন্ধের মতামতের জন্য লেখকই দায়ী।)

আমরা সুকবি বঙ্কিমের বিষবৃক্ষ উল্লেখে দেখাইয়াছি, তিনি তাঁহার এই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ কাব্যরচনায় উত্তরচরিতকার ভবভূতি, এবং রত্নাবলীকার শ্রীহর্ষের নিকট কত ঋণী। এইরূপ ঋণ করা সত্ত্বেও অন্যান্য বহু অংশে তাঁহার প্রচুর মৌলিকতা আছে। যাঁহারা তদীয় কাব্যের নখাগ্র হইতে কেশাগ্র পর্য্যন্ত সর্ব্বাংশেরই অতিস্তবকারী, তাঁহাদের কথা পরিত্যাগ করিলেও প্রকৃত প্রস্তাবে তাঁহার লেখায় কতকগুলি অসাধারণ গুণ আছে। যদিও এই প্রবন্ধে তাঁহার রাজনীতি সম্বন্ধেই আমরা আলোচনা করিতে বসিয়াছি, তথাপি তাঁহার লেখার অসাধারণ গুণ, যাহা দ্বারা তাঁহার সর্ব্বশ্রেণীর লেখাই উদ্ভাসিত এবং যাহা দ্বারা তিনি দেশবাসী লোকের হৃদয় এত আকর্ষণ করিয়াছেন, যে গুণ তাঁহার রাজনৈতিক লেখারও প্রচুর উপকার করিয়াছে, সেই সম্বন্ধে অগ্রেই ২।৪টী কথা না বলিয়া পারা যায় না।

বঙ্কিম বাবুর লেখার ন্যায় অন্য কাহারও লেখা দেশে এত প্রভাব বিস্তার করিতে পারে নাই, লোকের মন এত আকর্ষণ করিতে পারে নাই। এই প্রভাব, এই আকর্ষণের অন্যান্য কারণ মধ্যে একতর কারণ এই যে, তাঁহার লেখা অতীব পরিষ্কৃত, অতীব নির্ম্মল এবং স্বচ্ছ। তাঁহার স্ফটিকস্বচ্ছ ভাষার স্রোতের মধ্য দিয়া লেখার তলবর্ত্তী বালুকাকণা পর্য্যন্ত দৃষ্টিগোচর হয়। তাঁহার রচনাগত, ভাবাগত এই স্বচ্ছতা তাঁহার লেখায় বিশেষ আকর্ষণ জন্মাইয়াছে! তিনি কোন বিষয় লক্ষ্য করিয়া কয়েক পংক্তি লিখিবামাত্রই

এই সম্বন্ধে বঙ্কিমের প্রশংসা করিয়া শেষ করা যায় না। ইহা ছাড়া তাঁহার লেখার আরো কতকগুলি গুণ আছে। এতগুলি শ্রেষ্ঠগুণ লইয়া যিনি সাহিত্যের আসরে অবতীর্ণ হন, তাঁহার জয় নিশ্চিত, বস্তুতঃ হইয়াছেও তাহাই। তাঁহার প্রভাব বাঙ্গালা সাহিত্যে এতই বিস্তৃত হইয়াছে যে, তাঁহার লেখা বাদ দিলে বাঙ্গালা সাহিত্য যেন আন্ধার হইয়া যায়! বলিতে কি, তাঁহার শিষ্যপ্রশিষ্য স্থানীয় সমস্তগুলি লেখক এ পর্যান্ত যাহা লিখিয়াছেন, সেগুলি ষোল আনা একত্র করিলে তাঁহার লেখার ষোল কলার এক কলাও হয় কি না সন্দেহ।

সত্য বটে, তাঁহার কাব্যে, উপন্যাসে, ভূরি ভূরি দোষ আছে; সমগ্র দোষ-গুণের ইজা টানিলে হয় ত বঙ্কিম ভারতে দ্বিতীয় শ্রেণীর উচ্চতম স্তরের বিন্দুমাত্রও উপরে উঠেন নাই; তথাপি তিনি বাঙ্গালা ভাষার শ্রেষ্ঠ কবি, শ্রেষ্ঠ সাহিত্যিক এবং অনন্যসাধারণ গুণসম্পন্ন লেখক। ভারতীয় সাহিত্যগগণের ধ্রুব নক্ষত্র কালিদাসের শকুন্তলা, শ্রীহর্ষের রত্নাবলী, ভবভূতির মালতীমাধব ও উত্তরচরিত প্রভৃতি কাব্যনাট্যের সঙ্গে তুলনায় বঙ্কিমের কাব্যগুলি মধ্যবিত্ত বস্তু, এবং কতকটা তরলহৃদয় নির্ব্বিচার যুবকযুবতীগণেরই প্রধানতঃ ভোগ্য বলিয়া মনে হয়; কিন্তু তাঁহার সর্ব্বতোমুখী প্রতিভার গুণে তাঁহার এই অংশেরও যেন কতকটা ক্ষতিপূরণ হইয়াছে। এই সর্ব্বতোমুখী প্রতিভার উপরই প্রকৃত প্রস্তাবে তাঁহার প্রভাব প্রতিষ্ঠিত। বঙ্কিম কেবল কবি হইলে সম্ভবতঃ তাঁহার এত প্রভাব বিস্তৃত হইত না। তিনি কবিত্ব অংশ অপেক্ষা বরং ধর্ম্মনীতি, সমাজনীতি, রাজনীতি প্রভৃতি অংশেই অধিকতর লব্ধপ্রতিষ্ঠ। যাঁহারা সমগ্র জগতের দশ বিশ জন কবির অন্তর্ভুক্ত, ভারতের সেই কালিদাস প্রভৃতি লেখক নাট্যকাব্য সাহিত্য ছাড়া অন্য সাহিত্যে হস্তার্পণ করেন নাই, এবং অন্যান্য কোন বিষয়ের জন্য প্রসিদ্ধি লাভও করেন নাই। কিন্তু বঙ্কিম কাব্যাংশে অপেক্ষাকৃত নিম্নবর্ত্তী হইলেও অন্যান্য বহু বিষয়ে অপেক্ষাকৃত শ্রেষ্ঠ স্থান অধিকার করিয়াছেন।

ভারতীয় প্রাচীন কাব্য-সমালোচক (আলঙ্কারিক);দিগের প্রতিষ্ঠিত নিয়মানুসারে নিরেট কাব্যে রাজনীতি, ধর্ম্মনীতি, সমাজনীতি শিক্ষার দোকান খুলিবার নিয়ম নাই। নিরেট কবি কাব্যরাজ্যের বাহিরের সংবাদ অল্পই রাখেন! দশরূপের কারিকায় লিখিত আছে:—

আনন্দ নিষ্যন্দিষু রূপকেষু ব্যুৎপত্তিমাত্রং ফলমল্পবুদ্ধিঃ
যোপীতিহাসাদিবদাহ সাধুস্তস্মৈ নমঃ স্বাদু-পরাঙ্মুখায়।

একমাত্র আনন্দের মধুধারা প্রবাহিত করিবার জন্যই কাব্যনাট্য উপনিবদ্ধ হয়। যে সকল অল্পবুদ্ধি লোক মনে করেন, কাব্যনাট্য ইতিহাসাদিবৎ ধর্ম্ম, অর্থ, কামাদি বিষয়ক নীতি শিক্ষার জন্য রচিত হইতে পারে, সেই সকল মাধুর্য্যপরাঙ্মুখ লোকদিগকে নমস্কার !!

কাব্যপ্রকাশ প্রভৃতি পুস্তকে এই নীতির পর্য্যাপ্ত সমর্থন আছে ; এখন ইয়ুরোপীয় কাব্যবিচারেও এই নীতিই স্বতঃরূপে গৃহীত হইতে চলিয়াছে। কালিদাসাদি মহাকবিগণের শাকুন্তল প্রভৃতি নাট্যকাব্য এই নীতি অনুসারে লিখিত। সেই সেই কাব্যনাট্য পাঠ করিলে স্পষ্ট প্রতীয়মান হয়, ধর্ম্ম ও অর্থাদি শিক্ষার দোকান খোলা ঐ সকল গ্রন্থের উদ্দেশ্য ছিল না। ঐ সকল গ্রন্থের রচয়িতৃগণ সেই সেই কাব্যনাট্যের বস্তু (ইতিহাস) অবলম্বনে বস্তুর বিভিন্ন অংশ এমন ভাবে স্পর্শ ও সজ্জিত করিয়াছিলেন, যাহাতে বস্তুর অঙ্গ হইতে অযত্নে রসপ্রবাহ নিষ্যন্দিত হইয়া পড়িয়াছে। ধনিক ধনঞ্জয় প্রভৃতির মতে যে কবি এই ভাবে রসনির্ব্বাহ করিতে না পারেন, তাঁহার বর্ণ্যমান বস্তু (ইতিবৃত্ত) কাব্যনাট্য-পদবীতে আরোহণ করিতে পারে না। যে সকল কবির অভ্যাস এইরূপ রসনির্ব্বাহকতায় দৃঢ়মূল হইয়া যায়, তাঁহাদের কাব্যনাট্যে রাজনীতি ধর্ম্মনীতি প্রভৃতির দোকান খোলা থাকে না। কাব্যপ্রকাশের একজন প্রসিদ্ধ টীকাকার লিখিয়াছেন, কেবল মাত্র কবিত্ব দ্বারাই জগতে যে কবির পরিচয়, তিনিই প্রকৃত কবি। তিনি দৃষ্টান্ত স্থলে কালিদাসের নাম উল্লেখ করিয়া দেখাইয়াছেন, কালিদাসের বংশ, গোত্র, কুল, দেশাদির কোন পরিচয় নাই ; তিনি ব্যাসাদির ন্যায় তপস্বী, অথবা প্রাতিস্বিক দৃষ্টিসম্পন্ন বলিয়াও কোন প্রসিদ্ধি নাই ! তিনি কেবলই কবি ছিলেন, এই জন্যই তিনি সরস্বতীর বরপুত্র।

বঙ্কিম বাবুর কাব্যরীতি ঠিক এইরূপ নহে ; তাঁহার শ্রেষ্ঠ কাব্য বিষবৃক্ষে পর্য্যন্ত শিক্ষাদানের ইচ্ছা দেখা যায়। বস্তুতঃ বঙ্কিমের প্রতিভা এককেন্দ্রে সংরুদ্ধ ছিল না। ইহাতে তাঁহার দোষ ও গুণ উভয়ই প্রকাশ পাইয়াছে। শেষ অবস্থায় বঙ্কিম ধর্ম্মশিক্ষা, রাজনীতি-শিক্ষা প্রভৃতি ব্যাপারে এতই আকৃষ্ট হইয়াছিলেন যে, তাঁহার অনেকগুলি উপন্যাসকাব্যই কাব্যত্বের উচ্চ-ভূমিকা ছাড়িয়া নিম্নে অবরোহণ করিতে বাধ্য হইয়াছিল। তাঁহার কোন কোন সমালোচক লিখিয়াছেন, বঙ্কিমের মৃত্যুর পূর্ব্বে হইতেই তাঁহার উপ-ন্যাসের মৃত্যু হইয়াছিল।" শিক্ষাদানে যাঁহার মনের এত আকর্ষণ

তাঁহার পক্ষে নিভৃত বৈকুণ্ঠসম কবিকুঞ্জে নিয়তধ্যাননিষ্ঠ হইয়া বসিয়া থাকা শোভা পায় না। কাজেই বঙ্কিম রাজনীতি ধর্ম্মনীতি প্রভৃতি বিবিধ বিষয়ে প্রতিভা প্রদর্শনে ব্যাপৃত হইয়াছিলেন। এই প্রবন্ধে আমরা বঙ্কিমকে রাজনীতির শিক্ষক স্বরূপেই পর্য্যালোচনা করিব। মনে হয়, রাজনীতিই তাঁহার জীবনের মুখ্য রস ছিল, অন্যান্য বিষয়ক অনুরাগ মুখ্যরসের আনুষঙ্গিক ভাব ছিল বলিলেও বড় দোষ হয় না।

বঙ্কিম বাবুর রাজনীতি।

বঙ্কিম বাবু রাজনীতি সম্বন্ধে প্রকাশ্যরূপে স্পষ্টভাবে সেরূপ কিছু না লিখিলেও তিনি যে একটা রাজনীতিকতার ভাব পোষণ করিতেন তাহা সকলেই অবগত আছেন। তাঁহার রাজনীতি যেরূপই হউক না কেন, তিনি সেই নীতি অনুসারে বাঙ্গালীজাতির এক অংশ চালাইতে ইচ্ছা করিয়াছিলেন। তিনি স্বকীয় নীতি প্রয়োগ করিবার জন্য একটা কার্য্য-বিধিও খাড়া করিয়াছিলেন। তাঁহার আনন্দমঠ, দেবী চৌধুরাণী, সীতারাম এই প্রবন্ধের সাক্ষী।

এই সকল গ্রন্থে কিরূপ কার্য্য-বিধি প্রদর্শিত হইয়াছে, সে সম্বন্ধে বিস্তৃত আলোচনা করা অনাবশ্যক। চক্ষুষ্মান্ লোকমাত্রেই তাহা দেখিতেছেন ও বুঝিয়াছেন।

যদি তাঁহার রাজনীতির সূত্র ও এই কার্য্য-বিধি পরিশুদ্ধ হইয়া থাকে, তবে উহা সম্প্রতি দেশের যত অনিষ্টকর ও অশান্তিজনক হউক না কেন, পরিণাম বিবেচনায় বঙ্কিমকে দোষ দেওয়া যায় না। কিন্তু যদি তাঁহার নীতি এবং কার্য্য-বিধি সত্যনীতি ও সত্যভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত না হইয়া থাকে, তবে তিনি স্বোদ্ভাবিত নীতি ও কার্য্য-বিধির জন্য জনসাধারণের নিকট দায়ী সন্দেহ নাই। কার্য্য-বিধি দ্বারা তাঁহার যে নীতি ধরা পড়িতেছে, সেই নীতি সম্বন্ধেই প্রথমতঃ একটু আলোচনা করিয়া লইব।

অনেকের বিশ্বাস, পরাধীন দেশের রাজনীতি নাই। এই কথা প্রকৃত বলিয়া বোধ হয় না। কারণ, (১) যদি রাজনীতি শব্দে পরাধীন দেশ কর্ত্তৃক স্বাধীনতা লাভের উপায় নির্দ্ধারণ বুঝিতে হয়, তবে পরাধীন দেশের রাজনীতি অবশ্যই আছে; যাঁহারা স্বাধীনতা ও পরাধীনতার প্রভেদ উপলব্ধি করিতে সমর্থ, তাঁহারা পরাধীন থাকাবস্থায় স্বাধীনতা লাভের চেষ্টা

অবশ্যই কোন না কোনরূপে করিবেন। রাজনীতি শব্দের উক্ত ব্যাখ্যা অনুসারে পরাধীন দেশের রাজনীতি আছে। (২) রাজনীতি শব্দে যদি মিলিত রাজা-প্রজার পক্ষে প্রজাসাধারণের সুখসমৃদ্ধিবর্দ্ধনের উপায় নির্দ্ধারণ বুঝায়, তবে ত পরাধীন দেশের রাজনীতি আছেই। (৩) রাজনীতি শব্দে যদি প্রজা সাধারণ কর্ত্তৃক প্রয়োজন অনুসারে রাজশক্তিতে বাধা দেওয়ার অধিকার বুঝাইতে হয়, তবে নিশ্চয়ই পরাধীন জাতির রাজনীতি নাই।

বঙ্কিমের কার্য্য-বিধি-দ্বারা বুঝা যায়, তিনি পরাধীন জাতির রাজনীতি থাকা অনিবার্য্য মনে করিতেন এবং আমরা উপরে রাজনীতি যে তিন অর্থে গ্রহণ করিয়াছি, তন্মধ্যে প্রথম অর্থেই বঙ্কিম রাজনীতি বুঝিতেন। তাঁহার কার্য্য-বিধি এই প্রথম ব্যাখ্যারই অনুকূল। বুঝা যায়, তাঁহার মতে স্বাধীনতা লাভের জন্য যত্ন করাই মূল রাজনীতি—পরাধীন জাতির মুখ্য রাজনীতি। তাঁহার মতে এই প্রকার নীতিশীল প্রজাবৃন্দের পক্ষে যে প্রণালীতে কার্য্যক্ষেত্রে অবতীর্ণ হওয়া উচিত, তাহাই যেন তিনি আনন্দমঠাদি পুস্তকে দেখাইয়াছেন। যে শ্রেণীর লোক আনন্দমঠীয় কার্য্য প্রণালী প্রকাশ্যে গ্রহণ করিয়াছেন, তাঁহারা বঙ্কিমের নীতিসূত্র ও প্রয়োগসূত্র এইরূপ বলিয়াই নিঃসন্দেহ বুঝিয়াছেন। সন্তানভাবের দেশহিতৈষী ব্যক্তিগণ বঙ্কিমের রাজনীতি ও কার্য্যবিধি এইরূপ বলিয়াই বুঝিয়াছেন, এবং তাঁহারা তাঁহাকে শুদ্ধরূপে বুঝিয়াছেন বলিয়াই আমাদের ধারণা।

দেশের বর্ত্তমান রাজনীতিক্ষেত্র পরীক্ষা করিলে বহুতর রাজনৈতিকের ভাব ও আচরণের সঙ্গেই এই ব্যাখ্যার ঐক্য দেখা যায়। যাঁহাদিকে 'গরম দল' বলা হয়, তাঁহারা এই বিষয়ে খুব স্পষ্টবাদী। বঙ্গবিভাগের অছিলা ধরিয়া লোকে যে ভাবের রাজনীতি দেশে প্রচলিত করিয়া উঠাইয়াছিলেন, তাহার মোল আনাই যেন স্বাধীনতাবাদ প্রচার বলিয়া বোধ হয়। তবে মনে হয়, কার্য্যের সুবিধার জন্য একই স্বাধীনতাবাদী রাজনৈতিক সম্প্রদায় দুইভাগে বিভক্ত হইয়া গরম ও নরম নাম গ্রহণ করিয়াছিলেন। গরম দল পূর্ণ স্বাধীনতা চাহেন। নরম দল ঔপনিবেশিক প্রণালীর স্বাধীনতা চাহেন। উভয় সম্প্রদায়েরই মূল লক্ষ্য এক। ইংরেজের তরবার ভয়ে পূর্ণ স্বাধীনতার কথা এখন কণ্ঠ হইতে নিঃসৃত হয় না, কিন্তু শরীর কম্পিত হইতে থাকিলেও নরম দল মুখে এখনও ঔপনিবেশিক স্বাধীনতার কথা বলিতে বিস্মৃত হন না।

ভয়ের কারণ না থাকিলে উভয় সম্প্রদায়ই প্রকাশ্যে স্বাধীনতার কথা বলিতেন বলিয়া মনে হয়। নরম এবং গরম সম্প্রদায় মধ্যে যে ভাবের সম্বন্ধ, তাহা লর্ড মিণ্টোর বিখ্যাত সার্কুলারে বিশদভাবে ব্যাখ্যাত হইয়াছে। কাজেই বঙ্গ-বিভাগের অছিলায় যে রাজনৈতিক আন্দোলন প্রবর্ত্তিত হইয়াছিল তাহার সঙ্গে বঙ্কিমনীতির ঐক্য আছে।

বঙ্গের বর্ত্তমান রাজনৈতিকগণ বঙ্কিমকৃত আনন্দমঠের বীজমন্ত্র "বন্দে মাতরম্" ধ্বনিত করিয়াই প্রত্যেক কার্য্যে প্রবৃত্ত হইয়া থাকেন। তাঁহার কার্য্য-বিধি এক শ্রেণির লোক অবিকল গ্রহণও করিয়াছেন। তাহার সঙ্গে প্রচলিত রাজনৈতিকতার সম্বন্ধ বুঝিতে কোন ক্লেশই হইবার কথা নাই।

মহাজাতির কথা।

আজকাল অনেক রাজনৈতিকের মুখে শুনা যায়, একটা বাঙ্গালী জাতি বা ভারতীয় জাতি গঠন করিতে না পারিলে কোন প্রকারের রাজনৈতিকতা সফল হইবার উপায় নাই। ভারতবর্ষ দূর হউক, অন্ততঃ বাঙ্গালার আটকোটি মানব একটা দৃঢ়-বদ্ধ-জাতিরূপে খাড়া না হইলে, রাজনৈতিকতা কোন ফলই উৎপাদন করিতে পারিবে না। ঠেকিয়াই হউক, আর যেরূপেই হউক, বাঙ্গালীর রাজনৈতিকক্ষেত্রে এই ধারণার আভাস জন্মিয়াছে বলিয়া বোধ হয়। * কোন দেশের লোকসমষ্টি দৃঢ় দল-বদ্ধ একটা জাতিরূপে পরিণত না হইতে পারিলে জগৎ সমক্ষে—দণ্ডায়মান হইতে পারে না, মনুষ্য বলিয়া গণ্য হইবার যোগ্য হয় না, কোন বৃহৎ বা মহৎ কার্য্য সম্পাদন করিতে পারে না, এই কথা সত্য। যে দেশের মানবমণ্ডলী মধ্যে স্বল্পসংখ্যক লোক অ'শিষ্ট মানব মণ্ডলীর স্কন্ধে দাঁড়াইয়া সকলের পরিশ্রমের সার নবনীত ভক্ষণে নিয়ত লোলুপ থাকে, সে দেশের মনুষ্যসমষ্টি কথনই মহজাতিরূপে দাঁড়াইতে পারে না। ইহা ধ্রুব সত্য হইলেও বাঙ্গালা দেশে এই সত্য ধারণা এখনও জন্মে নাই। বাঙ্গালা দেশেরই বা দোষ কি? ভারতবর্ষে, অথবা ভারতবর্ষের কোন একটা জনপদেও এই রীতিতে কখনও জাতি গঠিত হওয়ার ধারণা যে ছিল সেরূপ মনে হয় না। ভারতবর্ষের বিভিন্ন জনপদের জাতি ছিল ও আছে; ব্রাহ্মণ, অম্বষ্ঠ, মাহিষ্য, উগ্র, আভীর, জাঠ প্রভৃতি। এই সকল ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র জাতি এই

* পরে বুঝাইব; বঙ্কিমের নীতি ও কার্য্যবিধি নিষ্ফল হওয়ার পরে কতিপয় রাজনৈতিক এই সুরে কথা বলিতেছেন।

ভাবের জাতীয়তা দ্বারাই পূর্ব্বযুগে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র শক্তি গঠন করিয়াছিল। তখনকার লোকে যদি বুঝিত, ভবিষ্যতে ইহা অপেক্ষা প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড জাতি সমূহ পৃথিবীতে গঠিত হইবে, এবং তাঁহাদের চপেটাঘাতে এই আকারের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র তথাকথিত জাতি সকল ভূতলশায়ী হইবে, তবে সে কালের লোক কখনও ঐরূপ ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র জাতি পত্তনের পন্থা দেখাইতেন না। দেখ দেখি, এখনকার জাতি! এক একটা দেশের সমগ্র লোক-সমষ্টি লইয়া এক একটা জাতি!! চাহিয়া দেখ, আমাদের ভূতপূর্ব্ব প্রভু মুসলমানই কম কি? আমাদের বর্ত্তমান প্রভু ইংরেজ এক জাতি, ফরাসী এক জাতি, রুষ এক জাতি, জাপান এক জাতি, এমেরিকার যুক্তরাজ্যবাসী এক জাতি, জার্ম্মেন এক জাতি! ইঁহাদের এক একটী জাতির মহিমা দর্শন করিলে আমাদের সহস্রধা বিভক্ত ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র জাতিগুলি জাতি নামের যোগ্য বলিয়াই গণ্য হইতে পারে না! ঐ সকল মহাজাতির সমক্ষে আবার মাথা উঠাইবেন ভারতবর্ষের এই সকল নগণ্য জাতি? ঐ সকল মহাজাতির ভাব যে পর্য্যন্ত বাঙ্গালীর বা ভারতবাসীর মনে না বসিবে, তাবৎকাল ভারতবাসী লোক কখনই আত্মোন্নতি লাভের যোগ্য হইবে না, ইহা অভ্রান্ত সত্য। কিন্তু দেশের রাজনৈতিকবর্গ কি এখনও প্রকৃত প্রস্তাবে এই ধারণা করিতে সমর্থ হইয়াছেন? যদি বর্ত্তমানের সুশিক্ষিত, সর্ব্বনীতি-নিষ্ণাত বাঙ্গালীই সেই ধারণায় অসমর্থ বলিয়া গণ্য হন, তবে অর্দ্ধশতাব্দী পূর্ব্বে যাঁহাদের শিক্ষা পরিসমাপ্ত ও জীবন গঠিত হইয়াছিল, সেইরূপ বঙ্কিম প্রভৃতি মনস্বী লোক পূর্ব্বের জাতিগত ক্ষুদ্র সংস্কার ও মমতা কিরূপে এড়াইবেন? প্রকৃত কথা এইঃ—বঙ্কিম শত নীতিমান্ হউন, এইরূপ মহাজাতির ভাব তিনি হৃদয়ঙ্গম করিতে পারেন নাই। যেমন বঙ্কিম তেমনই তাঁহার নীতির অনুসরণকারী এক শ্রেণির হিন্দুও কার্য্যতঃ মহাজাতি গঠনের পক্ষপাতী নহেন। ইঁহারা সেই ক্ষুদ্র জাতির সংস্কার বক্ষে লইয়াই মহাজাতির ধারাণায় মুখে বড় বড় কথা কিছু কিছু অভ্যাস করিতেছেন মাত্র।

যাঁহাদের কথা ও কার্য্য দ্বারা বঙ্কিমের রাজনীতি ব্যাখ্যা করিতে হইতেছে, তাঁহাদের রচিত সাহিত্য ও তাঁহাদের আচরণ দ্বারা দেখাইতে পারিব, তাঁহারা মুখে যাহাই বলুন, তাঁহাদের কার্য্য ঐরূপ প্রকাণ্ড জাতি গঠনের অনুকূল নহে; তাঁহাদের সমস্ত আচরণই ক্ষুদ্র জাতিত্বে প্রতিষ্ঠিত। একটু আলোচনা করিলেই দেখা যাইবে আমাদের কথা প্রকৃত কিনা।

বঙ্কিম বাবু যে এই প্রকাণ্ড জাতি ধারণা করিতে সমর্থ ছিলেন না,

অন্ততঃ ভালরূপে ধারণা করিতেন না, তাহা তাঁহার নীতির প্রশংসাকারী লোকের মধ্যেই কেহ কেহ স্পষ্ট স্বীকার করিতে বাধ্য হইতেছেন। বিগত আষাঢ়ের নব্যভারতে বঙ্কিমের পক্ষসমর্থক একজন লেখক লিখিয়াছেন :—

"চতুর্থ অভিযোগ—বঙ্কিমের ব্যক্তিগত চরিত্র বেশ ফুটিয়াছে, কিন্তু যেখানে মানুষের সমষ্টি লইয়া বর্ণনা করিয়াছেন সেই খানেই অকৃতকার্য্য হইয়াছেন।

"এ সম্বন্ধে কবি রবীন্দ্রনাথ বলিয়াছেন—যখন বঙ্কিম বাবুর আনন্দমঠ প্রথম প্রকাশিত হয়, তখন চন্দ্রনাথ বসু তৎসম্বন্ধে আমার মত জানিতে চাহিয়াছিলেন। আমিও এক বিস্তৃত সমালোচনা করিয়া পাঠাইয়া ছিলাম……বঙ্কিম বাবু যেখানে ব্যক্তিগত চরিত্র ফুটাইয়া তুলিতে চেষ্টা করিয়াছেন, সেখানে চমৎকার কৃতকার্য্য হইয়াছেন,……কিন্তু যেখানেই মানুষের সমষ্টি লইয়া নাড়াচাড়া করিয়াছেন সেখানেই একটা পিণ্ডবৎ তাল পাকাইয়া গিয়াছেন……দেবীচৌধুরাণীতেও এই দোষ আছে।"

"উপরে রবীন্দ্রনাথের যে মত উদ্ধৃত হইল, তাহা অনেকাংশই সত্য বলিয়া মনে হয়।" (১৩৮—১৩৯ পৃঃ)

আমরা যেরূপ **সমষ্টির** কথা বলিতেছি, উদ্ধৃত সমালোচনা ঠিক সেইরূপ সমষ্টি বিষয়ক নহে; উহা ক্ষুদ্র সমষ্টি বিষয়ক। আমরা যে ব্যাপক সমষ্টির কথা বলিতেছি, তাহা এই সকল সমালোচকের চিন্তার বিষয়ীভূত হইয়াছিল বলিয়া মনে হয় না। ইঁহারা বলিতেছেন, বঙ্কিম যে রূপ সমষ্টি লইয়া কার্য্য করার কল্পনা করিয়াছিলেন, সেই সমষ্টিই চিত্রিত করিতে পারেন নাই; কিন্তু আমরা বলিতেছি, বঙ্কিম যে সমষ্টি কল্পনা করিয়াছিলেন, সে সমষ্টি প্রকৃত সমষ্টি নহে; সমষ্টির নগণ্য ক্ষুদ্রাংশ। যিনি তাহাই চিত্রিত করিতে সমর্থ হন নাই, তিনি মহাসমষ্টি ধারণা করিবেন কিরূপে?

অবশ্য সমষ্টি সম্বন্ধে ধারণা দুর্ব্বল না হইলে সমষ্টির কার্য্যবিধি চিত্রণে বঙ্কিমের এত দোষ হইতে পারিত না। আনন্দমঠাদি পুস্তকে বঙ্কিম যে সমষ্টির চিত্র প্রদর্শনে শক্তিহীনতা দেখাইয়াছেন বলিয়া এক শ্রেণির স্বদেশী নেতা আজ স্পষ্ট স্বীকার করিতেছেন, সেই সমষ্টিও প্রকৃত সমষ্টি নহে; প্রকাণ্ড সমষ্টির অংশগত সমষ্টি মাত্র। এইরূপ সমষ্টিকেই ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র জাতিরূপে নির্দ্দেশ করা হয়। ইহার প্রমাণ দিতে হইলে বহুতর কথা উল্লেখ করিতে হয়। এই ক্ষুদ্র প্রবন্ধে স্থান না থাকিলেও উহার দৃষ্টান্তস্বরূপ মোটামোটি ভাবে কয়েকটী কথা বলা যাইতে পারে।

বঙ্কিম বাবুর কোন চিত্রে, কোন গ্রন্থে, সাবয়ব বিরাট বাঙ্গালী জাতি চিত্রিত হয় নাই। ব্রাহ্মণ হইতে চণ্ডাল পর্য্যন্ত বিবিধ হিন্দু জাতির ও সম্প্রদায়ের সমবেত চিত্র অথবা সমবায়-জনিত কোন একটা শ্লাঘার ভাব তাঁহার কোন পুস্তকেই নাই, বরং তাঁহার লিখায় কতিপয় হিন্দু জাতি সম্বন্ধে এমন ভাবের মন্তব্য পাওয়া যায়—যাহাতে তাঁহার হৃদয় সমষ্টি-প্রীতি-বিশিষ্ট না হইয়া একদেশ-প্রীতি-কলঙ্কিত বলিয়াই বোধ হয়। ইত্যাকার হৃদয়ে সমষ্টি বিষয়ক ধারণা থাকা সম্ভবপর নহে। ইয়ুরোপীয় সভ্যতার মহাজাতিগত ভাব ইদানীন্তন বাঙ্গালীদের মধ্যে কিছু প্রবেশ করিয়াছে বলিয়া মনে করা যায়; কিন্তু বাঙ্গালার নবযুগের মূল "কীর্ত্তনীয়া" বঙ্কিমে সে ধারণা দেখা যায় না।

বঙ্কিম কতকগুলি জাতি মুছিয়া ফেলিয়াছেন।

বঙ্কিমের কাব্যে বাঙ্গালী সমষ্টি মধ্যে মাত্র দুইটি খণ্ড জাতির অস্তিত্ব দেখা যায়। যথা—পুরোহিত ও লেখক শ্রেণী। তাঁহার সাহিত্য পাঠে কাহারও মনে হইবার উপায় নাই যে, এই দুইটি শ্রেণী ছাড়া বাঙ্গালায় অন্য কোন শ্রেণী, জাতি, সম্প্রদায় ছিল বা আছে। প্রকৃত প্রস্তাবে অন্য কোন জাতির প্রতি তাঁহার শ্রদ্ধা, প্রীতি, নির্ভর কিছুই ছিল না! থাকিলে বঙ্কিমের সুন্দর ও পরিষ্কৃত রচনায় তাহা ফুটিয়া সাধারণের দৃষ্টিগোচর হইত।

বঙ্কিম প্রথম অবস্থায় নিজ কাব্যে রাজপুত জাতীয় নায়ক নায়িকা অবতারণা করিতেন। কিন্তু শেষে সেরূপ করা স্বকীয় নীতির প্রতিকূল কার্য্য বলিয়া নিঃসন্দেহ স্থির করিয়াছিলেন। তিনি বুঝিয়াছিলেন, রাজপুত জাতীয় বীরের কার্য্য দেখিয়া বাঙ্গালী জাতি বৃহৎ কার্য্যে হস্ত দিতে সাহস করিবে না। তাহারা মনে করিবে, ঐরূপ সাহস ও তেজ বীর্য্যের কার্য্য বাঙ্গালীর জন্য অভিপ্রেত নহে। সম্ভবতঃ ইহা মনে করিয়াই তিনি জগৎ-সিংহাদি স্থানে বাঙ্গালী হিন্দুজাতির শ্রেণী বিশেষ হইতে নায়ক নায়িকা নির্ব্বাচিত করিতে লাগিলেন। কেন না এই শ্রেণীর অধিকাংশ লোক বাঙ্গালায় ইংরাজী ভাবে শিক্ষিত হইয়াছে। এই নূতন নীতি গ্রহণের ফলেই ঐরূপ শ্রেণীর নায়ক নায়িকায় এখন বাঙ্গালা সাহিত্য পরিপূর্ণ হইতেছে। এইরূপ সাহিত্যের ফলেই বোধ হয়, ঐ শ্রেণীর বাঙ্গালীরই সাড়াশব্দ এখন পাওয়া যাইতেছে।

বাঙ্গালী ব্রাহ্মণের উপর বঙ্কিমের বিশেষ শ্রদ্ধা বা নির্ভর কখনও ছিল না।

ব্রাহ্মণ শ্রেণীর পাত্রগণ উপরোক্ত জাতীয় পাত্রগুলির একটা উপসর্গ বলিয়াই তাঁহার সাহিত্যে প্রতীয়মান হয়। এক সময়ে সমগ্র বাঙ্গালা যাঁহাদের পদভরে কম্পিত হইত, সেই চাষী কৈবর্ত্ত (মাহিষ্য), উগ্রক্ষত্রিয়, আভীর, মল্ল, খ্যান প্রভৃতি বলবীর্য্য সম্পন্ন বাঙ্গালী সম্প্রদায়গুলির অস্তিত্ব থাকাও বঙ্কিম-কাব্য দ্বারা প্রমাণ করিবার কোন উপায় নাই। তিনি যে সকল স্থানে ভিন্ন দেশীয় মানসিংহ, জগৎসিংহ, কতলু খাঁ প্রভৃতির লীলাভূমি স্থাপন করিয়াছিলেন, ঠিক সেই সকল স্থানেই তমলুক, ময়না গড়, কর্ণগড়, হিজলীগড়, বনবিষ্ণুপুর গড়, অজয়গড় প্রভৃতি দুর্গ এখনও বর্ত্তমান আছে, এবং ঐ সকল দুর্গের কতিপয়ে সেই সেই সম্প্রদায়ের নৃপতিবর্গের সন্তান সন্ততি এখন পর্য্যন্ত বর্ত্তমান আছে; কিন্তু বঙ্কিম সেই সকল বংশীয়, সেই সকল জাতীয়, লোকদের বীর্য্য কাহিনীর, এমন কি অস্তিত্বের, ঈঙ্গিত পর্য্যন্ত করেন নাই!! তিনি ইচ্ছা করিলে মাহিষ্য, মল্ল, গোপবংশীয় নৃপতি ও সন্তানবর্গের অবদানপরম্পরা অবলম্বনে উৎকৃষ্ট উৎকৃষ্ট উপন্যাস লিখিতে পারিতেন,—ঐ সকল দেশ যে এই সকল বাঙ্গালী রাজন্য-মণ্ডলের লীলাভূমি, বঙ্গের রাজপুতনা, তাহা অবলীলাক্রমে চিত্রিত করিতে পারিতেন। তাহাতে বাঙ্গালীর অতীত চরিত্র কিরূপ উজ্জ্বল ও সমুন্নত ছিল তাহা দেখাইতে পারিতেন।

এই সকল জাতীয় নৃপতিবর্গের ইতিহাস গবেষণায় ক্রমশঃ ফুটিয়া বাহির হইতেছে। ঐতিহাসকগণ বিস্পষ্টরূপে দেখাইতেছেন, সমগ্র বর্দ্ধমান বিভাগ তিনটী স্বাধীন জাতির অধিকারভুক্ত ছিল; যথা, চাষী-কৈবর্ত্ত (মাহিষ্য), মল্ল এবং গোপ। ৺বটব্যাল মহাশয় রাঢ়দেশ সম্বন্ধে লিখিয়াছিলেন, রাঢ় লাঢ়, লাট শব্দ গোয়ালা জাতির নামের অপভ্রংশ। যে অংশ রাঢ় বলিয়া খ্যাত তাহা এই গোপ জাতির মৌলিক রাজ্য; যে অংশ বনবিষ্ণুপুরের রাজ্যভুক্ত তাহা প্রাচীন মল্ল রাজ্য; যে অংশের মূল কেন্দ্র তাম্রলিপ্ত সেই অংশ মাহিষ্য জাতির রাজ্য। তমলুক ময়নাগড়ের জগন্নাথ ভুঞা প্রভৃতি, বনবিষ্ণুপুরের রঘুনাথ ও বীর হাম্বির প্রভৃতি এবং রাঢ়েশ্বর ইচ্ছাই ঘোষ প্রভৃতি রাজগণের অবদান-বৃত্তান্তে কত উপন্যাস পূর্ণ হইতে পারে! অভাব—উপযুক্ত কবির, সহৃদয় উপন্যাসিকের, বিজ্ঞ ঐতিহাসিকের। এই সকল জাতীয় রাজন্যবৃন্দের অবদানের অভাব নাই। এই সকল বৃত্তান্ত বঙ্কিম জানিতেন না, এরূপ কল্পনা করা সঙ্গত নহে। তিনি অবশ্যই এই সকল শ্রেণীর ইতিহাস ও বিক্রম জানিতেন; কিন্তু বোধ হয় ইঁহাদের পরাক্রম বর্ণনা দ্বারা ইঁহাদের তেজ

সঙ্কুচিত করা, ইহাদিগকে আবার জাগ্রত করিয়া দেওয়া, তাঁহার সমাজনীতি ও রাজনীতির অনুকূল কার্য্য ছিল না। যদি তাঁহার কুনীতি এই ভাবেরই হইয়া থাকে, তবে তিনি যে উৎকট রাগদ্বেষ লইয়া আসরে নামিয়া ছিলেন তাহাতে সন্দেহ নাই। সেরূপ অবস্থায় তিনি বাঙ্গালী জাতির সমষ্টি ধারণা করিবার অযোগ্য ছিলেন, এরূপ বলিতে কোন বাধাই নাই।

বর্ণিত আভীর, মল্ল, মাহিষ্য প্রভৃতি জাতি অবশ্য চাষাভূয়িষ্ঠ সম্প্রদায়। ইহাদের মধ্যে এক একটা প্রাচীন অভিজাত স্তর আছে সত্য, কিন্তু ইঁহারাও অশিক্ষিতকল্প। এইরূপ চাষাভূয়িষ্ঠ জাতি যত বীর হউক না কেন, যত ঐতিহাসিক গৌরবে গৌরবান্বিত থাকুক না কেন, শিক্ষিত মানবভূয়িষ্ঠ সভ্য যুগে তাহারা দাঁড়াইয়া কোন কার্য্য করিতে পারিবে এরূপ আশা বা ইচ্ছা বোধ হয় বঙ্কিমের ছিল না। কাজেই তাহাদিগকে নিগ্রহ করিয়া, চাপা দিয়া, পশ্চাৎভাগে রাখিয়া, নূতন সৃষ্টি করাই তিনি সঙ্গত মনে করিয়াছিলেন; বোধ হয় এই নীতি অনুসারেই বঙ্কিম নিজ কাব্যে তাঁহাদের কোন উল্লেখ বা অস্তিত্ব স্বীকার করেন নাই। ইহাতেই কৃতের নাশ, অকৃতের কল্পনা করা হইয়াছে। বঙ্কিমের এই নীতি শুদ্ধ হইয়া থাকিলে এইরূপ কৃতনাশ ও অকৃত কল্পনার জন্য বঙ্কিমকে দোষ দেওয়া যায় না। আর এইরূপ একটা হেতু কল্পনা না করিলে বলিতে হয়, বঙ্কিম ঘোর রাগদ্বেষের বশবর্ত্তী হইয়া বাঙ্গালী জাতির প্রধান প্রধান অবয়বই চাপা দিয়া গিয়াছেন, তাহাদিগের সমুজ্জ্বল ইতিহাস নিজ সাহিত্য হইতে মুছিয়া ফেলিয়াছেন!! বোধ হয়, এত ঘোর ফির না করিয়া বঙ্কিমের রাগদ্বেষ স্পষ্টভাবে স্বীকার করাই ভাল।

সত্য বটে, ব্রাহ্মণগণ যোদ্ধৃ জাতি নহেন; ইংরেজ লেখকগণ বাঙ্গালী ব্রাহ্মণকে মহাস্রষ্ট্রী এবং কাশ্মীরী ব্রাহ্মণের ন্যায় নীতিবিৎ এবং চরিত্রবিৎ বলিয়া প্রশংসা করেন না; কিন্তু তথাপি বলিতে হইবে, বাঙ্গালী ব্রাহ্মণের ব্রাহ্মণ বলিয়া যে একটা বিস্ময়জনক ঐতিহাসিকতার দাবী আছে তাহা ত সামান্য নহে। ভারতবর্ষ তল্লাস করিলে ব্রাহ্মণের সাম্রাজ্যের যথেষ্ট ইতিহাস পাওয়া যায়; তাহাদিগকে নেতা বা বাঙ্গালার প্রতিনিধি কল্পনা করা বরং ঐতিহাসিক হিসাবে সহনীয় হইতে পারে। ব্রাহ্মণ পরশুরাম সপ্তদ্বীপের সম্রাট্ হইয়া সমন্তপঞ্চকে সমগ্র পৃথিবীর সাম্রাজ্য কশ্যপকে দান করিয়া তপস্বী হওয়ার পৌরাণিক ইতিহাস আছে; কশ্যপ সেই সাম্রাজ্য ক্ষত্রিয়ের হস্তে ন্যাসরূপে রাখিয়া দেওয়ার ঐরূপ ইতিহাস আছে; ঋষিকুমার শৃঙ্গী

রাজা পরীক্ষিৎকে পর্য্যন্ত ব্রাহ্মণগণের দ্বারের পাহারাওয়ালা কুক্কুর বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছিলেন, তাহারও ইতিহাস আছে। এই সকল দূরগত ইতিহাসের প্রতিধ্বনি কর্ণে প্রবেশ করিয়া মাহিষ্যাদি অর্দ্ধঅশিক্ষিত বিক্রান্ত জাতিগুলিকে ব্রাহ্মণের এতটা ভক্ত করিয়া রাখিয়াছিল। বঙ্কিম ব্রাহ্মণদিগকেও নেতৃ বাঙ্গালী বলিয়া খাড়া করেন নাই। সুতরাং রাগাদ্বেষযুক্ত বঙ্কিম কল্পনা-রাজ্যের রাজনৈতিক মুনি খাড়া হইতে পারেন, কিন্তু রক্তমাংসঘটিত বাঙ্গালী জাতি সমষ্টির রাজনৈতিক মুনি বলিয়া গণ্য হইতে পারেন কিনা সন্দেহ। বিস্ময়ের কথা, যাঁহাদিগকে তিনি সর্গ, উপসর্গের প্রতিমূর্ত্তি খাড়া করিয়াছেন, সেই অংশ ব্যতিরেকে বাঙ্গালার বাকি আটকোটি লোক মধ্যে কেহই বঙ্কিমের রাজনৈতিক এই সকল সূত্র সত্য বলিয়া গ্রহণ করেন নাই, করিতে পারেন না এবং করিবেন না। কেন না, বঙ্কিমের নীতি বাঙ্গালী জাতির সমষ্টি বিষয়ক নহে, একাংশ বিষয়ক। বঙ্কিমের আনন্দমঠ একটা শিবমন্দির বা কালী মন্দির; উহা মস্‌জিদের ন্যায় নহে, বৌদ্ধমঠের ন্যায়ও নহে। উহার মন্ত্র বাঙ্গালায় পার্শিতে কি উর্দ্দূতে রচিত নহে, সংস্কৃতে। সন্তানগণ কেবল হিন্দু সম্প্রদায়ের দুই একটী জাতি বলিয়া বোধ হয়। উহাতে অন্যের প্রবেশাধিকার আছে বলিয়া বোধ হয় না। উহা সর্গ ও উপসর্গের রাজ্য। সে রাজ্যে বাকি কোটি কোটি হিন্দু মুসলমান নগণ্য প্রজা। এই সকল ভাব বিরাট বাঙ্গালী জাতি বিষয়ক ধারণার ত্রিসীমায় পর্য্যন্ত পঁহুছে নাই।

শিক্ষাপ্রাপ্ত লিপিকুশল সমাজ দ্বারাই কার্য্য সিদ্ধি হইবে; আভীর, মাহিষ্য, উগ্র, মল্লাদি সদৃশ কঠোরকর্কশ চাষাভূয়িষ্ঠ শ্রেণিগুলির দ্বারা কোন কার্য্য হইবে না, ইহা মনে করিয়া তাঁহাদিগকে স্বচিত্রিত বাঙ্গালীপট হইতে মুছিয়া ফেলা গুরুতর ভ্রম হইয়াছে।

ইতিহাস আলোচনা করিলেও দেখা যায়—রাজপুত, মহারাষ্ট্রা, জাঠ, খণ্ডাইত প্রভৃতি যে শ্রেণির মনুষ্য ভারতের বহুলাংশ এখনও অর্দ্ধস্বাধীন ভাবে শাসন করিতেছেন, তাঁহারাও ঐরূপ অশিক্ষিত, চাষাভূয়িষ্ঠ জাতি বা সম্প্রদায়। তাঁহারা লিপিকুশল জাতি নহেন। সেরিং সাহেব তদানীন্তন মূর্খ মহারাষ্ট্রা নেতৃগণকে লিখাপড়া শিখিবার জন্য অনুরোধ করা মাত্র, তাঁহারা বলিয়া উঠিয়াছিলেন—"ছি, ও সব কারকুণ (পাটোয়ারী) জাতির কার্য্য, উহা করিলে আমাদের জাতি যাবে!" (সেরিং)! বঙ্কিমের অভীপ্সিত শ্রেণির লোক ভারতের কোন অংশে কোন দিন বৃহৎ কার্য্য সাধন করিয়াছেন,

তাহার ইতিহাস এখন পর্য্যন্ত শত চেষ্টায়ও কেহ আবিষ্কার করিতে সমর্থ হন নাই।

ক্ষত্রলোপের পর ভারতে রাজত্বকারী জাতির কথা।

কলির ১০১৫ বৎসরান্তে ক্ষত্রিয় জাতির বিলোপ হইবার পরে ভারতবর্ষে যে সকল জাতি রাজ্যশাসনকারী হইয়াছিলেন, বায়ুপুরাণ, বিষ্ণুপুরাণ, ভাগবত ও মৎস্যপুরাণ প্রভৃতি গ্রন্থে তাহার এক একটা ফর্দ্দ আছে। উক্ত ফর্দ্দে বর্ণিত জাতিগুলি সকলেই ক্ষত্রিয়ের সঙ্কর, অনুসঙ্কর ও মহাসঙ্কর বলিয়া বর্ণিত। তৎকালে ভারতে রাজত্বকারী শ্রেণিগুলির যে ফর্দ্দ পুরাণে বর্ণিত আছে তন্মধ্যে নন্দগণ উগ্রক্ষত্রিয়, বিশ্বস্ফটিক নৃপতিগণ ক্ষত্রসঙ্কর কৈবর্ত্ত (মাহিষ্য), মৌর্য্যগণ উগ্র ও শূদ্র জাতির সঙ্কর, সেইরূপে কাণ্ব, আভীর, অন্ধ্র, অন্ধ্রভৃত্য ও গুপ্তগণ ক্ষত্র ও শূদ্র সঙ্কর জনিত সঙ্কর। হিন্দু জাতি মধ্যে এই সকল জাতিই ভারতের রাজা হইয়াছিলেন। নাগেশভট্ট এই প্রসঙ্গে মাহিষ্য মদ্রকদিগকে উল্লেখ করিয়া বর্ত্তমান রাজপুতগণ ঐ জাতির সঙ্করবিশেষ বলিয়া কটাক্ষ করিয়াছেন। এই মাহিষ্য-সাম্রাজ্যের বিপুল তরঙ্গ বাঙ্গালার ভিন্ন ভিন্ন অংশে কিরূপ প্রতিহত হইয়াছিল, তাহার চিহ্ন অদ্যাপি তাম্রলিপ্ত প্রভৃতি স্থানে, পাটকষ্কদ্বীপে, বরেন্দ্রভূমিতে, ভোগবেতালে, সাভারের কোণ্ডাগাঙ্কার গড়ে ক্রমশঃ গবেষণায় বাহির হইতেছে। এই সকল জাতির অবদানেই মহাপুরাণের এক একটি অধ্যায় পূর্ণ রহিয়াছে। চাষাভূয়িষ্ঠ অর্দ্ধশিক্ষিত আভীর, উগ্র ও মাহিষ্যাদি জাতিকে চাপা দেওয়ার রাজনীতি ও সমাজনীতি অতীব গর্হিত।*

উপন্যাস নাট্যশ্রেণির সাহিত্যেরই একটী অসম্পূর্ণ অবস্থামাত্র। ভারতের নাট্য-শাস্ত্রের নিয়মানুসারে ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় ও বৈশ্যজাতি কাব্যনাট্যের নায়ক নায়িকা হইতে অধিকারী, অন্যে নহেন। ১০১৫ কল্যব্দে বিশুদ্ধ ক্ষত্রিয় লোপ হইলেও উল্লিখিত সঙ্কর ও সঙ্করানুসঙ্কর নৃপতি জাতিগুলিকে ক্ষত্রিয় কল্পনা করিয়া তদানীন্তন পণ্ডিতগণ নাট্যকাব্যে ঐ সকল শ্রেণী হইতেই

* রাজনৈতিক আন্দোলনের কতিপয় কর্ণধার এই নীতি বিস্মৃত হন নাই। তাঁহারাও অশ্লীল গালি, ভয়প্রদর্শন প্রভৃতি জঘন্য উপায় অবলম্বনে অনেককে নিজ পথে আনিয়া কর্ত্তৃত্ব করিতে চাহিয়াছিলেন, শেষে ভগ্নদন্ত বিষধরের ন্যায় উলটিয়া হাঁফাইতে বাধ্য হইয়াছিলেন। সমষ্টি বিষয়ক ধারণা থাকিলে ইঁহারা এইরূপ করিতেন না। সমষ্টিগত ধারণা জন্মিলে জনসমাজের প্রতি ভক্তি ও শ্রদ্ধা আসে, ঔদ্ধত্য আসে না।

নায়ক নায়িকা নির্ব্বাচন করিতেন। এই জন্তই তৎকালীন নাট্যে নন্দ, চন্দ্রগুপ্ত প্রভৃতি সঙ্কর জাতীয় নৃপতিগণকে নায়ক দেখিতে পাই। আবার যে নাট্যে চন্দ্রগুপ্তের স্থায় হীন সঙ্করানুসঙ্কর জাতীয় রাজা উৎকৃষ্ট পাত্র হইয়াছেন, ঠিক সেই নাট্যেই বঙ্কিম বাবুর নির্ব্বাচিত শ্রেণীর লোক "লঘ্বী মাত্রার" দৃষ্টান্তরূপে অধম পাত্র খাড়া হইয়াছেন!! আমরা প্রসিদ্ধ নাটক মুদ্রারাক্ষসের কথা বলিলাম।

সেদিনকার বাঙ্গালা ভাষার কবি ঘনরামের কাব্যেও গোপরাজ ইচ্ছাই ঘোষ নায়ক হইতে পারিয়াছেন। আবার বঙ্গ জাতীয় কালু নৃপতিও নায়ক হইয়াছেন; কিন্তু সেই নৃপতি কালুর পালাতেই তদীয় প্রজা ভাঁড়ুদত্ত অধম পাত্র রূপে অবতারিত হইয়াছেন!! ভাঁড়ুদত্তের প্রকৃতি দর্শনে রাজা কালু ভাঁড়ুদত্তের মাথা মুড়াইয়া মুখে চূণকালী দিয়া রাজধানীর চতুর্দ্দিকে ঘুরাইয়া দণ্ড প্রদান করিয়াছেন!! যেন ঠিক সেই যাজ্ঞবল্ক্য সংহিতা, ব্রহ্মবৈবর্ত্ত পুরাণ ও উশনঃ সংহিতার সঙ্গে মিল দিয়া কাব্য লেখা হইয়াছে। এই নীতিও আমরা অনুমোদন করি না। এই নীতি প্রাচীন হইলেও দুর্নীতি ভিন্ন কিছু নহে।

বৌদ্ধ ব্রাহ্মণ সন্ধ্যাকর নন্দী রামচরিত কাব্যে বৌদ্ধ নরপতি রামপাল ও হিন্দু নরপতি দিব্যক রুদক ও ভীমকে নায়ক প্রতিনায়করূপে খাড়া করিয়া খ্যাতি লাভ করিয়াছেন। বস্তুতঃ, কি প্রাচীন কি আধুনিক কাব্য নাট্যে পুরাণোল্লিখিত ক্ষত্র-সঙ্করগণকেই নায়করূপে গৃহীত দেখিতে পাই, কিন্তু বঙ্কিম সেই সকল ক্ষত্র-সঙ্করদিগকে মুছিয়া ফেলিয়া কাব্যের নূতন যুগ প্রবর্ত্তিত করিয়া গিয়াছেন। বঙ্কিমের নব প্রণালীতে যাঁহারা কাব্যনাট্য লিখেন, তাঁহাদের কাব্যনাট্যে আবার ঐ সকল বিক্রান্ত জাতি এখন অতিহীন ও দুর্দ্দশাগ্রস্তরূপে অবতারিত হন *। বঙ্কিমের প্রভাবেই এই যুগপরিবর্ত্তন ঘটিয়াছে। যদি বঙ্কিম বাঙ্গালী জাতিগুলিকে একটা মহাজাতি খাড়া করিবার জন্ত যাহাকে যে স্থানে মানায়, তাহাকে সেই স্থানে খাড়া করিয়া, সমগ্র বাঙ্গালী জাতির চিত্র নিজকাব্যে দেখাইতেন, তবে তাঁহার কাব্যগত নবযুগ পত্তনে কাহারও এত ঘোর আপত্তি উঠিত না। কিন্তু আমরা পূর্ব্বেই বলিয়াছি, বঙ্কিম রাগদ্বেষের বশীভূত ছিলেন, এবং বাঙ্গালী জাতির সমষ্টি সম্বন্ধে তাঁহার ধারণা ছিল না; তিনি সমষ্টির একটা অংশকে অবশিষ্টের মস্তকে বসাইবার প্রয়াসী ছিলেন। তাঁহার

* রেভারেণ্ড লালবিহারী দে গোবিন্দ সামন্ত উগ্রক্ষত্রিয় জাতীয় নায়ক গ্রহণ করতঃ সুনীতি ও সুরুচির পরিচয় দিয়াছেন।

সমগ্র সাহিত্যই এই কথার সাক্ষী। এখনকার রাজনৈতিকদের অন্ততঃ একাংশ এই ভাবেই ভাবিত।

আমরা বাঙ্গালী-জাতি-সমষ্টির দিকে চাহিয়া বার বার আভীর, মাহিষ্য, মল্ল ও উগ্রাদি সম্প্রদায়ের কথা বলিতেছি! ঐতিহাসিকগণ বলিতেছেন, মাহিষ্য জাতীয় একজন ভুঞা নৃপতি হইতেই পাল বংশের (১) উৎপত্তি। তাঁহাকে একদিন বাঙ্গালী জাতি দেশের নেতা খাড়া করিয়াছিলেন। আবার দশম শতাব্দীতে সমগ্র হিন্দু জাতি মিলিয়া মাহিষ্য নৃপতি দিব্যককে দেশের নেতা খাড়া করিয়াছিলেন (২)। সে দিনও নীলকুঠির অত্যাচার হইতে রক্ষা পাইবার জন্য সর্ব্বজাতীয় প্রজা নদীয়া জেলার ২ জন মধ্যবিত্ত মাহিষ্য ভুম্যধকারীকে নেতা খাড়া করিয়া রক্ষা পাইয়াছিলেন। কাজেই মনে হয়, বাঙ্গালী জাতির একতর স্বাভাবিক নেতাই বুঝি মাহিষ্য জাতি। বঙ্কিম এইরূপ জাতিকেও চাপা দিতে ইতস্ততঃ করেন নাই। আমরা কোন প্রকারের এক জাতীয় নেতৃত্বের পক্ষপাতী নহি। যদি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বাঙ্গালী জাতিগুলি একত্র হইয়া মহাজাতি গঠন করিতে চাহেন, বঙ্কিমের রাজনৈতিক সাহিত্যের প্রকৃতি ও আদর্শের অনেক উপরে বাঙ্গালা সাহিত্যের আদর্শ টানিয়া উঠাইয়া লইতে হইবে। সে সাহিত্যে খণ্ড খণ্ড জাতিগুলির মধ্যে যাহার পক্ষে যে স্থান অধিকার করা শোভা পায় তাহাই থাকিবে। তাহাতে রাগদ্বেষ থাকিবে না, লেখনীগত চাপাচাপি রেশা রেশি থাকিবে না। ইহাতেই মন প্রশস্ত হইবে, হৃদয়ে শান্তি, বল এবং একতা আসিবে। বঙ্কিমের সাহিত্য-নীতি বর্ত্তমান থাকিতে সেরূপ বল, সেরূপ নীতি, সেরূপ একতা কখনও আসিবে না।

বঙ্কিম বাবুর স্বাধীনতা-লিপ্সা।

বঙ্কিম বাবুর মতে কি উপায়ে স্বাধীনতার পথ পরিষ্কৃত করিতে হয়, তাহার কার্য্যবিধি আনন্দমঠ, দেবীচৌধুরাণী ও সীতারাম প্রভৃতি

(১) পালবংশ মাহিষ্য—এই বিষয়ে (ক) মহামহোপাধ্যায় হরপ্রসাদ শাস্ত্রী এম এ কৃত রাম চরিত-কাব্যের ভূমিকা ও রাম-চরিতের শ্রীপতিনাভিসম্ভূত শ্লোক, (খ) ১৯১৩ জানুয়ারী সংখ্যা ঢাকা রিভিউতে বিজয়কুমার রায় বি এ কৃত পালবংশ ও রামচরিত কাব্য বিষয়ক প্রবন্ধ, (গ) দীনেশ চন্দ্র সেন লিখিত ঢাকায় কয়েকটি স্থান সম্বন্ধীয় প্রবন্ধ (প্রবাসী), (ঘ) দীনেশ চন্দ্র সেন কৃত ঢাকার ইতিহাসের সমালোচনা (১৩২০ সালের শ্রাবণের সাহিত্য) (ঙ) যতীন্দ্র নাথ রায় কৃত ঢাকার বিবরণ।

(২) রাম চরিত কাব্য।

উপন্যাসে একরূপ বিবৃত হইয়াছে। প্রথমোক্ত ২ খানা উপন্যাসের উপকরণ হাণ্টারকৃত রংপুর জিলার ষ্টেটিস্‌টিকেল বিবরণ হইতে সংগৃহীত বলিয়া বঙ্কিম নিজেই নির্দ্দেশ করিয়াছেন। ঐ দুই খানা উপন্যাসেরই আখ্যান অংশ কল্পিত। সীতারামের আখ্যানের একটা সত্য ঐতিহাসিক ভিত্তি আছে।

সীতারাম রায়ের ঘটনা।

ষ্টুয়ার্টস্ কৃত বাঙ্গালার ইতিহাসে ঘটনাটি বিস্তৃতভাবে বর্ণিত আছে। নবাব মুর্শিদকুলী খাঁর নবাবীকালে দিল্লির বাদসাহ বংশের ঘনিষ্ঠ কুটুম্ব আবু তোরাপ ভুষণার ফৌজদার নিযুক্ত হইয়া আসেন। তিনি নিজে সাক্ষাৎ বাদসাহের কুটুম্ব এই অভিমান বশতঃ নবাব মুর্শিদকুলী খাঁকে কিছু অবজ্ঞা করিতেন। নবাব মুর্শিদকুলী খাঁ তাহা সহজে টের পাইয়া, তাঁহাকে আক্কেল দেওয়ার উদ্দেশ্যে, মহম্মদপুরের প্রসিদ্ধ ডাকাইত সীতারামের গ্রেপ্তারের ভার আবু তোরাপের উপর অর্পণ করিলেন। আবু তোরাপ এই কার্য্যের জন্য উপযুক্ত সংখ্যক সিপাহী চাহিয়া পাঠাইলেও নবাব মুর্শিদকুলী খাঁ তাহা না দিয়া ডাকাত গ্রেপ্তার করিতে তাম্বি করিতে আরম্ভ করিলেন। আবু তোরাপ অগত্যা অল্প কয়েকজন বরকন্দাজ লইয়াই নিজেই ডাকাত ধরিতে গেলেন! আবু তোরাপ কি রকম পদস্থ লোক এবং তাঁহার গায় হাত দিলে নিজের ভাগ্যে কি ঘটিবে, সীতারাম তাহা বেশ জানিতেন। তথাপি তিনি নিজ দস্যুদলকে আবু তোরাপের বরকন্দাজদিগকে অতর্কিতে আক্রমণ করিবার আদেশ করিলেন। দস্যুগণ বরকন্দাজদের সঙ্গে অতর্কিতে স্বয়ং আবু তোরাপকে কাটিয়া ফেলিল!! যখন এই সংবাদ মুর্শিদাবাদে পৌছিল তখন নবাব ভয়ে একেবারে আড়ষ্ট হইলেন। আবু তোরাপের দিকে সাবধান দৃষ্টি রাখিবার জন্য নবাবের উপর দিল্লির কড়া হুকুম ছিল। আবু তোরাপ নবাবেরই কৌশলে এইরূপে মারা গিয়াছেন এই সত্য সংবাদ দিল্লিতে পৌছিলে তাঁহার আর রক্ষা নাই। মুর্শিদকুলী খাঁ তখন মহম্মদপুর পরগণার চারিদিগের পরগণার জমীদারগণ যাহাতে সীতারামকে পলাইতে না দেন এই মর্ম্মে কড়া হুকুম জারী করিয়া কতকগুলি সিপাহী পাঠাইয়া সসহচর সস্ত্রীক সপরিবার সীতারামকে বিনা আয়াসে ধরিয়া মুর্শিদাবাদে আনিলেন!! তৎপর নবাব সীতারামকে ও দস্যুগণকে শ্রেণীবদ্ধ ভাবে মুর্শিদাবাদে শূলে আরোপণ করাইয়া তদীয় স্ত্রীগণ ও পরিবারবর্গকে মুর্শিদাবাদের বাজারে প্রকাশ্যে বিক্রয় করিলেন, এবং আবু

তোরাপের মৃত্যুর প্রতিশোধমূলক রিপোর্ট দিল্লিতে পাঠাইয়া কোন মতে অব্যাহতি পাইলেন।

এইরূপ জীবনে বঙ্কিমের আকর্ষণ ছিল।

বঙ্কিম বাবু এই দস্যুর জীবন কি ভাবে বর্ণনা করিয়াছেন, তাহা সকলেই জানেন। এমন কি, বঙ্কিমের সেই মনঃকল্পিত দস্যুবীরের বাসস্থানে যাইয়া অনেক দেশহিতৈষী সরল প্রকৃতির ভদ্রলোক অশ্রুজল পর্য্যন্ত ত্যাগ করিয়াছেন!! আমরা শুনিয়াছি, এক ভক্ত পাঠক, "তুমি সে কারণ, প্রভু তুমি সে কারণ" স্থলে, পড়িতে অনভ্যাস বশতঃ, "ভুসি সে কাবল, প্রভু ভুসি সে কাবল" পাঠ করিয়াও অশ্রু বিসর্জ্জন করিয়াছিলেন। মানব-শক্র একজন কাপুরুষ দস্যুর জন্য সরলদিগকে এইভাবে ক্রন্দন করান কিরূপ নীতিসঙ্গত হইয়াছে, তাহা পাঠকই বিচার করুন।

এত কথা বলিবার তাৎপর্য্য এই, দেশের নানাস্থানে বলবীর্য্যশালী নানা-জাতীয় রাজ্যস্থাপক বীরগণের ইতিহাস আছে; তাহাদিগকে ছাড়িয়া একজন দস্যুকে এই ভাবে সাজাইবার বৃথাশ্রম স্বীকারে কি লাভ বুঝি না। বরং ইহাতে দুর্নীতিরই প্রশ্রয় হইয়াছে এবং তাহার ফল আমরা সকলেই ভোগ করিতেছি।

মহর্ষি যাজ্ঞবল্ক্যের মতে চাটুকার, তস্কর, বদমায়েস, ডাকাইত ইত্যাদি মানব একই শ্রেণীর লোক। ইহারা প্রজাপীড়নকারী; ইহাদের বৃত্তি একই জাতীয়। কাজেই এই সকল পেশার কোন পেশাই শ্রেষ্ঠ ও উন্নত মানব শ্রেণীর যোগ্য নহে। অর্থাৎ যে সকল লোক চরিত্রের বলে দেশের আদর্শ নেতা হইবেন, বর্ণিত পেশার কোন পেশাই সেই সকল মহাত্মা লোকের উপযোগী নহে। দস্যু-বৃত্তি স্বভাবতই নীচ; তা সে সীতারামই হউন, আর যেই হউন।

প্রজার সর্ব্বস্ব হরণই দস্যুর কার্য্য। অর্থনীতির হিসাবে দস্যুগণ দেশের মহাশক্র। রাজভাণ্ডার হরণ করিলেও দস্যুর শ্রেষ্ঠত্ব প্রতিপন্ন হয় না। রাজ-ভাণ্ডার প্রজার দত্ত অর্থে পূর্ণ থাকে। উহার লুণ্ঠনে প্রজার গৃহস্থিত ভাণ্ডার ক্রমশঃ রিক্ত হইতে থাকে। তাহাতে দস্যুগণ রাজা ও প্রজা উভয়েরই কণ্টক বলিয়া গণ্য হয়। দস্যুতা দ্বারা ইংরেজ সাম্রাজ্যের ধনভাণ্ডার ক্রমশঃ নিঃশেষ করা যাইবে, আর ইংরেজ গভর্ণমেণ্ট শুইয়া শুইয়া তাহা দেখিবেন, এইরূপ অজ্ঞোচিত ধারণা প্রকৃত রাজনৈতিকের মস্তকে বাস করিতে পারে না। এইরূপ

উপায় প্রয়োগ দ্বারা মহাশক্তি ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের বিরুদ্ধে ফললাভ করা দূরে থাকুক, মুসলমান সাম্রাজ্য কালেও সফলকাম হইবার কথা ছিল না। মোগলাধিকারে শিবজীর সমুত্থান এখনকার আদর্শ হইতে পারে না। শিবজী এই শ্রেণীর দস্যু ছিলেন না; তিনি মহারাষ্ট্রা কৃষকজাতীয় লোক ছিলেন; এখন বিজয়পুর প্রভৃতির ন্যায় কোন স্বাধীন রাজ্য ভারতবর্ষে নাই। এখন হিমবৎ হইতে মহাসাগর, শ্যাম হইতে কাবুল পর্য্যন্ত একছত্রী ইংরেজ সাম্রাজ্য। ইংরেজ বিরোধী দস্যুর মাথা রাখিবার স্থান গিরিকন্দর মহারণ্যেও নাই। আর যে শ্রেণীর দুর্ব্বল লোক এই স্বপ্নে ভ্রান্ত, তাঁহারা ঈদৃশ কার্য্যের যোগ্য কখনও ছিলেন না, এবং নহেন। মহারাষ্ট্রে শিবজী চাষাভূমিষ্ঠ যোদ্ধৃজাতীয় লোক ছিলেন। তাঁহার স্বজাতীয় মহারাষ্ট্রা কৃষকগণ আজ বৃটিশসিংহ সমীপে সেদিন দরখাস্ত দিয়া মহারাষ্ট্রী ব্রাহ্মণ হইতে নিজেদের স্বাতন্ত্র্য এবং স্বতন্ত্র ইচ্ছা ও ভাব জ্ঞাপন করিয়াছেন।

যে ভাবের স্বাধীনতার জন্য এই অস্বাভাবিক লিপ্সা হইয়াছিল, বর্ত্তমান শোচনীয় অবস্থায়, সমষ্টিগত ভাবের অভাবাস্থায়, সেই স্বাধীনতার অবস্থা কিরূপ দাঁড়াইবার কথা তাহাও বিবেচ্য। রাজদত্ত দান সম্বন্ধে ভারতশাসনের ক্ষমতা ভারতীয় লোকের হাতে আসিলে তাহা সমষ্টির হস্তে না পড়িয়া সমষ্টির একটা অতি ক্ষুদ্র অংশের হস্তে, খণ্ড জাতির হস্তেই, পতিত হইবার কথা। জাতিগত, ধর্ম্মগত, সমাজগত এই ভয়াবহ বিদ্বেষের দিনে কোন খণ্ড জাতি ইংরেজের স্থানে কৌশলে বসিতে পারিলে কি কার্য্য করিবে তাহা সহজে অনুমান করা যায় (১)। তাহাতে ভারতীয় জাতি-সমষ্টির কোন উপকারই হইবার কথা নাই। ভারতীয় কয়েকটি খণ্ড জাতির হস্তে এই ভারতবর্ষ বিভক্ত হইয়া বহু কালই হিন্দু শাসনে ছিল। এই শাসনের চিত্র এখনও দেশীয় রাজন্যদের রাজ্যে কতকটা দেখিতে পাওয়া যায়। আজ ইংরাজ রাজের সমুন্নত সুসভ্য রাজ্যে বাসকারী কোন শিক্ষিত প্রজা ব্রিটীশ অধিকারের অমূল্য স্বত্ব ছাড়িয়া ঐসকল দেশীয় রাজার রাজ্যে বাস করিতে ইচ্ছুক হইবেন না। দেশীয় রাজাদের রাজ্যমধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা সমুন্নত মহীশূর রাজ্যের দেওয়ান স্বয়ং নিজ প্রবন্ধে স্বীকার করিয়াছেন,— "ইংরেজ অফিসারের সহায়তা ব্যতীত এখনও নিজ নিজ গভর্ণমেণ্টকে

(১) জাতি-সমষ্টির অধিকারে ব্যাঘাত হইবে আশঙ্কায়ই সুসভ্য দেশ বিশেষেও অতিবৃদ্ধিপ্রাপ্ত-সম্প্রদায়-বিশেষকে বিশেষভাবে শাসন করা হইয়াছে।

তাঁহারা উন্নত স্থানে রাখিতে পারেন না, একটু বিকল হইলেই সংশোধনের জন্য ইংরেজ আফিসরের সহায়তা সর্ব্বদা গ্রহণ করিতে হয়।" কাজেই দেশীয় রাজ্যের শূন্যগর্ভ সভ্যতার চাকচিক্য ইংরেজ শাসনেরই প্রতিবিম্ব মাত্র। জাতি ও সম্প্রদায় ভেদের তীব্রতা সেই সকল দেশীয় শাসনে এখনও বর্ত্তমান। ব্রিটীশ সুশাসনে বর্দ্ধিত প্রজার পক্ষে সে শাসন এখনও সহনীয় বা প্রীতিকর নহে। খাস ব্রিটীশ ভারতবর্ষ দেশীয় কোন রাজার জিম্মায় সঁপিয়া দিলে আমাদের মনে যে ত্রাস হইবার কথা, আমাদিগকে নবনীতির অনুগত কোন জাতির হস্তে সমর্পণ করা তদপেক্ষাও ত্রাস এবং আশঙ্কার কথা। এখন কোন খণ্ড জাতির হস্তে ভারতের শাসন আসিলে দেশের অবস্থা অশান্তিকর ও ভয়ানক শোচনীয় হইয়া দাঁড়াইবে। ইংরেজের সুসভ্য সুনীতিসম্পন্ন শাসন হইতে ঐরূপ স্বাধীনতা শতগুণ দুর্দ্দশার কারণ হইয়া দাঁড়াইবে। আমাদের দেশের ভিন্ন ভিন্ন শ্রেণীর লোকের চরিত্র আমরা বিলক্ষণ জানি। যে পর্য্যন্ত ভারতে সমষ্টিগত জাতি খাড়া না হয়; প্রত্যেক জাতি, সম্প্রদায় ও সমাজের স্বত্ব কড়ায় গণ্ডায় হিসাব করিয়া বাঁটিয়া দেওয়ার ও সমবেত ভাবে তাহা রক্ষা করিবার ধারণা না জন্মে, সে পর্য্যন্ত স্বায়ত্ব-শাসন শব্দ মিষ্ট হইলেও দেশের গুরুতর ক্ষতিজনক বলিয়া গণ্য হইবে। কতকগুলি দুর্নীতিপরায়ণ স্বার্থপর লোক এই ভাবের স্বাধীনতাই চাহিতেছেন। তাঁহাদের মনের কোন স্থানেই প্রকৃত প্রস্তাবে জাতিগত সমষ্টির ভাব নাই—তাহার সাক্ষী তাঁহাদের লিখিত সাহিত্য। তাঁহাদের লিখিত রাজনীতি, সমাজনীতি, কাব্য, নাট্য, ইতিহাস, প্রত্নতত্ত্ব, এমন কি বিজ্ঞান, ভূগোল ও গণিত শাস্ত্রের মধ্যে পর্যন্ত এই উৎকট ভাবের গন্ধ পাওয়া যায়!! দেশের জনসাধারণের নাম দিয়া স্বাধীনতা অর্জ্জন করতঃ তাঁহারা দেশের জনসাধারণের মস্তক ভক্ষণ করিতে অভিলাষী। এই দল তাঁহাদের খণ্ডজাতি ছাড়া অন্য কাহারও হিত সহ্য করিতে পারেন না; অন্যের গৌরব, অন্যের ইতিহাস, অন্যের শিক্ষা, অন্যের সম্পদ্ কখনও সহ্য করিতে পারেন না। তাঁহাদের রচিত সাহিত্যেরই এই প্রকৃতি, এই গতি। যাঁহার চক্ষু আছে তিনি দেখুন, যাঁহার কর্ণ আছে তিনি শুনুন। ভারতীয় জাতি সাধারণ কখনও ইংরেজের উচ্চনীতিমূলক শাসনের পরিবর্ত্তে ভারতীয় প্রকৃতির তথা কথিত স্বাধীনতা চাহে না। ভারতবর্ষের বলসম্পন্ন খণ্ড জাতি গুলিই এই তত্ত্ব খুব বেশী বুঝিয়াছেন। জাতি-সমষ্টির প্রতি একাংশের

অত্যাচার বৃদ্ধি করিবার জন্য বঙ্কিমবাবুর নীতি খুব অশ্রুজল পরিত্যাগ করিতে পারে, কিন্তু ভারতের জাতি সাধারণ তাহা করিবেন না।

বঙ্কিম বাবুর স্বাধীনতার লালসা কতকটা অস্বাভাবিক বলিয়াও মনে হয়। ১২০৩খৃঃ হইতে ১৭৫৬ খৃঃ পর্য্যন্ত বাঙ্গালাদেশ, এমন কি ভারতবর্ষ, মুসলমানের হস্তে ছিল। পলাশীক্ষেত্রেই মুসলমান স্বাধীনতা অস্তমিত হইয়াছে। উক্ত যুদ্ধে বাঙ্গালী হিন্দুর সাম্রাজ্য অথবা স্বাধীনতা যায় নাই। বাঙ্গালী হিন্দু ১২০৩ খৃঃ হইতে অদ্য পর্য্যন্ত ৭০০ বৎসর পুরুষানুক্রমে পরাধীন; সেই আমলে কোটী কোটী হিন্দু লোভে ও ভয়ে মুসলমান হইয়াছিল, সেই সময়েই ব্রাহ্মণ কুলীনের কুলে দোষ সংক্রান্ত হইয়াছিল, সেই সময়েই মুসলমান ফকির উল্লঙ্ঘন করিয়া গেলে জীবিত অবস্থায় হিন্দুর সমাধি হইত! সেই সময়েই দিল্লির নরোজার মেলায় হিন্দুজাতির শ্রেষ্ঠতম কুলললনাগণ আত্মবিক্রয় করিতে বাধ্য হইতেন!! হিন্দু অত্যন্ত ভীরু ও কাপুরুষ, ভয় দেখাইলেই আত্মসাৎকৃত রাজস্বাংশ ফিরাইয়া দেয়—এই যুক্তিতেই তখন হিন্দুর নিকট জমিদারী বন্দোবস্ত দেওয়া হইত (১)। সেই সময়েই আমাদিগকে আমীল ফৌজদারের ন্যায় অধস্তন কর্ম্মচারীর নিকট পর্য্যন্ত কুর্ণিস করিয়া উপস্থিত হইতে হইত! যাঁহাদের প্রতাপরৌদ্রে আমাদের এই অবস্থা ঘটিয়াছিল, সেই বাঘ-প্রকৃতির মুসলমান্ ও মেষ-প্রকৃতির হিন্দুকে আজ ইংরাজ একঘাটে জল খাওয়াইতেছেন !! এই ইংরেজ শাসনে অন্ততঃ বাঙ্গালী হিন্দুর স্বাধীনতা-লালসা বর্দ্ধিত হইবার বিশেষ কারণ দেখা যায় না।

ভারতের ভুতপূর্ব্ব মালিক মুসলমান্, রাজপুত প্রভৃতি বলশালী হিন্দুজাতি মধ্যে এখনও বহুলোক এই ভারতে অর্দ্ধস্বাধীন রহিয়াছেন। তাঁহারা শিক্ষায়, দীক্ষায়, রাজনীতিজ্ঞানে বাঙ্গালী হিন্দু হইতে বড় কম নহেন। একটা আশ্চর্য্যের বিষয়, এই সকল প্রসিদ্ধ জাতির শিক্ষিত লোকেরা বিলাতে যাইয়া অত্যন্ত নরম ও ইংরেজভক্ত হইয়া দেশে প্রত্যাবর্ত্তন করেন, কিন্তু বাঙ্গালী বিলাত হইতে স্বাধীনতার লালসা লইয়া, উত্তেজনার বোঝা লইয়া দেশে প্রত্যাবর্ত্তন করেন। এই প্রভেদের মধ্যেই আমাদের বাঙ্গালী হিন্দুর স্বাধীনতার লালসার কারণ খুঁজিয়া পাওয়া যাইতে পারে।

অর্দ্ধস্বাধীন জাতিগুলি বহু শতাব্দী যাবৎ মানবজাতি শাসন করিয়া

---

(১) Stewarts' History of Bengal.

আসিয়াছেন ; শাসকের কি গুণ থাকা দরকার তাহা তাঁহাদের পুরুষানুক্রমে জানা আছে, সংস্কার আছে। তাঁহারা বিলাতের ভূমিতে পদক্ষেপ করিয়াই বিলাতীয় লোকের শাসকজাতি-সমুচিত অত্যুচ্চ গুণরাশি দেখিয়া তুলনায় নিজেদের শাসক-জাত্যুচিত গুণের অপকর্ষ বুঝিয়া ফেলেন, এবং সেই জন্যই অবনত হইয়া দেশে আসেন। কিন্তু শিক্ষিত বাঙ্গালীর শাসক-জাতি সমুচিত কোন সংস্কারই নাই, কাজেই ইংরেজের শাসকসমুচিত শক্তিটা তাঁহারা তুলনায় বুঝিয়া উঠিতে পারেন না। কেবল পরীক্ষা পাশের তুলনায় তাঁহারা ইংরেজকে সমান বলিয়া ভ্রম করেন। এই জন্যই ইঁহাদের স্বাধীনতা লিপ্সা প্রবল এবং কতকটা নাটকীয় ভাবের এবং অভিনয় নৈপুণ্য-সমুচিত। ডেপুটী ব্রাহ্মণ বঙ্কিমের স্বাধীনতা লালসাও এই ভাবের বলিয়া বোধ হয়। ইংরেজ ডিষ্ট্রিক্ট ম্যাজিষ্ট্রেটে ও নিজেতে বঙ্কিম বিশেষ প্রভেদ দেখেন নাই। এই যে আনন্দমঠাদি সংহিতা, ইহার মূল নীতি ও লালসা এই আকারের অতিরঞ্জিত আত্মশ্লাঘার ভাব হইতেই কল্পিত। দেশের প্রকৃত অবস্থা চিন্তা করিলে ঐ সকল সংহিতাগত নীতি ও কার্য্যবিধি নিতান্ত সঙ্ বলিয়াই কি মনে হয় না ?

কোন জাতি সঙ্ করিয়া সমষ্টিগত জাতি খাড়া করিতে পারে না, বড়, হইতে পারে না। শ্রেষ্ঠ জাতি হইতে হইলে চরিত্রগত শ্রেষ্ঠতা লাভ করিতে হয়। ক্লাইভ জাল করিয়াছিলেন, প্রতারণা করিয়াছিলেন সত্য, কিন্তু সেই ক্লাইভের প্রতারণার পশ্চাদ্‌ভাগে ইংরেজ জাতির সুমহৎ চরিত্র ও আদর্শ বল ছিল ; যে আদর্শে গঠিত ২।৪ শত গোরা সৈন্য শত সহস্র গুণ অধিক দেশীয় সৈন্য ও দেশীয় নেতাকে পদতলে মর্দ্দন করিতে সমর্থ হইয়াছিল। যে গুণে সে দিনকার টাইটানিক জাহাজ-ডুবির সময়ে অক্ষুব্ধচিত্তে স্ত্রীলোক ও বালকগণকে উদ্ধার করিতে দিয়া তেমন তেমন ধনকুবের ইংরেজ আরোহীগণ মৃত্যুকে আলিঙ্গন পূর্ব্বক কর্ত্তব্যনিষ্ঠার অসাধারণ পরিচয় দিয়াছেন ; সেইরূপ গুণ দ্বারাই জগৎ বশীভূত করা যায় ; শ্রেষ্ঠ জাতি হওয়া যায়। তস্করতা নীতিতে জাতীয় উৎকর্ষ জন্মায় না। দুঃখের বিষয়, ইংরেজের এত নিকটে থাকিয়াও তাঁহার চরিত্র-মাহাত্ম্য, নৈতিক উচ্চতা আমরা কিছুই শিখিলাম না। ইংরেজদের ন্যায় মহৎ চরিত্রলাভ না করিলে ইংরেজের স্থানে দণ্ডায়মান হওয়ার আশা অলীক দুশ্চিন্তা ও বৃথা স্বপ্নমাত্র। বঙ্কিমবাবু বহুলোককে এই বৃথা চিন্তায় স্ফূর্তি করিয়া গিয়াছেন। আমরা

বঙ্কিমের সুমহৎ গুণরাশির সংবাদ রাখি, তথাপি জাতি সাধারণের হিতেচ্ছা দ্বারা প্রণোদিত হইয়া তাঁহার কতিপয় গুরুতর ভ্রম না দেখাইয়া পারিলাম না। তাঁহার ন্যায় শ্রেষ্ঠ ব্যক্তি হইতে জাতি সাধারণের উৎকৃষ্টতর জাতি বিষয়ক ধারণা, উৎকৃষ্টতর রাজনীতি ও সমাজনীতি পাওয়া উচিত ছিল।

শ্রীবসন্তকুমার রায় এম্-এ, বি-এল্।

সাহিত্য ব্যাঙ্কিং এণ্ড ট্রেডিং কোম্পানির অংশীদারগণের নামধাম ও অংশের পরিমাণ।

(পূর্ব্ব-প্রকাশিতের পর)

৪৩৪	শ্রীযুক্ত দুর্য্যোধন ধাওয়া	রাণাপাড়া, আমতা, হাওড়া	১০৲
৪৩৫	,, মহেন্দ্রনাথ দাস	কুলপদ্দী, ফরিদপুর	৫০৲
৪৩৬	,, জয়গোপাল দাস মোক্তার	সোদপুর, ২৪ পরগণা	৫০৲
৪৩৭	,, প্রভাতকুমারী বিশ্বাস	পারকৃষ্ণপুর, দর্শনা, নদীয়া	১০৲
৪৩৮	,, বিভূতিভূষণ ভাগবতভূষণ	মণিখালি দারিয়াপুর	৫০৲
৪৩৯	,, বিনোদবিহারী দাস	২৮ পুলিশ হাঁসপাতাল রোড	১০৲
৪৪০	,, যতীন্দ্রনাথ সরকার	লালবাজার নাটোরসিটী	১০৲
৪৪১	,, অক্ষয়কুমার মাইতি	নিশ্চিন্তপুর, কুন্দোল, হাওড়া	১০৲
৪৪২	শ্রীমতী শ্যামাঙ্গিনী দেবী	রাহন দক্ষিণপাড়া, হাওড়া	১০৲
৪৪৩	শ্রীমতী সর্ব্বমঙ্গলা চৌধুরাণী	কুলিয়া, ভাটোরা ,,	১০৲
৪৪৪	শ্রীযুক্ত অনুকূল চন্দ্র চৌধুরী	,, ,, ,,	১০৲
৪৪৫	,, ভীষ্মদেব বাচস্পতি	,, ,, ,,	১০৲
৪৪৬	,, কিশোরীমোহন চৌধুরী	,, ,,	১০৲
৪৪৭	,, গৌরগোপাল চৌধুরী	,, ,, ,,	১০৲
৪৪৮	,, বীরেশ্বর চক্রবর্ত্তী	,, ,, ,,	১০৲
৪৪৯	,, অধরচন্দ্র চৌধুরী	,, ,, ,,	১০৲
৪৫০	,, রঘুনন্দন চৌধুরী	,, ,, ,,	১০৲
৪৫১	,, নব কিশোর দাস	জীবনপুর, হরিপুর, দিনাজপুর	২০৲
৪৫২	,, সুরেশচন্দ্র রায়	সুজাপুর, ফুলবাড়ি, দিনাজপুর	৫০৲
৪৫৩	,, হরেকৃষ্ণ সরকার	,, ,, ,,	২০৲
৪৫৪	,, পূর্ণচন্দ্র বিশ্বাস	খেমিদ দিয়ার, নদিয়া	১০৲
৪৫৫	,, শৈলেন্দ্র নাথ চক্রবর্ত্তী	খোষালপুর, আমতা, হাওড়া	১০৲
৪৫৬	,, হরিপদ পোড়্যাল	,, ,, ,,	১০৲
৪৫৭	,, নরেন্দ্রকুমার চৌধুরী	কুলিয়া, ভাটোরা মেদিনীপুর	১০৲

(ক্রমশঃ)

পল্লীসমিতি পরিদর্শন।

বিগত আশ্বিন ও কার্ত্তিক মাস মধ্যে আমরা হাওড়া জেলার অন্তর্গত যে কয়টী পল্লীসমিতি পরিদর্শন করিয়াছি, সাধারণের অবগতির জন্য তাহার সংক্ষিপ্ত বিবরণ প্রদত্ত হইল :—(১) কুলিয়া ভাটোরা সাহিত্য-সমিতি—হাওড়া জেলার মধ্যে কুলিয়ার চৌধুরী বংশ বহুদিন হইতেই আমাদিগের বিশেষ পরিচিত, এই বংশে অনেক খ্যাতিমান পুরুষ জন্মগ্রহণ করিয়াছেন, ঘাটালের শ্রেষ্ঠ উকীল বাবু হারাধন চৌধুরী আইন শাস্ত্রে বিশেষ বিজ্ঞ; আমাদের প্রিয় সুহৃৎ বাবু গোষ্ঠবিহারী চৌধুরী বি এল মহাশয়ও ঘাটালে বিশেষ প্রতিপত্তি-লাভ করিতেছেন। গত কোজাগরী লক্ষ্মীপূজার দিনে এই চৌধুরী বাবু-দিগেরই উদ্‌যোগে উক্ত সমিতির বার্ষিক অধিবেশন হইয়াছিল; হাওড়া জেলাস্থ অন্যতম জমিদার আন্দুল নিবাসী বাবু নিরঞ্জন মাইতি প্রভৃতি মহোদয়গণ উপস্থিত হইয়া সভার কার্য্যে যোগদান করিয়াছিলেন। স্থানীয় মধ্যইংরাজী স্কুলের হেড মাষ্টার শ্রীযুক্ত বাবু অনুকুল চন্দ্র চৌধুরী মহাশয় যে রিপোর্ট পাঠ করেন, তাহাতে জানা গেল যে, (এই সমিতির অন্তর্ভুক্ত বালিকা বিদ্যালয় হইতে প্রায় প্রতি বৎসরই একটী করিয়া মাহিষ্য মহিলা উচ্চপ্রাথমিক পরিক্ষায় বৃত্তি লাভ করিয়া থাকেন। গত কয়েক বৎসর মধ্যে যে কয়টী মাহিষ্য মহিলা বৃত্তিলাভ করিয়াছেন তাহাদের নাম নিম্নে উদ্ধৃত করা হইল। শ্রীমতী শরৎ কুমারী দেঈ, শ্রীমতী গৌরি সুন্দরী দেঈ, শ্রীমতী রেণুবালা দেঈ, শ্রীমতী জাহ্নবীবালা দেঈ, শ্রীমতী অবোধ বালা দেঈ।) মহিষ্য ব্যাঙ্কিং এণ্ড ট্রেডিং কোম্পানির উন্নতি জন্য সমিতির সভাগণ বিশেষভাবে চেষ্টা করিতেছেন। সভাস্থলে নিম্নলিখিত ব্যক্তিগণ কোম্পানির অংশ গ্রহণ করিয়া ধন্যবাদার্হ হইলেন। শ্রীযুক্ত গোষ্ঠবিহারী চৌধুরী, ৫০৲ শ্রীযুক্ত অনুকুল চন্দ্র চৌধুরী ১০৲ শ্রীযুক্ত কিশোরী মোহন চৌধুরী ১০৲ শ্রীযুক্ত অধরচন্দ্র চৌধুরী ১০৲ শ্রীযুক্ত রঘুনন্দন চৌধুরী ১০৲ শ্রীযুক্ত গৌর-গোপাল চৌধুরী ১০৲ শ্রীযুক্ত ভীষ্মদেব বাচস্পতি ১০৲ শ্রীযুক্ত বীরেশ্বর চক্রবর্ত্তী ১০৲ শ্রীমতী সর্ব্বমঙ্গলা চৌধুরাণী ১০৲ শ্রীমতি শ্যামমোহিনী দেবী ১০৲ শ্রীযুক্ত নরেন্দ্র কুমার চৌধুরী ১০৲। শ্রীযুক্ত গৌরহরি চৌধুরী এবং শ্রীযুক্ত গোষ্ঠ বিহারী চৌধুরী মহাশয়গণ মাহিষ্য সমাজ মাসিক পত্রের গ্রাহক-শ্রেণীভুক্ত হইলেন। (২) অরফুলি মাহিষ্য-সমিতি—এই সমিতির সম্পাদক

শ্রীযুক্ত বাবু নিরঞ্জন মাইতি জমিদার। সম্প্রতি ইনি কোলাঘাটে একটী উচ্চ শ্রেণীর ইংরাজী বিদ্যালয় স্থাপনের জন্য বদ্ধপরিকর হইয়াছেন। (৩) খোষালপুর মাহিষ্য-সমিতি—মাহিষ্য পুরোহিত ডাক্তার শ্রীযুক্ত বাবু হরিসাধন চক্রবর্ত্তী, এবং শৈলেন্দ্রনাথ চক্রবর্ত্তী মহাশয়দ্বয় এই সমিতির সভাচার্য্য। এই সমিতির উদ্‌যোগেও কয়েকজন মাহিষ্য ব্যাঙ্কিং এণ্ড ট্রেডিং কোম্পানির অংশ গ্রহণ করিলেন। (৪) বড়মোহরা মাহিষ্য-সমিতি—এই সমিতির সুযোগ্য সম্পাদক মাননীয় শ্রীযুক্ত বাবু বসন্তকুমার হাজরা মহাশয় আমতা থানার মধ্যে একজন বিশেষ স্বজাতি-প্রেমিক এবং "স্বনামধন্য পুরুষ" বলিয়া সকলের নিকটই সুপরিচিত। আমতা থানার অন্তর্গত মাহিষ্য ভ্রাতৃগণকে যাহাতে অপরাপর জাতির নিকট ঋণ গ্রহণ করিতে না হয়, তজ্জন্য বসন্তবাবু আমতা সহরে মাহিষ্য ব্যাঙ্কিং এণ্ড ট্রেডিং কোম্পানির একটা শাখা কার্য্যালয় খুলিবার জন্য বিশেষ চেষ্টা করিতেছেন। (৫) কাটালপোতা মাহিষ্য-সমিতি—এই সমিতির সম্পাদক শ্রীযুক্ত বাবু কাত্তিকচন্দ্র দিয়াশী মহাশয় বহুদিন হইতেই সমাজের জন্য বিশেষভাবে চেষ্টা করিয়া আসিতেছেন। সম্প্রতি তিনি "জাতীয় মিলন-মন্দির" নামে একটী সমিতিগৃহ স্থাপনের জন্য বিশেষ চেষ্টা করিতেছেন, অন্ততঃ প্রতিমাসে স্থানীয় মাহিষ্য ভ্রাতৃগণ এই গৃহে বসিয়া জাতীয় আলোচনা করিবেন এবং নৈশস্কুল স্থাপন করিয়া অশিক্ষিতগণকে শিক্ষা প্রদানের ব্যবস্থা করিবেন।

শ্রীরামপদ বিশ্বাস।

পল্লী-সভার অধিবেশন। (১) জেলা মেদিনীপুরের অন্তর্গত বির্শাপুর গ্রামে ২৬শে আশ্বিন রবিবার। ভেমুয়া নিবাসী শ্রীযুক্ত রামেশ্বর তর্ক সিদ্ধান্ত প্রমুখ মধ্যশ্রেণী ব্রাহ্মণগণ, অধ্যাপক শ্রীযুক্ত হংসেশ্বর কাব্যতীর্থ বেদান্তশাস্ত্রী, শ্রীযুক্ত সারদা প্রসাদ বেদান্তবাগীশ প্রভৃতি ব্রাহ্মণগণ উপস্থিত ছিলেন। (২) জেলা হাওড়ার অন্তর্গত তাজপুর গ্রামে শ্রীযুক্ত বসন্তকুমার রায় মহাশয়ের উদ্যোগে বিজয়া দশমীর দিবস। সভাপতি—পাশ্চাত্য বৈদিককুলভূষণ শ্রীযুক্ত বাণীকণ্ঠ কাব্যতীর্থ মহাশয়; বক্তা—শ্রীযুক্ত হরিশ্চন্দ্র চক্রবর্ত্তী মহাশয়। উভয় সভায় বহুসংখক মাহিষ্য উপস্থিত ছিলেন। জাতীয় উন্নতি, শিক্ষার প্রচার প্রভৃতি আলোচ্য বিষয় ছিল।

বাৎসরিক অধিবেশন।

(সন ১৩২০ সাল)

মাহিষ্য ব্যাঙ্কিং এণ্ড ট্রেডিং কোম্পানী লিমিটেড।

আগামী ১২ই পৌষ ইংরাজী ২৭শে ডিসেম্বর, শনিবার অপরাহ্ণ ৩ ঘটিকার সময় কলিকাতা, ইটালি, ৩৮ নং পুলিশ হাঁসপাতাল রোডস্থ ভবনে উক্ত কোম্পানীর অংশীদারগণের বার্ষিক সাধারণ সভার অধিবেশন হইবে। কোম্পানীর অংশীদারগণের (স্বয়ং অথবা প্রক্সী দ্বারা) যোগদান প্রার্থনীয়।

বঙ্গীয় মাহিষ্য-সমিতি।

আগামী ১৩ই পৌষ, ইংরাজী ২৮শে ডিসেম্বর রবিবার অপরাহ্ণ ৪ ঘটিকার সময় কলিকাতা, ইটালি, ৩৮ নং পুলিশ হাঁসপাতাল রোডস্থ ভবনে উক্ত সমিতির বাৎসরিক সাধারণ অধিবেশন হইবে। মাহিষ্যজাতি ও তৎপুরোধা ব্রাহ্মণগণের বর্ত্তমান কর্ত্তব্য, সমাজ-সংস্কার, শিক্ষাবিস্তার প্রভৃতি প্রয়োজনীয় বিষয়গুলির আলোচনা হইবে। সভায় মাহিষ্যহিতৈষী প্রত্যেক ব্যক্তিরই যোগদান প্রার্থনীয়।

মাহিষ্য-সমাজ।

তৃতীয় ভাগ, নবম সংখ্যা—পৌষ, সন ১৩২০ সাল।]

জয়ন্ত ও আদিশূর।

কাশ্মীরের রাজকবি কহ্লণ রাজতরঙ্গিণী গ্রন্থে রাজা জয়ন্তের কথা লিখিয়াছেন। তাঁহার লেখার ভাবে বুঝিতে পারা যায় যে, জয়ন্ত খৃষ্টীয় ৭ম শতাব্দীতে প্রাদুর্ভূত হইয়া পালবংশের পূর্ব্বে রাজত্ব করিয়াছিলেন। তিনি গৌড়ের একজন সামন্ত রাজা ছিলেন। কাশ্মীর-রাজ ললিতাদিত্যের পৌত্র জয়াপীড় গৌড় রাজ্যে অজ্ঞাতবাস কালে তাঁহার কন্যার পাণিগ্রহণ করিয়াছিলেন। এই জয়ন্ত সম্বন্ধে আর কোন পুস্তকে বা কোন শিলালিপিতে বা তাম্রশাসনে কোন উল্লেখ পাওয়া যায় নাই। ঐতিহাসিকগণ এ পর্য্যন্ত কোনরূপে গৌড়ের ইতিহাসে তাঁহার কোন সন্ধান বলিয়া দিতে পারেন নাই।

কবি কহ্লণ জয়ন্তের বা কাশ্মীররাজ জয়াপীড়ের সমসাময়িক নহেন, তাঁহাদের বহু পরে প্রাদুর্ভূত হইয়াছিলেন। স্থানীয় জনপ্রবাদ ও গল্পগুজব লইয়া তিনি কাব্য রচনা করিয়াছিলেন; তিনি ঐতিহাসিক নহেন, কবি ছিলেন। ভারতীয় কল্পনাপ্রিয় কবিগণের কাব্য হইতে প্রকৃত ঐতিহাসিক ঘটনা সঙ্কলন করিতে হইলে সুতর্ক বিচারের প্রয়োজন। সুতরাং জয়ন্ত প্রকৃত পক্ষে কোন রাজার নাম কি না এবং প্রকৃত প্রস্তাবে কোন রাজাসন অলঙ্কৃত করিয়াছিলেন কি না তাহার অনুসন্ধানকল্পে বাঙ্গালী ঐতিহাসিকগণের মধ্যে কেহ সেরূপ যত্ন বা আগ্রহ প্রকাশ করেন নাই। 'বঙ্গের জাতীয় ইতিহাস' প্রণেতা শ্রীযুক্ত বাবু নগেন্দ্রনাথ বসু মহাশয় তদীয় গ্রন্থে জয়ন্তকে আদিশূরের অপর নাম বলিয়া গ্রহণ করিয়াছেন। কনৌজ-পঞ্চ-ব্রাহ্মণ-আনয়নকারী আদিশূর ও কহ্লণোক্ত জয়ন্ত যে এক ব্যক্তি ইহার প্রমাণের জন্য বসু মহাশয় অনর্থক চেষ্টা করিয়াছেন। গৌড়রাজ-মালা-প্রণেতা তদীয় পুস্তকের ১৮ পৃষ্ঠায় লিখিয়াছেন—"যত দিন না সম-সাময়িক লিপিতে বা সাহিত্যে জয়ন্তের নামোল্লেখ দৃষ্ট হয়, ততদিন

জয়ন্ত প্রকৃত ঐতিহাসিক ব্যক্তি কিম্বা জয়াপীড়ের অজ্ঞাতবাস-উপন্যাসের উপনায়ক মাত্র, তাহা বলা কঠিন।” বাস্তবিকই জয়ন্ত সম্বন্ধে এই ধারণাই ঐতিহাসিকগণ পোষণ করিয়া থাকেন।

জয়ন্তকে ঐতিহাসিক ব্যক্তি খাড়া করিবার জন্য আদিশূরের সহিত তাঁহার অভিন্নত্ব—অথবা আদিশূরকে ঐতিহাসিক ব্যক্তি খাড়া করিবার জন্য জয়ন্তের সহিত আদিশূরের অভিন্নত্ব—প্রতিপাদন করা উভয়ই হাস্যজনক। অন্ধ যেমন অন্ধকে পথ দেখাইয়া লইয়া যাইতে পারে না, উহা তদ্রূপ। জনশ্রুতিমূলক আদিশূর ঐতিহাসিক ব্যক্তি কি না? এই প্রশ্ন উত্থিত হইয়া আজ কাল ঐতিহাসিকগণের নিকট নানা সংশয় মুখরিত হইয়া উঠিয়াছে।

কুলগ্রন্থের আদিশূর প্রকৃত ঐতিহাসিক ব্যক্তি হইলে সমসাময়িক লিপিতে বা তাম্রশাসনে আদিশূরের কোন উল্লেখ নাই কেন? সেনবংশের বহু তাম্র-শাসন আবিষ্কৃত হইয়াছে তাহাতেও আদিশূরের কোন কথাই নাই কেন? আদিশূর প্রকৃত ঐতিহাসিক ব্যক্তি হইলে, তিনি যে কনৌজ ব্রাহ্মণ-পঞ্চকের আনয়নকর্ত্তা তাহা ঠিক বলিয়া ধরিয়া লইলে, তিনি খৃষ্টীয় একাদশ শতাব্দীতে বর্ত্তমান ছিলেন ধরিতে হয়; কেন না রাঢ়ী শ্রেণীয় ব্রাহ্মণ সমাজে ভট্টনারায়ণ প্রভৃতি পঞ্চ ব্রাহ্মণ হইতে ৩৪।৩৫ পুরুষের ঊর্দ্ধতন পর্য্যায়ের লোক নাই; প্রতি পুরুষে ২৫ বৎসর গড় ধরিলে ঐতিহাসিক হিসাবে ৮৭৫ বৎসর পূর্ব্বে আদিশূরের অস্তিত্ব স্বীকার করিতে হয়; সুতরাং ১০০৮ খৃষ্টাব্দে বা তাহার সমকালে আদিশূর বর্ত্তমান ছিলেন ধরিতে হয় এবং ইহাও “বেদবাণাঙ্ক শাকে তু গৌড়ে বিপ্রা সমাগতাঃ” প্রমাণের বিরোধী নহে। অতএব আদিশূর তৎপূর্ব্ববর্ত্তী ৭ সপ্তম শতাব্দীর জয়ন্ত কিরূপে হইবেন? জয়ন্ত ও আদিশূর অভিন্ন হইলে তাঁহাকে চারিশত বৎসরেরও অধিক জীবিত রাখিতে হয়। বসু মহাশয় বোধ হয় বলিবেন যে, পূর্ব্বকালের লোক দীর্ঘজীবী ছিলেন—চারিশত বৎসরের পূর্ব্বের জয়ন্ত তৎপরে আদিশূররূপে বৃদ্ধ বয়সে কনৌজ হইতে ব্রাহ্মণ আনাইয়া ধর্ম্মকার্য্যে মনোনিবেশ করিয়াছিলেন। কল্পনাপ্রিয় বাঙ্গালীর মস্তিষ্কে এইরূপ ঐতিহাসিক সিদ্ধান্তের আশা করা অসম্ভব নহে।

মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত হরপ্রসাদ শাস্ত্রী মহাশয় রামচরিতের ভূমিকায় তিরুমলয় লিপিতে উল্লিখিত রাজেন্দ্র চোলের অভিযানের কাহিনী মধ্যে দক্ষিণ রাঢ়ের সামন্তরাজ রণশূরের উল্লেখ দেখিয়া এই শূরবংশকেই পঞ্চ ব্রাহ্মণ-

আনয়নকারী বলিয়া ইঙ্গিত করিয়াছেন। আদিশূর যে এই শূর বংশীয় তাহা তিনি বলিতে সাহস করেন নাই। গৌড়রাজমালা-প্রণেতা এই রণশূরের পুত্র বা পৌত্র বলিয়া আদিশূরকে ধরিয়া লইতে বাধা কি? এইরূপ আভাষ দিয়াছেন। প্রকৃতপক্ষে আদিশূর কখন কোন স্থানে অভ্যুদিত হইয়াছিলেন তাহা ঠিক হয় নাই। কুলগ্রন্থনিচয়ে উল্লিখিত রাজা আদিশূরের বিবরণ বিশেষ সাবধানতার সহিত পরীক্ষা করিয়া ইতিহাসে স্থান দেওয়া উচিত বলিয়া আজকাল অনেকে বিবেচনা করিতেছেন। সেন রাজগণের সহিত আদিশূরের কোন সম্পর্কই ছিল না। আদিশূর, বল্লালসেন ও লক্ষ্মণসেন এই তিন জন রাজার কথাই কুলগ্রন্থে পাওয়া যায়। তন্মধ্যে বল্লালসেন ও লক্ষ্মণসেন সম্বন্ধে শিলালিপি ও তাম্রশাসন দ্বারা অনেক কথা সমর্থিত হইয়াছে। আদিশূর সম্বন্ধে কোন কথাই পাওয়া যায় না। প্রবাসী পত্রের ১৩১৯ শ্রাবণ সংখ্যায় "লক্ষ্মণসেনের সময়" শীর্ষক প্রবন্ধে প্রত্নতত্ত্ববিৎ পণ্ডিত শ্রীযুক্ত রাখাল দাস বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় লিখিয়াছেন :—

"বল্লালসেন সম্বন্ধে এক মাত্র বিশ্বাসযোগ্য কথা এই যে, বর্দ্ধমান ভুক্তির উত্তর রাঢ়মণ্ডল তাঁহার অধিকার ভুক্ত ছিল এবং তিনি অন্যূন একাদশ বর্ষ কাল রাজত্ব করিয়াছিলেন। তাঁহার পিতা বিজয় সেন ৩১ বা ৩৬ বৎসরকাল রাজত্ব করিয়াছিলেন; তাহার কিয়দংশ কাল রাঢ়ে সামান্য ভূস্বামীর ন্যায় অতিবাহিত হইয়াছিল। সম্ভবতঃ রামপালের মৃত্যুর পর পালসাম্রাজ্যের বন্ধন শিথিল হইলে বিজয়সেন বরেন্দ্রে পাদক্ষেপ করিতে সাহসী হইয়াছিলেন। লক্ষ্মণ-সংবৎ হইতে ইহা প্রমাণিত হইতেছে যে, বল্লালসেনের রাজত্বকাল ১১১৯ খৃঃ অব্দে শেষ হইয়াছিলেন। বল্লালসেন সত্যই কৌলিন্য প্রথার প্রতিষ্ঠাতা কি না তাহার সত্য প্রমাণ অদ্যাপি আবিষ্কৃত হয় নাই। কৌলিন্য প্রথা সম্ভবতঃ মুশলমান বিজয়ের বহু শতাব্দী পরে কয়েক জন ব্রাহ্মণ কর্ত্তৃক সৃষ্ট হইয়াছিল। যদি কোন দিন প্রমাণ হয় যে সত্য সত্যই বল্লালসেনের সময়ে কৌলিন্য প্রথার প্রতিষ্ঠা হইয়াছিল, তাহা হইলে বুঝিতে হইবে যে, প্রাচীন অভিজাত সম্প্রদায় বৌদ্ধ ধর্ম্মানুরাগী ও প্রাচীন পালরাজ বংশের পক্ষপাতী দেখিয়া বিজয়সেন ব্রাহ্মণ বৈদ্য ও কায়স্থ জাতির মধ্যে আভিজাত্য সৃষ্টি করিবার সঙ্কল্প করিয়াছিলেন, তৎপুত্র বল্লাল সেনের সময়ে আদিশূর ও পঞ্চ ব্রাহ্মণাদি সম্বন্ধীয় উপাখ্যান সৃষ্টি করিয়া নূতন আভিজাত্য প্রতিষ্ঠা হইয়াছিল। মুশলমান আক্রমণে বৌদ্ধধর্ম্ম লুপ্তপ্রায় না হইলে এই নবজাত

সম্প্রদায় টিকিত কি না সন্দেহ। দৈববলে শত্রুপক্ষ নিহত হইলে পাদপহীন দেশে আভিজাত্যের নবজাত বৃক্ষ বৃহদাকার প্রাপ্ত হইয়া দেশকে আচ্ছন্ন করিয়াছিল, ইহাই বোধ হয় ঐতিহাসিক সত্যরূপে প্রমাণিত হইবে।”

রাখালবাবুর উপরোক্ত মন্তব্য হইতেও বুঝিতে পারা যায় যে, আদিশূর নামে কোন ঐতিহাসিক ব্যক্তির অস্তিত্ব ছিল না—তিনি পঞ্চ-ব্রাহ্মণ-আনয়নকারী উপাখ্যানভূত ব্যক্তি মাত্র।

জয়ন্তের ঐতিহাসিকত্ব যেমন সংশয়পূর্ণ, আদিশূরের ঐতিহাসিকত্ব তেমনই সংশয়পূর্ণ; সুতরাং যতদিন পর্য্যন্ত সমসাময়িক লিপিতে বা সাহিত্যে তাঁহাদের কোন প্রমাণ আবিষ্কৃত না হয়, ততদিন পর্য্যন্ত তাঁহাদের সম্বন্ধে ইতিহাস সত্য বলিয়া গ্রহণ করা যায় না। এরূপ অবস্থায় জয়ন্ত ও আদিশূরের অভিন্নত্ব প্রতিপাদনের জন্য বসু মহাশয় কেন পণ্ডশ্রম করিয়াছেন বুঝি না।

ঈশ্বরঘোষের তাম্রশাসন উপলক্ষে কবিত্ব।

বর্ত্তমান ইয়ুরোপে বিবিধ শ্রেণীর গবেষণাযোগী প্রাদুর্ভূত হইয়াছেন। তাঁহাদের মধ্যে কেহ জড়বিজ্ঞান-যোগী, কেহ মনোবিজ্ঞান-যোগী, কেহ প্রত্ন-তত্ত্ব-যোগী, কেহ বা ইতিহাস-সাধনার যোগী। তাঁহাদের চিত্তের একাগ্রতা, ধ্যান এবং ধারণা শক্তির কথা চিন্তা করিলে বিস্মিত হইতে হয়। তাঁহারা নিজ নিজ ধ্যানানুরূপ উপকরণ সাজাইয়া সুসজ্জিত প্রাসাদে যোগযুক্ত হইয়া বাস করেন; তাঁহাদের সেই তন্ময়তা দেখিলে প্রাচীন ভারতবর্ষের সেই গিরিগুহাসেবী ধ্যাননিষ্ঠ যোগিদিগের কথা স্মৃতিপথে আরূঢ় হয়। মনে হয়, ভারতবর্ষের সেই কপিল, কণাদ, ব্যাস ও বার্ষগণ্যগণ বুঝি আজ নব শরীর ও নব বেশ পরিগ্রহ করিয়া ইয়ুরোপীয় সারস্বত-মন্দিরে দেখা দিয়াছেন, এবং নিজ নিজ প্রকৃতিসিদ্ধ ধ্যানযোগে আবার মগ্ন হইয়া পড়িয়াছেন। বস্তুতঃ ইয়ুরোপে আজ একটা ধ্যাননিষ্ঠ যোগিসমাজ প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে বলিয়াই ইয়ুরোপের নিকট সমগ্র জগৎ অবনত হইয়া পড়িয়াছে। সেরূপ ধ্যাননিষ্ঠ বিদ্বৎসমাজ ভারতবর্ষে এখন আর নাই, এবং সন্নিহিত ভবিষ্যতে হইবারও কথা নাই। তবে ইয়ুরোপের সঙ্গে ভারতবর্ষের ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ স্থাপিত হইবার পর হইতে ইয়ুরোপীয় বিদ্বৎসমাজের চিন্তার প্রতিবিম্বের প্রতিবিম্ব আসিয়া

ভারতবর্ষে পতিত হইতে আরম্ভ করিয়াছে, এবং তাহারই ফলে এই অন্ধ-তসমাবৃত ভারত জ্ঞানালোকের প্রতিবিম্বে যেন একটু আলোকিত হইয়া উঠিতেছে। এই অবসরে কতিপয় বিজ্ঞ লোক পাশ্চাত্য আদর্শ বুকে লইয়া কার্য্যক্ষেত্রে অবতরণ করিতেছেন।

এই নূতন প্রণালীর কর্ম্মক্ষেত্রে যাঁহারা দৃষ্টিগোচর হইতেছেন, তন্মধ্যে বাবু অক্ষয়কুমার মৈত্রেয় অন্যতম ব্যক্তি। অবশ্য তাঁহার সিরাজ-উদ্দৌলার দেশহিতৈষণার কবিত্বে তাঁহার এইরূপ যোগ্যতার সেরূপ কোন প্রমাণ পাওয়া যায় নাই; কিন্তু বরেন্দ্র-অনুসন্ধান-সমিতি প্রসঙ্গে তাঁহার যোগ্যতার প্রচুর প্রমাণ পাওয়া যাইতেছে। ইয়ুরোপের গবেষণা প্রণালীর নিয়মই হইয়াছে, কারণ হইতে কার্য্যে এবং কার্য্য হইতে কারণে গমনাগমন। বিনা কারণে কোন কার্য্য কল্পনা করিলে সেই কঠোর পথে গতি স্খলিত হয়। মৈত্রেয় মহাশয় এই পথে অস্খলিত গতিতে চলিতে পারিবেন বলিয়া আমাদের আশা জন্মিয়াছে। ভগবান সমীপে প্রার্থনা করি তিনি কৃতকার্য্য হউন।

যিনি এইরূপ কঠিন পথের যাত্রী তাঁহাকে প্রতি কথায় সাবধান হইতে হইবে। তিনি অনুসন্ধান সমিতির সদস্য রূপেই বলুন, আর ব্যক্তিগত ভাবেই বলুন, তাঁহার প্রতি কথায়ই আমরা এখন পরীক্ষা করিয়া দেখিব। ত্রুটি পাইলেই, অথবা গতিস্খলন দেখিলেই, সন্দেহ করিয়া প্রশ্ন করিব; ইহাতে তাঁহার দুঃখিত হইলে চলিবে না। আমরা ঈশ্বর ঘোষের তাম্রশাসন সম্বন্ধে তাঁহাকে সেরূপ সাবধান হইয়া কথা বলিতে দেখি না—এমন কি বাঙ্গালীর চিরাগত কবিত্ব-প্রিয়তার শয্যায় শয়ান দেখি। ইহাও একটী গতিস্খলন বলিয়া আমাদের আশঙ্কা হইতেছে।

মৈত্রেয় মহাশয় ঈশ্বরঘোষের তাম্রশাসন খানি যে ভাবে চিত্রাঙ্কে প্রদর্শন করিয়াছেন, পাঠোদ্ধার দেখাইয়াছেন, পাদটীকা করিয়াছেন, সেইরূপ সুন্দর ভাবে বাঙ্গালীরা এরূপ কার্য্যে অগ্রসর হন নাই বলিলে বড় অত্যুক্তি হয় না। এই সম্বন্ধে একজন ইয়ুরোপীয় কৃতী পুরুষও এইরূপই করিবেন। কার্য্যটি এই অংশে অনবদ্য হইয়াছে বলিতে হইবে। দুঃখের বিষয় মৈত্রেয় মহাশয় এই অবসরেই গবেষণার আসর হইতে ফাঁক দিয়া বাহির হইয়া ঈশ্বর ঘোষ সম্বন্ধে একটু কবিত্ব করিয়া লইয়াছেন! কল্পনাপ্রিয় বাঙ্গালী হইয়া এতটা আটক থাকা তাঁহার যেন কুলায় নাই। মৈত্রেয় মহাশয় এই ভাবেই আসর হইতে বাহির হইয়া কবিত্ব সঙ্গীতে তান ধরিয়া আবার আসরে

ঢুকিয়াছেন; আমরা এইরূপ সঙ্গীতপ্রিয়তা পছন্দ করি না। ইহাতে অনেক দোষ ঘটে।

তিনি তাম্রশাসনের বিচারে পাদটীকায় বলিয়াছেন,—"সকরণ-ব্রাহ্মণ মাননাপূর্ব্বকম্" পাঠ যুক্তিযুক্ত হইলে, ঈশ্বর ঘোষ জাতিতে করণ ছিলেন বলিয়াই প্রতিভাত হয়।"

আর কুত্রাপি এই সন্দেহ তিনি নিশ্চয়ে পরিণত করিবার চেষ্টা না করিয়াই লিখিয়াছেন:—

"এ সকল বিবরণ সে কালের (করণদিগের) পদ মর্য্যাদা সম্ভোগের সংশয়শূন্য ঐতিহাসিক প্রমাণ।"

যাহা সংশয়, তাহা কিরূপে সংশয়-শূন্য প্রমাণ হইতে পারে? ইহার পরেই একদম কবিত্ব ছুটিয়াছে:—

"তাঁহাদের (করণদিগের) পূর্ব্বতন অবস্থা সম্বন্ধে আধুনিক রচনায় (এড়ু মিশ্র ও নুলো পঞ্চানন প্রভৃতির আধুনিক রচনায়?) যে সকল কথা (ব্রাহ্মণ সহ আগমনাদির কথা?) অবলীলাক্রমে (বিনা কঠোর দণ্ডে?) উল্লিখিত হইয়া থাকে, তাহা বাঙ্গালীর ইতিহাসের প্রচ্ছন্ন অপবাদ—সমগ্র হিন্দু সমাজের বিরুদ্ধে প্রকাশ্য অভিযোগ।"

বন্ধনীর মধ্যগত প্রশ্নগুলি আমাদের নিজের। যিনি গাণিতিক প্রমাণ দ্বারা অন্ধকূপ হত্যা অপ্রমাণ করিয়াছিলেন, তাঁহার পক্ষে এইরূপ যুক্তিবিন্যাস ও কবিত্ব প্রকাশ স্বাভাবিক,—কিন্তু গবেষণাকারীর পক্ষে উহা স্বাভাবিক বলিয়া বোধ হয় কি? সন্দেহ দ্বারা প্রমেয় নিরূপণ, এবং প্রমেয় বস্তুর স্বরূপ বর্ণনা করা কখনই গবেষণার পদ্ধতি হইতে পারে না। ইত্যাকার ঐতিহাসিক উদ্বোধনা, জাগরণ সঙ্গীত, স্বদেশীর কল্যাণে শোভা পাইয়াছে, এখন শোভা পাইবে কি? তাঁহার এই কবিত্বে বিষয়টীর প্রতি আমাদের মনোযোগ হওয়ায়, মূল তাম্রশাসন সম্বন্ধেই দুই একটি প্রশ্ন উপস্থিত হইয়াছে। লেখক লিখিয়াছেন,—

"তাহা (তাম্রশাসন) ৩৫ সংবতের ১ মার্গদিনের লিপি। মালদোয়ারে উহা ৩৫ বিক্রম সংবতের লিপি বলিয়া পরিচিত। বলা বাহুল্য এ লিপি সেরূপ পুরাতন হইতে পারে না।"

"তাম্রশাসনকে পাল সাম্রাজ্যের অভ্যুদয় যুগের (খ্রীষ্টিয় দশম একাদশ শতাব্দীর) লিপি বলিয়া অনুমান করা যাইতে পারে।"

দশম একদশ শতাব্দীর লিপিতে ৩৫ সংবৎ উৎকীর্ণ হইবার কারণ কি? এই কঠিন প্রশ্নের উত্তরে মৈত্রয় মহাশয় বলিয়াছেন, এই সংবৎ তদানীন্তন কোন গৌড়পতির, অথবা কোন সামন্ত রাজার অব্দ হওয়া সম্ভবপর।

দশম একাদশ শতাব্দীর কোন গৌড়নৃপতি এরূপ কোন সংবৎ প্রচলিত করার নিদর্শন দেখা যায় না। এরূপ সংবৎ কোন গৌড়পতি প্রচলন করিয়া থাকিলে তাহা এখন ৯০৯ সংবৎ রূপে ব্যবহৃত হইবার কথা ছিল। এই সংবৎ অন্য কোন সামন্ত রাজের হইলে ঈশ্বর ঘোষের ন্যায় প্রধান সামন্ত কদাচ তাহা আনিয়া ব্যবহার করিতেন না। ঈশ্বর ঘোষের প্রপিতামহ ধূর্ত্ত ঘোষ হইতে আরব্ধ হইলেও এই সংবৎ ঈশ্বর ঘোষের সময়ে অন্ততঃ শতাধিক সংবৎ হইত। কাজেই এই ৩৫ সংবৎ দশম একাদশ শতাব্দীর কোন গৌড়নৃপতি অথবা সামন্ত নৃপতির হওয়া সম্ভবপর নহে।

সংবৎ শব্দটী বিক্রমাব্দ বলিয়াই প্রসিদ্ধ। কিন্তু মৈত্রেয় মহাশয় বলিয়াছেন, "বলা বাহুল্য এ লিপি সেরূপ পুরাতন হইতে পারে না।" কেবল লিপির অবস্থা দ্বারাই যে ৩৫ অব্দ সংবৎ অর্থাৎ বিক্রমাব্দ হইতে পারে না তাহা নহে, অন্য প্রমাণ দ্বারাও তাহা সুন্দররূপে বুঝা যায়। ইয়ুরোপীয় গবেষণাকারী প্রফেসার মোক্ষমূলার ও ফার্গুসন্ সিদ্ধান্ত করিয়া গিয়াছেন যে, বিক্রম সংবতে কয়েকটি শতাব্দী যোগ করিয়া ৫৪৪ খৃঃ অব্দে প্রথম প্রচলন করা হইয়াছিল। মিঃ ফ্লিট্ সিদ্ধান্ত করিয়াছেন ৫৪৪ খৃষ্টাব্দেরও শতাধিক বৎসর পূর্ব্বে বিক্রম সংবৎ মালবাব্দ নামে ব্যবহৃত হইত। কাজেই ৩৫ সংবৎ যোগে কোন ফলক উৎকীর্ণ হওয়া অসম্ভব।

৩৫ সংবৎ মালদোয়ারে বিক্রমাব্দ বলিয়াই প্রচার। এইরূপ প্রচার থাকা খুব স্বাভাবিক। যিনি এই তাম্রশাসন সৃষ্টি করিয়াছিলেন, এই ৩৫ সংবৎ শব্দদ্বারা বিক্রমাব্দ বুঝানই তাঁহার উদ্দেশ্য ছিল। তিনিই সম্ভবতঃ এইরূপ প্রবাদের সৃষ্টিও করিয়া গিয়াছেন। আমাদের বোধ হয়, পরবর্ত্তী কালে এই তাম্রশাসন সম্বন্ধীয় ভূমি লইয়া দশম একদশ শতাব্দীর কোন রাজার সঙ্গে গোলযোগ উপস্থিত হইয়াছিল,—তাই তখন এই তাম্রশাসন কল্পিত হইয়াছিল, এবং দানপত্রখানার অত্যন্ত প্রাচীনতা দেখাইবার জন্য উহাতে একদম ৩৫ বিক্রমাব্দ বসাইয়া দেওয়া হইয়াছিল। স্মৃতিতে কূটলেখ্যের স্রষ্টাকে নরকের

ভয় দেখান হইয়াছে। মানব প্রকৃতি চিরদিনই একই রূপ। এখনকার আদালতেও কাগজে লেখা ইত্যাকার শত শত দানপত্র দাখিল হইতেছে, এবং তাহা কখন গ্রাহ্য, কখন অগ্রাহ্য হইতেছে। এই তাম্রশাসনও ইত্যাকার বলিয়া বোধ হয়।"

এই দলীল গবেষণাকারিদের দ্বারা যথানিয়মে কৃত্রিম সাব্যস্ত হইয়া গেলেও ইহার ঐতিহাসিক মূল্য নষ্ট হইবে এরূপ মনে করা যাইতে পারে না। কেন না, দশম একাদশ শতাব্দীতে ৩৫ বিক্রমাব্দ যোগ থাকা সত্ত্বেও স্বীকার করিতে হইবে, যিনি এই তাম্রশাসন প্রস্তুত করিয়াছিলেন, তিনি দশম শতাব্দীতে প্রচলিত তাম্রশাসনের পাঠ অথবা ফারম ভালরূপে জানিতেন। এই তাম্রশাসনে দশম শতাব্দীর মৌলিক তাম্রশাসনের ফারম বা আদর্শ অবিকল রক্ষিত হইয়াছে। এই আদর্শের প্রচুর ঐতিহাসিক মূল্য আছে।

অন্ততঃ এই আদর্শ কিরূপ ছিল তাহা জানিবার জন্য এই তাম্রশাসনের পাঠ উদ্ধার প্রভৃতি করা আবশ্যক। মৈত্রেয় মহাশয় এই সকল বিষয়ের আলোচনায় আমাদিগের প্রচুর সহায়তা করিয়াছেন। তজ্জন্য তিনি ধন্যবাদার্হ। এখন তৎকৃত পাঠ উদ্ধার সম্বন্ধে কয়েকটি কথা বলিব।

লেখক নিজেই লিখিয়াছেন বাচ্চা ঝা নামক একজন বিশিষ্ট পণ্ডিত পূর্ব্বে তাম্রশাসনের পাঠ উদ্ধার করিয়া গিয়াছেন। লেখক মৈত্রেয় মহাশয়ও স্বাধীন ভাবে পাঠ উদ্ধার করিয়াছেন। উভয় পাঠ উদ্ধারে যতটুকু মতভেদ আছে, লেখক পদটীকায় তাহা সুন্দররূপে বুঝাইয়া দিয়াছেন। তাম্রশাসনখানির যে অংশ ভাঙ্গিয়া নষ্ট হইয়া গিয়াছে, সে অংশের অক্ষর নাই। এইরূপ নষ্ট অক্ষর সমস্যাপূরণের প্রণালীতে উদ্ধার করিয়া বন্ধনীর মধ্যে রাখিয়া দেখান হইয়াছে। সমস্যা পূরণ কদাচ প্রমাণ বাক্য বলিয়া গণ্য হইতে পারে না— উহা (guess work) অনুমান মাত্র। তবে ঐরূপ অনুমান দ্বারা পাঠকের পক্ষে কল্পনা জল্পনা করার সুবিধা হয় মাত্র।

তাম্রফলকের বিংশ পংক্তির বর্ত্তমান শেষ অক্ষর স কারের পর দুই তিনটি অক্ষর যে ছিল তাহার সন্দেহ নাই, কেননা একবিংশ পংক্তির প্রথম অক্ষরই সমাসবদ্ধ ণ কার, এবং তাহার পরই সমাসবদ্ধ "ব্রাহ্মণমাননাপূর্ব্বকম্" লেখা আছে। বিংশ পংক্তির বর্ত্তমান শেষ অক্ষর স কার ও একবিংশ পংক্তির প্রথম অক্ষর ণ কার মধ্যে যে অক্ষরগুলি ছিল, তাহা বাচ্চা ঝার মতে (চর), এবং মৈত্রেয় মহাশয়ের মতে (কর) বলিয়া অনুমিত। (চর) এবং (কর)

ছাড়া যে অন্য অক্ষর হইতে পারে না এরূপ নহে। তবে দুইজন শ্রেষ্ঠ ব্যক্তি যে যে দুই পাঠ কল্পনা করিয়াছেন, তাহা উড়াইয়া দেওয়ার বিষয় নহে। (চর) অক্ষর পূরণ করিলে সমস্ত পদের পাঠ দাঁড়ায় "সচরণ ব্রাহ্মণ মাননা পূর্ব্বকম্" এবং (কর) অক্ষর বসাইলে সমস্ত পাঠ দাঁড়ায় "সকরণ ব্রাহ্মণ মাননা পূর্ব্বকম্"। এই দুইটি কল্পনার মধ্যে কোন্‌টী অধিকতর সমীচীন, ইহাই ত মূল কথা।

লেখক এই উভয় কল্পনা তুলনা করিয়া বলিয়াছেন তাঁহার কল্পনা সমীচীন। লেখক বিংশ পংক্তির বর্ত্তমান শেষ অক্ষর স-কারের পর যাহা অস্পষ্ট দেখা যায়, তাহাকে ক-কারের অবশিষ্টাংশ বলিতে চাহেন, অন্য দিকে বাচ্চা ঝা পূর্ব্বতন পণ্ডিত, তাঁহার সময়ে অক্ষর অধিকতর স্পষ্ট ছিল; তিনি উহা চকার পাঠ করিয়া গিয়াছেন। এই বিষয়ে আনুমানিক মতামত দেওয়া সম্ভবপর হয় না। মৈত্রেয় মহাশয় নিজেও এই বিষয়ে সন্দেহ করিয়া লিখিয়াছেন—

"সকরণ ব্রাহ্মণ মাননা পূর্ব্বকম্" পাঠ যুক্তিযুক্ত হইলে, ঈশ্বর ঘোষ (ভূমিদানকর্ত্তা নৃপতি) করণ ছিলেন বলিয়াই প্রতিভাত হয়।"

ঝা মহাশয়ের "সচরণ (১) ব্রাহ্মণ মাননা পূর্ব্বকম্" পাঠ মূল্যরহিত বলিয়াই মনে হয়। কেন না ব্রাহ্মণ কেন, অব্রাহ্মণও চরণ সহ বিদ্যমান থাকে। আর উক্ত সমাসবদ্ধ পদের চরণ সহ মাননা ক্রিয়ার এরূপ অন্বয় হইতেই পারে না, যাহাতে "ব্রাহ্মণ চরণ মাননা করিয়া" এরূপ একটা অর্থ করা যাইতে পারে; "সমর্থঃ পদবিধিঃ" এই পাণিনি-সূত্র ঐরূপ অন্বয়ের অন্তরায়।

"সকরণ" পাঠকেও সমীচীন বলা যায় না। কোন ক্ষত্রিয় বৈশ্য রাজা দানাদি পুণ্যকর্ম্মের বেলা সক্ষত্রিয়ব্রাহ্মণান্, সবৈশ্যব্রাহ্মণান্ নমস্যামঃ এই আকারের বাক্য কখনও প্রয়োগ করেন নাই। ব্রাহ্মণগণ অন্ততঃ জাতি বিভাগের

---

(১) চরণ শব্দে বেদের একাংশ বহ্বৃচ শাখা বুঝায়। উক্ত অর্থে "সচরণব্রাহ্মণ" শব্দে বহ্বৃচ শাখাধ্যায়ী ব্রাহ্মণ বুঝাইবে। একমাত্র ভবভূতি এই অর্থে চরণ শব্দ কাব্যে ব্যবহার করিয়াছেন। যথা—"চরণগুরবঃ পংক্তিপাবনাঃ......ব্রাহ্মাঃ নিবসন্তি" (মালতী মাধব)। চরণগুরু শব্দে বেদশাখার অধ্যাপক বুঝাইয়াছে। সেরূপ অর্থে সচরণব্রাহ্মণ শব্দে বহ্বৃচ-শাখী ব্রাহ্মণ বুঝায়। কাব্যাদিতে এই ভাবের প্রয়োগ খুব কম বলিয়া আমরা বাচ্চা ঝার পাঠ অসংলগ্ন মনে করিয়া মন্তব্য করিয়াছি। বাচ্চা ঝা পশ্চিম দেশীয় ব্রাহ্মণ। ভবভূতির ভাবে চরণ শব্দের অর্থ গ্রহণ করা তাঁহার পক্ষে স্বাভাবিক; আবার মৈত্রেয় মহাশয়ের চক্ষে 'করণ' পাঠ দেখা অস্বাভাবিক নহে।

পর হইতেই এই জগতের শ্রেষ্ঠ বলিয়া অভিমান (মনু) করিয়া আসিতেছেন। তাঁহারা ক্ষত্রিয়কে পর্য্যন্ত "শূদ্র" বলিয়া গালি দিতেন। (ছান্দোগ্য)। তাঁহারা পরীক্ষিতের ন্যায় ক্ষত্রিয়কে ব্রাহ্মণের দ্বাররক্ষক কুকুর বলিয়া অবজ্ঞা করিতেন। (ভাগবত)। ঈশ্বর ঘোষ হিন্দু রাজা ছিলেন, তাঁহার সভায় সমাজতত্ত্বজ্ঞ শাস্ত্রজ্ঞ ও চিরাগত শিষ্টাচার বিধিবিৎ ব্রাহ্মণ অবশ্যই ছিলেন। করণ জাতি বৈশ্য হইতে শূদ্রাতে জাত বলিয়া শূদ্রধর্ম্মী, অর্থাৎ এক শ্রেণীর শূদ্র মাত্র। চারিবর্ণের অনুলোম প্রতিলোম বিবাহে যে সকল সন্তান জন্মে, যথা মূর্দ্ধাভিষিক্ত, অম্বষ্ঠ, মাহিষ্য, পারশব, উগ্র, করণ, সূত, খত্তা, আয়গব ও চণ্ডাল মধ্যে প্রথম তিনটী মাত্র দ্বিজধর্ম্মী, অবশিষ্ট সমস্তই শূদ্র বিশেষ। কুল্লূকভট্ট মনুর "একান্তরেত্বানুলোম্যাৎ" এই শ্লোকের টীকায় বলিয়াছেন, অনুলোম প্রতিলোমজ দশবিধ সন্তান মধ্যে দ্বিজধর্ম্মী প্রথম তিন সন্তান, এবং অবশিষ্ট সাত সন্তান, সকলই স্পর্শাদি ব্যবহারযোগ্য ; চণ্ডালই মাত্র স্পর্শাদি ব্যবহারের অযোগ্য। করণ জাতি সূত, মাগধ, বৈদেহক ও উগ্রবৎ শূদ্র বিশেষ। সেই করণ ব্রাহ্মণের সঙ্গে সমান সম্মানিত হইলে, কথাটি শাস্ত্র ও ব্যবহারের অনুগত বলিয়া বোধ হয় না। যাহা হিন্দুর শাস্ত্র ও আচারের বিরুদ্ধ তাহা হিন্দুজাতি করিতে পারেন না।

যদি করণ ব্রাহ্মণের সমান অথবা শ্রেষ্ঠ মর্য্যাদা সম্পন্ন হইত, তবে করণ জাতি প্রাচীন নাট্য কাব্যে উৎকৃষ্ট পাত্র নায়ক নায়িকা হইতে বাধা ঘটিত না। কিন্তু করণ সংস্কৃত কাব্যে এবং ঘনরামের ভারুদত্ত পর্য্যন্ত নিম্ন পাত্র বলিয়া ব্রাহ্মণের নিকট গণ্য হইয়াছে। ইহা ছাড়া ব্রহ্মবৈবর্ত্ত পুরাণ, উশনঃ সংহিতা, ব্যাস সংহিতা প্রভৃতিতে করণের যে চিত্র দেখিতে পাই, তাহা প্রতিকূল। তাম্রশাসনের উক্তি কি এই সকল শাস্ত্রোক্ত ইতিহাস হইতে প্রবল ?

পুরাণোক্ত ঐতিহাসিক বিবরণে ক্ষত্রস্থলে যে সকল জাতি ভারতবর্ষে রাজত্ব করিয়াছিল বলিয়া ফর্দ্দে নির্দ্দিষ্ট আছে, সেই সকল ক্ষত্রসঙ্কর ও অনুসঙ্কর জাতির মধ্যে করণ বা কায়স্থের নাম নাই। (বিষ্ণু, ভাগবত, বায়ু ও মৎস্য পুরাণ দ্রষ্টব্য)। এই জন্য মনে হয়, মৈত্রেয় মহাশয়ের পাঠকল্পনা সমীচীন নহে।

বাচ্চা ঝা মহাশয়ের পাঠ কল্পনা ঠিক বলিয়া স্বীকার করি নাই ; কিন্তু মনে হয়, তাঁহার পাঠ-কল্পনাই সত্যের নিকটবর্ত্তী। "চরণ" স্থলে "চারণ" পাঠ করিলে আর কোন গোল থাকে না। চারণ জাতিই বর্ত্তমান ভাট জাতি,

যাহারা ব্রাহ্মণ বলিয়া গৃহীত হয় না, অথচ ব্রাহ্মণের মত। রাজপুতনায় চারণগণ রাজপুত জাতির নিকট অত্যন্ত সম্মানিত। চারণ সঙ্গে থাকিলে রাজপুত ডাকাইত পর্য্যন্ত আক্রমণ করে না। বাঙ্গলার ভাট জাতি (চারণ) স্বাধীনতার যুগে নিশ্চয়ই ঐরূপ সম্মানিত ছিল। তাহাদিগকেই বোধ হয় সচারণব্রাহ্মণ বলিয়া উল্লেখ করা হইয়াছে। বোধ হয় ঝা মহাশয় এই চারণ শব্দের আকার লোপ করিয়া ভ্রমে রাখিয়া গিয়াছেন। অবশ্য ইহাও একটা অনুমান মাত্র।

ঈশ্বরঘোষকে 'করণ' কল্পনা করিলে তাঁহার প্রতি গুরুতর অশাস্ত্রীয় আত্মশ্লাঘার দোষ চাপাইতে হয়। তদবস্থায় বরং তাঁহাকে করণেতর (গোপ-জাতীয়) রাজা মনে করাই ভাল।

গৌড় দেশ পূর্ব্বে মগধের অন্তর্ভুক্ত ছিল। তথায় সপ্ত আভীরাঃ দশ গর্দ্ধভিলাঃ প্রভৃতি স্থলে আভীর রাজগণের সাম্রাজ্য দেখিতে পাওয়া যায়। পশ্চিম ভারতের "আহারবারা" (মিঃ সেরিং), এবং রাঢ় দেশীয় "গোপভূম" নামে তাহার নিদর্শন এখনও আছে। ৺ বটব্যালের মতানুসারে রাঢ় শব্দ লাঢ়, লাট (গোপ) শব্দেরই রূপান্তর মাত্র। ঘনরামের মনে পর্য্যন্ত ঢেকুরের গোপ ইছাই ঘোষ, ভল্ল কপদ রায় প্রভৃতি গোপরাজগণের প্রবাদ প্রবল ছিল। রাঢ়ে করণ রাজা থাকিলে তাহাদের প্রবাদ লোপ করিল কে? বঙ্গের অন্যতর শাসক জাতি মাহিষ্যকৈবর্ত্ত এবং উগ্রজাতি পুরাণে মগধের শাসনকারী "সংকীর্ণ ক্ষত্রিয়" বর্ণিত আছে। করণের বর্ণনা নাই কেন?

উত্তর ভারত ও মধ্য ভারতে আহীর রাজাদের অনেক শাখা এখনও বিস্তৃত আছে (সেরিং দ্রষ্টব্য)। বাঙ্গালায়ও রাজত্বকারী আভীর বংশের শাখা আছে। আবার ঘোষ শব্দ অতি প্রাচীন কাল হইতেই গোপজাতির সঙ্গে জড়িত দেখিতে পাই।

মহাভারতের ঘোষযাত্রার (গোপস্থানদর্শন) কথা সকলেই জানেন। পাণিনির "পুংযোগাৎ আখ্যায়াম্" এই সূত্র ভাষ্যে পতঞ্জলি "কূপে গর্গকুলম্। গঙ্গায়াং ঘোষঃ" এইরূপ লক্ষণার দৃষ্টান্ত দিয়াছিলেন। গঙ্গার শৈত্য ও পাবনত্বাদি গুণবিশিষ্ট গোপপল্লী "গঙ্গায়াং ঘোষঃ" বাক্যের অর্থ।

"হলশ্চ" এই পাণিনি সূত্রানুসারে ঘুষ্ ধাতুর উত্তর ভাবে ঘঞ্ করিয়া ঘোষ শব্দ নিষ্পন্ন করা হইয়াছে। ইহার অর্থ শব্দ। কিন্তু আভীরসংসৃষ্ট ঘোষ শব্দ শব্দ বিশেষ বুঝাইয়াছে। গোপগণ বনে পশুচারণ করা কালে

একরূপ বিশেষ নিনাদ করিত। সেই নিনাদ সংস্রবে গোপগণের পল্লী ঘোষ নামে খ্যাত হইয়াছিল। মেদিনীকার লিখিয়াছেন—

ঘোষ আভীরপল্ল্যাং স্যাৎ গোপাল-ধ্বনি-ঘোষকে।

অমরসিংহও বলিয়াছেন, ঘোষ আভীর পল্লী স্যাৎ। শেষে ঘোষবাসী গোপই ঘোষ হইয়াছিল। তাই শেষে সোম ঘোষ, ইছাই ঘোষ, রাম ঘোষ শ্যাম ঘোষ প্রভৃতি ঘোষ হইয়াছিল। ঘোষের সঙ্গে করণজাতির সংস্রব দেখা যায় না। তাম্রশাসনের "ঘোষকুল" শব্দ আমাদের অনুকূলে সাক্ষ্য দিতেছে।

কুল শব্দ সেই সেই জাতীয়গণ বুঝায়। 'ক্ষত্রিয়কুল ধর্ম্মকেতু'র কুল শব্দ ক্ষত্রিয়কুল বা ক্ষত্রিয় জাতি বুঝাইয়াছে। ক্ষত্র কুল, বৈশ্য কুল শব্দের অনেক প্রয়োগ আছে।

কুলং জনপদে গোত্রে সজাতীয়গণেঽপি চ
ভবনে চ তবৌ ক্লীবম্ (মেদিনী)॥

ক্ষত্রকুল, বৈশ্যকুল শব্দে ক্ষত্রিয়গোত্র, ক্ষত্রিয়ের বাড়ী ক্ষত্রিয়ের শরীর বুঝায় না, কিন্তু ক্ষত্রিয় জাতি বুঝায়। করণ জাতীয় ঘোষ উপাধি করণ জাতি অথবা করণ গোত্র বুঝায় না; কেননা সমস্ত করণের এক গোত্র নহে, সমস্ত করণ ঘোষ বংশও নহে। বস্তুতঃ ঘোষকুল শব্দে ঘোষ জাতি বুঝানই উদ্দেশ্য। কাজেই ঈশ্বর ঘোষ করণ না হইয়া গোপবংশজাত বুঝাইতেছে। যদি এক জাতির উপাধি অন্য জাতি পাইয়া থাকে, তবে গোপজাতি সেই ব্যাপারে অধমর্ণ না হইয়া উত্তমর্ণ হওয়াই স্বাভাবিক।

তাহার পর তাম্রফলকে যে সকল কর্ম্মচারী বর্ণিত হইয়াছেন, তাঁহারা জাতি বাচক শব্দ দ্বারা বর্ণিত হন নাই, কর্ম্মবাচক শব্দ দ্বারা। রাজন্য শব্দে অভিধান অনুসারে ক্ষত্রিয় বুঝায়, এবং সিদ্ধান্ত কৌমুদীকার রাজন্য শব্দে ক্ষত্রিয়াৎ শূদ্রাদাবুৎপন্ন বলিয়া ব্যাখ্যা করিয়াছেন। কিন্তু তাম্রশাসনে শাসন অর্থে প্রযুক্ত হইয়াছে। এমন কি তাম্রশাসনের করণ ও কায়স্থ শব্দ পর্য্যন্ত জাতিবাচক অর্থে প্রযুক্ত হয় নাই। তাহা হইলে একই করণ জাতি বুঝাইবার জন্য মহাকায়স্থ, মহাকরণাধ্যক্ষ, এবং লেখ (করণিক?) শব্দ ব্যবহৃত হইত না। চাটভট জাতীয় শব্দের জাতীয় শব্দে জাতি শব্দ নাই, সদৃশার্থক জাতীয়র্ প্রত্যয় আছে। পাণিনির "পুম্বৎ-কর্ম্মধারয়-জাতীয়-দেশীয়য়োঃ" এই সূত্রে জাতীয়র প্রত্যয়ান্ত শব্দের দৃষ্টান্ত দেখান হইয়াছে। কাজেই সমবেত কর্ম্মচারি-

গণ কে কোন্ জাতীয় তাহা বুঝিবার কোন উপায় নাই। শেষাংশে জাতি বাচক ব্রাহ্মণ শব্দ আছে। দানাদি পুণ্য কর্ম্মে ব্রাহ্মণ জাতির উল্লেখ প্রাসঙ্গিক, চারণের উল্লেখ হইতেও বাধা নাই,—কিন্তু হিন্দুর দানকর্ম্মে করণের উল্লেখ কেবল অপ্রাসঙ্গিক নহে—সদোষ।

এই সকল কারণে মৈত্রেয় মহাশয়ের "সকরণ" পাঠ অসমীচীন বলিয়া বোধ হয়। আর জাতিগোত্র প্রভৃতি শূন্য অকস্মাৎ ৩।৪ পুরুষের নাম উল্লেখ দেখিয়া বোধ হয়, তাম্রফলক সৃষ্টিকারী ব্যক্তি ঈশ্বরঘোষ সম্বন্ধে বেশী কিছু জানিতেন না। তবে তখন পর্য্যন্ত ঈশ্বর ঘোষের প্রবাদ প্রচলিত ছিল।

শ্রীবসন্তকুমার রায় এম্-এ, বি-এল।

মাহিষ্য ব্যাঙ্কিং এণ্ড ট্রেডিং কোং লিমিটেড

বার্ষিক অধিবেশন, ১৯১৩।

বিগত ২৭এ ডিসেম্বর শনিবার অপরাহ্ণ ৩ ঘটিকার সময় ৩৮ নং পুলিশ হাস-পাতাল রোডস্থ ভবনে মাহিষ্য ব্যাঙ্কিং এণ্ড ট্রেডিং কোম্পানীর অংশিদারগণের বার্ষিক সাধারণ সভার অধিবেশন হইয়াছিল। ম্যানেজিং ডাইরেকটার শ্রীযুক্ত বাবু গগনচন্দ্র বিশ্বাস বি, সি, ই, মহোদয় কংগ্রেসের ডেলিগেস্ নির্ব্বাচিত হইয়া করাচিতে গমন করায় অন্যতম ডাইরেক্টার শ্রীযুক্ত বাবু নরেন্দ্র নাথ দাস মহাশয় ম্যানেজিং ডাইরেক্টারের কার্য্য সম্পাদন করেন। নির্দ্ধারিত সময়ে ব্যারাকপুর কোর্টের মোক্তার বাবু জয় গোপাল দাস মহাশয়ের প্রস্তাবে এবং নদিয়া মেদিনীপুর নিবাসী শ্রীযুক্ত বাবু শ্রীহরি বিশ্বাস মহাশয়ের সমর্থনে শ্রীযুক্ত বাবু কেদার নাথ দাস মহাশয় সভাপতির আসন গ্রহন করিলে সহকারী সম্পাদক শ্রীযুক্ত বাবু রামপদ বিশ্বাস মহাশয় বাৎসরিক হিসাব ও রিপোর্ট পাঠ করেন।

উপস্থিত সভ্যগণ।

শ্রীযুক্ত বাবু নরেন্দ্র নাথ দাস।
,, ,, কেদার নাথ দাস।
,, ,, শ্রীহরি বিশ্বাস।
,, ,, রবি ভূষণ মান্না।

পণ্ডিত শ্রীযুক্ত বিভূতিভূষণ ভাগবতভূষণ
শ্রীযুক্ত বাবু শ্রীরাম চন্দ্র বিশ্বাস
,, ,, গৌরীকান্ত বিশ্বাস।
,, ,, শশধর বিশ্বাস।

শ্রীযুক্ত বাবু কুমুদাকান্ত সামন্ত।
" " নলপতি দাস।
" " কেদার নাথ রায় চৌধুরি।
" " জয়গোপাল দাস।
" " ধীরেন্দ্র নাথ দাস।
" " শৈলেন্দ্র নাথ দাস।
" " সত্যেন্দ্র নাথ দাস।
" " চণ্ডী চরণ দাস।
" " নিত্যানন্দ ভট্টাচার্য্য।

শ্রীযুক্ত বাবু আশুতোষ বিশ্বাস।
" " উপেন্দ্রনাথ বিশ্বাস।
পক্ষে প্রকৃসী শ্রীযুক্ত বাবু রামপদ বিশ্বাস।
শ্রীযুক্ত বাবু নগেন্দ্র নারায়ণ রায়।
" " বনমালী পাল পক্ষে প্রকৃসী
শ্রীযুক্ত বাবু নরেন্দ্রনাথ দাস।
" " ননীগোপাল দাস।
" " অবনী মোহন দাস।
প্রকৃসী শ্রীযুক্ত বাবু হরিদাস দাস, ইঞ্জিনিয়ার।

নির্দ্ধারণ।

১। সেক্রেটারীর রিপোর্ট পাঠ করা হইল।

২। ১৯১৩ সালের উদ্ব‌ৃত্ত পত্র মঞ্জুর করা হইল।

৩। বর্ত্তমান বৎসরে এই কোম্পানি শতকরা ৫৲ টাকা হিসাবে লভ্যাংশ দিতে সক্ষম হওয়ায় সভা সন্তুষ্ট হইলেন।

৪। যে সকল অংশীদার অদ্যাবধি তাঁহাদের অংশের সমস্ত টাকা পরিশোধ করেন নাই তাঁহারা লভ্যাংশ পাইবার অধিকারী হইবেন না।

৫। কোম্পানির যে সকল অংশীদার তাঁহাদের দেয় অংশের টাকার মধ্যে কেবল মাত্র এক বা দুই কিস্তি আদায় দিয়া গত দুই বা ততোধিক বৎসরের মধ্যে আর কিছুই আদায় দেন নাই আগামী ১৯১৪ সালের ডিসেম্বর মাস পর্য্যন্ত পুনরায় তাঁহাদের সময় দেওয়া হইল, তৎপরে কোম্পানি ঐ সকল অংশ বাজেয়াপ্ত করিয়া লইতে বাধ্য হইবেন।

৬। গত বৎসর যাঁহারা ডাইরেক্টার ছিলেন আগামী বৎসরও তাঁহারাই রহিলেন এবং তৎসঙ্গে নদিয়া দারিয়াপুর নিবাসী জমিদার শ্রীযুক্ত বাবু হীরালাল বিশ্বাস মহাশয় তাঁহার অংশের বক্রী ৪০০৲ টাকা পরিশোধ করিয়া দেওয়ায় আগামী বৎসরের জন্য তিনি পুনরায় এই কোম্পানির ডাইরেকটার নির্ব্বাচিত হইলেন।

৭। আগামী বৎসরের জন্য ৮০০৲ শত টাকা বজেট্ মঞ্জুর করা হইল।

৮। কোম্পানীর এজেন্ট দিগকে শতকরা দশ টাকা হিসাবে কমিশন দেওয়া হইবে স্থিরীকৃত হইল।

সেক্রেটারীর রিপোর্ট।

গত বৎসর সাধারণ সভায় ১৯১২ সালের ৩১ এ মার্চ্চ পর্য্যন্ত যে হিসাব প্রদত্ত হইয়াছিল তাহাতে দেখান হইয়াছে যে ঐ বৎসর কোম্পানির সর্ব্বমোট ১৭৯৪০ টাকার অংশ বিলি হইয়াছিল তন্মধ্যে ১১৭২৭ টাকা আদায় হইয়া ১০৬২৫ টাকা ব্যাঙ্কিং কার্য্যে নিযুক্ত করা হইয়াছিল এবং তাহাতে ৫৩৯৴৫ রিজার্ভ ফণ্ডে রাখিয়া ৩৭৫৷৷ অংশীদারগণ মধ্যে বিতরিত হইয়াছিল। বর্ত্তমানে ১৯১৩ সালের ৩১ এ মার্চ্চ পর্য্যন্ত যে হিসাব অংশীদারগণের নিকট প্রেরিত হইয়াছে তাহাতে দেখান হইয়াছে যে এই বৎসর কোম্পানির ১৮৮৮০ টাকার অংশ বিলি হইয়া ১২৩৩৬ টাকা আদায় হইয়াছে এবং এই টাকার মধ্যে ১২৩০০ টাকা ব্যাঙ্কিং কার্য্যে নিয়োজিত করিয়া যে লাভ হইয়াছে তন্মধ্যে ৪২৪৷৷৴১০ রিজার্ভ ফণ্ডে রাখিয়া ৪৪২, অংশীদারগণ মধ্যে লভ্যাংশ স্বরূপ বিতরণ করা হইবে স্থির করা হইয়াছে। তৎপরে ১৯১৩ সালের ১লা এপ্রেল হইতে বর্ত্তমান তারিখ পর্য্যন্ত ৭০০৲ টাকার নূতন অংশ বিলি হইয়াছে সুতরাং গত অধিবেশনের তারিখ হইতে বর্ত্তমান তারিখ পর্য্যন্ত ১৫৪০ টাকার নূতন অংশ বিলি হইয়াছে। গত কয়েক বৎসরের তুলনায় বর্ত্তমান বৎসরের কার্য্য কতকটা সন্তোষজনক হইলেও আশানুরূপ হয় নাই, কারণ মেদনীপুর জেলার কাথি প্রভৃতি যে সকল অঞ্চলে সভাসমিতি স্থাপন করিয়া অনেকগুলি টাকার অংশ বিলি হইবে আশা করিয়াছিলাম, প্রবল বন্যায় ঐ সকল অঞ্চলের মাহিষ্য ভ্রাতৃগণ বিপর্য্যস্ত হওয়ায় বর্ত্তমান বৎসরে আমরা তাঁহাদিগের নিকট হইতে কিছুই আশা করিতে পারি নাই। আগামী বৎসরে পুনরায় চেষ্টা করা যাইবে।

মেদিনীপুর জেলার কাঁথি অঞ্চলের কোন সম্ভ্রান্তবংশীয় মাহিষ্য পরিবার ভিন্নজাতীয় কোন মহাজনের নিকট ঋণ গ্রহণ করায় মহাজন তাঁহার সমস্ত সম্পত্তি নিলাম বিক্রয়ের দ্বারা আত্মসাৎ করিবার মতলব করিয়াছিল কিন্তু যথাসময়ে মাহিষ্য ব্যাঙ্কিং এণ্ড ট্রেডিং কোম্পানির নিকট আবেদন করায় কোম্পানি হইতে অল্প সুদে তাঁহাকে টাকা দিয়া ঐ সম্পত্তি রক্ষা করা হইয়াছে। এইরূপ ২৪ পরগণা ও নদিয়া জেলার দুইজন মাহিষ্য ভূম্যধিকারী মহাজনের ঋণ জালে জড়িত হইয়া ধ্বংশ হইবার উপক্রম হইয়াছেন, কিন্তু দুঃখের বিষয় কোম্পানির তহবিলে টাকা না থাকায় আমরা তাহার কিছুই করিতে পারি নাই। যদি কোম্পানির সমস্ত অংশগুলি বিলি হইয়া যাইত তাহা হইলে মাহিষ্য

ভ্রাতাগণকে আর অপরের নিকট ঋণ গ্রহণ করিয়া ধ্বংস প্রাপ্ত হইতে হইত না। ইহা ছাড়া কোম্পানির বাণিজ্য এবং কৃষিবিভাগ খুলিতে পারিলে জগতের মধ্যে মাহিষ্য জাতীর গৌরব চিরদিনের জন্য অক্ষুন্ন রহিয়া যাইত। পূর্ব্বেও বলিয়াছি এবং এখনও বলিতেছি যে, মাহিষ্য ব্যাঙ্কিং এণ্ড ট্রেডিং কোম্পানি কেবল মাত্র আপনার আমার লাভের জন্য নয় ইহা সমগ্র মাহিষ্য জাতির একটী কীর্ত্তিস্তম্ভ এবং বিশেষ আদরের জিনিষ। এই মাহিষ্য ব্যাঙ্কের উপরই মাহিষ্য জাতির ভাবী উন্নতি সম্পূর্ণরূপে নির্ভর করিতেছে, সুতরাং এই কোম্পানির উন্নতি সাধনের নিমিত্ত প্রত্যেক মাহিষ্য ভ্রাতারই যথাসাধ্য চেষ্টা করা কর্ত্তব্য

বঙ্গীয় মাহিষ্য সমিতির বাৎসরিক অধিবেশন।

সন ১৩২০ সাল।

বিগত ১৪ই পৌষ ইংরাজি ২৮এ ডিসেম্বর রবিবার অপরাহ্ণ ৪ ঘটিকার সময় কলিকাতা ৩৮ নং পুলিশ হাসপাতাল রোডে বঙ্গীয় মাহিষ্য সমিতির অধিবেশন হইয়াছিল। হুগলী, হাবড়া ২৪ পরগণা নদিয়া, মুর্শিদাবাদ, মেদিনীপুর, যশোহর, খুলনা, পাবনা, ফরিদপুর, রংপুর, দিনাজপুর বগুড়া প্রভৃতি বঙ্গের প্রত্যেক জেলা হইতেই সভ্য এবং প্রতিনিধি, সভ্যগণ উপস্থিত হইয়া সভার কার্য্য যোগদান করিয়াছিলেন।

হাইকোর্টের উকীল বাবু প্রকাশ চন্দ্র সরকার মহাশয়ের প্রস্তাবে এবং সর্ব্ব সম্মতিক্রমে ঢাকা কলেজের অধ্যাপক শ্রীযুক্ত বাবু ভূপতিনাথ দাস, এম্-এ. বি-এস-সি (লণ্ডন) মহাশয় সভাপতির আসন গ্রহণ করিলে সম্পাদক শ্রীযুক্ত বাবু নরেন্দ্রনাথ দাস মহাশয় সমিতির আয় ব্যয়ের হিসাব ও কার্য্যাবলী পাঠ করেন। তৎপরে পাবনা মাহিষ্য সমিতির প্রতিনিধি শ্রীযুক্ত দীন নাথ দাস পণ্ডিত মহাশয় পাবনা টাউনহলে তত্রত্য জালিকগণ কর্ত্তৃক কৃত্রিম মাহিষ্য সভার প্রতিবাদ কল্লে তাহার কৃত্রিমতা সভ্যগণকে বিশদভাবে বুঝাইয়া দেন। দ্বিতীয় বক্তা পণ্ডিত শ্রীযুক্ত শ্রীধরচন্দ্র ভক্তি রত্ন মহাশয় মাহিষ্য জাতির কর্ত্তব্যাকর্ত্তব্য সম্বন্ধে আলোচনা করেন এবং শূদ্রোচিত ব্যবহার যে মাহিষ্য জাতির সর্ব্বতোভাবে পরিত্যাজ্য তাহা বিশেষভাবে বুঝাইয়া দেন।

৩য় বক্তা হুগলী জেলার উগারদহ নিবাসী পণ্ডিত শ্রীযুক্ত নারায়ণ চন্দ্র কাব্যরত্ন মাহিষ্য জাতীর শারিরীক, মানসিক এবং আধ্যাত্মিক উন্নতি সম্বন্ধে একটী সুন্দর বক্তৃতা করেন।

৪র্থ বক্তা ভ্রান্তিবিজয় প্রণেতা শ্রীযুক্ত বাবু হরিশ চন্দ্র চক্রবর্ত্তি মহাশয় "একমাত্র শিক্ষার অভাবই যে মাহিষ্য জাতীর উন্নতির অন্তরায়" তাহা ওজস্বিনী ভাষায় সকলকে বুঝাইয়া দেন।

হাইকোর্টের উকিল শ্রীযুক্ত বাবু প্রকাশ চন্দ্র সরকার কৃষি এবং গোরক্ষা বিষয়ে আলোচনা করেন। তৎপরে সভাপতি মহাশয় একটী সুন্দর সারগর্ভ বক্তৃতা দ্বারায় মাহিষ্য জাতির কর্ত্তব্য সকল নির্দ্ধারণ করিয়া বলেন যে মাহিষ্য সমাজে শিক্ষার বিস্তৃতি ব্যতীত মাহিষ্য জাতির উন্নতি অসম্ভব; শিক্ষা বিস্তারের সঙ্গে সঙ্গে মাহিষ্য জাতীয় ছাত্রদিগের সহিত অপর জাতীয় ছাত্রদিগের যতই আলাপ পরিচয় হইবে, ও পরস্পরের সহিত বন্ধুত্ব স্থাপিত হইবে, মাহিষ্য জাতির প্রতি অপরাপর জাতির যে ঈর্ষা ও বিদ্বেষ এক্ষণে রহিয়াছে, তাহা ততই তিরোহিত হইবে। মাহিষ্য জাতি নিতান্ত দরিদ্র; সমাজে কয়েকটী ধনবান লোক আছেন বটে; কিন্তু তাঁহাদিগের সংখ্যা সমগ্র জাতির সংখ্যার তুলনায় অতি অল্প। দানবীর হাজি মহম্মদ মহসীন বিপুল অর্থদান করিয়া মুসলমান ছাত্রদিগের বিদ্যাভ্যাসের সুবিধা করিয়া দিয়া যেরূপ চিরঃস্মরনীয় হইয়াছেন, মাহিষ্য জাতির ভিতর বোধ হয় এমন কেহই নাই যিনি মাহিষ্যদিগের মধ্যে শিক্ষা বিস্তারের জন্য ঐরূপ দান করিয়া চিরস্থায়ী কীর্ত্তিস্তম্ভ স্থাপিত করিতে পারেন। কিন্তু সমগ্র মাহিষ্য জাতি একমনে একপ্রাণে একত্রিত হইয়া যাঁহার যেমন সাধ্য সেইরূপ দান করিয়া অক্লেশেই যথেষ্ট টাকা তুলিতে পারেন এবং তদ্দ্বারা উপযুক্ত দরিদ্র মাহিষ্য-ছাত্রদিগকে বৃত্তি দানে বা অপরাপর উপায়ে সাহায্য করিয়া তাহাদিগের ম্যাট্রিকুলেশন পরীক্ষার পরে কলেজে অধ্যয়ন করিবার সুবিধা করিয়া দেওয়া যাইতে পারে।

এই বৃহৎ ব্যাপার কেবল মাত্র বার্ষিক সাহায্যে চলিতে পারে না ইহার জন্য প্রথমে যাঁহার যেরূপ ক্ষমতা, সেই রূপ এককালীন দান করিয়া ভাণ্ডার স্থাপিত করা আবশ্যক এবং পরে যথাসাধ্য মাসিক বা বাৎসরিক দান করিয়া ভাণ্ডারের পরিপুষ্ট করা প্রয়োজনীয়। যদি প্রত্যেক মাহিষ্য ন্যূনকল্পে তাঁহার মাসিক আয়ের দশমাংশ ভাণ্ডার স্থাপনের জন্য এককালীন দান করেন এবং পরে মাসিক আয়ের উপর শতকরা এক টাকা বার্ষিক চাঁদাস্বরূপ দেন, অর্থাৎ যাহার মাসিক আয় একশত টাকা, তিনি যদি দশটাকা এককালীন দান করেন এবং বাৎসরিক এক টাকা করিয়া চাঁদা দেন তাহা হইলেও যে জাতির সংখ্যা বিশ লক্ষ, সে জাতি প্রভূত অর্থ সংগ্রহ করিতে পারে, এবং যেমন ক্ষুদ্র তুষার কণা একত্রিত হইয়া বিস্তৃত হিমালয় পর্ব্বতকে তুষার কিরিটী নামে অভিহিত করিয়াছে, অদ্যকার তারিখে সংগৃহীত কয়েকটি টাকা ক্রমশঃ বঙ্গ দেশের এক প্রান্ত হইতে অপর প্রান্ত পর্য্যন্ত দরিদ্র মাহিষ্য ছাত্রদিগকে সাহায্য করিতে পারে।

উপরি লিখিত প্রস্তাব সভাতে উপস্থিত সকলেই সাদরে এবং সোৎসাহে গ্রহণ করেন এবং কলিকাতা ডিভিসনের ইঞ্জিনিয়ার শ্রীযুক্ত বাবু হরিদাস দাস মহাশয় তৎক্ষণাৎ সভাপতি মহাশয়কে ১০৲ টাকা দিয়া বলেন যে শিক্ষাবিস্তারের জন্য যে ধনভাণ্ডার স্থাপিত হইবে, ঐ দশ টাকা তাহার কেন্দ্র স্বরূপে প্রতিষ্ঠিত হউক। তাঁহার উচ্চ আদর্শে অপরাপর সভ্য মহোদয়দিগের মধ্যে কেহ কেহ ভাণ্ডারের জন্য কিছু কিছু দান করেন। এবং আরও অনেকেই এককালীন দান ও বার্ষিক এবং মাসিক সাহায্য করিতে প্রতিশ্রুত হইলেন। এই সকল সমাজহিতৈষী মহাশয় দিগের তালিকা নিম্নে প্রদত্ত হইল।

নাম ধাম	এক কালীন দান।
শ্রীযুক্ত বাবু প্রসন্ন কুমার চৌধুরী জমিদার জানবাজার কলিকাতা	৫০০৲
,, ,, নরেন্দ্র নাথ দাস, সম্পাদক বঙ্গীয় মাহিষ্য সমিতি	৫০০৲
মিঃ বি এন্ সাষমল্ বারিষ্টার কলিকাতা	১০০৲
শ্রীযুক্ত বাবু হরি দাস দাস ইঞ্জিনিয়ার বকুলবাগান রোড কলিকাতা	১০০৲
,, ,, প্যারী মোহন সিকদার উকীল হাইকোর্ট	৫০৲
,, ,, ক্ষীরোদ নারায়ণ ভুঞা ,, ,,	৫০৲
,, ,, রাম কৃষ্ণ মণ্ডল বি এল ,, ডায়মণ্ড হারবার	৫০৲
ডাক্তার শ্রীযুক্ত বাবু সতীশ চন্দ্র দাস কলিকাতা	৫০৲
মিঃ বি, এন্, শাসমল ব্যারিষ্টার হাইকোর্ট (বার্ষিক সাহায্য)	৬০৲
ডাক্তার শ্রীযুক্ত যোগেন্দ্র নাথ বিশ্বাস সাং চিথোলিয়া নদিয়া	১০৲
শ্রীযুক্ত বাবু কৃষ্ণদাস মণ্ডল বি, এল, ব্যারাকপুর কোর্ট	২৲
শ্রীযুক্ত বাবু প্রকাশ চন্দ্র সরকার বি এল, উকীল হাইকোর্ট	৫৲
শ্রীযুক্ত বাবু ভূপতিনাথ দাস এম, এ, বি, এস্, সি, (লণ্ডন)	১০৲
শ্রীযুক্ত বাবু শ্যামাচরণ সরকার সাং ভবানীপুর	১৲
,, গোবিন্দ চন্দ্র মণ্ডল বি. এ, হেডমাষ্টার সসাটি হাই-স্কুল	৫৲
,, হরিশ চন্দ্র চক্রবর্ত্তী সাং ছুল্যা	৫৲
,, বাবু প্রকাশ চন্দ্র সরকার সব ডেপুটী বালুর ঘাট	৫৲
,, ভুতনাথ প্রামাণিক সসাটী হাই-স্কুল	২৲
,, নিরঞ্জন মাইতি জমিদার অরফুলি হাওড়া	৫৲
,, হরিদাস দাস ইঞ্জিনিয়ার বকুলবাগান রোড, ভবানীপুর	১০৲
শ্রীযুক্ত বাবু প্রমদাপ্রসন্ন বিশ্বাস ডাক্তার সাং বাড়াদি নদিয়া	৫৲

নাম ধাম।	বার্ষিক সাহায্যের পরিমাণ।
,, দেবেন্দ্রনাথ দাস নস্কান, বরনগর	১৲
,, কৃষ্ণকালী রায় সাং চেতলা	৫৲
,, সীতানাথ সরকার সাং ফুলবাড়ী পাবনা	২৲
,, রমেশচন্দ্র তালুকদার সাং বান্দাইখাড়া রাজসাহী	১৲
,, নিরাপদ অধিকারী সাং কালিপুর নদিয়া	২৲
,, নবকৃষ্ণ সরকার সাং আমডাহারা মুর্শিদাবাদ	১৲
,, যোগেন্দ্রনাথ পট্টনায়ক সং দ্বারিবেড়্যা মেদিনীপুর	১৲

কাচাড়াপাড়া নিবাসী শ্রীযুক্ত বাবু প্রিয়নাথ দাস মহাশয় সাহিত্য ব্যাঙ্কিং এণ্ড ট্রেডিং কোংর একশত টাকার অংশের বাৎসরিক লভ্যাংশ এই শিল্প ভাণ্ডারের উন্নতি কল্পে দান করিবেন বলিয়া প্রতিশ্রুত হইলেন।

তৎপর মেদিনীপুর জেলার মহিষাদলের অন্তর্গত জগৎপুর নিবাসী পণ্ডিত শ্রীযুক্ত বিপিন চন্দ্র শ্রুতিধর মহাশয় সামবেদের যে ভাষ্য প্রণয়ন করিয়াছেন, অর্থাভাব বশতঃ উহা ছাপা শেষ হইতেছে না এই প্রস্তাব সভাস্থলে উথাপিত হইলে নদিয়া চিথোলিয়া নিবাসী ডাক্তার শ্রীযুক্ত বাবু যোগেন্দ্রনাথ বিশ্বাস এককালীন ১০৲ টাকা সাহায্য করায় সভাস্থ ব্রাহ্মণ মণ্ডলী তাঁহাকে আশীর্ব্বাদ এবং স্বজাতী বৃন্দ ধন্যবাদ প্রদান করিলেন। আরও কেহ কেহ এই ব্রাহ্মণকে কিছু কিছু সাহায্য করিয়াছেন।

পরিশেষে হুগলী জেলার শ্রীরামপুর মহকুমার অন্তর্গত মধ্য হিজলা নিবাসী শ্রীযুক্ত পাঁচকড়ি চক্রবর্ত্তী মহাশয় স্বহস্তে গ্রামোফোন নির্ম্মাণ করিয়া গবর্ণমেণ্ট শিল্প প্রদর্শনী হইতে স্বর্ণপদক পুরস্কার পাইয়াছেন দেখিয়া সভাস্থ সকলেই বিশেষ সন্তুষ্ট হইলেন।

তৎপর রাখালচন্দ্র ভাগবতরত্ন মহাশয় সুললিত কণ্ঠে মধুর সংগীত দ্বারা সভাপতি মহাশয়কে ধন্যবাদ প্রদান করিলে সভার কার্য্য শেষ হইল।

সভ্যের চাঁদা আদায়।

(বার্ষিক সভার দিবস আদায়)

শ্রীযুক্ত	যোগেন্দ্রনাথ বিশ্বাস সাং চিথোলিয়া নদিয়া	১৲
,,	ভুপতিনাথ দাস এম, এ, ওয়ারিয়া ঢাকা	২৲
,,	শ্রীশচন্দ্র সরকার সাং নাটোর সিটি রাজসাহি	১৲
,,	বৃন্দাবনচন্দ্র সরকার ভবানীপুর কলিকাতা	১৲
,,	সীতানাথ সরকার সাং ফুলবাড়ী পাবনা বাকী মধ্যে আদায়	২৲
,,	কুমুদাকান্ত সামন্ত সাং তারকেশ্বর হুগলী	১৲
,,	মহীতোষ বিশ্বাস বি, এল, কৃষ্ণনগর নদিয়া	২৲
,,	শ্যামাচরণ সরকার সাং ভবানীপুর কলিকাতা	৲
,,	অনন্তরাম দাস সাং সোনাই	১৲
,,	নিরঞ্জন মাইতি সাং অরফুলি হাওড়া	১৲
,,	মেঘনাথ সরকার সাং আমডাহারা মুর্শিদাবাদ	১৲
,,	রাধাবিনোদ চৌধুরী সাং খোলাহাসী রংপুর	২৲
,,	ভোলানাথ সরকার সাং ভবানীপুর কন্যার বিবাহ উপলক্ষে	২৲
,,	দয়াল চন্দ্র দাস দিনাজপুর	১৲
,,	বিধু ভূষণ মজুমদার ঐ	১৲
,,	রাখাল কৃষ্ণ বিশ্বাস কুরুশা নদীয়া	১৲
,,	দেবেন্দ্র নাথ জোয়ার্দ্দার ঐ	১৲
,,	রাধা সুন্দর রায় রায়পুর মুর্শিদাবাদ	১৲
,,	যোগেন্দ্র নারায়ণ দাস সাহাবাদ ঐ	১৲
,,	দয়াল চাঁদ বৈদ্য উকিল ডায়মণ্ড হারবার	১৲
,,	কেদার নাথ দাস উকিল ঐ	১৲
,,	শ্রীশচন্দ্র পুরকাইত উকীল ঐ	১৲
,,	নারায়ণ পদ দাস উকিল ঐ	১৲
,,	গঙ্গাধর হালদার মোক্তার ঐ	১৲
,,	নিলমনি ভাণ্ডারি মোহরার ঐ	১৲
,,	কিশোরি মোহন মৃদ্যা ঐ	১৲

বঙ্গীয় মাহিষ্য সমিতি (সেক্রেটারীর রিপোর্ট)।

১৯১২ সালের ৩১এ ডিসেম্বর হইতে ১৯১৩সালের ২৭এ ডিসেম্বর

পর্য্যন্ত আয় ব্যয়ের হিসাব।

জমা—

গত বৎসরের জের
——————— ৯॥৵৫

গত সভার দিন আদায়
যাহা কার্য্য বিবরণীতে
প্রকাশিত হইয়াছে
——————— ৬৫৲

মেম্বর ফি
শ্রীযুক্ত মহেন্দ্রনাথ মহান্তি
সাং গোপেন্দ্র নিকেতন
জেলা মেদিনীপুর
——————— ১৲

দুর্য্যোধন ধাওয়া
সাং রাণাপাড়া
জেলা হাওড়া
——————— ১৲

বিহারী লাল বিশ্বাস
সাং গোপীনাথপুর
জেলা নদিয়া
——————— ১৲

দেবেন্দ্রনাথ দাস
সাং চাতরা
শ্রীরামপুর হুগলী
——————— ২৲

দেবনাথ মজুমদার
গত তিন বৎসরের মেম্বর
ফি ৩৲ হিঃ
——————— ৯৲

খরচ —

সার্ভিস কমিসনের জন্য
প্যাম্পলেট ছাপাইবার
খরচ
——————— ৪০৲

সাহিত্য পরিষদের চাঁদা
——————— ১৲

সভার দিন সমাগত ভদ্র
লোকদিগের জন্য
——————— ৬/০

পোষ্টেজ ষ্ট্যাম্প
——————— ১১॥/০

ট্রামভাড়া ইত্যাদি
খরচ
——————— ১।৵১০

জমা		খরচ	
পূর্ব্বপৃষ্ঠার জের	৮৮৷৷৵৫	পূর্ব্বপৃষ্ঠার জের	৬০৴১০
শ্রীযুক্ত বনমালী পাল সাং চন্দন নগর হুগলী	৬৲	ষ্টেশনারি খরচ	৸৴১০
বিবাহ বৃত্তি শ্রীযুক্ত নবীন কৃষ্ণ রায় সাং শ্যাম নগর নদিয়া কন্যার বিবাহ উপলক্ষে	৫৲	টেলিগ্রাম খরচ	৩৲
হীরালাল হালদার মাঃ শ্রীযুক্ত অতুলকৃষ্ণ সরকার, ভবানীপুর	১৲	রাম চরিত খরিদ	২৲
শ্রীযুক্ত হরিদাস দাস সাং বকুল বাগান রোড ভবানীপুর কন্যার বিবাহ উপলক্ষ্যে	৫৲	সেন্সস রিপোর্ট খরিদ	১৪৲
শ্রীযুক্ত পুণ্যরঞ্জন রক্ষিত মহাশয়ের বিবাহ উপলক্ষ্যে	২৲	রমানাথপুর মাহিষ্য সমিতিকে হাওলাত	১০৲
হাওলাত জমা শ্রীযুক্ত বাবু নরেন্দ্রনাথ দাস	৩২০৲	মাহিষ্য ব্যাঙ্কের হাওলাত শোধ	১১০৷৷০
মাহিষ্য ব্যাঙ্কের নিকট হইতে লভ্যাংশ মধ্যে সিকি প্রাপ্ত	১১১ ৸৶	১৩১৭ সাল হইতে ১৩১৯ সালের চৈত্র তক ৪১৯ টাকা মধ্যে বাড়ী ভাড়া	৩০২৲
	৫২১ ৷৷৵৫		৫০২৲৷৷০

উপরে বঙ্গীয় সাহিত্য সমিতির যে হিসাব প্রদত্ত হইল তাহাতে দেখা যাইতেছে যে সমিতির তহবিলে এখন কেবল মাত্র ১৯/৫ মজুত রহিয়াছে, কিন্তু সমিতির ঘর ভাড়ার নিমিত্ত পুনরায় ৩০২ টাকা হাওলাত করিতে হইয়াছে, সাহিত্য ব্যাঙ্কের নিকট ১৯০৪ সালে সমিতি যে ৮৭৬৷৶০ কর্জ্জ করিয়াছিলেন গত কয়েক বৎসর মধ্যে তাহার কিছু কিছু করিয়া পরিশোধ করিয়া এখন উক্ত ঋণের মধ্যে ২৬০/১০ বাকী আছে, সমিতির সভ্যগণের নিকটও প্রায় ৭২০ পরিমাণ পাওনা আছে যদি সভ্যগণ তাঁহাদের দেয় টাকা পরিশোধ করিয়া দেন তাহা হইলে সমিতি ঋণমুক্ত হইয়া প্রয়োজনীয় কার্য্য সকলে হস্তক্ষেপ করিতে পারেন আশা করি সভ্যগণ এ বিষয়ে বিশেষ মনোযোগ দিয়া সমিতির উন্নতিকল্পে সহায়তা করিবেন।

২। বিভিন্ন জেলার সাহিত্য সমাজের সহিত পরস্পর যৌন সম্বন্ধ স্থাপনের যে প্রস্তাব গৃহীত হইয়াছিল গত কয়েক বৎসর মধ্যে ঐ প্রস্তাব অনেকটা কার্য্যে পরিণত হইয়াছে, হুগলী হাওড়া ২৪ পরগণা, নদিয়া এবং মেদিনীপুর জেলার সহিত কয়েকটী বিবাহ কার্য্যও ইতি মধ্যে সমাধা হইয়াছে।

৩। গত বৎসরে নিম্ন লিখিত পল্লী সমিতিগুলি স্থাপিত হইয়াছে।

(১) খয়রা মারি সাহিত্য পল্লীসমিতি জেলা নদিয়া।

(২) খাগড়া সাহিত্য সমিতি জেলা মুর্শিদাবাদ।

(৩) গাজিপুর সাহিত্য সমিতি জেলা মালদহ।

(৪) চণ্ডীপুর সাহিত্য সমিতি (সাতখানি গ্রাম লইয়া প্রতিষ্ঠিত) জেলা মালদহ।

কোতোয়ালি সাহিত্য সমিতি (৩ খানি গ্রাম লইয়া স্থাপিত) জেলা মালদহ।

(৬) বিরামপুর সাহিত্য সমিতি (৮ খানি গ্রাম লইয়া স্থাপিত) জেলা মালদহ।

(৭) বাউলি সাহিত্য সমিতি কেন্দ্রস্থান চাঁদপুর জেলা মালদহ।

(৮) কাহুয়া পল্লী সমিতি জেলা মেদিনীপুর।

(৯) সাহাবাদ সাহিত্য সমিতি	জেলা	মুর্শিদাবাদ।
(১০) ফরিদপুর সাহিত্য-সমিতি	,,	,,
(১১) মমরাজপুর সাহিত্য-সমিতি	,,	,,
(১২) ঘোড় ঢাকা সাহিত্য-সমিতি	,,	,,
(১৩) রাম নগর সাহিত্য-সমিতি	,,	,,
(১৪) বহু পাড়া সাহিত্য-সমিতি	,,	,,

(১৫) চিথোলিয়া মাহিষ্য-সমিতি জেলা নদিয়া
(১৬) কুলিয়া-ভাটোরা মাহিষ্য-সমিতি জেলা হাওড়া
(১৭) অম্বুলি মাহিষ্য-সমিতি জেলা হাওড়া
(১৮) খোষালপুর মাহিষ্য-সমিতি ,,
(১৯) বড় মোহরা মাহিষ্য-সমিতি ,,
(২০) কাঠালপোতা মাহিষ্য-সমিতি ,,
(২১) বিশাপুর মাহিষ্য-সমিতি ,, মেদিনীপুর
(২২) তাজপুর মাহিষ্য-সমিতি ,, জেলা হাওড়া
(২৩) কালীপুর মাহিষ্য-সমিতি জেলা নদিয়া এই সমিতি বঙ্গীয় মাহিষ্য-সমিতিকে বাৎসরিক অন্ততঃ ১০৲ করিয়া সাহায্য করিবেন বলিয়া প্রতিশ্রুত হইয়াছেন।

৪। বঙ্গীয় মাহিষ্য-সমিতির উদ্‌যোগে কলিকাতাবাসী মাহিষ্য ছাত্রদিগকে লইয়া যে বঙ্গীয় মাহিষ্য ছাত্রসম্মিলনী সংগঠিত হইয়াছে হাইকোর্টের খ্যাতনামা উকিল মাননীয় শ্রীযুক্ত বাবু মহেন্দ্রনাথ রায় মহাশয়ের সুযোগ্য পুত্র শ্রীযুক্ত মন্মথনাথ রায় এম, এ, বি, এল, (রায়চাঁদ প্রেমচাঁদ স্কলার) মহাশয় তাহার সভাপতি এবং ধনপতি দাস এম,এ, মহাশয় তাহার সম্পাদক নিযুক্ত হইয়া ছাত্র সম্মিলনীয় উন্নতি জন্য বিশেষ যত্ন এবং চেষ্টা করিতেছেন।

৫। বঙ্গীয় মাহিষ্য-সমিতির উদ্‌যোগে প্রত্যেক জেলাতেই কিছু কিছু করিয়া স্কুল পাঠশালা এবং বালিকা বিদ্যালয় স্থাপিত হইতেছে।

৬। ব্রহ্মচর্য্য আশ্রম :—মাহিষ্য এবং তদ্‌যাজী, ব্রাহ্মণ বালকগণের বিদ্যাশিক্ষার নিমিত্ত যে ব্রহ্মচর্য্য আশ্রম স্থাপিত হইয়াছে তাহাতে বর্ত্তমানে ১২ জন বালক প্রতিপালিত হইয়া সংস্কৃত এবং অন্যান্য কলেজে লেখা পড়া শিক্ষা করিতেছে, যশোহর জেলার পুরন্দরপুর নিবাসী আশ্রম বালক শ্রীমান কান্তিভুষণ ভট্টাচার্য্য গত বৎসর সংস্কৃত কলেজ হইতে ম্যাট্রিকুলেসন পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়াছেন, মেদিনীপুর জেলা নিবাসী শ্রীমান সুধাকুমার চক্রবর্ত্তী গত বৎসর সংস্কৃত কলেজ হইতে কাব্যের মধ্যে পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়াছিলেন বর্ত্তমান বৎসরে তিনি ঐ কলেজের প্রথম শ্রেণীতে পড়িতেছেন এবং উহার সহিত কাব্যের উপাধি পরীক্ষার জন্যও প্রস্তুত হইতেছেন। আর আর বালকগণ মধ্যে অনেকেই এফে পরীক্ষার জন্য প্রস্তুত হইতেছেন কিন্তু দুঃখের বিষয় এরূপ একটী মহৎ কার্য্যের প্রতি মাহিষ্য ভ্রাতাগণের সহানুভূতি পাইলাম না।

যাঁহারা সাহায্য করিবেন বলিয়া প্রতিশ্রুত হইয়াছিলেন তাঁহাদের মধ্যে অনেকেই দুই একবার মাত্র কিছু কিছু সাহায্য করিয়া পশ্চাদ্‌পদ হইয়াছেন। এখন এই দ্বাদশটী বালকের ব্যয় ভার একজনের উপরই চাপিয়া পড়িয়াছে যদি সাহিত্য ভ্রাতাগণ সকলেই এই কার্য্যে সহায়তা না করেন তাহা হইলে একা একজনের দ্বারা এই বিরাট ব্যাপার সাধন করা যে কতদূর কষ্টকর তাহা বোধ হয় সকলেই অনুভব করিতে পারিবেন।

এই আশ্রম বালকদিগের সহায়তার নিমিত্ত ইটালি নিবাসী জমিদার শ্রীযুক্ত বাবু যদুনাথ সরকার মহাশয় প্রায় ৫০৲ টাকার পুস্তক এবং ভবানীপুর বকুলবাগান নিবাসী স্বনামধন্য ইঞ্জিনিয়ার শ্রীযুক্ত বাবু হরিদাস দাস মহাশয় প্রায় ৭৭ টাকা মূল্যের শীত বস্ত্র প্রদান করিয়া অশেষ কল্যাণ সাধন করিয়াছেন, আমরা আশা করি, সাহিত্য ভ্রাতাগণ সকলেই আশ্রম বালকগণের প্রতি এইরূপ দৃষ্টি রাখিবেন।

৭। বঙ্গীয় সাহিত্য-সমিতির উদ্দেশ্য প্রচারের নিমিত্ত সাহিত্য সমাজ নামক যে মাসিক পত্র প্রকাশ করা হইতেছে ১৯১২ সালের অধিবেশনের সময় তাহার ১৩১৭ এবং ১৩১৮ সালের হিসাব দেওয়া হইয়াছিল এবং তাহাতে দেখান হইয়াছিল যে ১৩১৭ সালের দরুণ সমাজের ৪৮৸৴৫ এবং ১৩১৮ সালের দরুণ ১১৫।৴২॥ হাওলাত হইয়াছিল, বর্ত্তমানে ১৩১৯ সালের এবং ১৩২০ সালের মাহ অগ্রহায়ণ পর্য্যন্ত একটী হিসাব সভ্যগণের নিকট দেওয়া যাইতেছে—

সন ১৩১৯ সাল

জমা		খরচ	
গ্রাহকদিগের নিকট আদায়	৯৭৩।০	বৈশাখ হইতে অগ্রহায়ণ পর্য্যন্ত যাহা কার্য্য বিবরণীতে প্রকাশিত হইয়াছে	৬৫৯৸৴১০
বিজ্ঞাপন	২৮৲	পৌষ হইতে চৈত্র পর্য্যন্ত পোষ্টেজ খরচ এবং ষ্টেশনারি	৭৫৲
	১০০১।০	প্রিণ্টিং	১৬৮৲
		দপ্তরি	৫৲
		যুগল ও কালীপদর বেতন	৬৮।৴০
		নিত্যানন্দের বেতন	২৪৲
			১০০০৶১০

সন ১৩২০ সালের অগ্রহায়ণ পর্য্যন্ত

জমা—

গ্রাহকদিগের নিকট আদায় — ৫৯১৸/০

১৩১৭, ১৩১৮ ও ১৩১৯ সালের সমাজ বিক্রয় — ৫৪৲

বিজ্ঞাপন দরুণ আদায় — ১৯৷০

পুস্তক বিক্রয়ের কমিশন প্রাপ্ত — ৩৯৷৵১০

মোট জমা— ৭০৪৸৶১০
মোট খরচ— ৫৬৯৸/৫

মজুত তহবিল ১৩৫৵৫

গ্রাহকদিগের নিকট প্রাপ্য ৪৯৩

খরচ—

প্রিন্টিং খরচ— ৩৪৪৲

পোষ্টেজ — ১৭৫৲

ষ্টেশনার এবং অন্যান্য খরচ — ১৮৸/৫

৫৩৭৸/৫

ঘড় ভাড়া — ৩২৲

৫৬৯৸/৫

পৌষ হইতে নাগাইত চৈত্র মোটামুটি খরচ।

পৌষ হইতে নাগাইদ চৈত্র প্রিন্টিং — ১৭২

পোষ্টেজ — ১০০৲

বেতন — ৯৬৲

ষ্টেশনারি— ১০৲

ঘর ভাড়া— ১৬৲

৩৯৪৲

উল্লিখিত হিসাবে দেখা যাইতেছে যে সন ১৩১৯ সালে লোকসান হয় নাই, বর্ত্তমান ১৩২০ সালেও যেরূপ দেখা যাইতেছে তাহাতে এ বৎসরও লোকসান না হইবারই সম্ভব, তবে দুঃখের বিষয় এই যে ২০ লক্ষ মাহিষ্যের মধ্যে এরূপ একখানি জাতীয় পত্রিকাও তাদৃশ সহানুভূতি পাইল না। প্রত্যেক জেলার প্রত্যেক পল্লীতে যদি একখানি করিয়া কাগজ বিলি হইত তাহা হইলে আমাদিগের বিশ্বাস যে অন্ততঃ পঞ্চাশ হাজার খানি বিলি হইতে পারিত; কিন্তু পঞ্চাশ হাজার দূরের কথা এক হাজারও পাওয়া দুষ্কর। হায় সমাজ! কতদিন আর এই ঘোর নিদ্রায় অভিভূত থাকিবে!

উদ্বোধন গীতি।

(বঙ্গীয় মাহিষ্য সমিতির ১৩২০ বার্ষিক অধিবেশনে গীত)

মনোহারিণী সুষমাশালিনী সমিতি-নলিনী বিকসতি।
প্রীতি-প্রতিমা মহামহিমা গৌরব-গরিমা বিলসতি॥
মদনমত্ত অরিকরি-স্বত্ব বিনষ্টো ভবতু সম্প্রতি।
মোহমেঘ-মুক্তঃ স্বকিরণযুক্ত অস্ত ভবতু প্রভাব-দিনপতি॥
জাড্যতুহিনং করোতু হীনং প্রভাব-তপন-তপ্ত জ্যোতিঃ।
কুহকতমসা কৃতান্ধদিশা লভ্যতামরমপগতিঃ॥
কীর্তিকিসলয়ং শুভ্রতানিলয়ং প্রাপ্নোতু বিস্তৃতিঃশাশ্বতী।
কৃত্যকিঞ্জল্কং কৃৎস্নমশঙ্কং শ্রয়তু শ্রিয়ঃ সমুন্নতিঃ॥
বীতবিরাগ পরমানুরাগ পদ্মিনীপরাগ পরিণতিঃ।
ভবতু ভব্য দুর্লভদিব্য গৌরব-সৌরভ-সন্ততিঃ॥
সত্যমমৃতং নিত্যমবিকৃতং সুন্দতাম্ সুমনঃসুপ্রীতি।
সত্যলোলুপ মুগ্ধমধুপ বিবুধ-বিনোদ-চেতো হৃতি॥
যে হি জ্ঞানান্ধা নীচাশয়া মন্দা যেষামতিশয়পাপমতিঃ।
সত্যমধুনা তেষামধুনা অন্ধনয়নদানগতিঃ॥
করোতুবাসং লসগুল্লাসং পদ্মে পদ্মালয়া সরস্বতী।
বিধায়শেষং সাপত্ন্যদ্বেষং ভবত্বিয়মাশা ফলবতী॥
প্রীয়তামত্র বদ্ধসৌহৃত্ত সমিতিপদ্মেন সভাপতিঃ।
যস্তহিহৃদি রীতি নীতি বিধি জ্ঞানগুণ নিধিঃ সুতিষ্ঠতি॥
ভারতসম্রাজি, সদ্গুণ-রাজি—রাজতে ভারতং সুশাসতি।
সত্যং জয়তি মিথ্যা ক্ষয়তি দ্বিজনারায়ণকৃতি গীতিঃ॥

The Mahishya Educational Trust.

(মাহিষ্য শিক্ষা বিস্তার ভাণ্ডার)

বিগত ২০ এ পৌষ রবিবার প্রাতে ৯ ঘটিকার সময় কলিকাতা ইটালি ৩৮নং পুলিশ হাসপাতাল রোড ভবনে মাহিষ্য শিক্ষা বিস্তার ভাণ্ডারের কার্য্য নির্ব্বাহক সভার গঠন উদ্দেশ্যে বঙ্গীয় মাহিষ্য সমিতির কার্য্য নির্ব্বাহক সভার একটি

অতিরিক্ত অধিবেশন হইয়াছিল। হাইকোর্টের খ্যাতনামা ব্যারিষ্টার মিঃ বি এন্ শাসমল উক্ত সভার সভাপতির আসন গ্রহন করিয়াছিলেন। সভাপতি মহাশয়ের প্রস্তাব অনুসারে এবং সর্ব্ব সর্ম্মতিক্রমে নিম্নলিখিত মহোদয়গণকে লইয়া উক্ত ভাণ্ডরের কার্য্য নির্ব্বাহক সভা গঠিত হইল।

সভাপতি মাননীয় শ্রীযুক্ত বাবু মহেন্দ্র নাথ রায় এম এ বি এল উকিল হাইকোর্ট এবং বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক সভার সদস্য।

সহঃ সভাপতি শ্রীযুক্ত বাবু ভূপতি নাথ দাস এম এ বি এস্ সি (লণ্ডন) প্রফেসার ঢাকা কলেজ।

" " " প্যারিমোহন সিকদার বি এ বি এল উকিল হাইকোর্ট।

" " " মন্মথ নাথ মণ্ডল, জমিদার পারুলিয়া, ডায়মণ্ডহারবার।

অবৈতনিক সম্পাদক মিঃ বি এন শাসমল ব্যারিষ্টার হাইকোর্ট

" সহঃ সম্পাদক শ্রীযুক্ত বাবু ধনপতি দাস এম এ

" " " " শ্যামাচরণ সরকার

" " " " প্রকাশ চন্দ্র সরকার বি এ বি এল উকিল হাইকোর্ট।

" ধনাধ্যক্ষ শ্রীযুক্ত বাবু হরিদাস দাস বি ই ইঞ্জিনিয়ার কলিকাতা।

" হিসাব পরীক্ষক ডাক্তার এস্ সি দাস: এল্ আর্ সি্ পি এণ্ড এস্ (এডিনবরা)

" শ্রীযুক্ত বাবু নারায়ন পদ দাস বি এল ডায়মণ্ডহারবার

এই ভাণ্ডারের উন্নতি কল্পে যাঁহারা সাহায্য করিতে ইচ্ছা করেন অনুগ্রহ পূর্ব্বক তাঁহারা যেন ১৫০ নং রসারোড সাউথ ভবানীপুর, কলিকাতা ঠিকানায় শিক্ষাভাণ্ডারের সম্পাদক ব্যারিষ্টার শ্রীযুক্ত বি এন্ শাসমল মহাশয়ের নিকট প্রেরণ করিবেন। নিয়মাবলী এবং অন্যান্য বিস্তৃত বিবরণ সত্বরেই প্রকাশিত হইবে।

(প্রাপ্তি স্বীকার।)

শ্রীযুক্ত বাবু হরিদাস দাস, বকুল বাগান, ভবানীপুর, কলিকাতা	১০৲
শ্রীযুক্ত বাবু সীতানাথ সরকার, ফুলবাড়ী, পাবনা	২৲
শ্রীযুক্ত বাবু যোগেন্দ্রনাথ বিশ্বাস, সাং চিথোলিয়া, নদীয়া	১৲
শ্রীযুক্ত বাবু নবকৃষ্ণ সরকার, সাং আমডহরা মুর্শিদাবাদ	১৲
শ্রীযুক্ত বাবু দেবেন্দ্রনাথ দাস, নস্তান বরাহনগর	১৲
শ্রীযুক্ত বাবু ভূতনাথ প্রামানিক, সসাটী হাইস্কুল হাওড়া	২৲
শ্রীযুক্ত বাবু জয়গোপাল দাস মোক্তার সোদপুর, ২৪ পরগণা	২৲
শ্রীযুক্ত বাবু মাণিক চন্দ্র দাস তালপুকুর বারাকপুর, ঐ	২৲

মাহিষ্য ব্যাঙ্কিং এণ্ড ট্রেডিং কোংর অংশীদারগণের

নাম ধাম ও অংশের পরিমাণ

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর)

৪৫৮। শ্রীযুক্ত বাবু পঞ্চুরাম নস্কর সাং সাইপুর ২৪ পরগণা ১০৲

৪৫৯। শ্রীযুক্ত বাবু কালীপদ চৌধুরী সাং কুলিয়া জেলা হাওড়া ২০০৲

৪৬০। ডাক্তার লালমোহন চক্রবর্ত্তী সাং পোড়াডাঙ্গা
চাকদহ পোঃ নদিয়া ১০৲

৪৬১। শ্রীযুক্ত বাবু কালীদাস মণ্ডল গ্রাম পোড়াডাঙ্গা
চাকদহ নদিয়া ১০৲

৪৬২। শ্রীযুক্ত বাবু পঞ্চানন বিশ্বাস গ্রাম পোড়াডাঙ্গা পোঃ
চাকদহ নদিয়া ১০৲

৪৬৩। ডাক্তার হাজারিলাল বিশ্বাস গ্রাম পোড়াডাঙ্গা
পোঃ চাকদহ নদীয়া ১০৲

৪৬৪। শ্রীযুক্ত বাবু যোগেন্দ্রনাথ বাগ গ্রাম তেঘাট
পোঃ তারকেশ্বর হুগলি ১০৲

৪৬৫। শ্রীযুক্ত বাবু বিধুভূষণ বিশ্বাস গ্রাম বালিয়াসিশা
পোঃ চিথোলিয়া নদীয়া ১০৲

ক্রমশঃ

বিবিধ প্রসঙ্গ।

পঙ্ক্তাশৌচ সংবাদ।

বিগত ১৮ই পৌষ শুক্রবার মাহিষ্য বান্ধব সম্পাদক পণ্ডিত শ্রীযুক্ত মহেন্দ্র নাথ তত্ত্বনিধি মহাশয়ের শ্বশুর পরলোকগত লালচাঁদ মণ্ডল মহাশয়ের আদ্য শ্রাদ্ধ সর্ব্ববাদিসম্মতি ক্রমে পক্ষাশৌচান্তে সুসম্পন্ন হইয়া গিয়াছে।

শোক-সংবাদ।

আমরা শোকসন্তপ্তচিত্তে প্রকাশ করিতেছি যে, ঢাকা জেলার অন্তঃপাতী মাণিকগঞ্জ মুন্সেফ কোর্টের প্রথিতনামা প্রবীন উকীল বাবু রামচন্দ্র রায় মহাশয় প্রায় ৭৫ পাঁচাত্তর বৎসর বয়সে স্বীয় জন্মভূমি: সিঙ্গাইর গ্রামে বিগত ১৬ই অগ্রহায়ণ দিবা দ্বিপ্রহরে ইষ্টমন্ত্র জপ করিতে করিতে ইহলোক পরিত্যাগ

করিয়া দিব্যধামে প্রস্থান করিয়াছেন। লোকান্তরিত উকিল বাবু দয়ালু, সৌজন্য-সম্পন্ন, উদারহৃদয় ও স্বজাতিবৎসল লোক ছিলেন। বহু দুঃস্থ ব্যক্তি তাঁহার করুণায় বিপন্মুক্ত হইয়াছে এবং দুর্দ্দিনে তাঁহার আশ্রয় লাভ করিয়াছে। তিনি মাহিষ্য সমাজের মাঙ্গলিক অনুষ্ঠানে প্রকাশ্যরূপে আনুগ্রহ সহকারে যোগদান করেন নাই বটে; কিন্তু বিনাড়ম্বরে নীরবে আজীবন এই দুস্থ সমাজের সেবা করিয়া গিয়াছেন। মাণিকগঞ্জ বারে রাজচন্দ্র বাবু একজন উপার্জ্জনশীল শ্রেষ্ঠ উকীল ছিলেন। তিনি প্রায় ৪০ বৎসর ওকালতী করেন। তাঁহার ব্যবসায়ের আরম্ভ হইতে শেষ পর্য্যন্ত বরাবর তাঁহার বাসায়, নিকট বা দূরসম্পর্কিত এবং ৭।৮ জন করিয়া মাহিষ্য-বিদ্যার্থী আহার ও বাসস্থান প্রাপ্ত হইয়া মানিকগঞ্জ উচ্চ ইংরেজী বিদ্যালয় বিদ্যোপার্জ্জনের সুবিধা প্রাপ্ত হইয়াছে। ভিন্ন জাতীয় ২।১টী বিদ্যার্থীও তাঁহার বাসায় আহার ও বাসস্থান প্রাপ্ত হইত। রায় মহাশয়ের অনুকম্পায় যাঁহারা মানুষ হইয়াছেন তাঁহাদের মধ্যে কেহ কেহ বেশ উপার্জ্জন-শীল হইয়া সুখে সংসারযাত্রা নির্ব্বাহ করিতেছেন। কিন্তু দুঃখের বিষয় তাঁহাদের কাহাকেও মাহিষ্য-সমাজের কোনরূপ মাঙ্গলিক অনুষ্ঠানে যোগদান করিতে দেখিতে পাই না। স্বজাতি বৎসল মহাত্মার অনুগ্রহে বিদ্যালাভ করতঃ সঙ্গতি-সম্পন্ন হইয়া স্বজাতির উন্নতি সম্বন্ধে এবম্বিধ উদাসীনতা প্রকাশ, শিক্ষা লাভের নিতান্ত শোচনীয় পরিণাম নহে কি? স্বর্গীয় রায় মহাশয় ১২।১৩ বৎসর হইল শ্রীধাম বৃন্দাবনে একখানা বাড়ী নির্ম্মাণ করতঃ তথায় শ্রীশ্রীরাধাকৃষ্ণ বিগ্রহ স্থাপন করিয়াছিলেন; ইদানীং অনেক সময় তথায় আসিয়া ভজন সাধন করিতেন। এই মহাত্মার বিয়োগে ঢাকার মাহিষ্য-সমাজ একটী উজ্জল রত্নহারা হইলেন, আমরা পরলোকগত উকীল বাবুর পরিজনবর্গের শোকে সমবেদনা প্রকাশ করিতেছি। ভগবান তাঁহাদিগকে এই নিদারুণ-শোক সংবরণ করিবার শক্তি প্রদান এবং স্বর্গীয় আত্মার সদ্‌গতি ও শান্তি বিধান করুন, ইহাই আমাদের একান্ত কামনা।"

মাহিষ্য সমাজের হিতকারী বাবু বলরাম মাইতি বিগত ১০ই অগ্রহায়ণ বুধবার সন্ধ্যাকালে দীর্ঘকালব্যাপী অম্লরোগে ইহলোক ত্যাগ করিয়াছেন। জ্ঞাতিবর্গ পক্ষদশাহ অশৌচ ত্যাগ করিয়াছেন। ইনি দরিদ্রের গৃহে জন্মগ্রহণ করিয়া সমাজের হিত কামনায় অকাতরে স্বার্থ বিসর্জ্জন করিয়াছেন। ইহার মত পরোপকারী সত্যবাদী ব্যক্তি অল্পই দৃষ্ট হয়, জগদীশ্বর শোকসন্তপ্ত পরিবারকে সান্ত্বনা প্রদান করুন, ইহাই আমাদের বিনীত প্রার্থনা।

মাহিষ্য-পল্লীসমিতি—বিগত ২৯ অগ্রহায়ণ তারিখে পূজ্যপাদ পণ্ডিত শ্রীযুক্ত বিভূতিভূষণ ভাগবত ভূষণ মহাশয়ের উদ্‌যোগে নদিয়া জেলার রাণাঘাট মহকুমার অধীন কালীপুর গ্রামে একটী বিরাট মাহিষ্য সভার অধিবেশন হইয়াছিল। নদিয়া পারকৃষ্ণপুর মাহিষ্যপল্লী সমিতির সম্পাদক শ্রীযুক্ত বাবু বিপ্রদাস বিশ্বাস কলিকাতা মাহিষ্য ছাত্র সম্মিলনীর অন্যতম সভ্য শ্রীমান প্রমথনাথ সিকদার বি, এস, সি, মাহিষ্য ব্যাঙ্কিং এণ্ড ট্রেডিং কোম্পানির সহকারী সম্পাদক শ্রীযুক্ত বাবু রামপদ বিশ্বাস, বঙ্গীয় মাহিষ্য-সমিতির প্রতিনিধি সভ্য বাবু বিজয়কৃষ্ণ দাস ও সীতক্ষীরা মাহিষ্য ছাত্রসম্মিলনীর ভূতপূর্ব্ব—সম্পাদক শ্রীযুক্ত ধীরেন্দ্রনাথ দাস প্রভৃতি মহোদয়গণ উপস্থিত হইয়া সভার কার্য্যে যোগদান করিয়াছিলেন। স্থানীয় মাহিষ্য কুলপুরোহিত পণ্ডিত শ্রীযুক্ত নিরাপদ অধিকারী মহাশয় সভাপতি পদে বৃত হইয়াছিলেন, মাহিষ্য জাতির কর্ত্তব্য, শিক্ষা বিস্তার, সমাজসংস্কার প্রভৃতি আবশ্যকীয় বিষয়ের আলোচনা হইয়াছিল। স্থানীয় বিদ্যালয়ের সুযোগ্য পণ্ডিত শ্রীযুক্ত ভগীরথ বিশ্বাস মহাশয়ের যত্নে বিদ্যালয়টী ক্রমশঃ উন্নতিলাভ করিতেছে দেখিয়া সভা সন্তুষ্ট হইলেন এবং এই সভা বাৎসরিক অন্ততঃ দশ টাকা করিয়া বঙ্গীয় মাহিষ্য-সমিতিকে সাহায্য করিতে প্রতিশ্রুত হইয়াছেন।

দান—মেদিনীপুর জেলার তমলুক পরগণার কাথর্দ্দা গ্রামের শ্রীযুক্ত রামকৃষ্ণ সামন্ত মহাশয় নিজগ্রামে 'রামকৃষ্ণ মধ্যইংরাজী' বিদ্যালয়ের জন্য ৭০০০৲ সাত হাজার টাকার উপর মূল্য একটী ভূসম্পত্তি দান স্বীকার করিয়াছেন এবং স্কুলের গৃহাদি নির্ম্মাণ করিবার জন্য ৩০০৲ তিন শত টাকা দিবেন এরূপ প্রতিশ্রুত হইয়াছেন, এজন্য তিনি সর্ব্বসাধারণের ধন্যবাদার্হ হইয়াছেন এরূপ দানশীল পুণ্যপ্রবর সদাশয়, সাধু ও ধার্ম্মিক মহাশয়ের দীর্ঘায়ু ও সর্ব্ববিষয়ে উন্নতিলাভ জগদীশ্বরের নিকট প্রার্থনা করিতেছি এবং অভীষ্ট সিদ্ধির আশাও প্রার্থনা করিতেছি।

সামাট মাহিষ্য সমিতি—১। মেদিনীপুর জেলার অন্তর্গত চেতুয়া পরগণার সামাট গ্রাম নিবাসী পূজনীয় শ্রীল শ্রীযুক্ত ভারতচন্দ্র পট্টনায়ক শ্রীযুক্ত বিক্রম জানা ও শ্রীযুক্ত ছোট অবিনাশচন্দ্র মাইতি প্রভৃতি মহোদয়গণের যত্নে গত ২৬শে কার্ত্তিক বুধবার উক্ত গ্রামবাসী শ্রীযুক্ত অবিনাশচন্দ্র পোড়্যার বাটীতে মাহিষ্য জাতির সমাজোন্নতি ও পক্ষাশৌচ প্রচলন সম্বন্ধে সভার অধিবেশন হয়।

শ্রীল শ্রীযুক্ত রাজা নরেন্দ্র লাল খাঁন বাহাদুরের পুরোহিত সভাপণ্ডিত মহামহোপধ্যাপক পণ্ডিত প্রবর পরমারাধ্য পরম পূজ্য শ্রীল শ্রীযুক্ত রাখালচন্দ্র ভট্টাচার্য্য মহাশয় সভাপতির আসন গ্রহণ করিয়াছিলেন। পণ্ডিত মহাশয় বহুবিধ শাস্ত্রানুশীল করাতে সমাগত ব্যক্তিগণ একচিত্তে সাদরে শ্রবণ করিয়া আপ্যায়িত হইয়া সকলে পণ্ডিত মহাশয়ের শ্রীচরণে লুণ্ঠিত-শীরে প্রণতিপূর্ব্বক সমাজোন্নতি বিষয় ও পঞ্চাশোচধারণাদির প্রতিজ্ঞা করিয়া পণ্ডিত মহাশয়কে আমাদের অজ্ঞান হৃদয়ে জ্ঞানদাতা বলিয়া ধন্তবাদের সহিত অভিনন্দন প্রদান করিয়া তাঁহার নিকট ব্যবস্থা পত্রে স্বাক্ষর করিতে প্রার্থনা করিলে পর পণ্ডিত মহাশয় ও সভাস্থ ব্রাহ্মণ পূজনীয় শ্রীযুক্ত বাবুলাল প্াহাড়ী ও শ্রীযুক্ত রামেশ্বর চক্রবর্ত্তী মহাশয় প্রভৃতি স্বাক্ষর করিয়া দিয়াছেন। এবং তৎসম্বন্ধে গ্রামস্থ ঠাকুর বাড়ীর মহান্ত রামদাস ঠাকুর মহাশয়ও মত প্রদান করিয়াছেন।

২। উক্ত সভায় পণ্ডিত মহাশয়ের আজ্ঞানুসারে উক্ত পরগণায় জোত গোবর্দ্ধন নিবাসী শ্রীযুক্ত বাবু উদয়চন্দ্র বেরা ও নাড়াজোল নিবাসী শ্রীযুক্ত বাবু চন্দ্রমোহন মাইতি ও শ্রীযুক্ত বাবু কৃষ্ণপ্রসাদ মণ্ডল মদনমোহনপুর নিবাসী শ্রীযুক্ত বাবু নরেন্দ্র নাথ সামন্ত ও কুতুবপুর পরগণার গোপালনগর নিবাসী শ্রীযুক্ত বাবু রাখালচন্দ্র চৌধুরি বক্তা ছিলেন। সভাপতি মহাশয়ের আজ্ঞানুসারে বালিপোতা গ্রাম নিবাসী শ্রীযুক্ত বাবু উপেন্দ্র নাথ ভুঞা ও গোপালনগর গ্রাম নিবাসী শ্রীযুক্ত বাবু রাইচরণ চৌধুরী প্রভৃতি প্রায় ৪০ জন সভ্য নির্ব্বাচন হইয়াছেন। সভায় সমগেত লোক সংখ্যা প্রায় তিন শত হইবে। গ্রামসংখ্যা নাড়াজোল পরগণার নিজ নাড়াজোল হইতে চেতুয়া রাজনগর পর্য্যন্ত ১৬ খানি গ্রাম নিমন্ত্রণ হইয়াছিল।

মাহিষ্য-সমাজ।

[তৃতীয় ভাগ, দশম সংখ্যা—মাঘ, সন ১৩২০ সাল।]

ভবদেব ভট্ট।

পরস্পর বিরোধী কুলশাস্ত্রের প্রমাণ অবলম্বনে যে আদিশূরের ইতিহাসের উদ্ধার বিড়ম্বনা মাত্র, তাহা গৌড় রাজমালাকার স্পষ্টভাবে দেখাইয়াছেন। আমরাও নগেন্দ্র বাবুর বঙ্গের জাতীয় ইতিহাসে উল্লিখিত জয়ন্ত ও আদিশূরের অভিন্নত্ব প্রতিপাদনের চেষ্টা যে ইতিহাসবিরুদ্ধ ও হাস্যজনক তাহা দেখাইয়াছি। বঙ্গের জাতীয় ইতিহাসে বসু মহাশয় হরি বর্ম্মার তাম্র শাসন ও ভুবনেশ্বর প্রশস্তি অবলম্বনে বালবলভীভুজঙ্গ ভট্ট ভবদেবকে রাঢ়ী শ্রেণী ব্রাহ্মণ ধরিয়া লইয়াছেন। তাম্রশাসনের অস্পষ্ট প্রতিকৃতি ও আনুমানিক পাঠ মাত্র প্রকাশিত হইয়াছে *, তাহা হইতে জানা যায় যে বিক্রমপুর সমাবাসিত শ্রীমজ্জয় স্কন্ধাবার হইতে "মহারাজাধিরাজ জ্যোতিবর্ম্ম-পাদানুধ্যাত-পরম বৈষ্ণব-পরমেশ্বর-পরমভট্টারক মহারাজাধিরাজ-শ্রীহরিবর্ম্মদেব" ভূমিদান করিতেছেন।

ভট্ট ভবদেব বালবলভী ভুজঙ্গের ভুবনেশ্বর প্রশস্তিতে উক্ত হইয়াছে—সাবর্ণ-মুনির বংশধর শ্রোত্রিয়গণ যে সকল গ্রামে বাস করিতেন তন্মধ্যে রাঢ়া বা রাঢ় দেশের অলঙ্কার সিদ্ধল গ্রাম সর্ব্বাগ্রগণ্য। এই গ্রামের একটী সমুন্নত বংশে (প্রথম) ভবদেব জন্ম গ্রহণ করিয়াছিলেন। তিনি গৌড়নৃপ হইতে হস্তিনী-ভিট্ট নামক গ্রাম প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। এই ভবদেবের পুত্র রথাঙ্গ। রথাঙ্গের পুত্র অত্যঙ্গ। অত্যঙ্গের পুত্র স্ফুরিতবুধ। স্ফুরিতবুধের পুত্র আদিদেব। আদিদেব বঙ্গরাজের মহামন্ত্রী মহাপাত্র-সন্ধিবিগ্রহী ছিলেন। আদিদেবের পুত্র গোবর্দ্ধন, গোবর্দ্ধন জনৈক বন্দ্যঘটীয় ব্রাহ্মণের দুহিতার (সাঙ্গোকার) পাণিগ্রহণ করিয়াছিলেন। গোবর্দ্ধন এবং সাঙ্গোকার পুত্র ভবদেব বালবলভী-ভুজঙ্গ দীর্ঘকাল

---

* বঙ্গের জাতীয় ইতিহাস দ্বিতীয়ভাগ ২১৫ পৃষ্ঠা ও চিত্র দ্রষ্টব্য।

হরিবর্ম্মদেবের মন্ত্রী ছিলেন এবং পরে হরিবর্ম্মদেবের পুত্রেরও মন্ত্রী-পদারূঢ় ছিলেন। এই দ্বিতীয় ভবদেব রাঢ়দেশে একটী জলাশয় খনন করাইয়া ছিলেন। এবং ভুবনেশ্বরে মন্দির নির্ম্মাণ করাইয়া, সেই মন্দিরে নারায়ণ, অনন্ত এবং নৃসিংহমূর্ত্তি স্থাপিত করিয়াছিলেন।

এই ভুবনেশ্বর প্রশস্তি আমাদের পক্ষে আদিশূরের ঐতিহাসিকতা ও কণৌজ ব্রাহ্মণ আনয়নের অমূলকত্ব প্রতিপাদনে সাক্ষ্য দান করিতেছে। পাশ্চাত্য বৈদিক কুলগ্রন্থ ও হরিবর্ম্মার তাম্রশাসন এবং এই প্রশস্তিতে পরস্পর ঐক্য আছে। জনশ্রুতিমূলক আদিশূরের ইতিহাস প্রমাণীকৃত হইবার নানা অন্তরায় উপস্থিত হইতেছে। আদিশূর প্রকৃত ঐতিহাসিক ব্যক্তি হইলেও তাঁহার আবির্ভাব কাল সম্বন্ধে বসু মহাশয়ের সিদ্ধান্ত যে একবারেই অসঙ্গত তাহা রাঢ়ী-বারেন্দ্র ব্রাহ্মণগণের বংশাবলী অনুসারে হিসাব করিলেই ধরা যাইতে পারে। "গৌড়ে ব্রাহ্মণ" প্রণেতা লিখিয়াছেন— "সাণ্ডিল্য গোত্রীয় বর্ত্তমান ব্যক্তির পুরুষ সংখ্যা ভট্ট নারায়ণ হইতে ৩৬।৩৭ এবং ৩৮ পুরুষ, কাশ্যপ গোত্রে ৩১।৩২ ৩৩।৩৪ পুরুষ, ভরদ্বাজ গোত্রে ৩৫ হইতে ৩৯ পুরুষ, কিন্তু বাৎস্য গোত্রে ২৫ হইতে ২৮ পুরুষ দৃষ্ট হয়।" "রাঢ়ীয় সমাজে ৩৫ হইতে উর্দ্ধতম পর্য্যায়ের লোক বিরল। বাৎস্য গোত্র ছাড়িয়া দিলে বর্ত্তমান কালকে আদিশূর আনীত ব্রাহ্মণগণের কাল হইতে গড় পড়তায় ৩৪।৩৫ পুরুষের কাল বলা যাইতে পারে। প্রতি পুরুষ ২৫ বৎসর ধরিয়া লইলে, আদিশূর ৮৫০ বৎসর পূর্ব্বে বর্ত্তমান ছিলেন এরূপ অনুমান করা যাইতে পারে। এই অনুমান, বেদ বাণা শুক শাকেতু গৌড়ে বিপ্রাঃ সমাগতাঃ [৯৫৪ শকে বা ১০৩২ খৃষ্টাব্দে গৌড়ে ব্রাহ্মণগণ আগমন করিয়া ছিলেন] এই কিম্বদন্তীর বিরোধী নহে এবং তৃতীয় বিগ্রহ পালের রাজত্বকালে কর্ণাট রাজকুমার বিক্রমাদিত্যের সহিত বল্লালসেনের পূর্ব্ব পুরুষের গৌড় আগমন কালের সহিত ঠিকঠাক মিলিয়া যায়।"

গৌড়-রাজমালা প্রণেতা লিখিয়াছেন :—"ভুবনেশ্বর প্রশস্তিতে উল্লিখিত ভট্টভবদেবের বংশবৃত্তান্তের সহিত আদিশূর কর্ত্তৃক ব্রাহ্মণানয়ন বৃত্তান্তের সামঞ্জস্য অসম্ভব। ভবদেব সাবর্ণ গোত্রীয়, তাঁহার পূর্ব্ব পুরুষগণ সিদ্ধল গ্রাম বাসী, এবং তাঁহার জননী বন্দ্যঘটীবংশীয়া ছিলেন। সুতরাং ভবদেব যে রাঢ়ি শ্রেণীর ব্রাহ্মণ ছিলেন, তদ্বিষয়ে আর সংশয় হইতে পারেনা। প্রশস্তির রচয়িতা ভবদেবের সুহৃদ বাচস্পতি, যে ইদানীন্তন কালের ঘটকগণের অপেক্ষা ভব-

করা যায় না। প্রশস্তিতে ভবদেব বালবলভী ভুজঙ্গকে ধরিয়া সাত পুরুষের বিবরণ আছে। প্রশস্তিতে উল্লিখিত প্রথম ভবদেব খৃষ্টীয় দশম শতাব্দের শেষ পাদে বর্তমান ছিলেন, এরূপ অনুমান করা যাইতে পারে; এবং এই প্রথম ভবদেব যে গৌড়নৃপ হইতে হস্তিনীভিট্ট গ্রাম প্রাপ্ত হইয়াছিলেন, তিনি সম্ভবতঃ প্রথম মহীপাল। বাচস্পতি যে ভাবে প্রশস্তির সূচনায় সিদ্ধল গ্রামবাসী সাবর্ণ গোত্রীয় ব্রাহ্মণগণের প্রসঙ্গের অবতারণা করিয়াছেন, তাহাতে মনে হয়, যেন স্মরণাতীত কাল হইতেই সাবর্ণ গোত্রীয় শ্রোত্রিয়েরা তথায় বাস করিতে ছিলেন। এখন যেমন সাবর্ণ গোত্রীয় রাঢ়ীয় বারেন্দ্র ব্রাহ্মণ মাত্রেই আদিশূর আনীত বেদগর্ভ বা পরাশর হইতে বংশ পরিচয় দিয়া থাকেন, তখন এই প্রবাদ প্রচলিত থাকিলে, বাচস্পতি বোধ হয় তাঁহার প্রিয় সুহৃদের প্রশস্তিতে তাহার উল্লেখ করিতে বিস্মৃত হইতেন না। ভবদেবের ভুবনেশ্বর প্রশস্তিতে আদিশূর কর্তৃক ব্রাহ্মণ আগমনের প্রতিকূল প্রমাণ দেখিয়া, আদিশূর বৃত্তান্তের ঐতিহাসিকতা সম্বন্ধে ঘোর সংশয় উপস্থিত হয়।'

গৌড় রাজমালা প্রণেতা চন্দ মহাশয় ভট্ট ভবদেবের মাতা বন্দ্য ঘটীয় ছিলেন বলিয়া (বসু মহাশয়ের ন্যায়) তাঁহাকে রাঢ়ী শ্রেণীর ব্রাহ্মণ নিঃসন্দেহে স্থির করিয়া লইলেন; কিন্তু প্রশস্তির লিখার ভাবে বোধ হয় যে তাঁহার পূর্ব্ব পুরুষগণ স্মরণাতীত কাল হইতেই* যেন রাঢ় দেশে বাস করিতেছেন এই সংশয় মীমাংসা করিতে পারেন নাই। আমরা এই সংশয়ের একটা মীমাংসা করিতে পারি।

বালবলভী ভুজঙ্গ ভট্ট ভবদেব রাঢ়ীয় শ্রেণী ব্রাহ্মণ নহেন, তিনি বারেন্দ্র বা পাশ্চাত্য কি দাক্ষিণাত্য বৈদিকও নহেন। তিনি গৌড়ীয় আদি বৈদিক ব্রাহ্মণ ছিলেন। ইহা বিশ্বাস করিলে উপরোক্ত সংশয়ের মীমাংসা হইতে পারে। যে সময়ে গঙ্গাগতি প্রভৃতি পাশ্চাত্য বৈদিক ব্রাহ্মণগণের পূর্ব্ব পুরুষগণ এদেশে

---

* সম্বন্ধ নির্ণয়ের ক্রোড় পত্রের ৬৫।৬৬ পৃষ্ঠায় বিদ্যানিধি মহাশয় প্রসিদ্ধ কুলাচার্য্য কুলচন্দ্র ঘটক সংগৃহীত মহাবংশাবলী উদ্ধৃত করিয়া সাবর্ণ গোত্রীয় বেদগর্ভ হইতে ভট্ট ভবদেবের বংশধারা প্রদর্শন করিতে চেষ্টা করিয়াছেন। ইহা বিশ্বাস করা যায় না। কারণ এই বংশাবলীর সংগ্রহ কর্ত্তা অপেক্ষা ভুবনেশ্বর প্রশস্তির রচয়িতা ভবদেব সম্বন্ধে অনেক অধিক খবর রাখিতেন নিঃসন্দেহ। কিন্তু তিনি যে ভাবে প্রশস্তির আরম্ভ করিয়াছেন তাহাতে বোধ হয় সাবর্ণ গোত্রীয় ব্রাহ্মণগণ বহুদিন যাবৎ সিদ্ধল গ্রামে বাস করিতে ছিলেন। বেদগর্ভের আগমনের বহুপূর্ব্ব হইতেই তাঁহারা ছিলেন।

আসেন, তাহার কিছু পূর্ব্ব বা সম সময়েই রাঢ়ী বারেন্দ্র গণের পূর্ব্ব পুরুষগণ ও এদেশে আসেন। ইতি পূর্ব্বে বংশাবলীর হিসাব করিয়া যে সময় দেখান হইয়াছে সেই সময়েই অর্থাৎ দশম শতাব্দীর শেষপাদে প্রথম ভট্ট ভবদেব বর্ত্তমান ছিলেন। কণোজ ব্রাহ্মণ পঞ্চক সেই সময়েই এদেশে আসেন, অতএব তিনি বা তাঁহার পূর্ব্ব পুরুষগণ কণোজ ব্রাহ্মণ নহেন, তাঁহারা গৌড়ীয় ব্রাহ্মণ ছিলেন। বাদলস্তম্ভে বর্ণিত পালবংশের মন্ত্রী ভট্ট গুরবের এবং বৈদ্য দেবের বংশবৃত্তান্ত হইতে জানা যায় তৎকালে মন্ত্রিপদ বংশানুগত ছিল। সুতরাং ভট্ট ভবদেবের বংশ ও তদ্রূপ বর্ম্মরাজবংশের মন্ত্রী-পদে অধিরূঢ় হইতেন। বর্ম্মরাজবংশ কোথায় কি ভাবে কত কাল রাজ্য করিয়াছিলেন তাহার বিস্তৃত ইতিহাসের উদ্ধার হইলে ভট্ট ভবদেব বংশের বিস্তৃত ইতিহাসও পাওয়া যাইতে পারিবে। ভ্রান্তিবিজয় প্রণেতা দেখাইয়াছেন যে, বঙ্গে রাঢ়ী বারেন্দ্র পাশ্চাত্য দাক্ষিণাত্য বৈদিক ব্রাহ্মণগণের অভ্যুদয়ের পূর্ব্বে যে সাগ্নিক বেদপারগ ব্রাহ্মণ ছিলেন বঙ্গের জাতীয় ইতিহাস প্রণেতা ও ঐ কথা বলেন। কিন্তু ভট্ট ভবদেবকে তিনি গৌড়ীয় ব্রাহ্মণ না বলিয়া রাঢ়ী ব্রাহ্মণ বলিয়াছেন। রাম চরিত গ্রন্থে ও তাৎকালীক বৌদ্ধ পালরাজগণের শাসন সময়ে ও বাঙ্গালায় বহুতর বেদপারগ ব্রাহ্মণ ছিলেন দেখা যায়। তাঁহাদের বংশধরগণ আজও বর্ত্তমান রহিয়াছেন। রাঢ়ী কুলজ্ঞ নুলো পঞ্চাননের কারিকা হইতে ভ্রান্তি বিজয় প্রণেতা প্রমাণ করিয়াছেন যে সেন রাজগণের শাসন কালের সময়ে ও তৎপূর্ব্বে বঙ্গে সাতশতী, পরাশর ও ব্যাস-বৈদিক প্রভৃতি সদব্রাহ্মণগণ বাস করিতেন। এখনও তাঁহাদের বংশধরগণ রহিয়াছেন। ৺যাদবচন্দ্র লাহিড়ী মহাশয় তাঁহার কুলকালিমা গ্রন্থে সাবর্ণ-গোত্রীয় পরাশর ব্রাহ্মণগণের সহিত কণৌজাগত ব্রাহ্মণগণের বিবাদ বিসংবাদ ও পৃথক সমাজ গঠনের ইতিবৃত্ত বর্ণনা করিয়াছেন। এই 'পরাশর' ব্রাহ্মণগণ এক্ষণে পূর্ব্ব বঙ্গে বর্ত্তমান রহিয়াছেন, ইহারা গৌড়ের আদি বৈদিক। বর্ত্তমান কালে ইহারা মাহিষ্য (চাষীকৈবর্ত্ত) জাতির পুরোহিত। ভট্ট ভবদেব এই সাবর্ণ গোত্রীয় পরাশর সমাজের গৌড়ের বৈদিক ব্রাহ্মণ ছিলেন। মহাত্মা হাণ্টর তাঁহার ষ্টাটীষ্টিকাল একাউণ্টে এই পরাশর ব্রাহ্মণ ও পরাশর দাস আখ্যাত মাহিষ্য জাতির কথা লিখিয়াছেন। বাচস্পতি যে ভাবে প্রশস্তির সূচনা করিয়াছেন তাহাতে যে স্মরণাতীত কাল হইতেই এই ব্রাহ্মণগণ এদেশে বর্ত্তমান ছিলেন তাহাই সত্য, কেননা, মহাভারতীয় যুগ হইতেই গৌড়ের ব্রাহ্মণগণ এদেশে পবিত্র সামগান ও ঋক মন্ত্র পাঠ করিতেন।

দ্বিতীয় ভট্ট ভবদেবের মাতা কেন বন্দ্যঘটীয় কন্যা হইলেন? ইহাতে আশ্চর্য্যের কথা কিছুই নাই। পূর্ব্বে রাঢ়ী সমাজের সহিত গৌড়ীয় বৈদিক সাতশতী ব্রাহ্মণগণের পরস্পর যৌন সম্বন্ধ অবাধে চলিত, ইহাই তাহার একটী বিশেষ প্রমাণ। ভট্ট ভবদের পিতা রাঢ়ীয় বন্দ্য ঘটীয় ব্রাহ্মণের দুহিতা সাঙ্গোকার প াণি গ্রহণ করিয়াছিলেন। খ্রীষ্টীয় দ্বাদশ শতাব্দীতে যে যৌন সম্বন্ধ চলিত তাহার স্রোত যে এই সে দিন পর্য্যন্ত বর্ত্তমান ছিল, তাহার একটী দৃষ্টান্ত দেওয়া যাইতেছে। জেলা ত্রিপুরা, কুমিল্লার ৬ষ্ঠ মুন্সেফী আদালতে ১৯১১ খৃঃ অব্দের ৫৩৬ নং স্বত্ব সম্বন্ধীয় একটী মোকদ্দমায় এইরূপ বিবাহের একটী নিদর্শন পাওয়া যায়। জেলা ঢাকার অন্তর্গত বিক্রমপুর পরগণার দরহাটা নিবাসী ৺কালীপ্রসন্ন চক্রবর্ত্তী পুত্র শ্রীসারদা প্রসন্ন চক্রবর্ত্তি রাঢ়ী শ্রেণী ব্রাহ্মণ; থানা দাউদকান্দি সাং বড় কোটা নিবাসী কৃষ্ণ চন্দ্র চক্রবর্ত্তি প্রভৃতির নামে তাঁহার মাতামহ মাহিষ্যযাজী গৌড়ীয় বৈদিক শ্রেণীর ৺উমাকান্ত চক্রবর্ত্তি মহাশয়ের সম্পত্তি প্রাপ্তির ইচ্ছাতে নালিশ করিয়াছিলেন। ১৩০৯ সালের সেবিকা মাসিক পত্র ও ভ্রান্তি বিজয়ের প্রথম সংস্করণের সপ্তম অধ্যায়ে রাঢ়ীয় সমাজের সহিত এই গৌড়ীয় বৈদিক সমাজের কন্যা আদান প্রদানের বিস্তৃত তালিকা প্রকাশিত হইয়াছে। যে যৌন সম্বন্ধে একালে বাধা হয় নাই সে কালে যে তাহা অবাধে সম্পন্ন হইয়াছিল তাহার আর সন্দেহ কি? চন্দ্রমহাশয় এ সকল বিষয় প্রণিধান করিবার অবসর পান নাই। অবশ্য আদিশূরের ঐতিহাসিকতা সম্বন্ধে তাঁহার যতদূর বলা আবশ্যক তাহা আলোচনা করিয়াছেন। বোধ হয়, ভট্ট ভবদেবকে রাঢ়ী ব্রাহ্মণ ধরিয়া বসু মহাশয় আদিশূর ও জয়ন্তের অভিন্নত্ব প্রতিপাদনে সাহস করিয়াছেন। জয়ন্ত ও আদিশূর অভিন্ন নহেন। আদিশূর বলিয়া কোন রাজা বঙ্গদেশে ছিলেন কি না, তাহার সত্য প্রমাণ অদ্যাপি আবিষ্কৃত হয় নাই। ভট্ট ভবদেবও রাঢ়ীয় শ্রেণীর ব্রাহ্মণ নহেন; তিনি সাবর্ণ গোত্রীয় গৌড়ীয় ব্রাহ্মণ ছিলেন।

মাহিষ্যজাতির উপনাম বিচার।

মাহিষ্যজাতির উপনাম বিচার সম্বন্ধে সুদর্শন বাবু দ্বারা যে আলোচনা চলিতেছে, আমিও ঐরূপ আলোচনা দ্বারা কোন একটা স্থির হওয়া একান্ত কামনা করি। মনু বলিয়াছেন :—

আর্ষং ধর্ম্মোপদেশঞ্চ বেদশাস্ত্রাবিরোধিনা।
যস্তর্কেণানুসন্ধত্তে স ধর্ম্মংবেদ নেতরঃ।

ঋষিপ্রণীত ধর্ম্মোপদেশকে বেদ শাস্ত্রের অবিরোধিতর্ক দ্বারা যিনি নিশ্চয় করেন, তিনিই ধর্ম্মবিৎ, অন্যে নহে। শাস্ত্রে আরও আছে।

কেবলং শাস্ত্র মাশৃত্য ন কর্ত্তব্যো বিনির্ণয়ঃ।
যুক্তিহীন বিচারেতু ধর্ম্মহানিঃ প্রজায়তে॥

কেবল পুস্তকের লেখার আশ্রয়ে কোন বিষয়ে কর্ত্তব্য নির্ণয় করিবে না। কারণ যুক্তিহীন বিচারে ধর্ম্মহানি হইয়া থাকে। শাস্ত্রে আরও বিধি পাওয়া যায়।

বেদঃ স্মৃতিঃ সদাচারঃ স্ব স্ব চ প্রিয়মাত্মনঃ।
এতচ্চতুর্ব্বিধং প্রাহুঃ সাক্ষাদ্ধর্ম্মস্য লক্ষণং॥

বেদ, স্মৃতি, সদাচার ও আত্মার প্রীতি, এই চারিটি সাক্ষাত ধর্ম্মের লক্ষণ। ধর্ম্মনির্ণয় করিতে হইলে শাস্ত্রের প্রমাণ সকল বেদের অবিরোধিতর্ক দ্বারা, যাহাতে আত্মপ্রীতির সহিত সদাচার হয়, এইরূপ মীমাংসায় উপনীত হইতে হইবে। আবার সেই মীমাংসাটি বহুমনীষির চিত্তপ্রসাদকর কিনা, তজ্জন্য প্রাকাশ্য পত্রিকায় সমালোচনা দ্বারা মতৈক্য হওয়া বিশেষ আবশ্যক। সুদর্শন বাবু ও দুর্গানাথ বাবু প্রভৃতি তাহাই করিতেছেন। কিন্তু প্রত্যক্ষ বচনাভাবে বৈশ্যের বর্ম্মা উপনামটি আমার চিত্তে অপ্রসন্নতাদায়ক হওয়ায়, রঘুনন্দন ভট্টাচার্য্য মীমাংসিত সংহিতার বচন কয়টি সার্থ আলোচনা করিতে প্রবৃত্ত হইতেছি। মনু সংহিতায় ২য় অধ্যায়ে ৩১ শ্লোকে নামকরণ স্থলে লিখিত আছে।

মঙ্গল্যং ব্রাহ্মণস্যস্যাৎ ক্ষত্রিয়স্য বলান্বিতং।
বৈশ্যস্য ধন সংযুক্তং শূদ্রস্য—তু জুগুপ্সিতং॥

ব্রাহ্মণাদীনাং যথাক্রমং মঙ্গল বল ধন নিন্দা বাচকানি শুভ বল বসু দীনাদীনি নামানি কর্ত্তব্যানি।

ব্রাহ্মণের মঙ্গল বাচক, ক্ষত্রিয়ের বল বাচক, বৈশ্যের ধনবাচক ও শূদ্রের জুগুপ্সা অর্থাৎ নিন্দাবাচক নাম রাখিবে। এইটি গেল নামের কথা। উপনাম সম্বন্ধে ৩২ শ্লোকে বলিতেছেন।

শর্ম্মবদ্ ব্রাহ্মণস্যস্যাদ্ রাজ্ঞো রক্ষা সমন্বিতং।
বৈশ্যস্য পুষ্টি সংযুক্তং শূদ্রস্য প্রৈষ্য সংযুতং॥

এষাং যথাক্রমং শর্ম্মরক্ষা পুষ্টি প্রৈষ্য বাচকানি কর্ত্তব্যানি, শর্ম্ম ধর্ম্ম ভূতি

দাসাদীনি উপপদানি কার্য্যাণি। উদাহরণানি তু শুভ শর্ম্মা, বলবর্ম্মা, বসুভূতিঃ, দীনদাসঃ ইতি।

ব্রাহ্মণের মঙ্গল বাচক শর্ম্মা, ক্ষত্রিয়ের বলবাচক বর্ম্মা, বৈশ্যের সম্পত্তি বাচক ভূতি ও শূদ্রের সেবক সূচক দাস, এইরূপ উপপদ নামের সহিত যুক্ত রাখিবে। ঐ শ্লোকের টীকায় কুল্লুক ভট্ট ও উদ্বাহতত্ত্বে রঘুনন্দন স্বমের নাম করিয়া একই বচন দৃষ্টান্তরূপে লিখিয়াছেন।

শর্ম্মাদেবশ্চ বিপ্রস্য বর্ম্মাত্রাতা চ ভূভুজঃ।
ভূতির্দ্দত্তশ্চ বৈশ্যস্য দাসঃ শূদ্রস্য কারয়েৎ॥

শর্ম্মন্ ও দেবশব্দ ব্রাহ্মণের, বর্ম্মন্ ও ত্রাতৃশব্দ ক্ষত্রিয়ের, ভূতি ও দত্ত শব্দ বৈশ্যের, দাস শব্দ শূদ্রের উপনামরূপে ব্যবহার করিবে। এই শ্লোকের বিশেষ একটি অর্থ এই যে, মনুষ্য সমাজ স্ত্রী পুরুষভেদে বিভক্ত বলিয়া উক্ত বচে উপনামেরও লিঙ্গভেদে স্পষ্ট বিভাগ দেখাইয়াছেন। স্ত্রী বিষয়ে স্ত্রীলিঙ্গপ্রত্যয় যোগ এইমাত্র বিশেষ। অর্থাৎ ব্রাহ্মণ পুরুষে শর্ম্মা, স্ত্রীতে দেব শব্দে স্ত্রীপ্রত্যয় যোগ করিয়া দেবী, ক্ষত্রিয় পুরুষে বর্ম্মা, স্ত্রীতে ত্রাত্রী, বৈশ্য পুরুষে ভূতি, স্ত্রীতে দত্তা, শূদ্রের দুইটি শব্দ না থাকায় পুরুষে দাস, স্ত্রীতে দাসী উপনাম ব্যবহার করিবে। ঐ স্থলে বিষ্ণুপুরাণের আরও একটি বচন উদ্ধার করিয়াছেন।

শর্ম্মবদ্ ব্রাহ্মণস্যোক্তং বর্ম্মেতি ক্ষত্র সংযুতং।
গুপ্তদাসাত্মকং নাম প্রশস্তং বৈশ্য শূদ্রয়োঃ॥

ব্রাহ্মণের শর্ম্মা নাম, ক্ষত্রিয়ের বর্ম্মা নাম, বৈশ্যের গুপ্ত নাম, শূদ্রের দাস নাম প্রশস্ত।

এই বচনে নাম উপনাম উভয় বলিতেছেন। অর্থাৎ ব্রাহ্মণের শুভজনক শব্দ নাম ও অন্তে শর্ম্মাপদ উক্ত হইয়াছে। এইরূপ ক্ষত্রিয়ের বলবাচক নাম ও অন্তে বর্ম্মা পদ, বৈশ্যের ধন বাচক নাম ও অন্তে গুপ্ত পদ, শূদ্রের সেবা বাচক নাম ও অন্তে দাস পদ ব্যবহার প্রশস্ত। নাম করণ স্থলে বিষ্ণুপুরাণে আরও একটী বচন পাওয়া যায় যে।

ততশ্চ নাম কুর্ব্বীত পিতৈব দশমেহহনি।
দেব পূর্ব্বং নরাখ্যংহি শর্ম্ম বর্ম্মাদি সংযুতং।

তাহার পর পিতা দশমদিনে দেব পূর্ব্ব শর্ম্ম বর্ম্মাদি সংযুক্ত পুংবাচক নাম রক্ষা করিবে। স্ত্রীজাতির নাম করণ স্থলে মনুমহাত্মা একরূপ লক্ষণ নির্দ্দেশ করিয়াছেন। জাতিভেদ রাখেন নাই।

স্ত্রীণাং সুখোদ্যমক্রুরং বিস্পষ্টার্থং মনোহরম্।
মঙ্গল্যং দীর্ঘ বর্ণান্তমাশীর্ব্বাদাভিধানবৎ॥ ৩৩

স্ত্রীলোকের নাম সুখোচ্চার্য্য, অক্রুর, সুস্পষ্টার্থ, মনোহর, দীর্ঘবর্ণান্ত এবং মাঙ্গল্য ও আশীর্ব্বাদ বাচক নাম রাখিবে। যেমন যশোদাদেবী, দয়াময়ীদেবী ইত্যাদি। উপনাম সম্বন্ধে স্মৃতিতে স্ত্রীজাতির দ্বিজ ও শূদ্র এই দুই থাক মাত্র দেখা যায়।

দেব্যন্তাশ্চ স্ত্রিয়ঃ সর্ব্বা দাস্যন্তাঃ শূদ্রযোনয়ঃ।

সকল জাতীয়া স্ত্রী দেবী অন্ত নাম, শূদ্র জাতীয়া স্ত্রী দাসী অন্ত নাম ব্যবহার করিবে। স্মার্ত্ত রঘুনন্দন এই সকল বচনের মীমাংসায় লিখিয়াছেন।

"দেব্যন্তাস্ত স্ত্রিয়ঃ স্মৃতা ইতি দ্বিজাতি স্ত্রীপরং। শূদ্রী দাসান্তকাঃ স্মৃতাঃ ইতি বচনাৎ তৎ পত্ন্যাশ্চ পুংযোগাজ্জাতেশ্চেতি ঈপ্রত্যয়েন দাস্যন্ততা শূদ্রে শিষ্ট ব্যবহারোহপি। তথা যত্ত সর্ব্ববর্ণ স্ত্রীপরং দেব্যন্তা ইতি। তন্ন প্রকরণাৎ দ্বিজাতি পুংযোগ বাধাচ্চ শর্ম্মণী বর্ম্মণী প্রয়োগস্ত ন ব্যবহার্য্যং।" (ক্রমশঃ)

শ্রীসাগরচন্দ্র কবিরত্ন.
রাজারামপুর, নন্দপুর পোষ্ট, মেদিনীপুর।

উন্নতির অন্তরায়।

এক সময়ে এই মাহিষ্য জাতি উন্নতির শীর্ষস্থানে উপনীত থাকিয়া যে দেশ বিদেশে যশঃসৌরভ বিস্তার করিয়াছিলেন, তমলুক, ময়না, তুর্কা, সুজামুঠা প্রভৃতি প্রভৃতি রাজবংশ, বাহুবলীন্দ্র, রণঝম্প, গজেন্দ্রমহাপাত্র, সেনাপতি, সিংহ, হাজরা, আদক, সামন্ত, দলপতি প্রভৃতি কার্য্যোচিত উপাধি তাহার জাজ্জ্বল্যমান নিদর্শন। সম্প্রতি ২৫।৩০ বৎসর পূর্ব্বেও বঙ্গদেশস্থ মাহিষ্য পল্লী মধ্যে যে উন্নতির স্রোত প্রবাহিত ছিল, গ্রামদেবতা সমূহের পূজাপার্ব্বণাদির যথাবিহিত ব্যবস্থা, পল্লীব্যাপী স্ত্রী পুরুষের সচ্চরিত্রতা, আচার ব্যবহার, গ্রাম্য সম্মান প্রভৃতি তাহার প্রকৃষ্ট প্রমাণ প্রদান করিতেছে। অদ্যাপিও অনেক স্থান দৃষ্ট হয়, গ্রামের মধ্যে অন্যান্য জাতি সবিশেষ বর্দ্ধিষ্ণু হইলেও প্রধান মাহিষ্যের (অর্থাৎ গ্রাম্য মণ্ডলের) অনুমতি ব্যতিরেকে কোন শুভ কার্য্য সুসম্পন্ন হয় না। তবে জাতীয় অবনতির কারণ কি? সময়ের পরিবর্ত্তনে সকলই পরিবর্ত্তিত হয়। চিরকাল একই রীতি কার্য্যকর হয় নাই। এক সময়ে গ্রাম মধ্যে এমনই একতা

ছিল যে, গ্রামের মধ্যে কোনরূপ বিশৃঙ্খলা উপস্থিত হইলে তাহা আদালতে যাইত না, ভ্রাতৃ বিরোধের পরিণামে মোকর্দ্দমা দ্বারা কেহই সর্ব্বস্বান্ত হইত না, পরস্পর পরস্পরকে নির্ব্বিকার চিত্তে বিশ্বাস করিত, আবাল বৃদ্ধ বনিতার কাহারও চরিত্রে কোনরূপ দোষ স্পর্শ করিত না, ইত্যাদি। সে সময়ে গ্রাম মধ্যে উচ্চ শিক্ষার আলোক পতিত না হইলেও গ্রাম্য মণ্ডলদিগের ন্যায়-বিচার প্রভাবে শান্তির সহিত একরূপ বেশ চলিয়া আসিতেছিল। কোন লোক সমাজ বিরুদ্ধ বা অপরাধজনক কোন কর্ম্ম করিলে গ্রাম্য একতার গুণে তাহাকে বিনা আপত্তিতে শাস্তি স্বরূপ অর্থদণ্ড ভোগ করিতে হইত, ও সে অর্থ গ্রামের কোন সাধারণ সৎকার্য্যে ব্যয়িত হইত। কিম্বা কোন কার্য্য ব্যপদেশে কিছু অর্থ প্রয়োজন হইলে মণ্ডলগণের আদেশে গ্রাম হইতে অবলীলাক্রমে চাঁদা উঠিয়া সেই কার্য্য নিরাপদে সম্পন্ন হইত। মোটের উপর গ্রামের সকল লোকেই সমপ্রাণ, ভাবে একজন প্রধান মণ্ডলের আজ্ঞানুবর্ত্তী হইয়া দেশ-হিতকর কার্য্যে ব্রতী হইত। এক্ষণেও যে সকল স্থানে উক্ত রূপ বিচার, ব্যবস্থা ও একতা বিদ্যমান রহিয়াছে সেই সকল স্থানে যথেষ্ট উন্নতি দৃষ্ট হইতেছে। হায়! হায়!! সময়ের পরিবর্ত্তনে আজ কাল এরূপ দুঃসময় উপস্থিত হইয়াছে যে একজনের সহিত অন্যের সামান্য কলহ হইলে মিথ্যার বলে মারামারির প্রমাণ সংগ্রহ করিয়া আদালতে উপস্থিত হয় ও শেষে নিজে সর্ব্বস্বান্ত হয় ও পরকে কাঙ্গাল করিয়া তুলে। এইরূপে মোকর্দ্দমার মাত্রা এতই বৃদ্ধি পাইয়াছে যে, গ্রামের অধিকাংশকে মহকুমায় মাসের মধ্যে অধিক দিন অতিবাহিত করিতে হইতেছে। কেহ কেহ দালাল হইয়া অন্যকেও উৎসন্নে পাঠাইতেছে। তখনকার ন্যায় ন্যায়-বিচার নাই, পরন্তু থাকিলেও কাহারও তাহাতে বিশ্বাস জন্মে নাই। সকলেই স্বেচ্ছাচারী হইয়া আজ একজনের কাল আর একজনের সহিত দল বাঁধিয়া গ্রামের মধ্যে বিশৃঙ্খলতা উত্তরোত্তর বাড়াইতেছে। কেহ কাহারও অধীনতা স্বীকার করিতে চায় না! দেশ হিতকর-কার্য্যে সকলের সমবেত-চেষ্টা দিন দিন প্রযুক্ত হওয়া দূরে থাকুক, ক্রমে বহু কালের প্রচলিত বিদ্যালয়, দেবালয়, দেব-কীর্ত্তি প্রভৃতির অস্তিত্ব লোপ পাইতেছে। ঈদৃশ বিশৃঙ্খলতার বিশেষ তথ্য সন্ধান করিলে স্পষ্টই নির্ণীত হইবে, যাহাদের ঈদৃশ অনিষ্ট উৎপাদিত হইতেছে, তাহারা অধিকাংশই অশিক্ষিত; কেহ কেহ শিক্ষিত বলিয়া সাধারণের নিকট পরিচিত হইলেও স্বার্থপরতা, খলতা, পরছিদ্রান্বেষণ, সৎকার্য্যে গোলযোগ প্রদান প্রভৃতি অসৎ-শিক্ষায় সম্যক-শিক্ষিত। প্রকৃত সমাজহিতৈষী শিক্ষিত মহানুভবগণ

উহাদের উপর কোন কার্য্য করিতে পারেন না; পরন্তু তাঁহাদের সাময়িক সুবুক্তি উহাদের নিকট নিতান্ত উপহাস্যাস্পদ হইতেছে। সেইজন্য শিক্ষিতগণ সমাজের ভাবী উন্নতির পথ-প্রদর্শক হইয়াও গুটিপোকার ন্যায় মনের কষ্টে দিন-যাপন করিতেছেন। আবার গ্রাম লইয়া থানা, থানা লইয়া মহকুমা, মহকুমা লইয়া জেলা। এইরূপ গ্রাম, থানা, মহকুমা জেলা ব্যাপিয়া ঈদৃশ ভীষণ সংক্রামক রোগের বীজ দেশব্যাপী হইয়াছে। এই দেশব্যাপী সংক্রামক রোগের বীজ ধ্বংসের একমাত্র মহৌষধ;—জ্ঞানকরী বিদ্যা। উহা সমাজ মধ্যে যতই প্রচারিত হইবে, ততই জাতীয় উন্নতি বৃদ্ধি পাইতে থাকিবে। সেই সঙ্গে সঙ্গে নিম্নোক্ত বিষয় সমূহের প্রতি মনোযোগী হইতে হইবে।

(১) প্রতি গ্রামে একটী পল্লিসমিতি প্রতিষ্ঠা করিতে হইবে ও তাহাতে কয়েক জন কার্য্যদক্ষ শিক্ষিত ব্যক্তি মেম্বার থাকিবেন।

(২) কর্ত্তৃত্বাভিমানিগণের সর্ব্বনাশকর কার্য্যাবলী আদৌ যাহাতে সমাজ মধ্যে স্থান না পায়, অঙ্কুরেই বিনষ্ট হয়, তদ্বিষয়ে বিশেষ লক্ষ্য রাখিতে হইবে।

(৩) প্রত্যেক বাটীর বিশ বৎসর পর্য্যন্ত (অন্ততঃ) বালককে শিক্ষাধীনে রাখিতে হইবে।

(৪) কৃষি, গোরক্ষা, বাণিজ্য বিষয়ে উন্নতির দিকে বিশেষ দৃষ্টি রাখিতে হইবে।

(৫) দুই একটী যৌথ কারবার প্রতিষ্ঠা করিতে হইবে।

(৬) প্রতি মাসে অন্ততঃ একদিন গ্রামস্থ প্রধান প্রধান ব্যক্তিগণকে একত্র করিয়া সমাজ-হিতকর-কার্য্য ও পল্লিসমিতির কার্য্য সমালোচনা করিতে হইবে।

(৭) গ্রামের মধ্যে মোকর্দ্দমার সংখ্যা যত কম হয়, তদ্বিষয়ে যথেষ্ট চেষ্টা করিতে হইবে। নচেৎ উন্নতির আশা সুদূরপরাহত। গ্রামের মধ্যে পূর্ব্ববৎ একতা স্থাপিত হইলে উক্ত সদুদ্দেশ্য সমূহ কার্য্যে পরিণত হইতে আর বিলম্ব ঘটিবে না। এই গ্রাম্য একতার প্রভাবে বিরাট মাহিষ্য সমাজের কেন্দ্র স্বরূপ "বঙ্গীয় মাহিষ্য সমিতি" হইতে "মাহিষ্য ব্যাঙ্কিং এণ্ড ট্রেডিং কোম্পানি", "বঙ্গীয় কৃষিপরিষদ্" "সারস্বত ভাণ্ডার প্রতিষ্ঠা" প্রভৃতি যে কোন প্রস্তাব উত্থাপিত হইবে, তাহা অচিরেই কার্য্যে পরিণত হইবে ও দেশব্যাপী উন্নতির স্রোত বর্দ্ধিত হইবে; নতুবা সকল বাসনাই নিস্ফল হইবে সন্দেহ নাই।

শ্রীশিবপ্রসাদ কুতি।

কবি দয়ারাম দাস। (২)

আমরা আমাদের মাহিষ্য-সমাজের মুখ পত্রিকা 'মাহিষ্য-সমাজ' ১৩১৯ সালের ভাদ্র সংখ্যায় "মাহিষ্য কবি দয়ারাম দাস" এর জীবনী যৎকিঞ্চিৎ আলোচনা করিয়াছিলাম। নানাবিধ কারণে তাঁহার জীবনী পুনরালোচনায় বিরত ছিলাম। কিন্তু আজ জগৎ পালন কর্ত্রী লক্ষ্মী দেবীর কৃপায় তাঁহার সম্বন্ধে দুই এক কথা বলিবার জন্য অগ্রসর হইতেছি।

এই অগ্রহায়ণ, পৌষ মাসে আমাদের আত্মীয় বন্ধুবান্ধবগণ তাঁহাদের সাম্বৎসরিক দুঃখের মূল্য-স্বরূপ স্ব স্ব ভূমি হইতে ধান্য ছেদন করিয়া বাড়ীতে আনয়ন করেন। ইহাতে তাহাদের যে কিরূপ কষ্ট হয় তাহা অন্যে কি করিয়া জানিবে? ইহাদের কষ্টে যে জগতের কি ইষ্ট নিহিত আছে তাহা কি কেহ ভাবিয়া দেখেন! বরং কেহ কেহ 'চাষা' 'অনার্য্য', প্রভৃতি বিশেষণ দিয়া গালি বর্ষণ করিতে সঙ্কুচিত হয় না। তাহাদের ন্যায় 'বাবুসজ্জায়' ভূষিত হইয়া কৃষিক্ষেত্রে গমন করিলে বোধ হয় ঐরূপ গালি পাইতে হইত না। সত্যই কি তাহাদের ধারণা যে কৃষকেরা অনার্য্য, এবং কৃষিকর্ম্ম ঘৃণ্য কার্য্য? যে কৃষিকার্য্য একসময়ে পরম পবিত্র কর্ম্ম,—এমন কি, যাহা ব্রাহ্মণেরাও অবলম্বন করিতেন, তাহা কি না আজ কতিপয় দাম্ভিকের বাক্যে ঘৃণ্য কর্ম্ম বলিয়া কথিত হইবে? যে ক্ষত্র বৈশ্য জাতি এক সময়ে ভারতের নানাস্থানে রাজত্ব ও ভারত সমুদ্রের নানা দ্বীপে উপনিবেশ স্থাপন করিয়া দিগ্বিজয়ী সম্রাটের পরিচয় দিয়া গিয়াছেন, সম্রাট ডেরায়ুন, মাহাত্মা হাণ্টার সাহেব, খ্রীষ্টান ধর্ম্মযাজক, চীনদেশীয় পরিব্রাজক প্রভৃতি যে জাতির কৃষিবাণিজ্যাদি কার্য্য ও যুদ্ধ বিদ্যা প্রভৃতির উচ্চ-প্রশংসা করিয়া গিয়াছেন,—মেদিনীপুর, নদীয়া প্রভৃতি জেলায় যে জাতির কবি ও রাজা সকলের কত শত প্রাচীন কীর্ত্তি এখন ও বিদ্যমান আছে, সেই জাতি কিনা আজ মুষ্টিমেয় কতিপয় পণ্ডিতম্মন্য ব্যক্তির কথায় অনার্য্য জাতিতে পরিণত হইবে? হায়! কালের কি বিচিত্র গতি!! যাহা হউক, ইহা এই প্রবন্ধের বিষয় নহে। সুতরাং এ বিষয়ে বিশেষ কিছু বলিবার আবশ্যকতা নাই।

ইহারা সমস্তদিন এই রূপ কঠিন পরিশ্রম করিয়া সায়ংকালে যে ক্ষুদ্র পুস্তকখানি পাঠ করিয়া অপার আনন্দ অনুভব করেন তাহার নাম 'লক্ষ্মী চরিত্র'। এই পুস্তকখানি যে তাঁহারা পবিত্র বস্তু সমস্তের মধ্যে স্থান দান করিয়াছেন

তাহা বোধ হয় অনেকে জানেন। কিন্তু তাহার মূল রচয়িতা কে তাহা অনেকেই অজ্ঞাত। শুনিয়া সুখী হইবেন যে ইনি আমাদের বর্ত্তমান সুপরিচিত "সাহিত্য কবি দয়ারাম দাস"। আজকাল পল্লীগ্রামে এমন গৃহ অল্পই আছে, যেখানে লক্ষ্মীদেবীর গুণ বর্ণনা হইতেছে না। বিশেষতঃ বৃহস্পতিবার দিবসে তাঁহার রচিত লক্ষ্মী চরিত্র পাঠের একটী ধুমধাম পড়িয়া যায়। অনেকে নিষ্ঠা করিয়া উহা শ্রবণ করিতে থাকেন। ইহারা যে ধন রত্নাদি পাইয়াছেন তাহা লক্ষ্মী-দেবীর কৃপা ব্যতীত আর কিছুই নহে, ইহা ইহাদের সম্পূর্ণ বিশ্বাস। এই সময়ে যে কেবল লক্ষ্মীদেবীর গুণ বর্ণনা হইয়া থাকে, তাহা নহে; তাঁহার সেবক কবি দয়ারামের নাম ও ইহাদের মুখে নৃত্য করিতে থাকে। ইহারা এই সময়ে অনেক গুলি নিয়ম পালন করিয়া থাকেন। উহার অধিকাংশ গুলি আমাদের কবি দয়ারাম রচিত।

কিছুদিন পূর্ব্বে পল্লীগ্রামস্থ বালকেরা স্বগ্রামস্থিত পাঠশালায় যৎকিঞ্চিৎ লেখা পড়া ও হিসাবাদি শিক্ষা করিয়া হস্ত লিখিত, দাতাকর্ণ, গুরুদক্ষিণা, "লক্ষ্মী-চরিত্র" প্রভৃতি পুঁথি পড়িতে আরম্ভ করিত। ঐরূপে তাহারা পাঠ সমাপন করিত। ঐ সময়ে উহাদের মাতা, পিতা ও শিক্ষক মহাশয়গণ দয়ারাম রচিত,—

" চাষ করি চতুর্ব্বর্গ পায় যদুরায়"।
" লক্ষ্মীকে যে জন চিনে লক্ষ্মী চিনে তারে।
তার দুঃখ নাহি চারি যুগ যুগান্তরে॥"
" যাহার যেমন মন সে পায় তেমন।"
" মুক্ত অন্নে ভোজন করিবে বার মাস।
অভাগা কপাল যার নাহি চাষ বাস॥"
" আষাঢ়ের চষা ধান্য পৌষ মাসে পাবে।
অসময়ে বপিলে ফল কোথা হতে পাবে॥" ইত্যাদি, ইত্যাদি অনেক

উপদেশপূর্ণ প্রবচন শিক্ষা দিতেন। মোট কথা অনেক পল্লীগ্রামে খণার বচন প্রভৃতির সহিত দয়ারাম-রচিত অনেক প্রবচন স্থান পাইয়াছে। কোন গুলি কাহা কর্ত্তৃক রচিত তাহা বর্ত্তমান সময়ে ঠিক করা কষ্টকর। প্রবন্ধ বৃদ্ধির আশঙ্কায় তাঁহার অধিকাংশ প্রবচন গুলি উদ্ধৃত করা হইল না।

পূর্ব্ব প্রবন্ধে তাঁহার জীবনী সম্বন্ধে কয়েকটা ঘটনা উল্লেখ করা হইয়াছে। এই প্রবন্ধে ও দুই চারিটী ঘটনা না বলিয়া থাকিতে পারিতেছি না। প্রবাদ আছে কবি বাল্যকালে বড়ই দুর্দান্ত ছিলেন। এমন কি ইহার অত্যাচারে

পল্লীস্থ প্রতিবেশীগণ বিরক্ত হইতেন। বয়সের সঙ্গে সঙ্গে তাঁহার এই ভাব সম্পূর্ণ পরিবর্ত্তিত হইয়াছিল। যতই তিনি বয়ঃস্থ হইতে লাগিলেন ততই তিনি অধিকাংশ সময় গভীর চিন্তায় নিমগ্ন হইতেন। মধ্যে মধ্যে আহার ও শয়নের সময় ভুলিয়া যাইতেন। শুনা যায় একদিন তিনি নিশীথ কালে স্বগৃহ পরিত্যাগ করিয়া কোথায় চলিয়া যান; তাহার কোন উদ্দেশ পাওয়া যায় নাই। অনেক স্থানে সন্ধান লইয়াও তাঁহার খোজ খবর পাওয়া যায় নাই। এইরূপ দুই দিবস অতীত হইল। তৃতীয় দিবসে যখন কমলিনী নায়ক অস্তগিরিশিখরে অদৃশ্য হইতে ছিলেন, তখন দয়ারাম ও চন্দ্রোদয়ের সঙ্গে সঙ্গে স্বগৃহে আবির্ভূত হইলেন। চন্দ্রোদয়ে জগত যেমন আনন্দে ভাসিতে থাকে তদ্রূপ দয়ারামের আবির্ভাবে হইয়াছিল। আত্মীয় বন্ধু বান্ধবগণ আনন্দনীরে ভাসিতে লাগিলেন। তিনি কেবল যে আত্মীয় বন্ধুবান্ধকে আনন্দিত করিয়াছিলেন তাহা নহে, তিনি পরে জগতের অনেক মানবকেও আনন্দিত করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। তিনি কোথায় গিয়াছিলেন তাহা জিজ্ঞাসা করিলে নিরুত্তর হইতেন। কিন্তু তাঁহার প্রতিভা গুণে প্রকৃত বিষয় পরে প্রকাশিত হইয়াছিল। তিনি দেবী-কমলার উদ্দেশে একটী নির্জ্জনস্থানে গিয়াছিলেন। দেবীও সন্তুষ্ট হইয়া ব্রাহ্মণীর বেশে শ্রীচরণ দর্শন দিয়াছিলেন এবং বর প্রদান করিয়াছিলেন। এই জন্য তিনি 'কমলার বরপুত্র নামে প্রসিদ্ধ। কবি তাঁহার স্বরচিত পুস্তকে লিখিয়া রাখিয়া গিয়াছেন যে,—

'দয়ারাম দাস গায় লক্ষ্মীর চরিত্র।
ব্রাহ্মণীর বেশে মাতা যারে দিল গীত ॥'
'দয়ারাম দাস গায় কমলার বরে।'   ইত্যাদি।—

কিশোরচক গ্রামে একটী স্থান এখন ও অতীত বৃত্তান্তের চিহ্ন বক্ষে ধারণ করিয়া সাধারণের সমক্ষে কবির প্রতিভার সাক্ষ্য প্রদান করিতেছে। ঐ স্থানে শ্রীশ্রী৺চণ্ডিদেবীর ভগ্ন মন্দির আছে। দেবীর প্রভাব যথেষ্ট ছিল। উক্ত অধিষ্ঠাত্রী দেবীর নামানুসারে ঐ স্থানের নাম "চণ্ডীতলা" বা "চণ্ডীপাড়া" হইয়াছে। ঐ স্থানের দৃশ্য এরূপ মনোরম ছিল যে দেখিলে দর্শকের চিত্ত-বিমোহিত হইত। বসন্ত ও শরদাগমে যখন প্রস্ফুটিত বনফুলরাজির সুগন্ধ চতুর্দ্দিকে-পরিব্যাপ্ত হইত, যখন বৃক্ষসমূহ মন্দমারুত ভরে ঈষৎ আন্দোলিত হইত, যখন কোকিল প্রভৃতি বিহঙ্গগণ মনের উল্লসে কুহু কুহু রবে চতুর্দ্দিক প্রতিধ্বনিত করিত, তখন কি মনোরম দৃশ্যই না হইত! এইজন্য কেহ কেহ ঐ স্থানকে দেবদেবীর বাগান অথবা

বাগিচা বলিতেন এবং তদনুসারে ঐ স্থান "বাগিচাপাড়া" নামে ও অভিহিত হয়। কথিত আছে কবি ঐ স্থানে কমলাদেবীর শ্রীচরণদর্শন পাইয়াছেন। রাত্রিকালে দেবদেবীগণ ঐ স্থানে নানারূপ কেলি করিতেন। এই-সম্বন্ধে স্থানীয় লোকগণ অনেক অদ্ভুত গল্প করিয়া থাকেন। অনাবশ্যকবোধে গল্প উদ্ধৃত করা হইল না। স্থানটীর দৃশ্য যেরূপ রমণীয় ; সুতরাং কবির মনে সহজে ভাবোদ্রেক না হইয়া থাকিতে পারে না ; ইহাই তাঁহার কবিকুঞ্জ। এই কবিকুঞ্জে তিনি নিজের উন্মেষশালিনী প্রতিভার প্রভাবে নিত্য নব নব মাল্য রচনা করিয়া বঙ্গমাতার শ্রীচরণে অর্পণ করিতেন। হায়! আজ সেই মাল্যরাজি কোথায়! কালচক্র বিঘূর্ণনে তাহা কালের করাল কবলে ধ্বংস প্রাপ্ত হইয়াছে। কেবল মাত্র অতীতের সাক্ষ্য স্বরূপ সাধারণের দৃষ্টিপথে অতি হীন অবস্থায় পতিত হইতেছে।

তাঁহার মৃত্যু সম্বন্ধেও একটী অদ্ভুত গল্প প্রচলিত আছে। তিনি একদিন জ্বররোগে আক্রান্ত হইয়াছিলেন। সেইদিন তিনি আত্মীয় বন্ধুবান্ধবগণকে নিকটে ডাকাইয়া তাঁহাদের কথোপকথন করিতেছেন, এমন সময়ে সকলকে শ্রীহরির নাম স্মরণ করিতে বলিয়া ইহধাম পরিত্যাগ করেন। শুনা যায়, তাঁহার এই আকস্মিক মৃত্যুতে তাঁহার অনেকগুলি পুঁথি অসম্পূর্ণ অবস্থায় রহিয়া যায় এবং কতকগুলি উদ্দেশ্য কার্য্যে পরিণত হয় না।

চৈত্রমাসে গাজনের সময় অনেক ভক্তগণ তাঁহার রচিত শিবায়ন, অনেক পাঁচালী গাহিয়া অপার আনন্দ অনুভব করিতেন। পল্লীস্থ বালকেরাও তাঁহার রচিত অনেক ছড়া গাহিয়া নৃত্য করিত। কেহ কেহ বলেন কবির পূর্ব্বউপাধি "বেরা" ছিল পরে দাস হইয়াছিল। কিন্তু এ সম্বন্ধে বিশিষ্ট কোন প্রমাণ পাওয়া যায় না। ৩

'জগতে গ্রন্থপ্রচারের উদ্দেশ্য লোকশিক্ষা। এক একজন ক্ষণজন্মা মহাত্মা জন্মগ্রহণ করিয়া এরূপ গ্রন্থ রচনা করিয়া যান যে, গ্রন্থবর্ণিত ঘটনাগুলি সেই দেশের অধিবাসীদিগের উপর প্রভাব বিস্তার করিয়া থাকে ; এবং ন্যূনাধিক পরিমাণে লোকশিক্ষা পরিচালিত করে। চিত্রকর যেমন চিত্রাঙ্কণের আদর্শ লইয়া অঙ্কন এবং নয়নরঞ্জন স্বাভাবিক বর্ণসন্নিবেশ ও উহার প্রতিফলনে কৌশল প্রদর্শন করিয়া থাকেন ; কবিগণও সেইরূপ এক একটা ঘটনা আদর্শ স্বরূপ গ্রহণ করিয়া স্বীয় প্রতিভাবলে দেশ কাল পাত্র

বিবেচনা করিয়া স্বরচিত গ্রন্থে সেই সমস্ত ভাব সন্নিবিষ্ট করিয়া ধন্য ও চিরস্মরণীয় হইয়া থাকেন। 'কবি দয়ারাম দাস' এ দেশের লোক; অধিকন্তু আমাদের স্বজাতি, সুতরাং যাহাতে স্বদেশের স্বজাতির উন্নতি হয় তাহার উপায় অবলম্বন করিয়া পুস্তক রচনা করিয়া গিয়াছেন। যাহাতে কৃষিকার্য্যের বিস্তার হয়, কৃষিকার্য্যকে কেহ ঘৃণার চক্ষে না দেখে, কৃষির উন্নতি হইলে সকল বিষয়ে উন্নতি হয়, পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন থাকিলে স্বাস্থ্য ভাল থাকে, শ্রীমান হওয়া যায় ইত্যাদি বিষয়ে সাধারণের মনাকৃষ্ট করিয়া লিখিত?'

নূতনের নিকট পুরাতন চিরদিন লাঞ্ছনা প্রাপ্ত হইয়া থাকে, ইহা জাগতিক নিয়ম। পুরাতন যে নূতনের জন্মদাতা তাহা অনেকে জানিয়া ও নূতন পুরাতনে লাঞ্ছনা প্রদান করিতে শঙ্কুচিত হন না। আমরা পূর্ব্বপ্রবন্ধে লিখিয়াছিলাম যে,—"কবি তাঁহার স্বরচিত পুস্তকে উল্লেখ করিয়া গিয়াছেন যে—

কাশীযোড়া মহাস্থান,　　　　নরনারায়ণ আখ্যান,
ধন্য রাজা ধার্ম্মিক নরপতি।
হৈল তাঁর প্রতিষ্ঠিত　　　　কবিবর গায় গীত
কিশোর চকে যাহার বশতি॥"

উক্ত উদ্ধৃতাংশটী অনেকাংশে সন্দেহ উপস্থিত করিয়াছে। ঐ অংশটী বর্ত্তমান সময়ে অনেক যুবকের মুখে শুনিতে পাওয়া যায়, কিন্তু বৃদ্ধের মুখে কিম্বা হস্তলিখিত পুঁথিতে ইহার অনেক বিপরীত জানিতে পারা যায়। আমরাও নূতন পাইয়া পুরাতনে লাঞ্ছনা প্রদান করিতে সঙ্কুচিত হই নাই। আমরা ১২১৮ সালের হস্তলিখিত একখানি লক্ষ্মীচরিত পাইয়াছি। তাহাতে উক্ত স্থানে এইরূপ লেখা আছে,—

"কাশিজোড়া মহাস্তান　　　　মহারাজা নন্দনারাণ
ধন্য ধার্ম্মিক নরপতি।
হয়্যা তার পৃতিষ্ঠীত,　　　　দয়ারাম রচেগিত,"

১২৫৪ সালের একখানি পুঁথি হস্তগত হইয়াছিল তাহাতে রাজা নন্দনারাণের স্থলে সুন্দর নারাণ (নারায়ণ) লেখা আছে। ইহা দ্বারা এই প্রতিপন্ন হইতেছে যে কবি বোধ হয়, রাজা নন্দনারায়ণের রাজত্বকাল হইতে রাজা

সুন্দরনারায়ণের রাজত্বকাল পর্য্যন্ত সভা পণ্ডিত ছিলেন। আজকাল অনেক যুবকের মুখে নরনারায়ণের নাম শুনিতে পাওয়া যায়, ইহার কারণ কি? বর্ত্তমান সময়ে হস্তলিখিত পুঁথির প্রতি সকলের অশ্রদ্ধা জন্মিয়াছে। আজকাল ছাপা লিখিত পুস্তকেরও অভাব নাই। সুতরাং যাহা তাহারা বর্ত্তমান দেখিতে পায়, তাহাই শিক্ষা করিয়া থাকে।

বর্ত্তমান শ্রীদীননাথ দাস পাল (?) হইতে প্রাপ্ত হইয়া শ্রীবৈকুণ্ঠনাথ মাজি প্রণীত লক্ষ্মীচরিত্র কত ব্যবসায়ী কর্ত্তৃক প্রকাশিত হইয়া বাজারে বহুল পরিমাণে আমদানী হইতেছে। পূর্ব্বেই বলিয়াছি পল্লীগ্রামস্থ অধিবাসীরা লক্ষ্মীচরিত্রপাঠে অতীব আনন্দ অনুভব করে। এখনও অনেক পল্লীস্থ বালকেরা গ্রাম্য পাঠশালে অধ্যয়নকালে লক্ষ্মীচরিত্র পাঠ করিয়া থাকে। এই সব কারণে পুস্তকগুলি প্রচুর পরিমাণে বিক্রীত হওয়ায় পুনঃপুনঃ সংস্করণ করা হইতেছে। কিন্তু বিশ্বাস পুনঃপুনঃ দূষিত হইতেছে, সেই সমস্ত পুস্তকে লিখিত আছে,—

"কাশীজোড়া মহাস্থান, নরনারায়ণ আখ্যান,
ধন্য রাজা ধার্ম্মিক ভূপতি।
হৈয়া তার প্রতিষ্ঠীত, কবিবর গায় গীত,
তাঁর রাজ্যে যাহার বসতি॥

ইহাই দেখিয়া যুবকেরা 'নরনারায়ণের নাম কীর্ত্তন করিয়া থাকে, প্রশ্ন হইতে পারে যুবকেরা তবে তাঁর "রাজ্যে স্থলে" কিশোর চক বলিয়া থাকে কেন? যখন আমরা নরনারায়ণের নাম সম্বন্ধে কোন হস্তলিখিত পুস্তকাদিতে কিম্বা কোন বিশিষ্ট প্রমাণ পাই নাই, তখন উহা কিরূপে স্বীকৃত বিষয় হইতে পারে? সত্যের অপলাপ হয় এইজন্য বোধ হয় বাক্‌বাদিনী এখনও আবাল বৃদ্ধের কণ্ঠ হইতে কিশোর চকের নামটী অপহৃত করেন নাই।

আমরা জানি বর্ণাশুদ্ধি পদ্যের অমিল প্রভৃতি থাকিলে সেই সমস্ত শুদ্ধ করিয়া লিখিত হইলে সংস্করণ করা হয়,—যথা,—

"বিনন্দ রাখাল নামে বিরাট নগরে,
কোথক দিন কাল কাটে কুড়্যার ভিতরে॥
ভোজনে ভাজনে নাঞি ভাণ্ডে জলখায়।
শনি পীড়া জেন রাজা শ্রীবচ্ছের প্রায়" ইত্যাদি ইত্যাদি স্থলে

বিনন্দ রাখাল নামে বিরাট নগরে।
বাস করি থাকে সেই কুঁড়ের ভিতরে॥
জল পাত্র বিহনেতে ভাণ্ডে জল খায়।
শনিপীড়া হৈল যেন শ্রীবৎস রাজায়॥

কিন্তু রাজা নন্দনারায়ণ কিম্বা সুন্দরনারায়ণ (নরদিগের নারায়ণ এইভাবে লিখিত ?) দয়ারাম স্থলে কবিবর (যথা দয়ারাম দাস গায় লক্ষ্মীর চরিত্র স্থলে কবিবর গায়গীত লক্ষ্মীর চরিত্র) 'কিশোরচক' স্থলে তাঁর রাজ্যে ইত্যাদি লিখিলে সংস্করণ করা হয় না। ইহা নাম জাল করা, জানি নাই ঠিকানা বিহীন কবিযশাকাঙ্খী মাজি মহাশয় কি উদ্দেশ্যে কিশোরচক ও দয়ারাম দাসের নাম (দীননাথ দাস পালই কি দয়ারাম দাস ?) বিলোপ করিয়া দিয়াছেন। মোট কথা মাজি মহাশয়ের এরূপ ব্যবহার সাহিত্য মাত্রেই দুঃখিত না হইয়া থাকিতে পারে না। ছাপালিখিত পুস্তকে কেবল তিলোত্তমা পালাটীতে কবি প্রহ্লাদ দাসের নামোল্লেখ করা হইয়াছে। কিন্তু অন্যান্য সকল অংশে কেবল কবিবর লিখিত হইয়াছে। আমরা বহুচেষ্টা করিয়াও বিনন্দ রাখালের পালা ব্যতীত অন্য কোন হস্ত লিখিত পালাদি পাই নাই। এই জন্য অন্যান্য অংশের প্রতিবাদে বিরত রহিলাম। এইরূপ কতলোক যে কুব্যবহার করিয়া তাঁহার কীর্ত্তিকলাপ লোপ করিয়াছেন তাহা বলিতে পারা যায় না। ছাত্রসম্মিলনী ইহার যথোচিত প্রতিবিধান কামনা করিতেছেন। আমরা চাই সংস্কার। সত্য জয়যুক্ত হউক!

একটী অকিঞ্চিৎকর ঘটনার উল্লেখ করিয়া অদ্য অবসর গ্রহণ করিতেছি। বোধ হয় ইহা অপ্রাসঙ্গিক হইবে না। কয়েকদিবস অতীত হইল আমি ঘটনাক্রমে পাঁশকুড়ার নিকটবর্ত্তী একটা গ্রামের জনৈক বৃদ্ধের বাড়ীর অতিথি হইয়াছিলাম। সেই দিন সন্ধ্যার পরে বৃদ্ধ একখানি হস্তলিখিত লক্ষ্মী চরিত্র লইয়া পাঠ করিতে লাগিলেন; আর কতকগুলি প্রতিবাসী আসিয়া তাঁহার পার্শ্বে বসিয়া ঐকান্তিক চিত্তে শ্রবণ করিতে লাগিলেন; আমিও ঐ সম্প্রদায়ভুক্ত হইলাম। পুঁথিটীর স্থানে স্থানে এরূপ ভাব যে পড়িতে বিশেষ কষ্ট হয়। আমি বৃদ্ধের মনোভাব জানিবার অভিপ্রায়ে বলিলাম "মহাশয়! আপনার পড়িবার সাতিশয় আগ্রহ দেখিতেছি, অথচ হস্ত লিখিত পুঁথিটি পড়িতে বিশেষ কষ্ট বোধ করিতেছেন। আজকাল বাজারে খুব সস্তাদরে লক্ষ্মী চরিত্র বিক্রীত হইতেছে। তাহার একখানি

ক্রয় করিয়া আপনার ইচ্ছা পূর্ণ করুন না? বৃদ্ধ ইহার উত্তরে বলিলেন বৎস! তোমরা আজকালের নবাধরণের মানুষ তোমরাই সমস্ত পূর্ব্ব ইতিহাস বিলুপ্ত করিতেছে। এমন কি কেহ কেহ অম্লান বদনে পূর্ব্বের হস্তলিখিত পুথিসমূহ পোড়াইতে সঙ্কুচিত হও না। তোমরা ছাপার পুস্তকের দুই চারিটী ছবি এবং সুন্দর রঙের চিত্রিত মলাট দেখিলেই ভাল পুস্তক বিবেচনা কর। ঐ সকল পুস্তকে পূর্ব্বের পুঁথি হইতে অনেক কথা পরিত্যাগ করিয়া দিয়াছে। অনেকে নিজেদের প্রতিপত্তি দেখাইবার জন্য রচয়িতার নাম পর্য্যন্ত উঠাইয়া দিয়া স্ব স্ব নাম ইচ্ছামত স্থাপন করিয়াছেন —এই লক্ষ্মীচরিত্রের রচয়িতা দয়ারাম দাসের নাম আজকাল ছাপার কোন পুস্তকে দেখিতে পাওয়া যায় না। আমাদের স্বজাতির একজন কীর্ত্তিমান কবির পরিচয় দিয়া আমরা ধন্য হইতাম, আজ তাঁহার নাম বিলুপ্তপ্রায় হইতেছে। ইহাতেও তোমাদের ভ্রম ঘুচিলনা! ধন্য তোমাদের স্বজাতিপ্রিয়তা!! পাঠকগণ! বৃদ্ধের বচন শুনিলেন? দেখুন কবির কিরূপ প্রতিপত্তি ছিল। বৃদ্ধের অন্তঃকরণে স্বজাতি প্রিয়তা কি পরিমাণে প্রকাশ পাইয়াছে।

হে মাহিষ্য যুবকবৃন্দ! তোমরা আর নিরস্ত থাকিওনা। তোমরা নব উদ্যমে বহুপূর্ব্বের ইতিহাস পর্য্যালোচনা কর। দেখিবে তোমাদের সম্মান ও মর্য্যাদা কতদূর! স্বার্থপর ব্যক্তিগণ তোমাদের ইতিহাস বিলোপ করিয়া দিতেছে! তাহা কি তোমরা একবার ফিরিয়া দেখিবে না? ভাই তোমাদের কি তাম্রধ্বজ, শিখিধ্বজ, অনঙ্গভীমদেব প্রভৃতি রাজন্যবর্গের দয়ারাম প্রভৃতি কবিগণের ইতিহাস ভাল লাগিতেছে না? কেবল তোমরা আমেদ সা, আরঙ্গজীব, গোল্ডস্মিথ, কাউপারের ইতিহাস পাঠ করিয়া জীবন অতিবাহিত করিবে? ভাই! তোমাদের হৃদয় আছে একবার ভাব—চক্ষু আছে একবার দেখ—চিন্তা করিবার শক্তি আছে, একবার অনুধ্যান করিয়া দেখ,—স্বার্থপর, ঈর্ষান্বিত ব্যক্তিগণ তোমাদের ইতিহাসের অবস্থা কিরূপ করিয়াছে ও করিতেছে। তাই বলি একবার দেখ,—দেখ। জাতীয় গৌরব রক্ষা কর!

শ্রীউপেন্দ্র কিশোর সামন্ত রায়।
কিশোরচক চণ্ডীতলা মাহিষ্য পল্লী।

সিদ্ধ নাড়াঠাকুর জী।

বহু পল্লীগ্রামের নিবিড় অরণ্য মধ্যে ২।১টি করিয়া সিদ্ধস্থান বিদ্যমান দেখিতে পাওয়া যায়। প্রাচীনকালে সাধক যে স্থানে অবস্থান করিয়া, সাধন দ্বারা সিদ্ধিলাভ করিয়াছেন, অদ্যাবধি সেই স্থানকে সাধকের নামে বিশেষিত করিয়া লোক সকল ভয় ও ভক্তি করিয়া থাকে। কোন কোন সিদ্ধ পুরুষের স্থানে বৎসরের মধ্যে অন্ততঃ একদিনও উপহার সামগ্রী প্রদান করিয়া গ্রামের লোকে তাঁহার স্মৃতি জাগরিত রাখিয়া থাকে। এই পত্রিকায় 'পাতিলা-খালির মহামায়া' শীর্ষক প্রবন্ধে পাতিলাখালি গ্রামের সংক্ষিপ্ত পরিচয় দিয়াছি। এই পাতিলাখালি গ্রামের দক্ষিণ সীমায় বহুদিনের একটি পুরাতন দীঘি বিদ্যমান রহিয়াছে। এই দীঘির পশ্চিম ধারে একটি প্রকাণ্ড পুরাতন বৃক্ষ। বৃক্ষের পার্শ্বেই ১টি পুরাতন কুঠির ভগ্নাবশেষ। উহা বেঙ্কল সাহেবের নীল-কুঠি ছিল বলিয়া দেশের লোকে জানে। কুঠীর নিকটস্থ দীঘিটি নাড়ার দীঘি নামে বিখ্যাত। নাড়াঠাকুর নামে একজন সিদ্ধ পুরুষের আশ্রম ঐ দীঘির ধারে ছিল বলিয়া এই নাম হইয়াছিল। নাড়াঠাকুর প্রকৃতই সিদ্ধ পুরুষ ছিলেন। তাঁহার অলৌকিক কার্য্যের অনেক গল্পই শুনা যায়। এই গ্রামের বর্ত্তমান প্রাচীন লোকেরা, পূর্ব্ব পুরুষদের নিকট যাহা শুনিয়াছেন, অদ্যাপি প্রসঙ্গক্রমে সেই সব গল্প করিয়া থাকেন। নাড়াঠাকুর দীঘির পশ্চিম ধারে কুটির নির্ম্মাণ পূর্ব্বক তাহার মধ্যে আসন স্থাপন করিয়াছিলেন। তাহাতে বসিয়া সতত সাধনা করিতেন। দীঘির পূর্ব্বধারে কয়েক-জন লোক বাস করিবার জন্য বাড়ীঘর প্রস্তুত করা কালে, নাড়াঠাকুর নিষেধ করিয়াছিলেন, 'তোমরা থাকিতে পারিবে না; যেহেতু ঐ দিকে মুখ করিয়া আমি সাধনা করি।' অতঃপর ঠাকুরের কথাই সত্য হইয়াছিল। ব্যাধি এবং অন্যান্য নানাবিধ আকস্মিক উপদ্রবে অল্পদিনের মধ্যেই সকলকেই বাড়ী ভাঙ্গিয়া স্থানান্তরে যাইতে হইয়াছিল।

ঠাকুরের একটি বৃহৎ নারিকেলের মালার করঙা ছিল। তিনি প্রাতঃ-কালে উঠিয়া এক এক দিন এক এক গ্রামে ভিক্ষা করিতে যাইতেন। অতিথির সংখ্যা যতই হউক, তাঁহার ভিক্ষালব্ধ ঐ এক করঙার চাউল দ্বারাই, সকলের পরিতোষ রূপে ভোজন নির্ব্বাহ হইত। একদিন এক

ছুতোর (নাম ধামের কথা শুনিয়াছিলাম মনে নাই) ঠাকুরের করঙটি স্বয়ং একাকী পরিপূর্ণ করিয়া চাউল দিবার ইচ্ছা করিয়া, অধিক পরিমাণে চাউল ভিক্ষা লইয়া আসিল। তাহার দ্বারা করঙাটি পূর্ণ না হওয়ায় পুনঃ চাউল লইয়া আসিল। তথাপি পূর্ণ হইল না দেখিয়া ক্রমে গৃহের তাবত চাউল আনিয়া করঙাতে ঢালিয়া দিল। কিন্তু আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে, এ করঙা কিছুতেই পূর্ণ করা গেল না। ঠাকুর ঈষৎ হাসিলেন। ছুতোর ঠাকুরকে প্রণাম করিয়া ক্ষমা চাহিয়াছিল। ঠাকুর অন্যান্য বাড়ীতে ভিক্ষা করিতে চলিয়া গেলেন।

আরও একটি আশ্চর্য্যের কথা যে, ঠাকুরের ঐ করঙাটি একদিন এক গৃহস্থের বাড়ীতে গেলে পর কোনমতে চূর্ণ বিচূর্ণ হইয়া যায়! ঠাকুর তথায় বসিয়া ছিলেন। উঠিয়া যাইবার-কালে চূর্ণ বিচূর্ণ খোলা গুলি সন্ধি মত যোড়া দিয়া ঠিক পূর্ব্বের ন্যায় প্রস্তুত করিলেন। করঙা ভাঙ্গিয়া ছিল বলিয়া কেহ অনুভবও করিতে পারিল না। ভাঙ্গা করঙা ভাল হইয়া গেল। আরও শুনা যায়, ঠাকুর জ্যোৎস্নাময় রাত্রিতে মধ্যে মধ্যে দীঘির জলের উপর খড়ম পায়ে দিয়া পদচারণ করিতেন। হঠাৎ কোন এক ব্যক্তি তাহা দেখিয়া স্তম্ভিত হইয়া গিয়াছিল। এসকল অলৌকিক কথা এখনকার সভ্যসম্প্রদায় কেহ বিশ্বাস করিতে না পারেন, শুনিয়া নাসিকা কুঞ্চিত করিতে পারেন, কিন্তু সাধন বলে অণিমা, লঘিমা, প্রাকাম্যাদি অষ্টাদশ প্রকার সিদ্ধি লাভ হইয়া থাকে ইহা শাস্ত্রবিশ্বাসী নিষ্ঠাবান হিন্দুসন্তানের কখনই অবিশ্বাস হইবে না। ঠাকুরের এইরূপ মহিমা অবগত হইয়া, তাঁহার আশ্রমস্থ টী ভূম্যধিকারী নিষ্কর রূপে প্রদান করিয়াছিলেন। ব্রাহ্মণ হইতে ব্রাহ্মণেতর সমস্ত জাতিই তাঁহাকে সম্মান ও ভক্তি করিত।

এই সিদ্ধ মহাপুরুষের বৃত্তান্ত যতটুকু জানিতে ইচ্ছা হয়, তাহার সমস্ত জানিবার উপায় নাই। ঠাকুরের পূর্ব্বাশ্রম কোন্ গ্রামে ছিল, কাহার পুত্র ছিলেন, ঠাকুরের প্রকৃত নামই বা কি ছিল ইত্যাদি কিছুই জানিবার উপায় নাই। তৎকালে সাধক বা সিদ্ধগণের মধ্যে কেহ সকলের সহিত কথাবার্ত্তা বলিতেন না। কাহারও সহিত কথাবার্ত্তা বলিলেও অতি অল্পমাত্রায় বলিতেন। গ্রাম্যবার্ত্তা তাঁহাদের নিকট স্থান পাইত না। অতএব তাঁহাদের সম্পূর্ণ পরিচয় পাওয়া একরূপ অসম্ভব ছিল। নাড়াঠাকুরের সম্বন্ধে আমাদের গ্রামের বৃদ্ধ লোকেরা বলিয়া থাকেন যে, আমরা আমাদের স্বর্গীয় পুরুষদের মুখে শুনিয়াছি, একজন জন্ত গৃহস্থ যুবক নাড়াঠাকুরের চেলা হইয়াছিল। সে জাতিতে

মাহিষ্য ছিল এবং তাহার বাড়ীও এই দেশের মধ্যে ছিল। সেই চেলার মুখে শুনা গিয়াছে যে, নাড়াঠাকুরের পূর্ব্বাশ্রম পূর্ব্ব অঞ্চলের কোন গ্রামে ছিল। শৈশবে পিতৃমাতৃহীন হইয়া, জ্ঞাতিদের যত্নে লালিত পালিত ও ক্রমে বর্দ্ধিত হন। বয়ঃপ্রাপ্ত হইলে, একজন সাধু পুরুষের সঙ্গ লাভ করিয়া, তাঁহার আশ্রিত হন। সেই সাধু পুরুষের সঙ্গ লাভই তাঁহার গৃহত্যাগী হইবার কারণ হয়। পরে, বহুদিন বহু তীর্থস্থান ও দেশাদি ভ্রমণ করিয়াছিলেন। যোগ সাধনাদি দ্বারা সিদ্ধি লাভ করিয়াছেন। এই নিবিড় স্থানটী তাঁহার সাধন পক্ষে মনোজ্ঞ হওয়ায়, এখানে অবস্থান করিতেন। ঠাকুরের জাতির পরিচয় জিজ্ঞাসা করায়, চেলা বলেন; "ইনি পূর্ব্বে আমাদের জাতীয় মাহিষ্য ছিলেন পরে ভেখাশ্রিত হইয়াছেন।" এতদ্দেশে বিস্তর মাহিষ্য জাতীয় ভেখাশ্রিত বৈষ্ণব ছিলেন, ও এখনও আছেন। এ গ্রামে এখনও কয় ঘর মাহিষ্য জাতীয় বৈষ্ণব রহিয়াছেন। অতএব সিদ্ধ নাড়াঠাকুর যে প্রকৃতই জাতীয় মাহিষ্য ছিলেন, তদ্বিষয়ে আর সন্দেহ মাত্র নাই। শ্রীমন্মহাপ্রভু শ্রীমদদ্বৈতাচার্য্যকে নাড়া নাড়া বলিয়া সম্বোধন করিতেন। শ্রীচৈতন্য ভাগবতে ইহা দেখা যায় নিত্যানন্দ বংশমালায় বর্ণিত আছে যে, শ্রীমন্নিত্যানন্দ প্রভুর পত্নী শ্রীজাহ্নবী দেবী নাড়া বৈরাগীর সৃষ্টি করিয়াছিলেন। নাড়া শব্দের অর্থ যাহাই হউক, আমাদের এই মাহিষ্য নাড়া ঠাকুর যে স্মরণীয় ব্যক্তি তাহা তাঁহার প্রাগুক্ত অলৌকিক কার্য্য সকলই ব্যক্ত করে।

শ্রীদুর্গানাথ দেওরায়-তত্ত্ববিনোদ।

বিজয়-গীতিকা।

(১)

এ কি শুনি অকস্মাৎ বিজয় নাহিক আর!

বিনা মেঘে বজ্রাঘাত, সত্য সত্য হ'ল আজ,

ভীষণ আঘাতে এবে ছিন্ন হৃদি তার,

বাজেনা হৃদয়-বীণা, মন সঙ্গীত গাহেনা,

মনের আগুন তাই মনেতে রহিল।

আহিতাগ্নি গিরি সম হৃদয় জ্বলিল।

---

* ঢাকা জেলার দোগাছী নিবাসী বন্ধুবর শ্রীযুক্ত বসন্ত কুমার রায় এম, এ, বি, এল, মহোদয়ের পুত্র বিজয় কুমার রায়ের স্বর্গ গমন উপলক্ষে শোক প্রকাশ।

(২)

বিজয় স্বর্গের ধন পৃথিবীর নয়।

পার্থিব কলুষ রাশি, স্পর্শে বা তাঁহারে আসি,

এই ভয়ে নিল বিধি নিজের আলয়।

থাক বৎস থাক সুখে, প্রেমময়ের প্রেম বুকে,

পৃথিবীর বন্ধুগণে, ক'রও স্মরণ।

ধরণীর কার্য্য শেষে করিব দর্শন।

(৩)

শিক্ষার অমৃত ফল বিনয় ভূষণ,

তোমাতে দেখছি যাহা, কোথাও দেখি না তাহা,

"সার্ ষ্ট য়ার্ট বেলীবরে" ম্যাডেল সেজ দিন,

দৈন্য-ভরে মম পদে, বিনামা পরালে হাতে,

পিতৃ নির্বিশেষে আমায় করিলে যতন,

জীবন পর্য্যন্ত তাহা রহিবে স্মরণ।

(৪)

সাহিত্য গগনে তুমি নবীন-ভাস্কর।

প্রাতের মৃদুল ভাতি, নাহি দিতে দিব্য জ্যোতি,

কাল মেঘে চির তরে গ্রাসিল তোমার।

"অবনতির ইতিহাস", আর কে করে প্রকাশ,

"সাহিত্য সমাজ" অঙ্গ করিতে শোভন।

—অন্ধকারে আচ্ছাদিল হৃদয় গগন।

(৫)

ঢাকা সাহিত্য-পরিষদ্ বিজ্ঞের সেবিত।

"প্রতিভা" নামে পত্র তার, * সে প্রবন্ধ করে প্রচার,

—"সাভারে প্রাচীন কীর্ত্তি" যতনে লিখিত।

হরিশ্চন্দ্রের গর্ব্ব গীতি, শুনাইলে রাজনীতি,

মৃত সাহিত্যের প্রাণ হ'ল উদ্দীপন,

আর না শুনিতে পাব সে গৌরব গান।

---

* ১৩১৯ সাল ফাল্গুন সংখ্যা। ঢাকা। মূল্য ॥০ আনা।

(৬)

জাতীয় উত্থান তরে এজন্মের মত,
ঢাকা রিভিউর পত্রে, বর্ণিলে তার বহু ছত্রে,
বঙ্গীয় ক্ষত্রিয়তেজ মাহিষ্য গৌরব।
দিব্যক, রুদ্রক আর, মহারাজ ভীমবর,
স্বজাতীয় পালরাজা করিয়া নিধন,
বরেন্দ্রের আধিপত্য করিল গ্রহণ।

(৭)

এ সকল তত্ত্ব আর ভীমের গৌরব,
রাম চরিত কাব্য হ'তে, যত্নে তাহা প্রদর্শিতে,
কত না আয়াস হায়! দেখাইলে তব।
গত জানুয়ারী মাসে, "রিভিউ" প্রকাশি দেশে,
তব জ্ঞান-গরিমার যে সাক্ষ্য দিয়েছে।
তোমাসম প্রত্নবিৎ আর কেবা আছে?

(৮)

থাক বৎস সুখে থাক নন্দন কাননে,
ইতিহাসে বরণীয়, হয়ে রও স্মরণীয়,
"কীর্ত্তির্যস্য স জীবতি" এনব জীবনে।
শ্রদ্ধেয় বান্ধববর, রায় বসন্তকুমার,
তব পুত্র কীর্ত্তিমান্ কীর্ত্তির শরীর,
রাখিয়া হইল আজি ধরায় অমর।

(৯)

হৃদয় হইতে শোক করি বিৰ্জ্জন,
জন্ম জন্ম সাধ ক'রে, হেন পুত্র লভিবারে,
মানবেতে করে যেন নিত্য আকিঞ্চন।
গুণগ্রাহী যদি থাকে, মাহিষ্য-সমাজ বুকে
সভ্যতার শিষ্য যদি থাকে কোন জন।
বিজয়-গীতিকা নিত্য করিবে পঠন।

শোক-সন্তপ্ত—শ্রীসুদর্শনচন্দ্র বিশ্বাস,
হাবাসপুর—ফরিদপুর।

মাহিষ্য সমিতি।

স্থান—মেদিনীপুর জেলার ডেবরা থানার কুতুবপুর পরগনায় গোপালনগর গ্রামে শ্রীযুক্ত বাবু কালাচাঁদ মাইতির বাটী।

সময়—আমলী সন ১৩২১ সাল ৯ই অগ্রহায়ণ সোমবার বেলা ১টা হইতে রাত্রি ১০টা পর্য্যন্ত।

বিষয়—"মাহিষ্য" জাতীয় উন্নতি কল্পে স্বজাতীয় অধিবেশন।

লক্ষ্য—বর্ত্তমান পক্ষাশৌচ ধারণ জন্য।

স্থগিতা—প্রধান নেতা স্বজাতী সুহৃদ্ শ্রীযুক্ত বাবু সন্ন্যাসীচরণ চৌধুরী মহাশয়ের জ্যেষ্ঠ পুত্র শ্রীযুক্ত বাবু রাইচরণ চৌধুরী সাং গোপাল নগর শ্রীযুক্ত বাবু রাখালচন্দ্র চৌধুরী শ্রীযুক্ত বাবু শশীভূষণ মাইতি মহাশয়গণের বিশেষ চেষ্টা পরিশ্রমে এই স্বজাতীয় সমিতির সংঘটন হয়।

সভাপতি—পণ্ডিত শ্রীযুক্ত ঈশানচন্দ্র ভট্টাচার্য্য সাং গোপাল নগর।

সহকারী সভাপতি—নারাজোলাধিপতি রাজা নরেন্দ্রলাল খাঁন বাহাদুরের পুরোহিত মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত রাখালচন্দ্র তর্করত্ন প্রঃ ভট্টাচার্য্য, শামাট।

সভ্য—শ্রীযুক্ত প্রসন্নকুমার ভূঞা চন্দনপুর শ্রীযুক্ত ক্ষেত্রমোহন বেরা। শ্রীশিবপ্রসাদ বেরা সাং নানাচক। শ্রীনবদ্বীপ মাল শ্রীগয়া রাম শাসমল শ্রীচিন্তামণি শাসমল সাং পুরস্কার খোলা শ্রীবৈকুণ্ঠনাথ মাইতি সাং রহিমপুর শ্রীনাথবেরা সাং হরিনারায়নপুর শ্রীযুক্ত শ্রীপতিচরণ মাইতি বৈকুণ্ঠপুর শ্রীযুক্ত শ্রীপতিচরণ বেরা কাড়াদ্দী ইত্যাদি ৩৫০ ব্যক্তি হইবে।

অভিভাবক। শ্রীযুক্ত বাবু দীনবন্ধু মাইতি শ্রীযুক্ত বাবু সন্ন্যাসীচরণ চৌধুরী শ্রীযুক্ত গয়ারাম চৌধুরী।

বক্তা—শ্রীযুক্ত বাবু পূর্ণচন্দ্র মাইতি সাং রামদাসপুর শ্রীযুক্ত বাবু ভূষণচন্দ্র পট্টনায়েক সামাট শ্রীযুক্ত রাজেন্দ্র নাথ ভট্টাচার্য্য প্রভৃতি।

প্রতিজ্ঞা—হিন্দু শাস্ত্রানুসারে ও ব্রাহ্মণ পণ্ডিতগণের ব্যবস্থা মত "মাহিষ্য" ধর্ম্ম প্রতিপালনে যত্নবান হইব। এবং পক্ষাশৌচ নিয়ম করিব ও প্রচার জন্য চেষ্টা পাইব ইত্যাদি।

তর্ক—যদি মাহিষ জাতি বৈশ্য বলিয়া সপ্রমাণ হয় তাহা হইলে বৈশ্যের সমস্ত ধর্ম্ম প্রতিপালন করা কর্ত্তব্য?

মীমাংসা—সমস্ত মাহিষ্য ভ্রাতৃগণ একতা বন্ধন হইলে ক্রমেই সমস্ত ধর্ম্ম প্রতিপালন হইবে। ইত্যাদি।

বর্ত্তমান ক্ষেত্রে গোপাল নগর সাকিমের শ্রীযুক্ত বাবু রাইচরণ চৌধুরী মহাশয়ের বিমাতা ৺ধাম গমন করায় তাঁহার "পক্ষা শৌচ" প্রচলন আরম্ভ হইল। তাহাতে পুরোহিত ও নাপিত ধোপা সকলেই স্ব স্ব কার্য্যে নিষ্পন্ন করিতে বাধ্য হইয়াছেন।

স্বাক্ষর।—মধ্যশ্রেণী ব্রাহ্মণ, উৎকল শ্রেণী ব্রাহ্মণ, দক্ষিণাত্য বৈদিক শ্রেণী ব্রাহ্মণ ও সভাস্থিত প্রায় ২৫০ জন "স্বাক্ষর" করিয়াছেন।

মাহিষ্য-সমাজ।

[তৃতীয় ভাগ, একাদশ ও দ্বাদশ সংখ্যা—ফাল্গুন ও চৈত্র, ১৩২০ সাল।]

—:০:—

সাধক রামগোবিন্দ বিশ্বাস।

স্বর্গীয় রামগোবিন্দ বিশ্বাস মহাশয়ের জন্মস্থান পূর্ব্বদেশের খ্যাতনামা গ্রাম হরিপুরের নিকট মানইর গ্রাম। হরিপুরে বিস্তর ব্রাহ্মণের বাস ছিল, এখন অনেক হ্রাস হইয়া আসিয়াছে। এই ব্রাহ্মণেরা স্থানীয় জমীদার বংশ; এক্ষণে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অংশে বিভক্ত হইয়াছে। মানইর গ্রামেও অনেক সৎ ব্রাহ্মণের বাস ছিল; এখন সব লুপ্তপ্রায়। এই গ্রামেই একটী ভদ্র মাহিষ্যকুলে ৺ রামগোবিন্দ বিশ্বাসের জন্ম হয়। বিশ্বাস মহাশয়ের বাল্যকাল হইতেই ধর্ম্মপথে মনের লক্ষ্য ছিল। অল্প বয়সের মধ্যেই পিতৃমাতৃহীন হওয়ায়, সংসারের প্রতি বিরাগ ও পরমেশ্বরের প্রতি অনুরাগ বৃদ্ধি পায়। স্বীয় গুরুদেবের নিকট দীক্ষিত হইয়া অতি নিষ্ঠার সহিত ধর্ম্মানুষ্ঠানে রত হন। পূর্ব্বদেশে অনেক স্থানে ৺ কালীমাতার জাগ্রত মহিমাযুক্ত স্থান বিদ্যমান আছে এবং শাক্ত সম্প্রদায় ব্রাহ্মণেরও অধিক বসতি আছে। ঐ সকল ব্রাহ্মণের মধ্যে অনেকে পত্তনীদার, তালুকদার জমীদার প্রভৃতি অবস্থাপন্ন লোক আছেন এবং দুই একজন পূর্ব্বে উত্তম শক্তি সাধক ব্রাহ্মণও ছিলেন। বিশ্বাস মহাশয়, ঐরূপ কোন এক তেজস্বী ব্রাহ্মণের নিকটে কালীমন্ত্র গ্রহণ করিয়া রাত্রিকালে শ্মশানে সাধনা এবং দিবাভাগে নিবিষ্টমনে সেই মন্ত্র জপ করিতেন। এই সময় ইনি নানা স্থানে ভ্রমণ করিয়া, অনেক সাধকদের নিকটে উপদিষ্ট হন ও যোগরহস্য অবগত হইয়া, আসন, প্রাণায়াম, প্রত্যাহারাদি যোগধর্ম্ম অভ্যাস করেন। এক দিবস অমানিশায়, শ্মশানে সাধনা করিতে করিতে বিভীষিকা দেখিয়া ভয় প্রাপ্ত হওয়ায় মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িয়াছিলেন। প্রাতঃকালে তাঁহার সংজ্ঞালাভ হয়। তদবধি তিনি আর শ্মশানে সাধনা করেন নাই তবে নির্ভয়ে রাত্রিকালে একাকী শ্মশানে যাইতে পারিতেন ও মধ্যে মধ্যে যাইতেন। শ্মশান সাধনায় বাধা

পাইয়া, তিনি কৃচ্ছ্রব্রত আচরণ করেন। হংসব্রত নামক অতি কৃচ্ছ্রব্রত পালন করিয়া ছিলেন। ইহার পরে তিনি বিবাহ করিয়াছিলেন। বিবাহের পর, স্ত্রী ও শ্বশ্রূমাতাকে সঙ্গে লইয়া শ্রীশ্রী৺ বৃন্দাবনধামে গমন করেন। তথায় দিনাজপুরের রায় সাহেবদের সেবাকুঞ্জের কামদারীর (গোমস্তা) কার্য্যে নিযুক্ত হন। এই সময়ে, শ্রীধামের কোন পণ্ডিত বৈষ্ণবের নিকট কিছু হরিনামামৃত ব্যাকরণ শিক্ষা করেন। ইহাঁর শ্বশ্রূমাতা পৃথক স্থানে থাকিয়া, ভজনা করিতেন। ইহাঁর স্ত্রী প্রকৃত সহধর্ম্মিণীর ন্যায়, নিকটে থাকিয়া পরম সাধু পতিদেবের সেবা ও ধর্ম্মকার্য্যের সহায়তা করিতেন। বিশ্বাস মহাশয় স্বহস্তে ১২শ স্কন্ধ ভাগবত (স্বামীর টীকা সহিত) সম্পূর্ণ লিখিয়া ছিলেন। এই গ্রন্থ নিত্য নিত্য ভক্তিপূর্ব্বক ২।৩ তিন অধ্যায় করিয়া পাঠ করিতেন। ভাগবত ছাড়া তিনি সংস্কৃত ও বাঙ্গালা ভাষায় প্রচলিত অনেক বৈষ্ণব গ্রন্থ লিখিয়াছিলেন। তখনকার কালে সমস্ত বৈষ্ণব গ্রন্থ মুদ্রাযন্ত্রে প্রকাশিত হইয়া ছিল না। ইহাঁর হস্তাক্ষর প্রাচীন ব্রাহ্মণ পণ্ডিতদের ন্যায় ছিল; অক্ষরপংক্তি মুক্তামালার ন্যায় ঝক্ ঝক্ করিত। আমি স্বচক্ষে তাঁহার হস্তলিখিত গ্রন্থসকল দেখিয়াছি ও পাঠ করিয়াছি। শ্রীবৃন্দাবন ধামে ইহাঁর স্ত্রীবিয়োগ হয়। ইহাঁর সন্তান সন্ততি হইয়াছিল না। জয়দেব ও পদ্মাবতীর ন্যায় পবিত্র অন্তঃকরণে উভয়ে শ্রীশ্রীভগবদ্ভজনায় সংরত ছিলেন। স্ত্রীবিয়োগ হইলে, ইনি কিছুদিনের জন্য স্বদেশে আসিয়াছিলেন। এই সময় ইনি, থানা বড়াই গ্রামের নিকটবর্ত্তী তিরাইল গ্রামে স্বীয় ভাগিনেয়ের আলয়ে অবস্থান করেন। এই গ্রামেই ইহাঁর বিবাহ হইয়াছিল। এই সময়েই তিরাইল গ্রামে তাঁহার সহিত আমার সাক্ষাত হয়। তাঁহার পবিত্রমূর্ত্তি ও ভজন পরাকাষ্ঠা দর্শনে আমার চিত্তাকৃষ্ট হওয়ায় মধ্যে মধ্যে যাইয়া, ২।৪ দিন করিয়া তাঁহার নিকটে থাকিতাম। তিনি শ্রীভাগবত ও শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত গ্রন্থ উত্তমরূপে ব্যাখ্যা করিতে পারিতেন। তাঁহার নিকটে থাকিলে, প্রায় সততই শাস্ত্রকথা ও অনেক তত্ত্ব-কথার আলোচনা হইত। গোস্বামী প্রভুরা তাঁহাকে যেমন শ্রদ্ধাসম্মান করিতেন, অন্য সম্প্রদায়ের পণ্ডিত ব্রাহ্মণেরাও তাঁহাকে তেমনি শ্রদ্ধা করিতেন। জোয়ারি চতুষ্পাঠির অধ্যাপক শ্রীল মাণিকচন্দ্র চক্রবর্ত্তী বিদ্যারত্ন মহাশয়, ইহাঁকে এক জন পণ্ডিত ও সাধু পুরুষ বলিয়া অনেকের নিকটে প্রকাশ করিতেন। সর্ব্বসাধারণে ইহাঁকে কেহ 'প্রভু' কেহ 'গোসাঁই'

ইত্যাদি সম্বোধনে ডাকিত। ইনি গীতা ও চণ্ডী বেশ ব্যাখ্যা করিতে পারিতেন। ইনি নিষ্ঠাবান্ বৈষ্ণব ছিলেন বটে, কিন্তু চণ্ডীতেও ইঁহার গাঢ় ভক্তি দেখা গিয়াছে। ইনি অমায়িক চিত্তের লোক ছিলেন। অতদূর পণ্ডিত বা সাধক হইয়াও তেমন গাম্ভীর্য্য ছিল না। সময় সময় নিতান্ত বালকদের দলে মিশিয়া নৃত্য ও অঙ্গভঙ্গীর দ্বারা আমোদ করিতেন। বালক-বৃদ্ধ-যুবা সকলের সহিতই সমানভাব ছিল। অনেক সময় সকল শ্রেণীর লোকেদের সহিতই তাসখেলা করিতেন। প্রাতঃকালে উঠিয়া, মলমূত্র ত্যাগের পর, বাসিবাস ত্যাগ করিয়া, কপালে তিলক দিয়া মালা জপ করিতেন। পরে, কিছু ঔষধ লইয়া চিকিৎসার্থে গ্রামান্তরে বাহির হইতেন। স্নানের পূর্ব্বে আলয়ে উপস্থিত হইয়া স্নান করিতেন। পরে, ফুলতুলসী তুলিয়া পূজায় বসিতেন। একটি গোপাল মূর্ত্তি ছিল, তাহার পূজা সমাধা করিয়া, ২।১ অধ্যায় স্বহস্ত লিখিত শ্রীভাগবত গ্রন্থ পাঠ, পরে সংস্কৃত স্তোত্র, তাহার পরে জয়দেবের ২।১ টি গীত গাহিতে গাহিতে উঠিয়া নৃত্য করিতেন এবং তুলসীপরিক্রমা পূর্ব্বক রন্ধনে বসিতেন। রন্ধন এক পাকে সমাধা হইত। ডাইল, তরকারি, চাউল সবদ্রব্য একযোগে রন্ধন করিয়া, ভোগ লাগাইতেন ও সেই প্রসাদ ভোজন করিতেন।

এই প্রসাদ যে কি অমৃতময় আস্বাদের হইত তাহা আর বলিবার নহে। ইনি অভ্যাঙ্গে বা রন্ধনে তৈল ব্যবহার করিতেন না। রাত্রে ফল মূল দুধ খাইতেন। তিরাইলে এই অবস্থানকালে ইঁহার প্রথম বৃদ্ধবয়স। জ্ঞানপরাকাষ্ঠা দেহ বলিয়া তখনও উত্তম শক্তি বিদ্যমান ছিল। দেহের গঠন ঋষি তুল্য। চক্ষু দুটি যেন যোগী পুরুষের ন্যায় সতত ধ্যাননিমগ্ন হইয়া আছে। দাঁতগুলি অতি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ছিল। কবির ভাষায় বলিতে গেলে দাড়িম্ব-বীজের ন্যায়। অঙ্গে তৈল না মাখায় প্রকৃতই তাপসের ন্যায় দেখা যাইত। রাত্রিতে মশারি খাটাইয়া তক্তপোষের উপর শয়ন করিতেন। সকল ঋতুতেই মশারি খাটাইয়া শুইতেন। অনুসন্ধানে দেখা হইয়াছিল, ইনি রাত্রে নিদ্রা যাইতেন না, বসিয়া বসিয়া ভজনা করিতেন। ইহা অন্যকে জানিতে দিবেন না বলিয়াই, মশারি খাটাইতেন। শয়ন স্থান ইঁহার ভাগিনার বৈঠক ঘরে ছিল, আর আহ্নিক পূজা রন্ধনাদির জন্য পৃথক্ একখানি ক্ষুদ্র ঘর ছিল। পূর্ব্বে শক্তি মন্ত্র জপ বা শ্মশান সাধনা প্রভৃতি করিলেও শেষে ইনি গোঁড়া বৈষ্ণব হইয়া একমাত্র বৈষ্ণবাচারই পালন করিতেন। ইনি ইষ্টমন্ত্রের বিধিমত পুরশ্চরণ করাইয়া-

ছিলেন পুরশ্চরণে মন্ত্র জাগ্রত হইয়া, সত্বরেই সাধককে সিদ্ধি প্রদান করেন। দীর্ঘকাল শ্রীবৃন্দাবনধামে বাস করায়, ইঁহার আচার ব্যবহার অনেকাংশে ব্রজবাসীদের মত হইয়াছিল। ইনি চর্ম্মের চটিপাদুকা ব্যবহার করিতেন, স্বহস্তে প্রস্তুত পিরাণ গায়ে দিতেন, মস্তকে কেঠে কাপড়ের পাগ ও হাতে একখানি লাঠি লইয়া বাড়ীর বাহির হইতেন। চর্ম্মপাদুকা। ব্যবহারে গোঁড়া বৈরাগীরা মনে মনে কিছু ভাবিত; কেহ কেহ ইহার সমালোচনাও করিত। 'ইনি যদিও ভেখ (বেষ) গ্রহণ করেন নাই; তথাপি এমন পরম সাধক বৈষ্ণব হইয়া, কেন জুতা ব্যবহার করেন, এই বলিয়া কোন কোন স্থানে কথা উঠিত। আমরা কিন্তু শাস্ত্রে দেখিতে পাই যে, আশ্রমত্যাগী জনেরাও ছত্রপাদুকা (চর্ম্মের), যষ্টি, কান্থা, করঙ্গ ও কৌপিন দেহ, সংস্কার এই ছয়টি বস্তু ব্যতীত আর কোন সংসারের বস্তু গ্রহণ করিবে না। বিশ্বাস মহাশয় যেমন সুললিতভাবে ভাগবতের শ্লোক আবৃত্তি করিতেন, কোন বাঙ্গালী ব্রাহ্মণ পণ্ডিতদের মুখে শুনি নাই। ইঁহার শ্লোক আবৃত্তির সঙ্গে সঙ্গে যেন হৃদয়তন্ত্রী তালে তালে নৃত্য করিত। তিনি বলিতেন যে 'পশ্চিমে পণ্ডিত ভিন্ন বাঙ্গালীতে শ্লোক আবৃত্তি করিতে কে পারেন? বাঙ্গলা ১৩০৯ সালে রাজসাহি থানা বড়াই গ্রাম—কাচুটিয়া গ্রামের ধনকুবের সাহিত্য মহাজন পরম বৈষ্ণব বাবু প্যারীমোহন সরকারের বাড়ীতে একমাসের জন্য শ্রীশ্রীভাগবত পারায়ণ ও ব্যাখ্যা হয়। বৰ্দ্ধমান—কানাইডাঙ্গা নিবাসী দেবেন্দ্রমোহন গোস্বামী প্রভুপাদ এই ভাগবত ব্যাখ্যায় বৃত হন। তিনি প্যারী বাবুর নিকটে বিশ্বাস মহাশয়ের গুণগ্রাম অবগত হইয়া, এই একমাস তাঁহাকে নিকটে রাখিবার জন্য যত্নপূর্ব্বক আহ্বান করিয়া লইয়া যান। তিনি নির্জ্জনে নির্জ্জনে বিশ্বাস মহাশয়ের সহিত তত্ত্বালোচনায়, তাঁহার গুণে বিমুগ্ধ হইয়া পড়েন। প্রভুপাদ অতি আনন্দের সহিত প্রকাশ করিয়াছিলেন যে, এতদ্দেশের মধ্যে একটী মহারত্ন বিদ্যমান রহিয়াছে; কিন্তু হায়! ইহাকে চিনিবার লোক কেহ নাই। এই বিশ্বাস বুড়াকে দেখিলেও ইহার সহিত কৃষ্ণ কথার আলোচনা করিলে বোধ হয় যেন ইনি দ্বিতীয় রায় রামানন্দ। প্রভুপাদ বিশ্বাস মহাশয়কে সম্মুখে রাখিয়া, ভাগবত ব্যাখ্যা করিতেন। ব্যাখ্যাকালে তাঁহার সম্পূর্ণ লক্ষ্য থাকিত বিশ্বাস মহাশয়ের দিকে, তাহাতে বিশ্বাস মহাশয় একদিন বলেন যে প্রভুপাদ জানেন ত 'প্রতিষ্ঠার ভয়ে পুরী যান পলাইয়া।" আপনি আমাকে অতদূর মর্য্যাদা করিলে আমার পাতের ঝুঠা লইয়া, আর

প্রণাম করা লইয়া মগাভিড় বাধিবে।” বাস্তবিক, গৌরাঙ্গ সম্প্রদায়ে একটু ভক্ত নাম পড়িলেই তাহার পার ধুলা আর ঝুঠ (এটো) লইয়া কাড়াকাড়ি হইয়া থাকে। যাহা হউক, অতঃপর প্রভুপাদ যে কয়মাস যেখানে যেখানে ভাগবত করিয়াছিলেন, বিশ্বাস মহাশয়কে আর ছাড়েন নাই। বিশ্বাস মহাশয় অতি উদ্ভট রহস্য করিতেও অদ্বিতীয় ছিলেন। জালড়া গ্রামের ভক্তপ্রবর মাহিষ্য জমীদার শ্রীযুক্ত মহেশচন্দ্র সরকার মহাশয়ের বাড়ীতে মাসব্যাপী ভাগবত ব্যাখ্যার কালে একদিন অজামিল উপাখ্যান আরম্ভ হইয়াছে। অজামিলকে বক্রতুণ্ড প্রভৃতি নামক ৩ জন যমদূতে লইতে আসিয়াছে এই কথা উঠিয়াছে। বিশ্বাস মহাশয় কহিলেন প্রভো! বক্রতুণ্ড কি প্রকার, তাহা দেখাইয়া না দিলে সর্ব্ব সাধারণে বুঝিবে কেন?' প্রভু কহিলেন, 'আজ্ঞে সেটা আপনাকেই ভার দিলাম দেখাইয়া দিন।' তখন বিশ্বাস মহাশয় এমনি মুখের ভঙ্গী করিয়া বক্রতুণ্ড হইলেন যে, সভাস্থ লোকের সহিত প্রভুপাদ হাসিয়া অস্থির! ব্যাখ্যা অন্তে প্রভুপাদ ব্যাখ্যার দোষগুণ প্রশ্ন করিয়া, প্রত্যহ কৌশলে বিশ্বাসের নিকট অনেক তত্ত্ব কথা জানিয়া লইতেন। প্রায় ছয় মাস অতিবাহিত করিয়া, প্রভুপাদ স্বদেশ গমন কালে, জালড়াগ্রামের মহেশ বাবুকে বলেন যে তুমি এই বৃদ্ধ বৈষ্ণবকে আজীবন প্রতিপালন কর, তোমার বিগ্রহসেবার ফল হইবে।' বিশ্বাস মহাশয়ের প্রতি স্বতঃই ভক্তি শ্রদ্ধা ছিল, প্রভুর বাক্যে মহেশ বাবু আনন্দের সহিত সম্মত হইয়াছিলেন কিন্তু বিশ্বাস মহাশয় তথায় থাকেন নাই, কিছু দিন তিরাইল গ্রামে থাকিয়া, পুনঃ ৺ বৃন্দাবন ধামে চলিয়া যান। বৃন্দাবনেও মহেশ বাবু ও কাছুটীয়ার প্যারীমোহন বাবু মধ্যে মধ্যে ৫।৬৲ টাকা করিয়া পাঠাইয়া দিতেন। বিশ্বাস মহাশয়, কাহারও প্রতিগ্রহ করিতেন না, সুতরাং ঐ টাকা তথায় বৈষ্ণবসেবায় ব্যয় করিতেন। একবার (জালরার) মহেশ বাবুর অভিপ্রায় মত বিশ্বাস মহাশয়কে বৃন্দাবনে আমি এক পত্র লিখি, তদুত্তরে বিশ্বাস মহাশয় লিখেন যে “যশ্চবুদ্ধি পারংগতঃ যশ্চ বুদ্ধেস্তমোলোকে ; তাবুভৌসুখ নিষেবেক্লেশোহন্তরিতোজনে॥ শ্রীভাগবত॥' লিখনের তাৎপর্য্য এই যে 'হে দুর্গানাথ! তুমি আমাকে ধন্যবাদ দিয়া, স্বয়ং দৈন্যতা করিয়াছ ; কিন্তু জানিবা যে, যাঁর পরব্রহ্মগত বুদ্ধি, আর যার তমোময় বিষয় বুদ্ধি, তাঁরা উভয়েই সুখ সেবাকরে ইহার অন্তঃস্থ জনই পরম দুঃখী। আমিও অন্তঃস্থ জন ; যে হেতু বিষয় সুখও নাই, পরব্রহ্ম লাভ জনিত সুখও নাই, অতএব আমি পরম

দুঃখী। আমি আবার ধন্যবাদের পাত্র কিসে?" ইহা বিশ্বাস মহাশয়ের বৈষ্ণবোচিত দৈন্যতা। প্রকৃত পক্ষে, বিশ্বাস মহাশয় সাহিত্যকুলে ধন্যবাদের পাত্র তাহাতে সন্দেহ নাই। অনেক অনুরোধে, ইঁহার যোগাঙ্গের মধ্যে, বহুক্ষণ কুম্ভক করিয়া থাকা ও জিহ্বার অগ্রভাগ নাসিকার অগ্রভাগে স্পর্শ করান এই দুটি আমাকে এক সময় দেখাইয়াছিলেন। ইনি সাধনপূতচিত্তে আয়ুশেষ সময় বুঝিয়াই পুনঃ বৃন্দাবন ধামে গিয়াছিলেন। এই যাত্রায় এক বৎসর পরই তিনি চিন্ময় ব্রজধামে শ্রীশ্রীরাধাগোবিন্দের পাদপদ্ম প্রাপ্ত হন। এই বার তাঁহার পুরশ্চরণ কৃত কৃষ্ণমন্ত্রের পরমফল প্রাপ্তি ঘটিল। তাঁহার পবিত্র দেহ ব্রজধামের চিন্ময় মৃত্তিকায় সমাহিত হইল। ধন্য মহাপুরুষ! ধন্য তোমার সাধন ভজন! আজ তোমার সংক্ষিপ্ত জীবনী বর্ণনা করিয়া, আমিও ধন্য হইলাম। আর চর্ম্মচক্ষে তোমার ঋষিকল্প পবিত্রমূর্ত্তি দর্শন পাইব না, কিন্তু মনোমধ্যে তোমার সেই বৃদ্ধ তাপস মূর্ত্তিটি ধ্যান করিয়া, পরম আনন্দ অনুভব করিব।

শ্রীদুর্গনাথ দেওরায়-তত্ত্ববিনোদ।

সন্ধ্যাকর নন্দী কোন্ জাতির অন্তর্ভুক্ত ছিলেন?

মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত হরপ্রসাদ শাস্ত্রী মহাশয় রামচরিতের ভূমিকায় লিখিয়াছেন,—সন্ধ্যাকর নন্দী বারেন্দ্র শ্রেণীর ব্রাহ্মণ ছিলেন। ১৯১৩ সনের জানুয়ারী সংখ্যা 'ঢাকা-রিভিউ ও সম্মিলন' মাসিক পত্রে মৎপুত্র বিজয়কুমার রায় বি, এ 'রামপাল চরিত ও পাল রাজবংশ' সম্বন্ধে যে প্রবন্ধ লিখেন, (এই প্রবন্ধই তাঁহার জীবনের শেষ প্রবন্ধ) তাহাতে সন্ধ্যাকর নন্দী বৌদ্ধ ব্রাহ্মণ ছিলেন—বারেন্দ্র নহেন—বলিয়া মন্তব্য করিয়াছেন। খাঁটী হিন্দু ব্রাহ্মণ কবিগণ যে ভাবে বন্দনা করিয়া কাব্য সূচনা করেন, রামচরিত কাব্যে-সে ভাবে করা হয় নাই, 'শ্রীঘনায় নমঃ সদা,' বলিয়া সন্ধ্যাকর নন্দী কাব্য আরম্ভ করিয়াছিলেন; তিনি ব্রাহ্মণোচিত গোত্র বেদশাখাদির পরিচয় উপেক্ষা করিয়া প্রকৃতি দ্বারাই ব্রাহ্মণত্বের পরিচয় দিয়া গিয়াছেন।

১৯১৩ সনের জানুয়ারী সংখ্যা ঢাকারিভিউ ১৩১৯ বঙ্গাব্দের ফাল্গুন মাসে প্রকাশিত হইয়াছিল; ঐ সনের চৈত্র সংখ্যার সাহিত্যে শ্রীযুক্ত অক্ষয়কুমার মৈত্রেয় মহাশয় শাস্ত্রী মহাশয়ের উক্তির সমালোচনা করিয়া অন্য একটী প্রবন্ধ লিখিয়া-

ছেন। তাহাতে তিনি নির্দ্দেশ করিয়াছেন—সন্ধ্যাকর নন্দী করণ ছিলেন, ব্রাহ্মণ ছিলেন না। শ্রীযুক্ত রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় আবার তাহার প্রতিবাদ করিয়া বলিয়াছেন যে, সন্ধ্যাকর নন্দী করণ বা কায়স্থ হইতে পারেন না—তিনি বারেন্দ্র ব্রাহ্মণ ছিলেন। মৈত্রেয় মহাশয় তাঁহার সিদ্ধান্তের অনুকূলে রামচরিতোক্ত কবি-প্রশস্তির 'করণ্য' শব্দে এবং 'নন্দী' উপাধি এই দুইটার উপর ষোল আনা নির্ভর করিয়াছেন। তিনি লিখিয়াছেন—'করণ্য' শব্দের প্রতি শাস্ত্রী মহাশয় সমুচিত প্রণিধান করেন নাই। কিন্তু সুবিজ্ঞ শাস্ত্রী মহাশয়কে এরূপ দোষ দেওয়া সুকঠিন। রামচরিতের ভূমিকায় শাস্ত্রী মহাশয় বিশেষ পাণ্ডিত্য ও সাবধানতা দেখাইয়াছেন ; তিনি ঐ ভূমিকায় রামচরিতোক্ত অনেক অত্যাবশ্যক কথা উদ্ধৃত না করিয়াও সিদ্ধান্ত দ্বারা দেখাইয়াছেন, তিনি ঐ সকল কথা ভালরূপে বুঝিয়া ও চিন্তা করিয়াই কথা বলিয়াছেন। দৃষ্টান্ত স্বরূপ বলা যায়, শাস্ত্রী মহাশয় রামচরিতের ভূমিকায় "নাভি সম্ভূত (ক্ষত্রিয় বীর্য্যে উৎপন্ন) কথাটী উদ্ধৃত করেন নাই বটে, কিন্তু পালগণ যে "Plebian" সাধারণ জাতীয় লোক ছিলেন এবং ক্ষত্রিয় ছিলেন না, বৈদ্যদেবের প্রশস্তিতে উল্লিখিত পালগণের ক্ষত্রত্বের দাবী যে কিছুই নহে, তাহা নির্দ্দেশ করিয়া এবং ভীমপাল ও রাজা ভীম একই ব্যক্তি ছিলেন ইহা নির্দ্দেশ করিয়া তিনি দেখাইয়াছেন যে, তিনি রামচরিত কাব্য পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে পাঠ করিয়াছেন। বিজয়কুমার যখন ঢাকা রিভিউতে নাভি-সম্ভূত বচন উঠাইয়া উক্ত বচনের সঙ্গে ব্রহ্মবৈবর্ত্ত পুরাণের ক্ষত্রবীর্য্যেণ বৈশ্যায়াং বচনের সমন্বয় করেন, তখন কেহ কেহ বিস্মিত হইয়া বলিয়াছিলেন, প্রবন্ধে নির্দ্দেশ করা উচিত যে, শাস্ত্রী মহাশয় উক্ত শ্লোক প্রণিধান করেন নাই। কিন্তু বিজয়কুমার ঐরূপ লিখা সঙ্গত মনে করেন নাই এবং আমরাও ঐরূপ লিখা অনুমোদন করি না। রামচরিতের ভূমিকায় স্পষ্ট বুঝা যায় যে, শাস্ত্রী মহাশয় এই গ্রন্থের সমস্ত কথাই চিন্তা করিয়াছিলেন। কবি প্রশস্তির কথা যে তিনি প্রণিধান করেন নাই ইহা বলা আমরা সঙ্গত মনে করি না। যাহা হউক, মৈত্রেয় মহাশয় কবিপ্রশস্তির "করণ্যানাং অগ্রণীঃ" এবং 'নন্দিকুল' শব্দের উপর নির্ভর করিয়াই সন্ধ্যাকর নন্দীর জাতি ঠিক করিয়াছেন। যতদূর বুঝা যায়, শাস্ত্রী মহাশয় 'করণ্যানাং অগ্রণী' এবং 'নন্দিকুল' শব্দ দেখিয়াছিলেন, কিন্তু ঐ দুই শব্দের বলে সন্ধ্যাকরকে করণ জাতির অন্তর্ভুক্ত করা সম্ভবপর মনে করেন নাই। কথাটি একটু ভাঙ্গিয়া বুঝাইতে হয়।

করণ শব্দে করণ জাতি ও করণ কর্ম্ম (অর্থাৎ লিপিকর্ম্ম) এই দুইটাই

বুঝায়। মৈত্রেয় মহাশয় কর্ত্তৃক উদ্ধৃত মহেন্দ্রকৃত টীকা তাহাই বলিতেছে। করণ শব্দের উত্তর 'তত্র সাধুঃ' সূত্রানুসারে 'যৎ' প্রত্যয় করিতে হইলে করণ কর্ম্মার্থক করণ শব্দের উত্তরই যৎ প্রত্যয় করিতে হয়। 'তত্র সাধুঃ' সূত্রের অর্থ এই—সেই সেই ব্যাপারে নিপুণ' এই অর্থে (১) যৎ প্রত্যয় হয়। কর্ম্মণি সাধুঃ (নিপুণঃ) কর্ম্মণ্য. সামসু সাধুঃ সামন্যঃ, শরণে সাধু শরণ্য অগ্রে অগ্রবর্ত্তি-তায়াং সাধুঃ অগ্র্যঃ। উক্ত সূত্রোক্ত সাধু শব্দে শ্রেষ্ঠ বুঝায় না। মানবেষু শ্রেষ্ঠঃ মানব্যঃ, কায়স্থেষু শ্রেষ্ঠঃ কায়স্থ্যঃ, বালেষু শ্রেষ্ঠঃ বাল্যঃ, কবিষু কালিদাসঃ শ্রেষ্ঠঃ কব্যঃ কালিদাসঃ এরূপ অর্থে উক্ত সূত্রের প্রয়োগ হইতে পারে না। কাজেই করণেষু শ্রেষ্ঠ করণ্যঃ এরূপ হওয়াও সম্ভবপর নহে। যেমন কর্ম্মণি সাধুঃ তেমনই কর্ম্মণ্যঃ করণ কর্ম্মণি সাধুঃ করণ্যঃ এই ভাবে 'তত্র সাধুঃ' সূত্র দ্বারা কোন মতে যৎ হইতে পারে তদবস্থায় করণ্য শব্দে বুঝায় -এই লোকটী করণদিগের জাতীয় কর্ম্ম লেখা করণে নিপুণ। ইহাতে করণ্য ব্যক্তি যে করণ জাতির বহির্ভূত তাহাও বেশ বুঝা যায়। অর্থাৎ করণ্য শব্দে করণ কর্ম্মে কুশল অথচ করণেতর জাতীয় লোক বুঝায়। কাজেই 'করণ্যানামগ্রণীঃ' শব্দে বুঝায় যে সকল লোক করণোচিত লিপি কর্ম্মে দক্ষ তাহাদের মধ্যে ইনি অগ্রবর্ত্তী। তিনি জাতিতেও করণ এরূপ বুঝায় কি? বোধ হয়, শাস্ত্রী মহাশয় এই অর্থই গ্রহণ করিয়াছেন। তাহাতে সন্ধ্যাকর নন্দীর পূর্ব্বপুরুষ ব্রাহ্মণ হইয়াও করণ্য অর্থাৎ করণ জাতির কর্ম্মে দক্ষ এইরূপ অর্থ হওয়াই খুব যুক্তিযুক্ত।

তত্র সাধুঃ সূত্রানুসারে যেমন শরণে সাধুঃ শরণ্যঃ হয়, তেমনই স্বার্থিক যৎ প্রত্যয় যোগেও শরণং এব শরণ্যঃ শব্দ সিদ্ধ হয়। কেন না শাখাদিগণের উত্তর স্বার্থে যৎ প্রত্যয় হয় এবং করণ শব্দ শাখাদিগণের অন্তর্ভুক্ত; শাখাদিগণ আকৃতিগণ নহে; কাজেই শরণমেব শরণ্যঃ হইতে পারে বলিয়াই যে করণ এব করণ্যঃ হইবে এরূপ নহে; করণ শব্দ শাখাদিগণের অন্তর্ভুক্ত নহে। কাজেই স্বার্থিক যৎ প্রত্যয় দ্বারাও নন্দিবংশকে করণ জাতিভুক্ত করা যায় না।

মৈত্রেয় মহাশয় নানাজাতীয় করণ কল্পনা করিয়া করণবিশেষ নির্দ্ধারণ জন্য যৎ প্রত্যয় কল্পনা করিয়াছেন। কিন্তু একটু প্রণিধান করিলেই দেখা যায়, জাতিবোধক হিন্দু করণ একপ্রকার ভিন্ন দুই প্রকার নহে। মনুতে ব্রাত্য ক্ষত্রিয়ের সবর্ণাজাত ঝল্লমল্লাপরনামা করণ চতুর্ব্বর্ণের বহির্ভূত জাতি বিশেষ।

(১) সেই সেই শ্রেণীর মধ্যে ভদ্র বা সচ্চরিত্র এরূপ অর্থ নহে।

চতুর্ব্বর্ণান্তর্গত হিন্দু সমূহ মধ্যে তাহার কোন স্থান নাই। উহা মৈত্রেয় মহাশয় স্বীকার করিয়াছেন। মনু লিখিয়াছেন, আপস্তম্বাদি সূত্র অনুসারে যাহারা পুনঃ সংস্কার করিবে না সেই ব্রাত্যগণ 'অপূত' 'পাপাত্মা'। তাঁহাদের সঙ্গে আর্য্যগণ যৌনি সম্বন্ধ বা বিদ্যা সম্বন্ধ করিবেন না। ঐ সকল ব্রাত্য 'আর্য্যবিগর্হিতাঃ'। ব্রাত্যগণ আপস্তম্বাদি বিধানের বাহিরে যাইয়া যখন করণ অথবা মল্ল নামে একবার চিহ্নিত হয়, তখন তাহারা তুরস্কাদি দেশীয় ম্লেচ্ছের ন্যায় মহাব্রাত্য হয়। তাঁহারা চতুর্ব্বর্ণ্যের বহির্ভূত দ্রবিড়, কাম্বোজাদিবৎ বহিষ্কৃত জাতি মাত্র। এই জাতির বোধক শব্দ হিন্দু সাহিত্যে ব্যবহৃত দেখা যায় না। এই জন্যই কোষকার-শ্রেষ্ঠ অমরসিংহ "আচাণ্ডালাৎ তু সঙ্কীর্ণাঃ অম্বষ্ঠ করণাদয়ঃ" লিখিয়া হিন্দু জাতি বাচক করণ শব্দে শূদ্রা ও বৈশ্যের পুত্র বুঝায় ইহাই দেখাইয়া দিয়াছেন। মনু ঝল্ল মল্লকরণের নামকরণ করিয়া চিহ্ন দিয়া ছাড়িয়া দিয়াছেন, বৃষল ম্লেচ্ছ ইত্যাকার সাধারণ শব্দে উহাদের নির্দ্দেশ হইবে। পুরাণাদি শাস্ত্রে ও সংস্কৃত সাহিত্যে উক্ত করণের আর উল্লেখ দেখা যায় না। এই ম্লেচ্ছ করণ লইয়া মৈত্রেয় মহাশয় কেন এত নাড়া চাড়া করেন বুঝি না। হিন্দু সমাজে যে করণ আছে, সে বৈশ্য হইতে শূদ্রাতে জাত করণ।

শূদ্র নামক রাজার পুত্র 'কায়স্থ' রাজা। তাহার বংশে 'করণ' নামক রাজার উৎপত্তি এবং তাহা হইতে নূতন করণ জাতির উৎপত্তির আখ্যান মন্বাদি স্মৃতি এবং বিষ্ণুভাগবতাদি প্রামাণিক পুরাণের কথা নহে। সে কাহিনী গলাধঃকরণ কর্ত্তব্য নহে। কতকগুলি লোক প্রথমতঃ কায়স্থ জাতিকে কোলাঞ্চ দেশীয় শূদ্ররূপে গালাগালি দিয়া অনুতপ্ত হইয়াছিলেন; তাঁহারাই শেষে তাঁহাদিগকে শূদ্রস্তরে রাখিয়াই শূদ্র নৃপতিরূপে খাড়া করিয়া একটু যেন মান দেওয়ার চেষ্টা করিয়াছিলেন; উক্ত আখ্যানে তাহাই বুঝা যায়। এই আখ্যান স্মৃতি পুরাণোক্ত ইতিহাসসম্মত নহে।

করণজাতি একাধিক নহে; যখন একাধিক নহে, তখন বহুজাতির মধ্যে একতর করণ বিষয়ক একটা জাতি পরিপ্রশ্ন হয় কিরূপে? মনূক্ত এবং প্রয়োগ সিদ্ধ জাতির সঙ্গে ঘটকোক্ত কল্পিত করণ জাতি মিলাইয়া তাহাদের একতর জাতি নির্দ্ধারণার্থে পাণিনি সূত্র প্রয়োগে করণ্য শব্দ সাধিবেন—এরূপ কাঁচা লোক সন্ধ্যাকর নন্দী ছিলেন না। তিনি সংস্কৃতকাব্য ও টীকায় তাহা তিনি স্বঃ স্থঃ শব্দ হইতে স্বাস্থ্য শব্দ সাধিবার জন্য 'শরি পরে খরি লোপঃ' এই বুঝাইয়াছেন। ভাষান্তরিত বার্ত্তিকের বিচারে পাণিনিরিক্তা ...

দেখাইয়াছেন। কাজেই সন্ধ্যাকরকে পাণিনিসূত্র বোধে অসমর্থ বলিয়া নির্দ্দেশ করা যায় না।

মনুতে অনুলোম বিবাহ সিদ্ধ আছে। পাণিগ্রহণ সংস্কারঃ সবর্ণাসূপদিশ্যতে। অসবর্ণা স্বয়ং জ্ঞেয়ো বিধিরুদ্‌বাহ কর্ম্মণি। শরঃ ক্ষত্রিয়য়া গ্রাহ্যঃ ইত্যাদি বচনে এই সকল বিধি প্রদত্ত আছে। তদনুসারে মূর্দ্ধাভিষিক্ত করণ অম্বষ্ঠাদি অনুলোম মিশ্রিত জাতি শ্রেষ্ঠ জাতি। তন্মধ্যে মনুতিনটী অনুলোম মিশ্রিত জাতিকে দ্বিজধর্ম্মী পর্য্যন্ত নির্দ্দেশ করিয়াছেন। করণের মাতা শূদ্রা না হইলে তাহার দ্বিজধর্ম্মাতি দেশ হইত। ইহারা পারিভাষিক 'সঙ্কর' জাতি নহে। ব্যভিচার, অবেদ্যা বেদন ও স্বকর্ম্মত্যাগ দ্বারা "বর্ণসঙ্কর" হয়, স্বকর্ম্মত্যাগ বশতঃ ম্লেচ্ছ 'করণ' বর্ণসঙ্কর। কিন্তু চাতুর্ব্বণ্য বহির্ভূত হওয়ায় বর্ণসঙ্কর বলাও যায় না। বৈশ্য হইতে শূদ্রাতে জাত করণ বৈধ ও শ্রেষ্ঠ হিন্দুজাতি। এই করণ উড়াইয়া দিলে হিন্দু-সমাজে আর কোন 'করণ' থাকে না।

নানার্থকোষ ও মেদিনীকোষে এই করণ জাতিই উল্লিখিত। উভয় কোষেই একই করণ জাতি বর্ণিত হইয়াছে। উহার অন্বয় হইবে—বৈশ্যা-শূদ্রয়োঃ সুতে কায়স্থে করণঃ। কায়স্থ শব্দের ব্যুৎপত্তি 'সুপিস্থঃ" এই পাণিনি সূত্র অনুসারে কায়—স্থা+কঃ অর্থাৎ কায়ে বিপ্রক্ষত্রিয়াদেঃ কায়-সমীপে সেবার্থং তিষ্ঠতীতি কায়স্থঃ—এই অর্থই সঙ্গত হয়। এই সেবা লেখ্য করণাদি। এই লেখ্য করণ শব্দ হইতেই করণ শব্দ বৃত্তিবাচক হইয়াছে। তাহা হইতেই বৃত্তিবাচক কায়স্থ শব্দ সৃষ্ট হইয়াছে। "রাজনিযুক্ত কায়স্থ-কর চিহ্নিত" (বিষ্ণু) এবং "কায়স্থৈশ্চ বিশেষতঃ" (যাজ্ঞবল্ক্য) স্থলে লেখক ও গণকাদি অর্থে কায়স্থ শব্দ প্রযুক্ত হইয়াছে এই শব্দ আধুনিক যুগে জাতি বাচক হইয়াছে।

অমরসিংহ স্বকীয় কোষে স্মৃতির বিচার বা সমন্বয় করিতে বসেন নাই। সেই কর্ম্মে কুল্লূক মেধাতিথি প্রমুখ শাস্ত্রব্যাখ্যাতৃগণই আমাদের অবলম্বন। কুল্লূকাদি ব্যাখ্যাতৃগণ অবশ্য অমরকোষ জানিতেন। অমরকোষে মাহিষ্য, অম্বষ্ঠ, করণ শূদ্রবর্গে অবস্থিত। ইহা তদানীন্তন ব্যবহারেরই ইতিহাস মাত্র—মন্বাদি স্মৃতির ব্যাখ্যা নহে। অমরসিংহের শূদ্রবর্গ রূপ পরিভাষা দ্বারা মনুর "সজাতিজানন্তরজাঃ" বচনের ভুল ধরা যায় না।

লেখক অভিজাত শব্দে কি অর্থ গ্রহণ করেন, তাহাও বুঝা যায় না। অভিজাত শব্দে কুলীন পণ্ডিত ও মান্য বুঝায়। বৈশ্যাশূদ্রজ করণ মধ্যে কুলীন

না থাকিবার কথা কি ? অবশ্য ব্রাত্য ঝল্লমল্ল করণ চাতুর্ব্বর্ণের বহির্ভূত বিধায় হিন্দু মতে কুলীন না হইতে পারে—কিন্তু শূদ্রের উর্দ্ধবর্ত্তী করণ এমন কি শূদ্র পর্য্যন্ত "কুলীন" হইতে বাধা নাই। কার্য্যতঃ আচাণ্ডাল জাতি মাত্রেই কুলীন আছেন। এই জন্যই প্রাচীন কথা "ধনেন কুলম্"।

ইহার পর নন্দী শব্দ। নন্দনাবাসী হইতে নন্দী হইয়াছে এই কথা অবশ্য দৃঢ় ভাবে বলা যায় না। নন্দনাবাসী শব্দকে নন্দী (নন্দ-ঈ) করা সংস্কৃত রীতির কিছুমাত্র বহির্ভূত নহে। সংস্কৃত যুগে এইরূপ কাণ্ড হওয়ার অনুকূলে অনেক কথা পাণিনি সূত্রের বিচারে প্রাপ্ত হওয়া যায়। পাণিনির ৫।৩।৮৩ সূত্র-বার্ত্তিক দ্বারা এইরূপ নামবিবৃতির ইতিহাস পাওয়া যায়। উক্ত বিধান অনুসারে দেবদত্তকে দেব, দত্ত, দেবিক, দেবিয়, দেবিল, দত্তিয়, দত্তিক, দত্তিল, দত্তক লিখা যায়!! এবং তাহা সিদ্ধ শব্দরূপে গণ্য হয়। সত্যভামাকে সত্যা, ভামা ও সত্যভামা লিখা যায়। উপেন্দ্র দত্তকে উপেন্দ্র দত্ত উপড়, উপক, উপিক, উপিয়, উপিল লিখা যায়। সুতরাং অর্দ্ধ সংস্কৃত যুগে নন্দনাবাসী শব্দ একদম নন্দ—ঈ হইয়া যাওয়াও বিচিত্র নহে। তবে নন্দী শব্দ নন্দনাবাসী হইয়াছে, অথবা নন্দনাবাসীই নন্দী হইয়াছে, কি তৃতীয় কোন মূল শব্দ হইতে উভয় শব্দ হইয়াছে তাহা বলিবার উপায় নাই। বৃহদ্বটু সহ নন্দনাবাসীর কোন সম্বন্ধ ছিল কি না তাহাও জানিবার উপায় নাই। বস্তুতঃ নন্দী শব্দ দ্বারা সন্ধ্যাকর বংশকে কোন জাতিভুক্ত করা যায় না। যদি নন্দী উপাধি দ্বারা সন্ধ্যাকরকে কোন জাতিভুক্ত করা সম্ভবপর হয়—তবে সন্ধ্যাকর নন্দী করণ না হইয়া বৈদ্য জাতীয় হওয়াই অধিকতর সম্ভবপর ; পূর্ব্ববৃত্তি ও ইতিহাস দ্বারা শাস্ত্রজ্ঞ হওয়া বৈদ্যের পক্ষেই অধিকতর সম্ভবপর। ৺ সোমনাথ মুখোপাধ্যায় এই যুক্তিতেই কর উপাধিযুক্ত মেদিনীকরকে বৈদ্যজাতি বলিয়া নির্দ্ধারণ করিয়া গিয়াছেন। নন্দী উপাধি নবশাখ, কায়স্থ ও বৈদ্য মধ্যে বিশেষ ভাবে প্রচলিত। নন্দী, দত্ত, কর উপাধি পূর্ব্বে ব্রাহ্মণ মধ্যে ছিল বলিয়া জানা যায়। বর্ত্তমানে এই সকল উপাধি বিস্তৃত ভাবে ২০।২২ টী বাঙ্গালী হিন্দুজাতিতে প্রচলিত আছে। তথাপি পূর্ব্বাপর চিন্তা করিলে সন্ধ্যাকরের ন্যায় পণ্ডিত বৈদ্যজাতিতে উৎপন্ন হওয়াই স্বাভাবিক বলিয়া বোধ হয়।

বৌদ্ধযুগের বহুতর বৌদ্ধ ব্রাহ্মণ হিন্দু হইয়াছিলেন। বৈদ্যজাতি এই হিন্দুভূত বৌদ্ধ ব্রাহ্মণদিগের একটী স্তর বলিয়া বোধ হয়। যাহা হউক বৈদ্য-

ব্রাহ্মণ প্রথমেই হিন্দু হইয়াছিলেন, তাঁহারাই বৈদ্য নামে একটী জাতি খাড়া হইয়াছিলেন। শেষে যাঁহারা হিন্দু হইয়াছিলেন সেই সকল বৌদ্ধ ব্রাহ্মণ সোজাসুজি ব্রাহ্মণ হইয়াছিলেন। রামচরিতে "অমুচান" ব্রাহ্মণের অস্তিত্বের সংবাদ পাই। তাঁহাদের অবলম্বনেই বৌদ্ধ ব্রাহ্মণগণ পরে বিবিধ শ্রেণীর ব্রাহ্মণ এবং বৈদ্য হইয়াছিলেন বলিয়া মনে হয়। বরেন্দ্র দেশে এই কাণ্ড প্রবলভাবে ঘটিয়াছিল। ব্রাহ্মণ জাতি মধ্যে এক শ্রেণী অন্য শ্রেণীকে 'শূদ্রবৎ' হড্ডিক প্রভৃতি মধুর শব্দে গালি দেওয়ার ইতিহাস আছে। এই গালির মধ্যে বৌদ্ধ যুগের ইতিহাস লুক্কায়িত বলিয়া মনে হয়। মৈত্রেয় মহাশয় পূর্ব্বসংস্কার বিশেষের পক্ষপাতী না হইয়া চেষ্টা করিলেই এই সকল প্রশ্নের মীমাংসা সহজে করিতে পারিবেন। বৌদ্ধযুগ ভাঙ্গিয়া একদিনে খাঁটী হিন্দু সমাজ গঠিত হয় নাই। ইহার মধ্যে অনেক কাণ্ড ঘটিয়াছে বলিয়া টের পাওয়া যায়। লেখকের মুখে আমরা এই সকল তত্ত্ব জানিতে চাই। পূর্ব্ব সংস্কার বজায় রাখিয়া কাজ করিলে গবেষণা করা চলিবে না। মূল উৎপাটন করিয়া ইতিহাস বাহির করিয়া গবেষণা করিতে হইবে। ইহা ছোট খাট হৃদয়ের কাজ নহে। যে ব্যাস মুনি লিখিয়াছেন তিনি কৈবর্ত্তের দৌহিত্র ছিলেন, এবং যে শ্রীধর স্বামী লিখিয়াছেন, বর্ত্তমান কালের ব্রাহ্মণ দ্বারা আগামী সত্যে ব্রাহ্মণের কাজ চলিবে না, এবং যে সকল পুরাণকার মগধ-সাম্রাজ্যের ইতিহাসে বর্ত্তমান ব্রাহ্মণের অকথ্য ও অশ্রাব্য বহু কথা লিখিয়া গিয়াছেন—সেইরূপ হিমাচলের ন্যায় সমুন্নত চরিত্রের ব্রাহ্মণ না জন্মিলে দেশীয় লোক দ্বারা এই ইতিহাস উদ্ধার হইবে না (১)।

রামচরিতের 'সীমাসাহিত্যবিদাম্, নন্দিকুল-কুমুদ-কানন-পূর্ণেন্দু আবদ্য শব্দ-বিদ্যা-কোবিদ প্রভৃতি বিশেষ মৈত্রেয় মহাশয়ের সিদ্ধান্তের ঠিক বিপরীত দিকে আকর্ষণ করিতেছে। শূদ্রসদৃশ করণ জাতি মধ্যে এইরূপ অভিমানের অধিকার থাকিবার প্রমাণিক কোন দৃষ্টান্ত নাই। সন্ধ্যাকর "খরি পরে শরি লোপঃ" এই ভাবে বার্ত্তিকের মর্ম্ম উদ্ধৃত করিয়াছেন। পাণিনি সূত্রকে পাণিনি স্মৃতি বলে (শাঙ্কর ভাষ্য)। এই সকল শ্রুতি স্মৃতিতে কোন কালেই করণ জাতির অধিকার ছিল না। করণের অধিকার

(১) ইউরোপীয় জাতিদের মধ্যে এই সম্বন্ধে কোন জাতিগত আকর্ষণ বিকর্ষণ নাই। তাঁহারাই এই কার্য্যে বোল আনা যোগ্য। বাবু নগেন্দ্রনাথ বসু প্রভৃতি লোক ইতিহাসে যে কুয়াসা সৃষ্টি করিয়াছেন, ইউরোপীয় গবেষণা কারীগণ দ্বারাই তাহার দূরীকৃত হইবে।

লিপিকর্ম্মে। মৈত্রেয় মহাশয় সন্ধ্যাকরকে মুখে বলেন করণ, কিন্তু ভাবেন ব্রাহ্মণ। বৌদ্ধ ব্রাহ্মণগণ গোত্র প্রবর শাখা ও বেদ বিদ্যাজনিত উপাধি গ্রাহ্য করিতেন না। এই জন্য বৌদ্ধ ব্রাহ্মণগণ পতিত হইয়াও ব্রাহ্মণত্বের দাবী করিতেন না। যে সকল বৌদ্ধ ব্রাহ্মণ ব্রাহ্মণ বলিয়া পরিচয় দিতেন, তাঁহারা উপহাসাস্পদ হইতেন। বাক্য প্রকাশের গুণীভূত ব্যঙ্গের বিচারে "ব্রাহ্মণ শ্রমণ" ন্যায় ধরিয়া ঠাট্টা করা হইয়াছে। বৌদ্ধদিগের মধ্যেও কতকগুলি লোক ভূতপূর্ব্ব ব্রাহ্মণ বলিয়া পরিচয় দিতেন। ইহাঁদিগকে "কাঁঠালের আমস্বত্ব' ব্রাহ্মণ মনে করা হইত। বস্তুতঃ ব্রাহ্মণ মুসলমান, ব্রাহ্মণ খৃষ্টান, ব্রাহ্মণ ব্রাহ্ম, ব্রাহ্মণ-যবন যাহা, ব্রাহ্মণ-বৌদ্ধ তাহাই বটে। হিন্দুর চক্ষে ও গোড়া বৌদ্ধদিগের চক্ষে বৌদ্ধ ব্রাহ্মণ ব্রাহ্মণ নহেন ইহা ঠিক। কিন্তু মনে হয়, এই শ্রেণীর ব্রাহ্মণ তদানীন্তন বৌদ্ধ পালরাজাদের সভায় ব্রাহ্মণোচিত সম্মান পাইতেন, তাঁহাদের জাতি না থাকিলেও কুল ছিল; তাঁহাদের চরিত্র উৎকৃষ্ট ছিল, তাঁহারা পাটোয়ারী প্রকৃতি লাভ করেন নাই, অব্রাহ্মণ হইলেও শাস্ত্রোক্ত ব্রাহ্মণ চরিত্রে তাঁহারা উৎকর্ষ লাভ করিয়াছিলেন। ব্রাহ্মণ বৌদ্ধ না হইলে সন্ধ্যাকর নন্দী রামচরিত কাব্যের সকল অংশ লিখিতেই সমর্থ হইতেন না। ব্রাহ্মণেতর জাতিসমূহ মধ্যে আজও এমন অল্প লোকই জন্মিয়াছেন, যাঁহারা সন্ধ্যাকর নন্দীর ন্যায় উচ্চ ভূমিকায় দাঁড়াইয়া রামচরিতের অনুকরণে ঐতিহাসিক কথা বলিতে সমর্থ। প্রচলিত ঐতিহাসিক পুস্তকগুলি পড়িলেই এই কথাটা হৃদয়ে লাগিবে। এই সকল বিবেচনায় সন্ধ্যাকর নন্দী আমাদের মতে ব্রাহ্মণ ছিলেন। কাজেই আমরা শাস্ত্রী মহাশয়ের সিদ্ধান্ত সমর্থন না করিয়া পারি না।

শ্রীবসন্তকুমার রায়, এম-এ, বি-এল।

মাহিষ্য ছাত্রের কর্ত্তব্য। *

বিশ্বনিয়ন্তার অপূর্ব্ব সৃষ্টিকৌশলে বৈচিত্রময় জগতে, বিরামদায়িনী নিশার অবসানে, নবালোক সম্ভূতা রক্তরাগরঞ্জিতা উষার আবির্ভাব অতি মনোরম ও হৃদয়স্পর্শী। দূরগন্ধবাহী মৃদুমন্দ মলয় সমীরণ যখন সুপ্তোত্থিত মানবমণ্ডলীকে নবসঞ্জীবিত করে, নিস্তব্ধদিগ্মণ্ডলী যখন সহসা সহস্র পক্ষিকূজনে

* ২২শে ভাদ্র কলিকাতা রিপন কলেজে মাহিষ্য ছাত্র সম্মিলনীতে পঠিত।

মুখরিত হইয়া উঠে তখন ধরিত্রীবক্ষে মৃত্যুসুপ্তির অভ্যন্তরে যেন প্রাণ স্পন্দনা-মুভূতি পরিলক্ষিত হয়। ভগবান ময়ূখমালী সহস্রাংশু বিকীরণ পূর্ব্বক অন্ধকার নিমজ্জিতা পৃথিবীকে লোকলোচন সমীপে উদ্ভাসিত করিয়া তোলে তখন প্রাণমন এক অনির্ব্বচনীয় আনন্দে পরিপ্লুত হইয়া যায়।

নিদ্রা হইতে এই জাগরণ, শান্ত নীরবতার মধ্য হইতে এই চঞ্চলতার প্রথম উন্মেষ সর্ব্বোপরি, প্রাচীললাটে—এই নবোদিত বালার্ককরবন্ধন,—অনন্তসৌন্দর্য্যময়ী প্রকৃতি সুন্দরীর সর্ব্বশ্রেষ্ঠ অতুলনীয় সম্পদ।

অনন্তকাল সমুদ্রের পরিবর্ত্তনময় বক্ষে প্রভাতের এই পরিবর্ত্তনই সর্ব্বা-পেক্ষা মনোহর।

যে নিয়মে এই প্রাকৃতিক বৈচিত্রতার পুনরাবৃত্তি সম্পাদিত হইতেছে, প্রত্যেক মানববিশেষের ও প্রত্যেক সমাজ বিশেষের পরিবর্ত্তনেও সেই নিয়মের প্রবর্ত্তনা দৃষ্ট হয়। তাই বুঝি মানবের বাল্যাবস্থা তাহার জীবনের প্রভাত কাল, তাহার সমগ্র জীবনের মধ্যে সুন্দরতম অবস্থা; তাই বুঝি সমাজের বাল্যাবস্থা—তাহার প্রথম জাগরণ এত সুন্দর।

যিনি কখন উষার সুষমারাশি সন্দর্শন করেন নাই, বাল্য জীবনের অবর্ণ-নীয় আনন্দলহরী যাহার হৃদয়কে উদ্বেলিত করে নাই, যাঁহার সমাজ কখন নব জাগরণের মাধুর্য্য অনুভব করেনাই তাঁহাকে কেমন করিয়া বুঝাইব "নব জাগরণ" কি?

সাহিত্য ভ্রাতৃবৃন্দ। আজ তোমাদের সমাজের সেই নব জাগরণ—সেই তরুণারুণরঞ্জিত জীবন প্রভাত! কিন্তু এখনও যে তোমরা নিদ্রালসনিমীলিত-নয়নে শয্যায় শয়ান রহিয়াছ? তোমার গৃহে আজ আনন্দ উৎসব আর তুমি এখনও নিদ্রামগ্ন! ছি ভাই! এ ঘুমঘোর পরিত্যাগ পূর্ব্বক চক্ষুরুন্মীলিত কর, একবার দেখ তোমার চতুর্দ্দিকে কেমন আনন্দোৎসব চলিতেছে।

শরৎ সমাগমে যখন সমগ্রদেশ জুড়িয়া শক্তিপূজার আয়োজন হইতে থাকে তখন দেশে যে আনন্দস্রোত প্রবাহিত হয় তন্মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা কাহার আনন্দ অধিক দেখা যায়?—সুকুমার মতি বালক বালিকার।

সাহিত্য ছাত্রবৃন্দ! আজ আমাদের সমাজে সেই শক্তিপূজা, কিন্তু এ পূজার একটু বিশেষত্ব আছে। সমষ্টি ভাবে ত এ পূজা হইবেই, তদ্ভিন্ন ব্যষ্টিভাবে পূজা করাই এস্থলে প্রধান লক্ষ্য। অর্থাৎ লক্ষ্মী সরস্বতী কার্ত্তিকেয়াদি দেবতার পৃথক্ পৃথক্ পূজারও ব্যবস্থা করিতে হইবে।

বল দেখি ভাই সব! তোমরা কোন্ দেবতার চরণে অঞ্জলি দিবে?

সমগ্র দেবতার পূজা করিবেন বাটীর কর্ত্তৃস্থানীয়, সমাজের মস্তক স্বরূপ নেতৃবৃন্দ। লক্ষ্মীদেবীর আরাধনা করিবেন সমাজের দেহ ও বাহু স্বরূপ বিষয়-কর্ম্মলিপ্ত নরনারীগণ, আর বাণীবিদ্যাদায়িনী সরস্বতী ও বলরূপী কার্ত্তিকেয়ের চরণে পুষ্পাঞ্জলি দিব আমরা সমাজের পদ স্বরূপ ছাত্রবৃন্দ।

এক্ষণে যে যাহার কার্য্যে প্রবৃত্ত হও; অন্যে কি করিতেছে, সমাজের মস্তক ও বাহু কার্য্য করিতেছে কি না তাহা লইয়া আমাদের মাথাব্যথার প্রয়োজন নাই, আমাদের উপর যে ভার ন্যস্ত হইয়াছে, কর্ত্তব্যের যে অংশ সম্পাদন করিতে আমরা নিযুক্ত হইয়াছি, শক্তিপূজায় যে পরিমাণে যোগদান করিতে অধিকার পাইয়াছি প্রাণপণে এখন আমরা তাহাই সুসম্পন্ন করিতে সচেষ্ট হইব।

স্মরণ রাখিতে হইবে যে আমরা সমাজের পদ স্বরূপ—আমাদেরই উপর নির্ভর করিয়া সমাজ দণ্ডায়মান হইবে, আজ যাহারা ছাত্র তাহাদেরই উপর সমাজের ভবিষ্যৎ আশা ভরসার ভিত্তি স্থাপিত। ছাত্রগণ যদি দুর্ব্বল ও রুগ্ন হয় তাহারা যদি বাগ্দেবীর প্রসাদ লাভে বঞ্চিত হয়, তবে সমাজ পঙ্গু হইবে—চলচ্ছক্তি বিহীন আতুর সমাজ চিরকালের জন্য ধুল্যবলুণ্ঠিত হইয়া আর্ত্তনাদ করিতে থাকিবে।

এই জন্যই বলরূপী কার্ত্তিকেয় ও বিদ্যাধিষ্ঠাত্রীদেবীর পূজায় আমরা নিযুক্ত। অর্থাৎ একদিকে যেমন শারীরিকী বৃত্তির অনুশীলন দ্বারা দৈহিক উন্নতি সাধন করিতে হইবে অন্য দিকে সেইরূপ জ্ঞানার্জ্জনী বৃত্তির অনুশীলন পূর্ব্বক মানসিক উন্নতি সম্পাদন করিতে হইবে।

আজ সত্যই বড় আনন্দের দিন। আজ আমাদের সমাজ সুপ্তোত্থিত হইয়া জগতের সম্মুখে আত্মপরিচয় প্রদান করিতে দণ্ডায়মান। ভাই সব, আমাদের কর্ত্তব্য এখন সমাজের এই মহদুদ্দেশ্যে সহায়তা করা।

ভ্রাতৃবৃন্দ! তোমাদের ধমনীতে না ক্ষত্রিয় রক্ত প্রবাহিত? তাহা যদি হয় তবে জগতের সম্মুখে তোমরা এমন নত মস্তক কেন? উচ্চ সমাজের চক্ষে তোমরা এত হেয় বলিয়া প্রতীয়মান হও কেন? এমন কি অনেক স্থানে তোমার জাতির নাম পর্য্যন্ত কেহ জানে না! ইহাতেও কি তোমার চৈতন্য উদয়—হয় না—যেদেশে মুষ্টিমেয় নিম্নতম মুচি ডোম প্রভৃতিও আপনাদিগকে হিন্দু বলিয়া পরিচয় দেয়, সেই বঙ্গ দেশে—সেই হিন্দু সমাজে—বিংশতি লক্ষ

মাহিষ্যের নাম পর্য্যন্তও জ্ঞাত নহে। এই ত সেদিন দুইমাস মাত্র পূর্ব্বে এই কলিকাতায় কেবল মাত্র হিন্দু ছাত্রে পূর্ণ কোন বিদ্যামন্দিরে প্রবেশ লাভ করিতে জাতি লিখাইবার সময় কেরাণী বাবু আমাকে বলিলেন "মাহিষ্য—কি হে!" তখন ভাবিলাম যে দেশে আমার জাতি বিংশতি লক্ষ, সেই দেশের একজন ভদ্রব্যক্তি আমার জাতির নামও শুনে নাই এ দোষ কি আমার নহে।

ভাই সব এখনও কি তোমাদের শিরায় শিরায় উষ্ণ শোণিত স্রোত ছুটিতেছে না, এখনও কি হিন্দু সমাজে স্বীয় অধিকার লাভ করিবার জন্য, সদম্ভে সকলের সম্মুখে উন্নত মস্তকে স্ফীত-বক্ষে আত্ম পরিচয় প্রদান করিবার জন্য তোমার হৃদয় আনন্দে নাচিয়া উঠিতেছে না! তা যদি না উঠে তবে আমাদের মাহিষ্য নামে ধিক্!!

পূর্ব্বেই বলিয়াছি আমাদের সমাজের এখন নব জাগরণ— তাহা যদি না হইত তবুও একমাত্র ছাত্র সমাজের চেষ্টাতেই এই জাতি প্রতিষ্ঠা লাভ করিতে পারিত। ছাত্রগণ যদি অন্যান্য জাতীয় ছাত্রদিগকে শারীরিক বল বীর্য্যে ও মানসিক ক্ষমতায় পরাজিত করিতে পারে অথবা প্রতিদ্বন্দীতায় তাহাদের সমকক্ষ হইতে পারে, তাহা হইলে সমগ্র দেশ স্বতঃই তাহাদের দিকে বিস্ময় বিস্ফারিত নেত্রে চাহিবে এবং পরিচয় জানিবার জন্য উৎসুক হইবে।

হে সতীর্থবৃন্দ! আজ এই মিলন মন্দিরে প্রতিজ্ঞা করিয়া যাও, এই পুণ্যস্থান হইতে মহাব্রত লইয়া যাও যে আজ হইতে তুমি তোমার কর্ত্তব্যসাধনে প্রাণপণ করিবে। সর্ব্বদা মনে রাখিবে যে বিংশতি লক্ষ নরনারী তোমার কৃতকার্য্যতার দিকে উৎসুক নেত্রে চাহিয়া আছে।

আর একটী কথা এই যে চেষ্টা করিলে তোমরাই এই বিংশতি লক্ষ মাহিষ্যকে একতা সূত্রে আবদ্ধ করিতে পার। চেষ্টা করিলে অন্ততঃ তোমার জাতীয় ছাত্রদিগকে লইয়া একটী ছাত্র সমাজ গঠিত করিতে পার। এখনও জাতীয় ছাত্রের সংখ্যা এত অল্প যে সমগ্র বঙ্গদেশের ছাত্র লইয়া একটী বিরাট ছাত্র সমাজ গঠিত হইতে পারে। ঐ বিরাট সমাজের অংশ স্বরূপ প্রত্যেক জেলায় এক একটী ছাত্র সমাজ সংগঠিত হইবে। এইরূপে প্রয়োজন বোধে প্রত্যেক মহকুমা ও প্রত্যেক গ্রামে ঐরূপ ছাত্রসমাজ গঠিত হইতে পারিবে।
এই পন্থা অবলম্বন করিলে আমরা সহজই উদ্দেশ্য সাধনে ...

কারণ আমরা যে জগতের নিকট অজ্ঞাত তাহার হেতু বাদ এই যে আমরা আমাদের পরস্পরের পরিচিত নই ।

এক্ষণে এই ছাত্রসমাজের কর্ত্তব্য নির্ণয়। ইহাদের কর্ত্তব্য পূর্ব্বেই উক্ত হইয়াছে কেবল শারীরিক উন্নতি সাধন ও বিদ্যালাভ। এই কথা বিশেষ ভাবে মনে রাখিতে হইবে যে সমাজের অন্যান্য বিষয়ের উন্নতি বা রাজনীতি অথবা অর্থনীতি এই সমস্ত বিষয়ে ছাত্রসমাজ একেবারেই যোগদান করিতে পারিবে না। বিদ্যার্থী ছাত্রের যাহা কর্ত্তব্য কেবল তাহাই লইয়া থাকিবে।

হিন্দুসমাজে উপযুক্ত স্থান লাভ করিবার অবসর এইবার তোমার। সমাজের শীর্ষ স্থানীয় ব্রাহ্মণের এখন সন্ধ্যাকাল, বৈদ্যজাতির এখন অপরাহ্ন, আর কায়স্থ সমাজের এখন মধ্যাহ্ন, অন্যান্য হিন্দুজাতি এখন নিদ্রিত। কেবল তোমার এইবার নবজাগরণ। তোমার মধ্যে যে নবোৎসাহ জাগিয়া উঠিয়াছে তাহার ফলে তুমি কৃতকার্য্য হইবেই হইবে। ভারতের ইতিহাসে অথবা জগতের ইতিহাসে ব্রাহ্মণ বৈদ্য কায়স্থ প্রভৃতি উচ্চজাতি যে ডিপ্লোমা প্রাপ্ত হইয়াছে তাহার বেশী আর তাহারা কি করিবে। বিদ্যা, ধন, মান, সুখ্যাতি সকলই তাহারা লাভ করিয়াছে। এই বার সাহিত্য! তোমার পালা আসিয়াছে। তাই সাহিত্য আজ নববলদৃপ্ত ও উদ্বুদ্ধ।

ভাবিয়া দেখ একথা সত্য কিনা? দশ বৎসর পূর্ব্বে তোমার জাতি কোথায় ছিল, আর আজ তাহারা কোথায় বলিতে পার? আর কোন্ জাতি বিগত বৎসরে এত উন্নতি করিয়াছে? কেহই নহে।

এক্ষণে উপসংহারে আবার বলিতেছি সকলে স্ব স্ব কার্য্যে নিযুক্ত হও। "ছাত্রাণাং অধ্যয়নং তপঃ" এই মহাবাক্য স্মরণ করিয়া তোমার তপস্যায় নিমগ্ন হও। বিশ্বসংসার উলট্ পালট্ হইয়া যাক্। রাজনীতি ক্ষেত্রে অথবা অন্যত্র সহস্র পরিবর্ত্তন সংঘটিত হউক তুমি তাহাতে দৃকপাৎ করিওনা—লক্ষ্যে সমাধিপ্রাপ্ত সব্যসাচীর ন্যায় অথবা ধ্যান নিমগ্ন ধ্রুবের ন্যায় স্বীয় আরাধ্য দেবতার সাধনায় নিমগ্ন হও। ভগবান অবশ্যই তোমাদের মনোরথ পূর্ণ করিবেন।

শ্রীনীলরতন বিশ্বাস।

মাণ্ডেশ্বরী মন্দির।

বিহারের উত্তর পশ্চিম অংশে সাহাবাদ জেলার অন্তর্গত ভাবুয়া মহকুমার শত মাইল দক্ষিণে যে বিন্ধ্যাচল বিস্তৃত আছে, তাহার সংলগ্ন এক পাহাড় রামগড় গ্রামে প্রবেশ করিয়াছে। এই পাহাড়ের শেষ অংশের নিম্ন ভাগ প্রায় গোল এবং গোলের ব্যাস আন্দাজ ১৫০০ ফিট, পাহাড় উর্দ্ধদিকে ক্রমে সূক্ষ্ম হইয়া ৮০০ ফিটের ন্যূনাধিক উচ্চ হইবে। এই পাহাড়ে উঠিবার দুইটি সিঁড়ি, তন্মধ্যে একটি অপেক্ষাকৃত প্রশস্ত। তাহারই নিম্নভাগের একধারে একটী প্রস্তর নির্ম্মিত হস্তী দণ্ডায়মান আছে। অপর ধারেও সম্ভবতঃ আর একটি ছিল, কিন্তু তাহা পড়িয়া গিয়া এখন মাটি চাপা পড়িয়াছে। পাহাড়ে উঠিবার সময় দেখা যায় যে পাহাড়ের গায়ে গায়ে সোপানের পার্শ্বে সমদূরে স্থিত ছয় স্থানে বিশ্রাম করিবার জায়গা ছিল, এই সিড়ির ধারে বৃষ্টির জল সংগ্রহ করিবার জন্য দুই তিনটি চৌবাচ্চা আছে। সোপান-গাত্রে কোন কোন স্থানে খোদিত লিপি দেখিতে পাওয়া যায়, কিন্তু তাহার অক্ষর হিন্দি কিম্বা দেবনাগরি নহে, হয় ত তামিল হইবে। সিঁড়ির ধারে বিষ্ণু গণেশ ও সূর্য্যের ভগ্নমূর্ত্তি বর্ত্তমান আছে—পাহাড়ের উপরিভাগ সমতল, পরিমাপে এক বিঘা ভূমি হইবে। তাহার চতুর্দ্দিকে প্রস্তরের প্রাচীর ছিল তাহার চিহ্ন এখনও লক্ষিত হয়। পাহাড়ে উঠিতে যে দারুণ কষ্ট হয় তাহা পাহাড়ের উপরিস্থিত স্নিগ্ধ সুশীতল বায়ু সেবনে দূরীভূত করে। পাহাড়ের উপরিভাগ হইতে চারিদিকের দৃশ্য অতি সুন্দর, নিম্ন দেশের রাস্তা সকল রেখার ন্যায় এবং নদী রৌপ্যসূত্রের ন্যায় বোধ হয়। বড় বড় বৃক্ষ সকল সামান্য কুশ-ঝপের মত দেখায় এবং মনুষ্য ও জীবজন্তু সকল অতীব ক্ষুদ্র অনুমিত হয়। পাহাড়ের উপরিভাগের মধ্য স্থলে এক অষ্টকেতন-বিশিষ্ট মন্দির আছে; ইহার দক্ষিণ দরজার এক পার্শ্বে যতদূর পড়িতে পারিয়াছি 'শ্রীভগবতীর মন্দির' লিখিত আছে। পূর্ব্বে এই মন্দিরের চতুর্দ্দিকে বারান্দা ছিল, তাহা পড়িয়া গিয়াছে এবং তাহার ভগ্নাবশেষের মধ্যে মন্দির একরূপ লুপ্ত হইয়া গিয়াছিল। কিন্তু লর্ড কর্জ্জনের অনুগ্রহে ভগ্নাবশেষ এখন স্থানান্তরিত হইয়াছে মন্দিরের উপরি ভাগ সংস্কার করা হইয়াছে এবং মন্দির সরকার বাহাদুরের তত্ত্বাবধানে সংরক্ষিত হইতেছে। মন্দিরের চারিধার ভগ্ন বারান্দার প্রস্তর সমূহের দ্বারা আবৃত ছিল, সেই জন্য মন্দিরটী এখনও ভাল অবস্থায় আছে, এই মন্দিরকেই মাণ্ডেশ্বরীর মন্দির এবং পাহাড়কে মাণ্ডেশ্বরীর

মন্দিরের মধ্যস্থলে চারিমুখবিশিষ্ট এক শিবলিঙ্গ স্থাপিত আছে এবং এক কোণে এক অষ্টভূজার মূর্ত্তি দণ্ডায়মান আছে, শেষোক্ত মূর্ত্তি অতিশয় পুরাতন, ইহার দু'এক ভুজ ব্যতীত আর সব ভূজ ভাঙ্গিয়া গিয়াছে, তবে সব ভূজের প্রথমাংশ কিঞ্চিত বিদ্যমান আছে। মূর্ত্তি যে স্থানে রাখা হইয়াছে তাহা দেখিলেই বোধ হয় যেন ইহা অন্য স্থান হইতে উঠাইয়া আনিয়া কোণে রাখা হইয়াছে। শিবলিঙ্গের অবয়ব দেখিলে ইহা অষ্টভূজা মূর্ত্তি অপেক্ষা আধুনিক বলিয়া বোধ হয়। মন্দিরের প্রচলিত নাম ও দ্বারদেশের লোক এবং যে ভাবে অষ্টভূজা মূর্ত্তি রাখা হইয়াছে তাহা দেখিলেই প্রতীয়মান হয় যে, এই অষ্টভূজা মূর্ত্তি মন্দিরের অধিষ্ঠাত্রী দেবতা ছিলেন এবং তাঁহার স্থান মন্দিরের মধ্য স্থলে ছিল, কিন্তু বৌদ্ধ যুগের শেষ ভাগে দাক্ষিণাত্য হইতে আর্য্যাবর্ত্ত পর্য্যন্ত শিব স্থাপনের যে মহা উদ্‌যোগ চলিয়াছিল, সেই পরিবর্ত্তনের সময়ে অষ্টভূজার মূর্ত্তি মধ্যস্থল হইতে অপসৃত করিয়া তাহারই স্থানে শিবলিঙ্গ স্থাপিত হইয়াছিল এবং অষ্ট ভূজা এক পার্শ্বে অপনীত হইয়াছিল। পাহাড়ের পাদদেশে দক্ষিণদিকে প্রায় এক বর্গ মাইল বিস্তৃত এক সহরের চিহ্ন বর্ত্তমান আছে, তাহার পূর্ব্বপার্শ্বে বাঁধা ঘাট ছিল, তাহার কিঞ্চিৎ দূরে স্থানে স্থানে স্তূপাকার পাথর পড়িয়া আছে, লোকে বলে, এই সকল প্রস্তরই বড় বড় অট্টালিকার ভগ্নাবশেষ। হ্রদের দক্ষিণদিকে বিন্ধ্যাচল পর্ব্বত এবং ইহা হইতে এক জলপ্রপাত হ্রদে পড়িয়াছে, হ্রদের উত্তর দিকে মাণ্ডেশ্বরী পাহাড়ের তলদেশ দিয়া একটি ক্ষুদ্র নদী বাহির হইয়া নিকটস্থ শুরা-নদীতে মিলিত হইয়াছে। পুরাকালে এই হ্রদে জল রাখিবার জন্য ক্ষুদ্র নদীতে বাঁধ দেওয়া হইত তাহার চিহ্ন পাওয়া যায়। কিম্বদন্তি এই যে বর্ষার সময় বড় বড় নৌকা গঙ্গা হইতে শুরা নদী বহিয়া আসিয়া হ্রদে প্রবেশ করিত। এই হ্রদের নিকটস্থ রামগড় গ্রামের লোকের প্রচুর ব্যবসা বাণিজ্য ছিল, এখনও এখানে ব্যবসায়ী জাতি অন্য স্থানের অপেক্ষা অধিক দেখিতে পাওয়া যায়। মন্দির সত্য যুগ হইতে চলিয়া আসিতেছে ইহাই প্রবাদ, ইহাতে আধুনিক দেবতা সকলের এমন কি শ্রীরাম লক্ষ্মণ এবং মহাবীরের (হনুমানের) মূর্ত্তিও দেখিতে পাওয়া যায় না। এই সকল মূর্ত্তি পশ্চিম অঞ্চলে প্রায় অনেক স্থানেই দেখিতে পাওয়া যায়। মন্দির যদি ত্রেতা কিম্বা দ্বাপর যুগের হইত তাহা হইলে শ্রীরাম, লক্ষ্মণ ও মহাবীরের মূর্ত্তি পাহাড়ের কোন না কোন স্থানে থাকিত—এই কারণে এবং মন্দিরের সোপানের পার্শ্বে যে সূর্য্য মূর্ত্তি ও সত্য

যুগের আর আর দেবতার মুর্ত্তি দেখিতে পাওয়া যায় তাহাতে এবং মন্দিরের অবস্থা দেখিলেই বোধ হয় মন্দির সত্যযুগের নির্ম্মিত হওয়া সম্ভব। মন্দিরের নিকটবর্ত্তী স্থানে এই প্রবাদ যে, মুণ্ড নামক এক রাজা হ্রদের পূর্ব্ব দিকে বাস করিতেন। তিনিই ঐ মন্দির নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন এবং তন্মধ্যে মাণ্ডেশ্বরী নাম-ধারিণী অষ্টভুজা মূর্ত্তি স্থাপন করিয়াছিলেন। পাহাড়ের প্রায় চার ক্রোশ দূরে চণ্ডী দেবীর এক মূর্ত্তি আছে, লোকে তাহাকে মুণ্ড রাজার ভ্রাতা চণ্ড নির্ম্মিত বলে। এই চণ্ডীর মন্দিরও অতি পুরাতন, সাবেক মন্দির একেবারে ভাঙ্গিয়া গিয়াছে—ইহার ভগ্নাবশেষ প্রস্তরে অনেক কারুকার্য্য দেখিতে পাওয়া যায়—তাহা মাণ্ডেশ্বরীর মন্দিরে কারু কার্য্যের ন্যায় সুন্দর। স্থানীয় লোকের বিশ্বাস চণ্ড মুণ্ড দুই ভ্রাতা শম্ভু নিশম্ভু নামক দুই দৈত্যের প্রধান সেনাপতি ছিলেন, ভগবতী তাহাদিগকে বধ করিয়া চামুণ্ডা নাম ধারণ করিয়াছিলেন। এই দুই দৈত্যের ও তাহাদের সেনাপতির বিষয় পুরাণে কথিত আছে—হাণ্টার সাহেবের ষ্টাটিসটিকাল বিবরণে (Statistical Account) এই মন্দিরের ও তাহার পৌরাণিক নির্ম্মাতার উল্লেখ আছে, এবং ইম্পিরিয়াল গেজেটীয়ারে (Imperial Gazetteer) বলেন যে মন্দির পঞ্চম হইতে ষষ্ঠ খ্রীষ্টাব্দের মধ্যে নির্ম্মিত হইয়াছে, কিন্তু কি প্রমাণের উপর নির্ভর করিয়া মন্দির নির্ম্মাণের সময় নির্দ্ধারিত করা হইয়াছে—তাহা লেখা নাই। মন্দিরটি অতীব পুরাতন, যে কোন উচ্চ পদের ইংরাজ কিম্বা শিক্ষিত দেশীয় লোক ভাবুয়ায় কার্য্যোপলক্ষে উপস্থিত হন। তিনি একবার মন্দির দেখিতে যান। কোন প্রত্নতত্ত্ববিৎ এ পর্য্যন্ত বৈজ্ঞানিক চক্ষুতে মন্দিরটি দেখিয়াছেন কিনা জানি না, ইহা তাঁহাদের দেখিবার যোগ্য। এই মন্দিরের স্থানে স্থানে যে সকল খোদিত লিপি আছে ও মূর্ত্তি দেখিতে পাওয়া যায় এবং মন্দিরের উপরের কারু কার্য্য দেখিলে তাঁহারা মন্দিরের বয়স ঠিক করিতে পারিবেন আশা করা যায়। এ মন্দির কাশী হইতে প্রায় চল্লিশ মাইল পূর্ব্বে এবং গয়া মোগল সরাই লাইনের ভাবুয়া ষ্টেশন হইতে ষোল মাইল দূরে অবস্থিত।

শ্রীযজ্ঞেশ্বর বিশ্বাস,
ডেপুটী ম্যাজিষ্ট্রেট—আরারিয়া, পুর্ণিয়া।

বর্ণাশ্রম-ধর্ম্ম-রহস্য।

বর্ত্তমান সময়ে বৈদিক সমাজের আভ্যন্তরীণ সকল স্তরেই জাতি-ধর্ম্ম লইয়া অল্প বিস্তর আলোচনা চলিতেছে। কাল প্রভাবে ব্রাহ্মণ হইতে আরম্ভ করিয়া চণ্ডাল পর্য্যন্ত সকল শ্রেণীতেই স্পর্শ করিয়া কি এক যেন নব ভাবের বায়ু প্রবাহিত হইতেছে, যাহাদ্বারা সকলেই চঞ্চল ও চিন্তান্বিত হইয়াছে। স্থির ভাবে অনুভব করিলে বুঝায় যে (১) কতকগুলি যেন কোন নূতন আশার—আলোকে পুলকিত, (২) কেহ কেহ বা অজ্ঞাতসারে অপহৃত-ধন—প্রায় চমকিত (৩) কেহ কেহ বা ভাবি বিপদ বা আগত বিপদের সূচনায় শঙ্কিত ও ব্যতিব্যস্ত। সে যাহাহউক ইহাদ্বারা বৈদিক সমাজ যে জীবিত ও জাগরিত ইহা অবশ্য স্বীকার করা যাইতে পারে।

কিছু কাল পূর্ব্ব হইতে সেন্সাস্ রিপোর্ট-সম্বন্ধে যাঁহারা কিঞ্চিৎ মাত্রও আলোচনা করিয়াছেন বা করিতেছেন তাঁহারা আমার বাক্যকে সম্যক গলাধঃকরণ করিতে না পারিলেও অবশ্য স্বাদ গ্রহণে কোন কষ্ট ভোগ করিবেন না। তথাপি সাধারণের অবগতির জন্য উদাহরণ স্বরূপ আপাততঃ দুই একটী বিষয়ের যাহা আদর্শ দেওয়া যাইতেছে, তাহাতে অবশ্য সূচিত বিষয় সুস্পষ্ট হইতে পারিবে (১) নমশূদ্রগণ জলাচরণীয় সৎশূদ্র মধ্যে পরিগণিত হইবার জন্য (২) ধীবরগণ, কৈবর্ত্ত নামের ধুয়া ধরিয়া "মাহিষ্য-মর্য্যাদা" হরণ জন্য (৩) কোন কোন সম্প্রদায় "মাহিষ্য-মর্য্যাদা" লাঘব করিতে এবং (৪) কেহ কেহ মাহিষ্য যাজী ব্রাহ্মণগণকে পর্য্যন্ত অসম্মানিত করিতে বদ্ধ পরিকর হইয়াছেন; ইত্যাদি ইত্যাদি। যাহা হউক বড় হইতে কে না চায়? বড় হইবার সুযোগ পাইলে কোন্ ব্যক্তিই বা তাহা সহজে ত্যাগ করিতে পারেন? সকলে বড় হউক বা সকলেরই বড় হওয়ার আশা থাকুক বা সকলের অন্তরে বড় হইবার আশা স্বাভাবিক, একথা সর্ব্ববাদী সম্মত হইবে কিনা জানিনা; কিন্তু ইহা যে চিন্তাশীল ব্যক্তি মাত্রেই সমীচিন বলিয়া স্বীকার করিবেন তাহাতে সন্দেহ নাই। তবে বড় হইতে হইলে অন্যকে ছোট সাজাইয়া নিজকে বড় হইতে হইবে, কিম্বা অন্যকে বসাইয়া দিয়া জোর করিয়া তাহার স্কন্ধে চড়িয়া বা লাফাইয়া বড় হইতে হইবে এমত নহে; প্রকৃত বড় থাকিয়াই বড় বলাইতে হইবে? যদি তাহা না হয় তবে এ নীতি কেবল অসুররাজ্যে ভিন্ন কখন শান্তিময় বৈদিক ধর্ম্মরাজ্যে শোভনীয় হইতে পারে না। সকলের স্মরণ রাখা উচিত যে বৈদিক

সমাজ নিত্যসত্য এবং সনাতন ধর্ম্মময়। ইহাতে কখন মিথ্যা আশ্রয় বা প্রশ্রয় পাইতেই পারে না।

বৈদিক সমাজ পরস্পরের সমবায় পরস্পরের স্নেহ ও পরস্পরের কল্যাণ লইয়া গঠিত ও চালিত। যদি এতদন্তর্গত কোন স্তর বা সমাজ উন্নতিকামী হন তবে নিজ নিজ মঙ্গলের সঙ্গে অন্যান্য স্তরের কল্যাণকামী হইলেই উত্তম, যদি তাহাও না হয় অন্ততঃ পক্ষে নিজ মঙ্গলের সঙ্গে অন্যান্য সমাজের কোন অপকার বা অকল্যাণ না করেন তাহা হইলেও কাহারও তেমন বাধা না থাকিতে পারে ; কিন্তু যদি তাহা না হইয়া এতদেতর অন্য কোন প্রকারে সিদ্ধি লাভেচ্ছু হন তবে বৈদিক সমাজ মধ্যে তাহাদের ইচ্ছা কোন কালে সাফল্য লাভ করিতে পারে না বা তেমন সমাজ কখন প্রতিষ্ঠিত হইতে পারে না। তাহাদের চেষ্টা বাতুলতাময় এবং বাক্য প্রলাপ ভিন্ন অন্য কিছুই নহে, অধিকন্তু তাহাদের অভ্যুদয় ও স্থিতি অসীম সমাজ সমুদ্রে জলবুদ্বুদবৎ ক্ষণবিধ্বংশী ও নগণ্য।

অন্তর্লক্ষে দৃষ্টি পাত করিলে দেখা যায় যে কতকগুলি জাতি ব্রাহ্মণত্বের, কেহ কেহ ক্ষত্রিয়ত্ব বৈশ্যত্বের কেহ কেহ বা জলা চরণীয় সৎশূদ্র মধ্যে স্থান-লাভের জন্ম দাবী করিতেছেন। চেষ্টাও করিতেছেন এবং ব্যয় ও করিতেছেন বা প্রমাণ প্রয়োগ করিতে অগ্রসরও হইতেছেন সত্য ; কিন্তু ব্যাপার দেখিলে জানিতে ইচ্ছা হয় যে ; ইহারা দাবী করিতেছেন কাহার নিকট এবং কাহার উপর। অবশ্য উত্তর পাইব যে সমাজ পতির নিকট ও সমাজের উপর—কিন্তু সুবিচার পাইতে হইলে বিচারক বা পক্ষ ও প্রতিপক্ষকে যে প্রত্যক্ষ সাক্ষ্যের উপর লক্ষ্য রাখিয়া চলিতে হইবে সে বিষয়ে লক্ষ্য আছে কি ?

বৈদিক সমাজে চিরকাল যে নীতিতে সুবিচার হইয়া থাকে, বা প্রার্থী যে নীতিতে সুবিচার পাইয়া সুখী হইতে পারেন এবং অন্যায় প্রার্থনাকারীগণ যে নীতি বলে নিজ নিজ অযথা আপত্তির মর্ম্ম বুঝিতে পারিয়া শান্ত হইতে বাধ্য হইতে পারেন ও হইয়া থাকেন, সেই সুপ্রসিদ্ধ বৈদিক সমাজ-তত্ত্ব অর্থাৎ "বর্ণাশ্রমমর্ম্ম-রহস্য" সম্বন্ধে কিঞ্চিত আলোচনা করিতে প্রবৃত্ত হইতেছি,—আশা করি সমাজ হিতৈষী শান্তি প্রিয় ব্যক্তি মাত্রেই অবশ্য সমালোচনা দ্বারা আলোচ্য বিষয় শুভকর বোধ করিলে তদঙ্গীকরণে সংসারে চলিতে বা পরিচালিত করিতে কুণ্ঠিত হইবেন না।

শিরোভাগে "বর্ণাশ্রম-ধর্ম্ম রহস্য" নাম দিয়া প্রবন্ধের সূচনা করা হইয়াছে। ঐ শব্দ কয়েকটী বিশ্লেষণ করিয়া অর্থ বোধ করিলে অবশ্যই আমার উদ্দেশ্য

সিদ্ধ হইতে পারিবে। ইহাতে বর্ণ, আশ্রম, ধর্ম্ম ও রহস্য এই যে চারিটী শব্দ আছে। ঐ চারিটী শব্দ ভেদে প্রবন্ধের চারিটী অংশ বিভাগ করিয়া বিষয়টী বর্ণিত হইবে। তবে শব্দ গুলির বিলোম পর্য্যায়ে অর্থ বোধ করাইবার প্রয়াসী হইয়া ১ম—রহস্য ২য়—ধর্ম্ম ৩য় আশ্রম ৪র্থ—বর্ণ তত্ত্ব সম্বন্ধে বক্তব্য বিষয় লিখিত হইবে। শেষে উপসংহারে সর্ব্বভাব সমন্বয় করতঃ প্রবন্ধের সার্থকতা সম্পাদন করিতে চেষ্টা পাইব। অতএব পাঠক পাঠিকাগণকে কিছুকাল ধৈর্য্য ধারণ করিতে অনুরোধ করিয়া এক্ষেত্রে যাত্রা করিতেছি, আশা করি অনুরোধ উপেক্ষিত হইবে না।

রহস্য ;—রহস্য শব্দে গুপ্ত ব্যাপার বুঝায় ; গোপনীয় ব্যাপারকেই রহস্য বলা হয়। ঐন্দ্রজালিকগণ কৌশল জাল দ্বারা বস্তু হইতে বস্ত্বন্তর প্রকাশ করতঃ দর্শক বৃন্দকে মুগ্ধ করিয়া থাকে। দর্শকবৃন্দ যে কৌশলটী অবগত নহে বলিয়া এরূপ অবস্থাপন্ন হয়েন সেই কৌশলটিই এস্থলে দ্রষ্টার নিকট গুপ্ত এবং উহাই ভেদ করিতে নাপারায় উহাই দ্রষ্টাগণ মধ্যে নানা রসের নিদান হইয়া থাকে। কার্য্যের প্রকৃত আভ্যন্তরিক নীতিই "রহস্য" নামের যোগ্য।

ইঞ্জিনিয়ারগণ একটী নদীর উপর দিয়া সেতু প্রস্তুত করিলেন, আমরা দর্শন করিয়া বিস্ময়ান্বিত হইলাম, এ বিস্ময়ের কারণ কি? ইঞ্জিনিয়ারগণ যে বিজ্ঞান বা যুক্তিটীর ফ্রেম বা কাটাম মনোমধ্যে অগ্রে সাজাইয়া পরে তাহারই উপর ইষ্টক প্রস্তর লৌহাদির ছাউনি দিয়া সেতু নির্ম্মাণ করিয়াছেন তাহাতে কোন সন্দেহ নাই ; কিন্তু সেই ইঞ্জিনিয়ারের মনোরাজ্য-স্থিত গুপ্ত চিত্র বা ব্যাপার বা নীতিটী আমরা আয়ত্তে আনিতে পারি নাই বলিয়াইত এত বিস্ময় এত সংশয়! এবং তেমন আদর্শ দর্শন করিয়াও সংগঠনে অসমর্থ হই বা অনুকরণেও অকৃত কার্য্য হইয়া বিড়ম্বিত ও ক্ষতিগ্রস্ত ও হাস্যাস্পদ হইয়া থাকি। এস্থলেও নীতিটীই রহস্য শব্দের বোধ্য বিষয়।

ভগ্ন যন্ত্র, ভগ্ন গৃহাদিকে সংস্কৃত করিতে হইলে সংস্কারক যদি মূল সংগঠন নীতি জ্ঞাত না থাকেন তিনি কখন কৃতকার্য্য হইতে পারেন না।

এইরূপ বৈদিক সমাজ সংগঠন সম্বন্ধে যে নীতি বৈধ ও সনাতন তাহাই এস্থলে রহস্য শব্দের অধিকৃত বিষয়। তাহা জ্ঞাত না হইয়া শত শত প্রকারে চেষ্টা করিলেও কেহ কখন বৈদিক রাজ্যে প্রবেশ করিতে বা স্থান পাইতে পারিবেন না। অধিকন্তু নিগৃহীত ও লাঞ্ছিত ও বিশেষ বিড়ম্বিত হইবেন এবং উৎপথগামী বিবেচিত হইয়া সমাজে উপহাস্যাস্পদ হইবেন তাহাতে কোন সন্দেহ নাই।

শ্রীনিত্যানন্দ ভট্টাচার্য্য

উদয়পুর পোঃ কুমারি নদীয়া।

মাহিষ্য শিক্ষা বিস্তার ভাণ্ডার।

বিগত ১লা মার্চ্চ রবিবার অপরাহ্ন ৩ঘটিকার সময় ৩৮নং পুলিস হাঁসপাতাল রোডস্থ ভবনে মাহিষ্য শিক্ষা বিস্তার ভাণ্ডার প্রতিষ্ঠাকল্পে একটী বিরাট সভার অধিবেশন হইয়াছিল। বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক সভার অন্যতম সদস্য এবং হাইকোর্টের উকিল মননীয় শ্রীযুক্ত মহেন্দ্রনাথ রায় এম্-এ, বি-এল মহোদয় সভাপতির আসন অলঙ্কৃত করিয়াছিলেন। রায়চাঁদ প্রেমচাঁদ স্কলার শ্রীযুক্ত মন্মথ নাথ রায় এম্ এ বি এল, উকীল হাইকোর্ট, শ্রীযুক্ত বি এন্ শাষমল ব্যারিষ্টার শ্রীযুক্ত প্যারিমোহন শিকদার উকীল হাইকোট শ্রীযুক্ত উপেন্দ্র নাথ বিশ্বাস এম্ এ বি এল, শ্রীযুক্ত রাম কৃষ্ণ মণ্ডল বি এল, উকীল ডায়মণ্ড হারবার; শ্রীযুক্ত অমৃত লাল হাজরা বি-এল, উকিল উলুবেড়িয়া ; শ্রীযুক্ত গগণ চন্দ্র বিশ্বাস বি-সি-ই শ্রীযুক্ত শ্রীযুক্ত কেদার নাথ দাস বি সি ই, শ্রীযুক্ত হরিদাস দাস সি ই, প্রভৃতি সমাজের গণ্যমান্য মহোদয়গণ উপস্থিত হইয়া সভার কার্য্যে যোগদান করিয়াছিলেন। (১) নির্দ্ধারিত সময়ে ব্যারিষ্টার শ্রীযুক্ত বি, এন্, শাসমল মহাশয়ের প্রস্তাবে শ্রীযুক্ত বাবু নরেন্দ্র নাথ দাস মহাশয়ের সমর্থনে এবং সর্ব্ব-সম্মতি ক্রমে মাননীয় শ্রীযুক্ত মহেন্দ্রনাথ রায় এম্ এ বি এল মহাশয় সভাপতির আসন গ্রহণ করেন।

(২) তৎপরে সভাপতি মহাশয় মেদিনীপুর, ঘাটাল, চুয়াডাঙ্গা সিলেট, সুনামগঞ্জ, ঢাকা প্রভৃতি স্থান হইতে প্রেরিত সহানুভূতি সূচক টেলিগ্রাম এবং চিঠি পত্রাদি পাঠ করেন।

৩। তৎপরে সভাপতি মহাশয়ের অনুমত্যানুসারে আশ্রম বালক শ্রীমান সূর্য্যকুমার চক্রবর্ত্তী একটী আবাহন কবিতা পাঠ করেন ; এই কবিতা মেদিনীপুর কাপাসএড়ে নিবাসী "গাথা ও উচ্ছ্বাস" প্রণেতা শ্রীযুক্ত পূর্ণচন্দ্র দাস মহাশয় এই সভার উদ্দেশ্যে গ্রথিত করিয়া সম্পাদকের নিকট পাঠাইয়াছিলেন।

৪। তৎপরে সভাপতি মহাশয় একটী সুন্দর এবং সারগর্ভ বক্তৃতায় সভার উদ্দেশ্য সকলকে বুঝাইয়া দেন এবং এই সভার উদ্দেশ্য যাঁহাতে সফল হয় তজ্জন্য উপস্থিত প্রত্যেক সভ্যকেই অনুরোধ করেন।

৫। অতঃপর ভাণ্ডারের সুযোগ্য সম্পাদক ব্যারিষ্টার শ্রীযুক্ত বি এন শাসমল মহাশয় "শিক্ষাই মানব জাতির একমাত্র উন্নতির মূল" ইত্যাদি বিষয় আলোচনা করিয়া এই প্রস্তাব উত্থাপিত করেন যে" দরিদ্র অথচ মেধাবী মাহিষ্য এবং গৌড়াদ্য বৈদিক শ্রেণীর ব্রাহ্মণ বালকগণের শিক্ষার সুবন্দোবস্তের নিমিত্ত মাহিষ্য শিক্ষা বিস্তার ভাণ্ডার নামে একটী ভাণ্ডার প্রতিষ্ঠিত হউক.

বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক সভার অন্যতম সদস্য এবং হাইকোর্টের উকীল মাননীয় শ্রীযুক্ত মহেন্দ্রনাথ রায় এম্ এ বি এল মহাশয় এই ভাণ্ডারের সভাপতি, শ্রীযুক্ত বি এন্ দাস এম্ এ বি এস্ সি (লণ্ডন) শ্রীযুক্ত প্যারীমোহন শিকদার বি এ বি এল উকীল হাইকোর্ট ও শ্রীযুক্ত মন্মথনাথ মণ্ডল জমিদার ডায়মণ্ডহারবার ইহার সহকারী সভাপতি শ্রীযুক্ত বি এন্ শাসমল ব্যারিষ্টার এই ভাণ্ডারের সম্পাদক এবং শ্রীযুক্ত ধনপতি দাস এম্ এ, শ্রীযুক্ত শ্যামলাল সরকার শ্রীযুক্ত রামপদ বিশ্বাস ও শ্রীযুক্ত হরিশচন্দ্র চক্রবর্ত্তী ইহার সহকারী সম্পাদক শ্রীযুক্ত হরিদাস দাস সি ই এই ভাণ্ডারের ধনাধ্যক্ষ এবং ডাক্তার শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্র দাস এল আর, সি, পি এণ্ড এস (এডিন বরা) ও শ্রীযুক্ত নারায়ণ পদ দাস বি এল উকীল ডায়মণ্ড হারবার ইহার হিসাব পরীক্ষক নিযুক্ত হউন।” ডায়মণ্ড হারবারের উকীল শ্রীযুক্ত রামকৃষ্ণ মণ্ডল বি এল, মহাশয় এই প্রস্তাব অনুমোদন করেন। উলুবেড়িয়ার উকীল শ্রীযুক্ত অমৃতলাল হাজরা বি এল, শ্রীযুক্ত বাবু কেদার নাথ দাস বি, সি ই এবং পণ্ডিত শ্রীযুক্ত হরিশচন্দ্র চক্রবর্ত্তী এই প্রস্তাব সমর্থন করিলে উহা সর্ব্বসম্মতি ক্রমে গৃহীত হইল।

৬। অতঃপর হাইকোর্টের উকীল শ্রীযুক্ত বাবু প্যারীমোহন শিকদার মহাশয় প্রস্তাব করেন যে ভাণ্ডারের কার্য্য পরিচালন জন্য যে নিয়মাবলী প্রস্তুত হইয়াছে তাহা এই সভা কর্ত্তৃক গৃহীত হউক, সম্পাদক শ্রীযুক্ত বি এন্ শাসমল মহাশয় এই সকল নিয়মাবলী উপস্থিত সভ্যবৃন্দকে পাঠ করিয়া শুনান, তৎপর উহা সর্ব্ব সম্মতি ক্রমে পরিগৃহীত হইল। (শেষাংশে ভাণ্ডারের নিয়মাবলী দ্রষ্টব্য।

৭। তৎপর সভাপতি মহাশয়ের প্রস্তাবে এবং সর্ব্বসম্মতি ক্রমে নিম্ন লিখিত মহোদয়গণ ভাণ্ডারের সাধারণ সভার (General Committeeর) সভ্য মনোনীত হইলেন অতঃপর যাঁহারা সভ্য হইবেন তাঁহাদের নাম এই তালিকা ভুক্ত হইবে।

১। শ্রীমতী ঠাকুরদাসী বিশ্বাস জমিদার ৭১ নং ক্রীস্কুল ষ্ট্রীট কলিকাতা

২। শ্রীযুক্ত বাবু প্রসন্নকুমার চৌধুরী জমিদার জানবাজার কলিকাতা

৩। শ্রীযুক্ত বাবু নরেন্দ্রনাথ দাস জমিদার ৩৮ নং পুলিস হাসপাতাল রোড কলিকাতা

৪। মাননীয় শ্রীযুক্ত বাবু মহেন্দ্রনাথ রায় এম্ এ বি এল ২ নং বলরাম বোসের ষ্ট্রীট ভবানীপুর কলিকাতা

৫। শ্রীযুক্ত বি এন শাসমল ব্যারিষ্টার হাইকোর্ট ১৫০ নং রসারোড সাউথ কালিঘাট

৬। শ্রীযুক্ত বি এন দাস এম এ বি এস সি (লণ্ডন) প্রফেসার ঢাকা কলেজ

৭। শ্রীযুক্ত বাবু হরিদাস দাস সি, ই ১নং বকুলবাগান রোড ভবানীপুর কলিকাতা।

৮। শ্রীযুক্ত বাবু দেবনাথ মজুমদার দিঘাপতিয়া রাজষ্টেট রাজসাহী।

৯। শ্রীযুক্ত বাবু রামকৃষ্ণ মণ্ডল বি এ বি এল উকিল ডায়মণ্ডহারবার—২৪ পরগণা।

১০। শ্রীযুক্ত আর এম মাইতি ব্যারিষ্টার হাইকোর্ট কলিকাতা।

১১। শ্রীযুক্ত বাবু নারায়নপদ দাস বি এল উকিল ডায়মণ্ডহারবার ২৪ পরগণা।

১২। শ্রীযুক্ত বাবু ক্ষিরোদচন্দ্র ভুঁঞ্যা এম এ বি এল উকিল হাইকোর্ট-কলিকাতা।

১৩। ডাক্তার এস সি দাস এল আর সি. পি এণ্ড এস (এডিনবরা) ১২ ওয়েলিংটনষ্ট্রীট কলিকাতা।

১৪। শ্রীযুক্ত বাবু প্যারিমোহন সিকদার বি এ বি এল উকিল হাইকোর্ট ৩১ নং চন্দ্রনাথ চাটার্জ্জির ষ্ট্রীট ভবানীপুর কলিকাতা।

১৫। শ্রীযুক্ত বাবু মন্মথনাথ রায় (প্রেমচাঁদ রায়চাঁদ স্কলার) এম এ বি এল উকিল হাইকোর্ট ২নং বলরাম ঘোষের ঘাট রোড ভবানিপুর।

১৬। শ্রীযুক্ত বাবু বৃন্দাবনচন্দ্র সরকার (জমিদার) রসারোড নর্থ ভবানিপুর কলিকাতা।

১৭। ডাক্তার সুরেন্দ্রনাথ সরকার এল এম এস ১১৯।৬ কর্পোরেশনষ্ট্রীট কলিকাতা।

১৮। শ্রীযুক্ত বাবু প্রকাশচন্দ্র সরদার বি এ বি এল উকিল হাইকোর্ট।

১৯। শ্রীযুক্ত বাবু উপেন্দ্রনাথ বিশ্বাস এম্ এ বি এল্ (মুনসেফ) ডায়মণ্ডহারবার ২৪ পরগণা।

২০। শ্রীযুক্ত বাবু কেদারনাথ দাস বি সি ই ব্রুকম্যান ষ্ট্রীট কলিকাতা।

২১। শ্রীযুক্ত বাবু বঙ্কিমচন্দ্র মণ্ডল ১২নং সাঁখারিটোলা ইষ্ট কলিকাতা।

২২। শ্রীযুক্ত বাবু শরচ্চন্দ্র হাজরা গার্ডেনরিচ খিদিরপুর কলিকাতা।

২৩। শ্রীযুক্ত বাবু গঙ্গাধর হালদার (মোক্তার) ডায়মণ্ডহারবার ২৪ পরগণা।

২৪। শ্রীযুক্ত বাবু উপেন্দ্রনাথ সরকার ১৫ নং মায়াপুর রোড চেতলা আলিপুর।

২৫। শ্রীযুক্ত বাবু অঘোরনাথ দাস নেপাল ভট্টাচার্য্যের লেন কালিঘাট কলিকাতা।

২৬। শ্রীযুক্ত বাবু উপেন্দ্রনাথ হাজরা ১২০ ডায়মণ্ডহারবার রোড খিদিরপুর কলিকাতা।

২৭। শ্রীযুক্ত বাবু এককড়ি কোলে হেডমাষ্টার বিমলা এম ই স্কুল অমরপুর ভাঙ্গামোড়া হুগলি।

২৮। শ্রীযুক্ত বাবু কেদারনাথ দোলুই নিধিরাম মাঝির লেন হাওড়া।

২৯। শ্রীযুক্ত বাবু মতিলাল চক্রবর্ত্তী কোড়ারবাগান, হাওড়া।

৩০। পণ্ডিত মহেন্দ্রনাথ তত্ত্বনিধি সাহিত্য বান্ধব সম্পাদক ডায়মণ্ডহারবার ২৪ পরগণা।

৩১। পণ্ডিত শ্রীযুক্ত উমেশচন্দ্র চক্রবর্ত্তী গৌড়াদ্য বৈদিক ব্রাহ্মণ সমিতির সম্পাদক বলরাম বাটী সিঙ্গুর হুগলি।

৩২। শ্রীযুক্ত বাবু আশুতোষ দাস ১০ পামারবাজার রোড ইটালি কলিকাতা।

৩৩। শ্রীযুক্ত বাবু কৃষ্ণকালী রায় চেতলা আলিপুর ২৪ পরগণা।

৩৪। শ্রীযুক্ত বাবু অমূল্যচরণ চক্রবর্ত্তী পাবলিক ওয়ার্কস ডিপার্টমেন্ট আফিস (বেঙ্গল)

৩৫। ডাক্তার যোগেন্দ্রনাথ বিশ্বাস ভি এল এম এস চিথোলিয়া নদীয়া।

৩৬। শ্রীযুক্ত বাবু কৃষ্ণ দাস মণ্ডল বি এল উকিল বারাকপুর ২৪ পরগণা।

৩৭। শ্রীযুক্ত বাবু হরিশচন্দ্র চক্রবর্ত্তী হেডক্লার্ক উলুবেড়িয়া ফৌজদারী কোর্ট হাওড়া।

৩৮। শ্রীযুক্ত বাবু গোবিন্দচন্দ্র মণ্ডল বি এ হেডমাষ্টার সলাটী হাইস্কুল হাওড়া।

৩৯। শ্রীযুক্ত বাবু মন্মথনাথ মণ্ডল (জমিদার) পারুলিয়া ডায়মণ্ডহারবার ২৪ পরগণা।

৪০। শ্রীযুক্ত বাবু ধনপতি দাস এম এ ইউনিভারসিটি 'ল' কলেজ কলিকাতা।

৪১। শ্রীযুক্ত বাবু শ্যামলাল সরকার ১০নং অন্নদা ব্যানার্জ্জির লেন ভবানীপুর কলিকাতা।

৪২। শ্রীযুক্ত বাবু রামপদ বিশ্বাস ৩৮নং পুলিস হাসপাতাল রোড ইটালি কলিকাতা।

৪৩। শ্রীযুক্ত বাবু প্রকাশচন্দ্র সরকার সবডেপুটী কলেকটর বালুরঘাট দিনাজপুর।

৪৪। শ্রীযুক্ত বাবু নিরঞ্জন মাইতি (জমিদার) অরকুলি হাওড়া।

৪৫। শ্রীযুক্ত বাবু প্রমদাপ্রসন্ন বিশ্বাস ডাক্তার পাবনা।

৪৬। শ্রীযুক্ত বাবু ভবানন্দ চক্রবর্ত্তী উকিল চুয়াডাঙ্গা নদীয়া।

৪৭। শ্রীযুক্ত বাবু প্রিয়নাথ দাস কাঁচড়াপাড়া ২৪ পরগণা।

৪৮। শ্রীযুত বাবু সীতানাথ সরকার জমিদার ফুলবাড়ী পাবনা।

৪৯। শ্রীযুক্ত বাবু রমেশচন্দ্র তালুকদার বান্দাইখাড়া রাজসাহী।

৫০। শ্রীযুত বাবু নিরাপদ অধিকারী কালিপুর মদনপুর নদীয়া।

৫১। শ্রীযুক্ত বাবু যোগেন্দ্রনাথ পট্টনায়ক দ্বারিবেড়ো লক্ষ্যা মেদিনীপুর।

৫২। শ্রীযুক্ত বাবু নবকৃষ্ণ সরকার আমডহরা জিয়াগঞ্জ মুর্শিদাবাদ।

৫৩। শ্রীযুত বাবু রজনীকান্ত দাস কোটালপাড়া আমতা হাওড়া।

৫৪। শ্রীযুক্ত বাবু গোপালচন্দ্র দাস সোনাই থার্ড লেন খিদিরপুর কলিকাতা।

৫৫। শ্রীযুক্ত বাবু কীর্ত্তিবাস দাস গৌড়ী সারদাবসান সাগরবাড় মেদিনী-পুর।

৫৬। শ্রীযুক্ত বাবু শশীভূষণ হাজরা খালনা আমতা হাওড়া।

৫৭। শ্রীযুক্ত বাবু উপেন্দ্রনাথ মণ্ডল ৩৭।৩ কর্পোরেশন ষ্ট্রীট কলিকাতা।

৫৮। শ্রীযুক্ত বাবু অমৃতলাল হাজরা বি এল উকিল উলুবাড়ীয়া হাওড়া।

৫৯। শ্রীযুক্ত বাবু তারাপদ বিশ্বাস জমিদার বিলকোলা নদীয়া।

৬০। শ্রীযুক্ত বাবু পূর্ণচন্দ্র দেব সরকার ৩৭ বি কর্পোরেশন ষ্ট্রীট কলিকাতা।

৬১। শ্রীযুক্ত বাবু শ্রীপদ বিশ্বাস জমিদার বিলকোলা নদীয়া।

৬২। শ্রীযুক্ত বাবু গগনচন্দ্র বিশ্বাস বি সি ই ৩৬।১ হ্যারিসন রোড কলিকাতা।

৬৩। শ্রীযুক্ত বাবু শ্যামমোহন রায় ব্যাঁটরা হাওড়া।

৬৪। শ্রীযুক্ত বাবু শ্রীশচন্দ্র পুরকাইত উকিল ডায়মণ্ডহারবার ২৪ পরগণা।

৬৫। শ্রীযুক্ত বাবু জয়গোপাল দাস মোক্তার সোদপুর ২৪ পরগণা।

৬৬। শ্রীযুক্ত বাবু কেদার নাথ দাস বি এল উকিল ডায়মণ্ডহারবার ২৪ পরগণা।

৬৭। শ্রীযুত বাবু কার্ত্তিকচন্দ্র হাজরা (এস্ ডি ও, এম ডব্লিউ ডি) ডায়মণ্ডহারবার ২৪ পরগণা।

৬৮। শ্রীযুক্ত বাবু দেবেন্দ্র বিজয় রায় পুলিস ইনেস্পেক্টর মেদিনীপুর।

৬৯। শ্রীযুক্ত বাবু বনমালি পাল চন্দননগর হুগলি।

৭০। শ্রীযুক্ত বাবু সুরেন্দ্রনাথ রায় তাজপুর হাওড়া।

৭১। শ্রীযুক্ত বাবু অতুলচন্দ্র সরকার ১২১নং ঢাকুরিয়া রোড কালিঘাট।

৭২। শ্রীযুক্ত বাবু যোগেন্দ্রনাথ মণ্ডল ৩১ কাসুন্দিয়া রোড হাওড়া।

৭৩। শ্রীযুক্ত বাবু হরিমোহন সরকার ১২১ ঢাকুরিয়া রোড কালিঘাট কলিকাতা।

৭৪। শ্রীযুক্ত বাবু বসন্তকুমার হাজরা বড়ময়রা আমতা হাওড়া।

৭৫। শ্রীযুক্ত বাবু নগেন্দ্রনাথ দোলুই রসপুর হাওড়া।

৭৬। শ্রীযুক্ত বাবু দামোদর পাত্র বালিচক রসপুর হাওড়া।

৭৭। শ্রীযুক্ত বাবু রামনারায়ন মাইতি হোগলাসী শ্যামপুর হাওড়া।

৭৮। শ্রীযুক্ত বাবু চারুচন্দ্র দাস রতনপোতা আমতা হাওড়া।

৭৯। শ্রীযুক্ত বাবু কার্ত্তিকচন্দ্র দেয়াসী কোটালপুর আমতা হাওড়া।

৮০। শ্রীযুক্ত বাবু গিরিশচন্দ্র পাত্র চাকপোতা আমতা হাওড়া।

৮১। শ্রীযুক্ত বাবু অনন্তকুমার দাস সোনাই থার্ডলেন খিদিরপুর কলিকাতা।

৮২। শ্রীযুক্ত বাবু কালিপদ দাস অন্নদা ব্যানার্জ্জির লেন ভবানীপুর কলিকাতা।

৮৩। পণ্ডিত শ্রীযুক্ত শ্রীধরচন্দ্র ভক্তিরত্ন তমলুক।

৮৪। শ্রীযুক্ত বাবু পূর্ণচন্দ্র চক্রবর্ত্তী সড়াবাড়ীয়া আন্দুলবাড়ীয়া নদীয়া।

৮৫। শ্রীযুত বাবু সুরেন্দ্রনাথ চক্রবর্ত্তী বাড়াদী মুন্সীগঞ্জ নদীয়া।

৮৬। শ্রীযুক্ত বাবু বিপ্রদাস বিশ্বাস পারকৃষ্ণপুর দর্শনা নদীয়া।

৮৭। শ্রীযুত বাবু প্রমথনাথ চক্রবর্ত্তী বলরামবাটী সিঙ্গুর হুগলি।

৮৮। শ্রীযুক্ত বাবু মন্মথনাথ চক্রবর্ত্তী বলরামবাটী সিঙ্গুর হুগলি।

৮৯। শ্রীযুক্ত বাবু শরচ্চন্দ্র বিশ্বাস সিকারপুর নদীয়া।

৯০। শ্রীযুক্ত বাবু ফকিরচন্দ্র দাস সাঁকরেল হাওড়া।

৯১। শ্রীযুক্ত বাবু ত্রৈলোক্যনাথ বিশ্বাস গাড়াবাড়ীয়া কাথুলি নদীয়া।

৯২। শ্রীযুক্ত বাবু দেবেন্দ্রনাথ দাস চাতরা বাদামতলা শ্রীরামপুর হুগলি।

৯৩। শ্রীযুক্ত বাবু উমেশচন্দ্র দাস কোন্নগর হুগলি।

৯৪। শ্রীযুক্ত বাবু চন্দ্রনাথ দাস (কণ্ট্রাক্টার) পরুই—বেহালা ২৪ পরগণা।

৯৫। ,, ,, অবিনাশচন্দ্র সরকার রসারোড ভবানীপুর কলিকাতা।

৯৬। ,, ,, ভবতারণ সাঁতরা ডি এন্ বল্লভ ফারম শ্যামবাজার কলিকাতা।

৯৭। শ্রীযুক্ত বাবু সুরেন্দ্রনাথ দাস ডি এন্ বল্লভ ফারম শ্যামবাজার কলিকাতা।

৯৮। শ্রীযুক্ত বাবু দুর্লভচন্দ্র দাস ডি এন বল্লভ ফারম শ্যামবাজার কলিকাতা।

৯৯। শ্রীযুক্ত বাবু মনিমোহন হাজরা বড়ময়রা আমতা হাওড়া।

১০০। শ্রীযুক্ত বাবু উমাচরণ দাস ১২ পানবসান লেন ইটালি কলিকাতা।

১০১। শ্রীযুক্ত বাবু অবিনাশচন্দ্র দাস ৩৬ পুলিষ হাসপাতাল রোড ইটালি কলিকাতা।

১০২। শ্রীযুক্ত বাবু কেদারনাথ দাস ৩৮ নং পুলিষ হাসপাতাল রোড ইটালি কলিকাতা।

১০৩। শ্রীযুক্ত বাবু হরিমোহন দাস পুলিষ হাসপাতাল রোড ইটালি কলিকাতা।

১০৪। শ্রীযুক্ত বাবু যদুনাথ মণ্ডল ১ নং উড়িয়াপাড়া লেন ইটালি কলিকাতা।

১০৫। শ্রীযুক্ত বাবু বিনোদবিহারি দাস পুলিষ হাসপাতাল রোড ইটালি কলিকাতা।

১০৬। শ্রীযুক্ত বাবু ললিতমোহন দাস পুলিষ হাসতাল রোড ইটালি কলিকাতা।

১০৭। শ্রীযুক্ত বাবু প্রিয়নাথ মান্না ৩নং উড়িয়াপাড়া লেন ইটালি কলিকাতা।

১০৮। শ্রীযুক্ত বাবু বিষ্ণুপদ দাস ৪২।১০ ডাক্তারের লেন তালতলা কলিকাতা

১০৯। শ্রীযুত বাবু গনেশচন্দ্র দাস ১০ শাখারিবাজার রোড ইটালি কলিকাতা।

১১০। শ্রীযুক্ত বাবু মন্মথনাথ পাল সেক্রেটারি অমরপুর, মধ্য ইংরাজী স্কুল বর্দ্ধমান।

১১১। শ্রীযুক্ত বাবু কেদারনাথ রায় চৌধুরী আরামবাগ হুগলি।

১১২। শ্রীযুত এন সি দাস ব্যারিষ্টার মৈমনসিং।

১১৩। শ্রীযুক্ত বাবু আনন্দগোপাল চক্রবর্ত্তী বালিগঞ্জ ২৪ পরগনা।

১১৪। শ্রীযুক্ত বাবু যোগেন্দ্রনাথ দাস সিতি সেণ্ট্রাল রোড কাশিপুর কলিকাতা।

৮। তৎপর সভাপতি মহাশয়ের প্রস্তাবে এবং সর্ব্বসম্মতিক্রমে নিম্নলিখিত মহোদয়গণ আগামী বৎসরের জন্য কার্য্য নির্ব্বাহক সভার সদস্য নির্ব্বাচিত হইলেন :—

১। শ্রীযুক্ত মহেন্দ্রনাথ রায় এম এ বি এল উকীল হাইকোর্ট সভাপতি।

২। ,, ভূপতিনাথ দাস এম্ এ বি এস সি (লণ্ডন) প্রফেসার ঢাকা কলেজ সহঃসভাপতি।

৩। ,, প্যারীমোহন সিকদার বি এ বি এল উকীল হাইকোর্ট ,,

৪। ,, মন্মথনাথ মণ্ডল জমিদার পারুলিয়া ডায়মণ্ডহারবার ,,

৫। ,, বি এন্ শাসমল বার-অ্যাট্-ল সম্পাদক।

৬। ,, ধনপতি দাস এম এ সহঃসম্পাদক।

৭। ,, শ্যামলাল সরকার ,,

৮। ,, রামপদ বিশ্বাস ,,

৯। ,, হরিশচন্দ্র চক্রবর্ত্তী ,,

১০। ,, হরিদাস সিহ ধনাধ্যক্ষ।

১১। ,, সতীশচন্দ্র দাস এল আর সি পি এণ্ড এস্ (এডিনবরা) হিসাব পরীক্ষক।

১২। ,, নারায়ণপদ দাস বি এল উকীল ডায়মণ্ডহারবার ,,

১৩। ,, মন্মথনাথ রায় এম্ এ বি এল (প্রেমচাঁদ রায়চাঁদ স্কলার) সভাপতি সাহিত্য ছাত্রসম্মিলনী।

১৪। ,, পণ্ডিত মহেন্দ্রনাথ তত্ত্বনিধি সম্পাদক সাহিত্য-বান্ধব।

১৫। ,, উপেন্দ্রনাথ বিশ্বাস এম্ এ বি এল মুন্সেফ ডায়মণ্ডহারবার

১৬। ,, ক্ষীরোদনারায়ণ ভূঞ্যা এম্ এ বি এল উকীল হাইকোর্ট।

১৭। এবং নির্ব্বাচন সমিতির সদস্যগণ। (৯ প্রস্তাব দ্রষ্টব্য)

অতঃপর যাঁহারা কার্য্য নির্ব্বাহক সভার সভ্য নিযুক্ত হইবেন তাঁহাদের নাম এই তালিকা ভুক্ত হইবে।

৯। তৎপর সভাপতি মহাশয়ের প্রস্তাবে এবং সর্ব্ব সম্মতি ক্রমে নিম্নলিখিত মহোদয়গণ নির্ব্বাচন সমিতির সদস্য মনোনীত হইলেন :—

১। শ্রীযুক্ত মহেন্দ্র নাথ রায় এম্ এ বি এল উকীল হাইকোট, সভাপতি

২। ,, বি এন্ শাষমল ব্যারিষ্টার সম্পাদক।

৩। ,, হরিদাস দাস সি ই ধনাধ্যক্ষ।

৪। ,, মন্মথ নাথ রায় এম এ বি এল, রায়চাঁদ প্রেমচাঁদ স্কলার, সভাপতি, মাহিত্য ছাত্র সম্মিলনী।

৫। ধনপতি দাস এম্ এ, সম্পাদক মাহিত্য ছাত্র সম্মিলনী।

৬। ,, গগন চন্দ্র বিশ্বাস বি সি ই নদিয়া।

৭। ,, প্যারী মোহন সিকদার বি এল ফরিদপুর।

৮। ,, রামকৃষ্ণ মণ্ডল বি এল ২৪ পরগণা।

৯। ,, সুরেন্দ্র নাথ সর্দ্দার এল্ এম্ এস খুলনা।

১০। ,, দেব নাথ মজুমদার পাবনা।

১১। ,, মন্মথ নাথ পাল বর্দ্ধমান।

১২। ,, কেদার নাথ দাস বি, সি, ই, হুগলী।

১৩। ,, এন সি দাস বার-অ্যাট ল্ ময়মানসিংহ।

অতঃপর যাঁহারা এই সমিতির সভ্য নির্ব্বাচিত হইবেন তাঁহাদিগের নাম এই তালিকা ভুক্ত হইবে।

১০। তৎপর সভাপতি মহাশয়ের প্রস্তাবে এবং সর্ব্ব সম্মতি ক্রমে গৃহীত হইল যে নির্ব্বাচন সমিতির অনুমোদনে কার্য্য নির্ব্বাহক সভা কর্ত্তৃক সমস্ত সাহায্য প্রদান করা হইবে।

১১। দরখাস্ত কারী ছাত্রের যোগ্যতা এবং সাহায্যের পরিমাণ নির্দ্ধারণ করাই নির্ব্বাচন সমিতির কর্ত্তব্য স্থিরীকৃত হইল।

১২। তৎপরে সভাপতি মহাশয়ের প্রস্তাবে এবং সর্ব্ব সম্মতি ক্রমে গৃহীত হইল যে বর্ত্তমান তারিখ ও সময় পর্য্যন্ত যে ১৫০০ টাকা দানের প্রতিশ্রুতি পাওয়া গিয়াছে তাহা হইতে মাসিক ৫০৲ টাকা এবং অতঃপর যাহা আদায়

হইবে তাহার মধ্যে শতকরা ২০ টাকা হিসাবে আগামী বৎসরের জন্য খরচ করা হইবে।

১৩। ভাণ্ডারের নিমিত্ত একটী Board of Trust প্রয়োজন কিনা তাহা কার্য্য নির্ব্বাহক সভা বিবেচনা করিবেন স্থিরীকৃত হইল।

১৪। সভাস্থলে নিম্নলিখিত মহোদয়গণের নিকট হইতে সাহায্য প্রাপ্ত হওয়া গেল।—

	নাম	ধাম	সাহায্যের পরিমাণ।
১।	শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্র নাথ রায়,	তাজপুর, হাওড়া	২৲
২।	,, দেবেন্দ্র বিজয় রায়,	পুলিষ সব-ইন্‌স্পেক্টার, মেদিনিপুর	৫৲
৩।	,, বনমালী পাল,	চন্দননগর হুগলী	৫৲
৪।	,, অতুল চন্দ্র সরকার,	১২১ ঢাকুরিয়া রোড কালিঘাট	২৲
৫।	,, যোগেন্দ্র নাথ মণ্ডল,	৩১ কাসুণ্ডিয়া রোড হাওড়া	১৲
৬।	,, হরিনারায়ণ সরকার,	১২১ ঢাকুরিয়া রোড কালিঘাট	৫৲
৭।	,, বসন্ত কুমার হাজরা,	বড়মোহরা আমতা হাওড়া	৫৲
৮।	,, জয় গোপাল দাস,	মোক্তার সোদপুর ২৪ পরগণা	২৲
৯।	,, নগেন্দ্র নাথ দলুই,	রসপুর আমতা হাওড়া	১৲
১০।	,, দামোদর পাত্র,	বালিচক রসপুর হাওড়া	২৲
১১।	,, রাম নারায়ন মাইতি,	হোগলসি শ্যামপুর হাওড়া	১০৲
১২।	,, চারু চন্দ্র দাস,	রতনপোতা আমতা	২৲
১৩।	,, শশীভূষণ হাজরা,	খালনা, আমতা	১৲
১৪।	,, কার্ত্তিক চন্দ্র দেয়াসী,	কোটাল পাড়া আমতা	১৲
১৫।	,, গিরিশ চন্দ্র পাত্র,	চাকপোতা আমতা	১৲
১৬।	,, অনন্ত কুমার দাস,	সোণাই বাজার থার্ডলেন খিদিরপুর, কলিকাতা	৫৲
১৭।	,, জনৈক মহিলা—		১৲

১৫। তৎপরে নিম্নলিখিত মহোদয়গণ এককালীন দান করিতে প্রতিশ্রুত হইলেন।—

	নাম	ধাম	প্রতিশ্রুত দানের পরিমাণ
১।	শ্রীমতী ঠাকুর দাসী বিশ্বাস, জমিদার জানবাজার কলিকাতা		১০০০৲
২।	শ্রীযুক্ত প্রসন্ন কুমার চৌধুরী, জমিদার		৫০০৲
৩।	,, নরেন্দ্র নাথ দাস, ইটালী		৫০০৲
৪।	,, মহেন্দ্র নাথ রায়, এম্ এ বি, এল উকিল হাইকোর্ট		৫০০৲
৫।	,, বি এন্ দাস, প্রফেসার ঢাকা কলেজ		১০০৲
৬।	,, বি এন্ শাষমল, ব্যারিষ্টার		১০০৲
৭।	,, হরিদাস দাস, সি, ই, ভবানীপুর, কলিকাতা		১০০৲
৮।	,, দেবনাথ মজুমদার, দিঘাপতিয়া রাজএষ্টেট্		১০০৲
৯।	গগন চন্দ্র বিশ্বাস, বি সি ই ৩৬।১ হ্যারিসনরোড কলিকাতা		১০০৲
১০।	,, রামকৃষ্ণ মণ্ডল, বি-এল, ডায়মণ্ডহারবার		৫০৲
১১।	,, ডাক্তার এস্ সি দাস, কলিকাতা		৫০৲
১২।	,, ক্ষীরোদ নারায়ণ ভুঞ্যা, উকিল হাইকোট		৫০৲
১৩।	,, প্যারী মোহন শিকদার, উকিল হাইকোট		৫০৲
১৪।	,, বৃন্দাবন চন্দ্র সরকার, জমিদার গয়া		৫০৲
১৫।	,, সুরেন্দ্র নাথ সর্দ্দার, এল্ এম, এস্ কলিকাতা		৫০৲
১৬।	,, কেদার নাথ দাস, বি সি ই (মাসিক ৫৲ হিঃ)		৫০৲
১৭।	,, উপেন্দ্র নাথ বিশ্বাস, এম্ এ বি এল মুন্সেফ ডায়মণ্ড হারবার		৫০৲
১৮।	,, বঙ্কিম চন্দ্র মণ্ডল, ১২ সাথারি টোলা ইষ্টলেন কলিকাতা		২৫৲
১৯।	,, শরচ্চন্দ্র হাজরা, খিদিরপুর কলিকাতা		২০৲
২০।	,, গদাধর হালদার, মোক্তার ডায়মণ্ড হারবার		১০৲
২১।	,, উপেন্দ্র নাথ সরকার		১০৲
২২।	,, অঘোর নাথ দাস, নেপাল ভট্টাচার্য্যের লেন কালিঘাট		১০৲
২৩।	,, উপেন্দ্র নাথ হাজরা, খিদিরপুর কলিকাতা		১০৲
২৪।	,, এক কড়ি কোলে, হেড মাষ্টার অমরপুর বিমলা মধ্য ইংরাজি স্কুল বর্দ্ধমান		৫৲
২৫।	,, মতি লাল চক্রবর্ত্তি, কোঁড়ার বাগান হাওড়া		৫৲

	নাম	ধাম	প্রতিশ্রুত দানের পরিমাণ
২৬।	শ্রীযুক্ত কেদার নাথ দলুই	হাওড়া	৫৲
২৭।	,, কালী চরণ দাস		৫৲
২৮।	,, উমেশ চন্দ্র চক্রবর্ত্তি, সিঙ্গুর হুগলী		৫৲
২৯।	,, আশুতোষ দাস, বেলিয়াঘাটা স্বদেশী এজেন্সী		১০৲
৩০।	ডাঃ শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রনাথ সর্দ্দারের, জনৈক বন্ধু		১৲
৩১।	শ্রীযুক্ত কৃষ্ণকালী রায়, চেতলা আলিপুর		১৲
৩২।	,, অমূল্যচরণ চক্রবর্ত্তী		২৲
৪৩।	ডাঃ শ্রীযুক্ত যোগেন্দ্রনাথ বিশ্বাস, চিথোলিয় নদীয়া		১০৲
৩৪।	শ্রীযুক্ত কৃষ্ণদাস মণ্ডল, বি-এল উকীল		২৲
৩৫।	,, প্রকাশচন্দ্র সরকার, বালুরঘাট		৫৲
৩৬।	,, গোবিন্দচন্দ্র মণ্ডল, হেডমাষ্টার সসাটী হাই স্কুল		৫৲
৩৭।	,, হরিশচন্দ্র চক্রবর্ত্তী, তুল্যা হাওড়া		৫৲
৩৮।	,, প্রকাশচন্দ্র সরকার, উকীল হাইকোর্ট		৫৲
৩৯।	,, নিরঞ্জন মাইতি, অরফুলি হাওড়া		৫৲
৪০।	ডাঃ শ্রীযুক্ত প্রমোদাপ্রসন্ন বিশ্বাস, পাবনা		৫৲
৪১।	শ্রীযুক্ত ভবানন্দ চক্রবর্ত্তী, উকীল চুয়াডাঙ্গা নদীয়া		১০৲

১৬। নিম্নলিখিত মহোদয়গণ বার্ষিক ও মাসিক চাঁদা দিতে প্রতিশ্রুত হইলেন

নাম	ধাম	বার্ষিক চাঁদার পরিমাণ।
শ্রীযুক্ত বি এন দাস, প্রফেসর ঢাকা কলেজ		১০৷৹
,, সীতানাথ সরকার, ফুলবাড়ি পাবনা		২৲
,, রমেশচন্দ্র তালুকদার		২৲
,, নীরাপদ অধিকারী, কালীপুর নদিয়া		২৲
,, নবকৃষ্ণ সরকার, আমডাহারা মুরশিদাবাদ		১৲
,, যোগেন্দ্রনাথ পট্টনায়ক, ঝারিবেড়্যা		১৲

	মাসিক চাঁদার পরিমাণ।
শ্রীযুক্ত বি-এন শাষমল	১৲
,, হরিদাস দাস	২৲
,, কৃষ্ণকালী রায়	২৲
,, রজনীকান্ত দাস	১৲

মাসিক চাঁদার পরিমাণ

শ্রীযুক্ত কৃত্তিবাস দাস, গৌড়ী সারদাবসান মেদিনীপুর ১৲
,, গোপালচন্দ্র দাস ১৲
,, অমৃতলাল হাজরা, উকিল উলুবেড়িয়া ১৲
,, শশীভূষণ হাজরা ১৲
,, উপেন্দ্রনাথ মণ্ডল ১৲
,, পূর্ণচন্দ্র দেব সরকার ১৲

১৭। কাঁচড়াপাড়া নিবাসী শ্রীযুক্ত বাবু প্রিয়নাথ দাস মহাশব সাহিত্য-ব্যাঙ্কিং এণ্ড ট্রেডিং কোম্পানির তাঁহার ১০০ টাকা অংশের লাভাংশ এবং গয়ার জমিদার শ্রীযুক্ত বাবু বৃন্দাবন চন্দ্র সরকার মহাশয় কল্যাণ কটন মিলের তাঁহার দুই শত টাকার অংশের লভ্যাংশ এই শিক্ষা বিস্তার ভাণ্ডারে দান করিবেন বলিয়া প্রতিশ্রুত হইলেন।

১৮। অতঃপর শ্রীযুক্ত প্যারীমোহন সিকদার মহাশয়ের প্রস্তাবে এবং শ্রীযুক্ত গগনচন্দ্র বিশ্বাস মহাশয়ের সমর্থনে সভাপতি মহাশয়কে ধন্যবাদ প্রদানন্তর সভাভঙ্গ করা হইল।

ভাণ্ডারের নিয়মাবলী (উদ্দেশ্য)।

১। সাহায্যোপযোগী সাহিত্য এবং গৌড়াদ্য বৈদিকশ্রেণীর ব্রাহ্মণ বালকগণের শিক্ষার সুবন্দোবস্ত করাই সাহিত্য-শিক্ষা-বিস্তার ভাণ্ডারের একমাত্র উদ্দেশ্য। জাতীয় অথবা অন্য কোনপ্রকার সামাজিক বিষয় ইহার উদ্দেশ্যের অন্তর্ভুক্ত থাকিবে না।

২। একটী সাধারণ সভা, একটী কার্য্যনির্ব্বাচক সভা একটী নির্ব্বাচন সমিতি এবং একটি ট্রষ্ট ফণ্ড লইয়া এই শিক্ষাবিস্তার ভাণ্ডার গঠিত হইবে।

সাধারণ সভা।

৩। সাধারণ সভার দুই জন স্থায়ী সভ্য কর্ত্তৃক প্রস্তাবিত এবং অনুমোদিত হইলে যে কোন ব্যক্তি উহার সভ্য হইতে পারিবেন।

৪। ১৮ বৎসর বয়সের কম কোন ব্যক্তিই সাধারণ সভার সভ্য নির্ব্বাচিত হইতে পারিবেন না, কোন বিশেষ ক্ষেত্রে সাধারণ সমিতি বিবেচনা করিতে পারিবেন।

৫। সাধারণ সভা যে কোন ব্যক্তিকে ইহার অবৈতনিক আজীবন সভ্য নির্ব্বাচিত করিয়া লইতে পারিবেন।

৬। সাধারণ সভ্যগণকে মাসিক অন্ততঃ এক টাকা করিয়া চাঁদা দেওয়া আবশ্যক।

৭। প্রতি ছয় মাস অন্তর একবার করিয়া কার্য্য নির্ব্বাহক সভার অধিবেশন হইবে। অধিবেশনের অন্ততঃ ১৫ দিন পূর্ব্বে ভাণ্ডারের সভ্যগণকে লিখিত নোটিশ দিতে হইবে। কোন অত্যাবশ্যক এবং অপরিহার্য্য কারণে ভাণ্ডারের কর্ম্মাধ্যক্ষগণ অধিকাংশের মতে এই নিয়মের পরিবর্ত্তন ও সংস্কার করিয়া লইতে পারিবেন।

৮। প্রয়োজনবোধে ভাণ্ডারের সভ্যগণকে যথাসময়ে নোটিশ দিয়া কার্য্য নির্ব্বাহক সমিতি অন্য কোন সময়েও সাধারণ সভার অধিবেশন আহ্বান করিতে পারিবেন।

৯। কোন বিশেষ প্রয়োজনে অধিকাংশ সভ্য হেতু নির্দ্দেশ পূর্ব্বক ভাণ্ডারের বিশেষ অধিবেশন আহ্বান করাইবার জন্য সম্পাদক মহাশয়কে অনুরোধ করিয়া পত্র লিখিলে সম্পাদক মহাশয় ঐ পত্র প্রাপ্তির তারিখ হইতে একমাস মধ্যে ঐ সভার বিশেষ অধিবেশন আহ্বান করিবেন। বিষয় উল্লেখ করিয়া অন্ততঃ ১৫ দিন পূর্ব্বে সভ্যগণকে অধিবেশনের নোটিশ দিতে হইবে।

১০। সাধারণ সভার বার্ষিক অধিবেশনে সম্পাদক মহাশয় স্বয়ং অথবা তাঁহার পক্ষে অন্য কোনও ব্যক্তি গত বৎসরের আয়ব্যয়ের হিসাব এবং কার্য্য বিবরণী ও পরবর্ত্তী বৎসরেব আনুমানিক তালিকা প্রস্তুত করিয়া তাহা অনুমোদনার্থ উপস্থাপিত করিবেন।

১১। সাধারণ সভার অন্ততঃ ১৫ জন সভ্য উপস্থিত হইলেই অধিবেশনের কার্য্য চলিতে পারিবে।

১২। সভাপতি মহাশয়ের কেবল একটী মাত্র ভোট (casting vote) থাকিবে।

১৩। সাধারণ সভার প্রত্যেক বার্ষিক অধিবেশনে কার্য্য নির্ব্বাহক সমিতির সদস্য এবং ভাণ্ডারের কর্ম্মাধ্যক্ষগণ নূতন করিয়া নির্ব্বাচিত হইবেন।

১৪। পূর্ব্ব এবং পরবর্ত্তী কারণ ব্যতীত বার্ষিক সাধারণ সভার বিনা অনুমোদনে এই সকল নিয়মের কোন পরিবর্ত্তন ঘটিবে না।

১৫। সাধারণ সভার কোন বিশেষ অধিবেশনে উপস্থিত সভ্যগণ সেই দিনের জন্য তাঁহাদের সভাপতি নির্ব্বাচন করিয়া লইবেন।

১৬। সাধারণ সভার কার্য্য কোন কারণে মুলতবী থাকিলে প্রথম দিনের সভাপতিই পরবর্ত্তী অধিবেশনের সভাপতি থাকিবেন।

১৭। সভার সংক্ষিপ্ত বিবরণী সম্পাদক মহাশয় একখানি কার্য্য বিবরণ পুস্তকে লিপিবদ্ধ করিয়া রাখিবেন।

১৮। সভার ষাণ্মাসিক এবং বার্ষিক অধিবেশনে ভাণ্ডার সংক্রান্ত যে কোন প্রয়োজনীয় বিষয় দুই জন সভ্য কর্ত্তৃক যথারীতি প্রস্তাবিত ও সমর্থিত এবং অধিকাংশ সভ্য কর্ত্তৃক গৃহীত হইলে তাহা আলোচিত হইতে পারিবে।

১৯। সম্পাদকের নিকট পত্র লিখিয়া বা কার্য্যালয়ে উপস্থিত হইয়া ভাণ্ডারের অবস্থা, বিধিব্যবস্থা এবং অন্যান্য সংবাদ জ্ঞাত হইবার এবং কার্য্যালয়ে স্বয়ং আসিয়া সম্পাদকের সম্মতিক্রমে হিসাব ও অন্যান্য খাতাপত্র দেখিবার অধিকার সদস্যের থাকিবে।

২০। ষাণ্মাষিক, বার্ষিক অথবা কোন বিশেষ অধিবেশনে উপস্থিত সভ্যগণ মধ্যে অন্যূন ত্রিচতুর্থাংশের সম্মতি থাকিলে, সাধারণ সভা উপযুক্ত কারণে ভাণ্ডারের যে কোন কর্ম্মাধ্যক্ষকে অপসারিত করিয়া অন্য কাহাকেও সেই পদে নিযুক্ত করিতে পারিবেন। এই নিয়মের জন্য ৫০ জন সভ্য উপস্থিত হইলেই সভার কার্য্য আরম্ভ হইবে।

কার্য্যনির্ব্বাহক সমিতি।

১। সাধারণ সভার যে কোন সদস্য এই সমিতির সভ্য নিযুক্ত হইতে পারিবেন।

২। প্রতিমাসে অন্ততঃ একবার করিয়া কার্য্য নির্ব্বাহক সমিতির অধিবেশন হইবে। অন্ততঃ সাত দিন পূর্ব্বে সভ্যগণকে লিখিয়া জানাইতে হইবে।

৩। কার্য্য নির্ব্বাহক সমিতির মাসিক অধিবেশনে সম্পাদক মহাশয় স্বয়ং অথবা তাঁহার স্থলাভিষিক্ত অন্য কোন ব্যক্তি পূর্ব্ববর্ত্তী মাসের আয় ব্যায়ের হিসাব এবং কার্য্য বিবরণী উপস্থিত করিবেন।

৪। সভাপতি এবং সহকারী সভাপতিগণের মধ্যে কেহ অধিবেশনে উপস্থিত না থাকিলে উপস্থিত সভ্যগণ উপযুক্ত ব্যক্তির নিয়োগ দ্বারা সেই দিনের কার্য্য পরিচালন করিবেন।

৫। সভাপতি মহাশয়ের একটী মাত্র ভোট (Casting vote) থাকিবে।

৬। কার্য্যনির্ব্বাহক সভায় ৫জন সভ্য উপস্থিত হইলেই সভার কার্য্য আরম্ভ হইবে।

৭। স্থানীয় সভ্যদিগের মধ্যে কোন সভ্য উপর্য্যুপরি ৩টী সভায় যোগদান না করিলে তাঁহাকে আর সভ্য বলিয়া গণ্য করা হইবে না, কোন বিশেষক্ষেত্রে কার্য্যনির্ব্বাহক সভা বিবেচনা করিতে পারিবেন।

৮। সভার কার্য্যবিবরণী সম্পাদক মহাশয় সমিতির কার্য্যবিবরণ পুস্তকে লিপিবদ্ধ করিবেন, সম্পাদকের স্বাক্ষর ব্যতীত এই সকল বিবরণী কোন সংবাদ পত্রে প্রকাশ করিবার জন্য প্রেরিত হইতে পারিবে না। কোনও সভ্য এই নিয়মের ব্যতিক্রম করিলে তাঁহার নাম সভ্যের তালিকা হইতে অপসারিত করিয়া দেওয়া হইবে।

৯। কার্য্যনির্ব্বাহক সভার সদস্যগণকে মাসিক অন্ততঃ দুই টাকা করিয়া সাহায্য করা আবশ্যক।

নির্ব্বাচন সমিতি।

১। নির্ব্বাচন সমিতির সভ্যগণ প্রার্থনাকারী ছাত্রের আবেদন পত্র সম্বন্ধে মীমাংসা করিবেন এবং অধিকাংশ সভ্য একমত হইয়া যে অভিমত প্রকাশ করিবেন তদনুযায়ী কার্য্য হইবে।

২। কার্য্য নির্ব্বাহক সমিতির অনুমোদনে নির্ব্বাচন সমিতি আবশ্যকীয় নিয়মাদি প্রণয়ন করিয়া লইতে পারিবেন।

৩। তিন জন সভ্য উপস্থিত হইলেই কার্য্য চলিতে পারিবে।

৪। মাসিক এবং বার্ষিক চাঁদা, এককালীন দান এবং অন্যান্য যে কোন প্রকারের সাহায্য লইয়া ভাণ্ডারের ফণ্ড গঠিত হইবে।

ভাণ্ডারের সাহায্য প্রাপ্তিস্বীকার।

শ্রীযুক্ত বাবু	মন্মথ নাথ পাল, সাং অমরপুর বর্দ্ধমান	১০০৲
,,	দুর্ল্লভ চন্দ্র দাস, সাং মোহনপুর, বর্দ্ধমান	৫৲
,,	এককড়ি কোলে, অমরপুর, বর্দ্ধমান	৫৲
,,	ভবতারণ সাঁতরা, সাং বড় ডিঙ্গরা, বর্দ্ধমান	৫৲
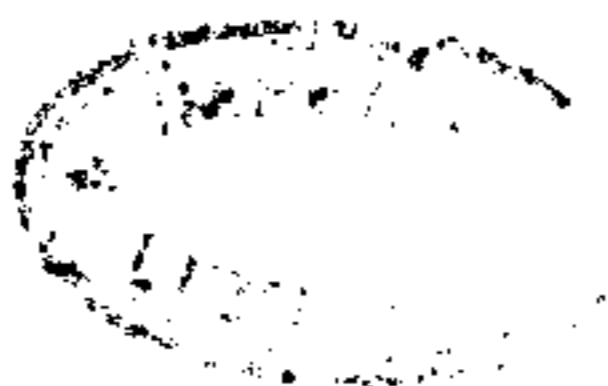
ক্রমশঃ—

মাহিষ্য-সমাজ কার্য্যালয়ে বিক্রেয় পুস্তকের তালিকা।

সুকবি শ্রীযুক্ত ক্ষিতিনাথ দাস প্রণীত বিবাহিত যুবক যুবতীর শিক্ষার জন্য দুইখানি নূতন গ্রন্থ (১) দাম্পত্য চিত্র——অপূর্ব্ব নাট্যকাব্য মূল্য ৮০ আনা, সুন্দর বাঁধাই ১।০ (২) বৌ-কথা-কও——সরল সামাজিক গদ্য কাব্য মূল্য ।৶১০ আনা। কবি শ্রীযুক্ত রেবতীরঞ্জন রায় প্রণীত (৩) প্রেমের স্বপন মূল্য ।০ আনা। (৪) মাহিষ্য-বিবৃতি (যন্ত্রস্থ)। (৫) ভ্রান্তি-বিজয়—— যন্ত্রস্থ) (৬) The Mahishyas-মূল্য ১৲ টাকা। (৭) মাহিষ্য- সমাজ—— সামাজিক পুস্তক —১৩১৭ সালে প্রকাশিত কেবল মাত্র ডাকমাশুল ৶০ দুই আনা পাঠাইলেই পাইবেন। (৮) মাহিষ্য-প্রদীপ ৶০ আনা। (৯) মাহিষ্যপ্রকাশ ২৲ টাকা। (১০) দিয়াশলাই-প্রস্তুত প্রণালী ৶০ আনা। (১১) আচার্য্য ব্রাহ্মণ ১৲ টাকা। (১২) গৌড়াদ্যবৈদিক ব্রাহ্মণ-পরিচয় ／০ আনা। (১৩) সার্ভে ও সেটেলমেণ্টে প্রজার কর্ত্তব্য ।০ আনা। (১৪) বঙ্গীয় মাহিষ্য-পুরোহিত ।০ আনা। (১৫) তমলুকের ইতিহাস ১৲ টাকা। (১৬) রাণী রাসমণি ॥০ আনা। (১৭) উচ্ছাস ॥০ আনা।

মাহিষ্য ব্যাঙ্কিং এণ্ড ট্রেডিং কোং লিঃ।

মাহিষ্য সমাজে কৃষি বাণিজ্য এবং শিল্পের উন্নতি সাধন জন্য মাহিষ্য ব্যাঙ্কিং এবং ট্রেডিং কোম্পানি গঠিত হইয়াছে। ইহার উদ্দেশ্য আসল টাকা বজায় রাখিয়া লাভের তিন ভাগ অংশীদারগণকে প্রদান করিয়া অবশিষ্ট এক ভাগ দ্বারা জাতীয় কার্য্য সকল সম্পাদন করা ইহার আরও একটী মহৎ উদ্দেশ্য যে সকল মাহিষ্য পরিবার অপরাপর জাতির নিকট ঋণ গ্রহণ করিয়া ধ্বংশ প্রাপ্ত হইতেছেন তাঁহাদিগকে রক্ষা করা। বর্ত্তমান বৎসরে এই কোম্পানির কেবল মাত্র তেজারতি বিভাগ খুলিয়া অংশীদারগণকে শতকরা ৫৲ টাকা হিসাবে লাভাংশ দেওয়া হইয়াছে। অধিক পরিমাণে টাকা উঠিলেই মাহিষ্য ব্যাঙ্কিং এণ্ড ট্রেডিং কোম্পানির জমিদারী, কৃষি এবং বাণিজ্য বিভাগ খোলা হইবে। আশাকরি মাহিষ্য ভ্রাতাগণ সকলেই স্ব স্ব ক্ষমতা অনুযায়ী ইহার অংশ গ্রহণ করিবেন। অংশের মূল্য দশ টাকা মাত্র ৩৬।১ হ্যারিসন রোড সম্পাদকের নিকট পত্র লিখিয়া বিশেষ বিবরণ অবগত হউন।

ঘরে বসিয়াই মাসিক ত্রিশ টাকা রোজগার।

মাহিষ্য ব্যাঙ্কের এজেণ্টগণকে শতকরা দশ টাকা হিসাবে কমিশন দেওয়া হইবে। যাঁহারা বৃথা বসিয়া সময় কাটাইতেছেন তাঁহারা বিশেষ চেষ্টা করুন, ঘরে বসিয়াই মাসিক অন্ততঃ ত্রিশ টাকা রোজগার করিতে পারিবেন।

MAHISHYA-SAMAJ—REGISTERED No. C. 611.